রবীন্দ্র-রচনাবলী

সিংহল ॥ ১৯৩৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

বিশ্বভারতী
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ছাব্বিশটি খণ্ড এবং দুই খণ্ড অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের পর কিছুকাল গত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংকলন করে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক নূতন রচনাও সংযোগ করা হয়েছে।

এযাবৎ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি অথচ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এরূপ রচনা এই খণ্ডে সংগৃহীত হল।

যে-সব রচনা এপর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল না পরবর্তী এক বা ততোধিক খণ্ডে সেগুলি সংগৃহীত হবে।

২৫ বৈশাখ ১৩৭২

কবিতা ও গান

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেলো
সেই তারি আনন্দ॥

স্ফুলিঙ্গ

১

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি প্রিয়ে !
কুহেলী আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি ।

২

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে ।

৩

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধুলার 'পর,
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর ।

৪

অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে
প্রতিক্ষণে করিয়ো মার্জনা ।

৫

অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ,
জীবন কেবলই খোঁজা ।
অনেক বচন করেছি রচন,
জমেছে অনেক বোঝা ।
যা পাই নি তারি লইয়া সাধনা
যাব কি সাগরপার ?
যা গাই নি তারি বহিয়া বেদনা
ছিঁড়িবে বীণার তার ?

৬

অনেক মালা গেঁথেছি মোর
কুঞ্জতলে,
সকালবেলার অতিথিরা
পরল গলে।
সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা!
গাঁথব কি হায় ঝরা পাতায়
শুকনো মালা!

৭

অন্ধকারের পার হতে আনি
প্রভাতসূর্য মন্দ্রিল বাণী,
জাগালো বিচিত্রেরে
এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে।

৮

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে,
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,
হবে তার জয়।

৯

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে

১০

অপরাজিতা ফুটিল,
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

১১

অপাকা কঠিন ফলের মতন,
কুমারী, তোমার প্রাণ
ঘন সংকোচে রেখেছে আগলি
আপন আত্মদান।

১২

অবসান হল রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব-আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে—
এক পথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক চিনে।

১৩

অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে,
করে সে এ কী ভুল—
তারার মাঝে কাঁদিয়া খোঁজে
ঝরিয়া-পড়া ফুল।

১৪

অমলধারা ঝরনা যেমন
স্বচ্ছ তোমার প্রাণ,
পথে তোমার জাগিয়ে তুলুক
আনন্দময় গান।
সম্মুখেতে চলবে যত
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
দুই কূলেতে দেবে ভ'রে
সফলতার দান।

১৫

অস্তরবিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তরে বাকি রহে
পাণ্ডুবরন হাসি।

১৬

আকাশে ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।

ভিতরে নবীন থাকে
অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপাগাছে
নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে
অমৃতের ভাষা।

৩০

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই-যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
ভাবী কালের হাতে।

৩১

আয় রে বসন্ত, হেথা
কুসুমের সুষমা জাগা রে
শান্তিস্নিগ্ধ মুকুলের,
হৃদয়ের গোপন আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যাস রেখে,
সুবর্ণের তুলিখানি
পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে।

৩২

আলো আসে দিনে দিনে,
রাত্রি নিয়ে আসে অন্ধকার।
মরণসাগরে মিলে
সাদা কালো গঙ্গাযমুনার।

৩৩

আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে—
চলে যেতে জানে, তাই
চিরদিন থাকে।

৩৪

আশার আলোকে
জ্বলুক প্রাণের তারা,
আগামী কালের
প্রদোষ-আঁধারে
ফেলুক কিরণধারা।

৩৫

আসা-যাওয়ার পথ চলেছে
উদয় হতে অস্তাচলে,
কেঁদে হেসে নানান বেশে
পথিক চলে দলে দলে।
নামের চিহ্ন রাখিতে চায়
এই ধরণীর ধুলা জুড়ে,
দিন না যেতেই রেখা তাহার
ধুলার সাথে যায় যে উড়ে।

৩৬

ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই
যে আলোকে ভাইকে দেখিতে পায় ভাই।
ঈশ্বরপ্রণামে তবে হাতজোড় হয়
যখন ভাইয়ের প্রেমে মিলাই হৃদয়।

৩৭

ঊর্মি, তুমি চঞ্চলা
নৃত্যদোলায় দাও দোলা,
বাতাস আসে কী উচ্ছ্বাসে—
তরণী হয় পথ-ভোলা।

৩৮

এই যেন ভক্তের মন
বট অশ্বত্থের বন।
রচে তার সমুদার কায়াটি
ধ্যানঘন গম্ভীর ছায়াটি,

মর্মরে বন্দনমন্ত্র জাগায় রে
বৈরাগী কোন্ সমীরণ ।

৩৯

এই সে পরম মূল্য
আমার পূজার—
না পূজা করিলে তবু
শাস্তি নাই তার ।

৪০

এক যে আছে বুড়ি
জন্মদিনে দিলেম তারে
রঙিন সুরের ঘুড়ি ।
পাঠ্যপুঁথির পাতাগুলো
অবাক হয়ে রয়,
বৃদ্ধা মেয়ের উধাও চিত্ত
ফেরে আকাশ-ময় ।
কণ্ঠে ওঠে গুনগুনিয়ে
সারে গামা পাধা ।
গানে গানে জাল বোনা হয়
ম্যাট্রিকের এই বাধা ।

৪১

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে ।

৪২

এমন মানুষ আছে
পায়ের ধুলো নিতে এলে
রাখিতে হয় দৃষ্টি মেলে
জুতো সরায় পাছে

৪৩

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা,
চলে গেনু দিয়ে ভালোবাসা ।

৪৪

'এসো মোর কাছে'
শুকতারা গাহে গান।
প্রদীপের শিখা
নিবে চ'লে গেল,
মানিল সে আহ্বান।

৪৫

'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে'
কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে।
তারা বলে, 'যে তোরে জাগায়
মোর জাগা ঘোচে তার পায়।'

৪৬

ওড়ার আনন্দে পাখি
শূন্যে দিকে দিকে
বিনা অক্ষরের বাণী
যায় লিখে লিখে।
মন মোর ওড়ে যবে
জাগে তার ধ্বনি,
পাখার আনন্দ সেই
বহিল লেখনী।

৪৭

কঠিন পাথর কাটি
মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা।
অসীমেরে রূপ দিক্
জীবনের বাধাময় সীমা।

৪৮

'কথা চাই' 'কথা চাই' হাঁকে
কথার বাজারে;
কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বাণী যদি থাকে
মৌনে ঢাকিয়া রাখ্ তাকে
মুখর এ হাটের মাঝারে।

৪৯

কমল ফুটে অগম জলে,
তুলিবে তারে কেবা।
সবার তরে পায়ের তলে
তৃণের রহে সেবা।

৫০

কল্লোলমুখর দিন
ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে
সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল
পেতে চায় ফল।
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে
চলিছে চঞ্চল।

৫১

কহিল তারা, 'জ্বালিব আলোখানি।
আঁধার দূর হবে না-হবে,
সে আমি নাহি জানি।'

৫২

কাছে থাকি যবে
ভুলে থাকো,
দূরে গেলে যেন
মনে রাখো।

৫৩

কাছের রাতি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

৫৪

কাঁটার সংখ্যা
ঈর্ষাভরে
ফুল যেন নাহি
গণনা করে।

৫৫

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

৫৬

কী পাই, কী জমা করি,
কী দেবে, কে দেবে—
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চ'লে তো যেতেই হবে—
'কী যে দিয়ে যাব'
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবো।

৫৭

কী যে কোথা হেথা-হোথা যায় ছড়াছড়ি,
কুড়িয়ে যতনে বাঁধি দিয়ে দড়াদড়ি।
তবুও কখন শেষে
বাঁধন যায় রে ফেঁসে,
ধুলায় ভোলার দেশে
যায় গড়াগড়ি—
হায় রে, রয় না তার দাম কড়া কড়ি।

৫৮

কীর্তি যত গড়ে তুলি
ধূলি তারে করে টানাটানি।
গান যদি রেখে যাই
তাহারে রাখেন বীণাপাণি।

৫৯

কুসুমের শোভা
কুসুমের অবসানে
মধুরস হয়ে
লুকায় ফলের প্রাণে।

৬০

কোথায় আকাশ
কোথায় ধূলি
সে কথা পরান
গিয়েছে ভুলি।
তাই ফুল খোঁজে
তারার কোণে,
তারা খুঁজে ফিরে
ফুলের বনে।

৬১

কোন্ খ'সে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি
সুরের অশ্রুধারা।

৬২

ক্লান্ত মোর লেখনীর
এই শেষ আশা—
নীরবের ধ্যানে তার
ডুবে যাবে ভাষা।

৬৩

ক্ষণকালের গীতি
চিরকালের স্মৃতি।

৬৪

ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে
সহসা নির্ঝরিণী
আপনারে লয় চিনি।
চকিত ভাবের ক্বচিৎ বিকাশে
বিস্মিত মোর প্রাণ
পায় নিজ সন্ধান।

৬৫

ক্ষুদ্র-আপন-মাঝে
পরম আপন রাজে,
খুলুক দুয়ার তারই।
দেখি আমার ঘরে
চিরদিনের তরে
যে মোর আপনারই।

৬৬

ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ,
রজনী দিবস বহিছে তীরের স্নেহ।
দিকে দিকে যেথা বিপুল জলের দোল
গোপনে সেথায় এনেছে ধরার কোল।
উত্তাল ঢেউ তারা যে দৈত্য-ছেলে
পুত্তলী ভেবে লাফ দেয় বাহু মেলে।
তার হাত হতে বাঁচায়ে আনিলে তুমি,
ভূমির শিশুরে ফিরে পেল পুন ভূমি।

৬৭

গত দিবসের ব্যর্থ প্রাণের
যত ধুলা, যত কালি,
প্রতি উষা দেয় নবীন আশার
আলো দিয়ে প্রক্ষালি।

৬৮

গাছ দেয় ফল
ঋণ ব'লে তাহা নহে।
নিজের সে দান—
নিজেরই জীবনে বহে।
পথিক আসিয়া
লয় যদি ফলভার
প্রাপ্যের বেশি
সে সৌভাগ্য তার।

৬৯

গাছগুলি মুছে-ফেলা,
গিরি ছায়া-ছায়া—
মেঘে আর কুয়াশায়
রচে একি মায়া।
মুখ-ঢাকা ঝরনার
শুনি আকুলতা—
সব যেন বিধাতার
চুপিচুপি কথা।

৭০

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্যামল রাখে প্রাণ।

৭১

গাছের পাতায় লেখন লেখে
বসন্তে বর্ষায়—
ঝ'রে পড়ে, সব কাহিনী
ধুলায় মিশে যায়।

৭২

গানখানি মোর দিনু উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামখানি বাদ দিয়ে।

৭৩

গিরিবক্ষ হতে আজি
ঘুচুক কুজ্ঝটি-আবরণ,
নূতন প্রভাতসূর্য
এনে দিক নবজাগরণ।
মৌন তার ভেঙে যাক,
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোক হতে
বাণীর নির্ঝরধারা
প্রবাহিত হোক শতস্রোতে।

৭৪

গোঁড়ামি সত্যেরে চায়
মুঠায় রক্ষিতে—
যত জোর করে, সত্য
মরে অলক্ষিতে।

৭৫

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে।
ভাবিছ ব'সে, সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে!

৭৬

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছে দুর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম!
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,

অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয়গৃহখানি ।

৭৭

চলার পথের যত বাধা
পথবিপথের যত ধাঁধা
পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পথের বীণার তারে তারে
তারি টানে সুর হয় বাঁধা ।
রচে যদি দুঃখের ছন্দ
দুঃখের অতীত আনন্দ
তবেই রাগিণী হবে সাধা ।

৭৮

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা—
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা ।

৭৯

চলে যাবে সত্তারূপ
সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে,
রেখে যাবে মায়ারূপ
রচিত যা আলোতে ছায়াতে ।

৮০

চাও যদি সত্যরূপে
দেখিবারে মন্দ—
ভালোর আলোতে দেখো,
হোয়ো নাকো অন্ধ ।

৮১

চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী
চীন-লণ্ঠন দুলায়ে
চলেছ সাগরপারে ।
আমি যে উদাসী একেলা প্রবাসী,
নিয়ে গেলে মন ভুলায়ে
দূর জানালার ধারে ।

৮২

চাঁদেরে করিতে বন্দী
মেঘ করে অভিসন্ধি,
চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ।
মন্ত্রে কালি হল গত,
জ্যোৎস্নার ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক।

৮৩

চাষের সময়ে
যদিও করি নি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম
ফসল কাটার বেলা।

৮৪

চাহিছ বারে বারে
আপনারে ঢাকিতে—
মন না মানে মানা,
মেলে ডানা আঁখিতে।

৮৫

চাহিছে কীট মৌমাছির
পাইতে অধিকার—
করিল নত ফুলের শির
দারুণ প্রেম তার।

৮৬

চৈত্রের সেতারে বাজে
বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে উঠে
তরঙ্গ তাহার।

৮৭

চোখ হতে চোখে
খেলে কালো বিদ্যুৎ—
হৃদয় পাঠায়
আপন গোপন দূত।

৮৮

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে—
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন।

৮৯

জানার বাঁশি হাতে নিয়ে
না জানা
বাজান তাঁহার নানা সুরের
বাজানা।

৯০

জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর,
প্রান্তর তব শান্ত,
পর্বত তব কঠিন নিবিড়,
কানন কোমল কান্ত।

৯১

জীবনদেবতা তব
দেহে মনে অন্তরে বাহিরে
আপন পূজার ফুল
আপনি ফুটান ধীরে ধীরে।
মাধুর্যে সৌরভে তারি
অহোরাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি,
এই আমি আশীর্বাদ করি।

৯২

জীবনযাত্রার পথে
ক্লান্তি ভুলি, তরুণ পথিক,
চলো নির্ভীক।
আপন অন্তরে তব
আপন যাত্রার দীপালোক
অনির্বাণ হোক।

৯৩

জীবনরহস্য যায়
মরণরহস্য-মাঝে নামি,
মুখর দিনের আলো
নীরব নক্ষত্রে যায় থামি ।

৯৪

জীবনে তব প্রভাত এল
নব-অরুণকান্তি ।
তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক্
শিশিরে-ধোওয়া শান্তি ।
মাধুরী তব মধ্যদিনে
শক্তিরূপ ধরি
কর্মপটু কল্যাণের
করুক দূর ক্লান্তি ।

৯৫

জীবনের দীপে তব
আলোকের আশীর্বচন
আঁধারের অচৈতন্যে
সঞ্চিত করুক জাগরণ ।

৯৬

জ্বালো নবজীবনের
নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো
স্বর্গের লিপিকা ।
আঁধারগহনে রচো
আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো
অমৃতের গীতিকা ।

৯৭

ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে
তপ্তবারির স্রোতে—
গোপনে লুকানো অশ্রু কী লাগি
বাহিরিল এ আলোতে ।

৯৮

ডালিতে দেখেছি তব
অচেনা কুসুম নব।
দাও মোরে, আমি আমার ভাষায়
বরণ করিয়া লব।

৯৯

ডুবারি যে সে কেবল
ডুব দেয় তলে।
যে জন পারের যাত্রী
সেই ভেসে চলে।

১০০

তপনের পানে চেয়ে
সাগরের ঢেউ
বলে, 'ওই পুত্তলিরে
এনে দে-না কেউ!'

১০১

তব চিত্তগগনের
দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে
পেয়েছে মহিমা।

১০২

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই লেখে,
মুছে বারে বারে।

১০৩

তারাগুলি সারারাতি
কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে
ফুটে বনময়।

১০৪

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারই গান।

১০৫

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিত।
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি সমে এসে—
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে।

১০৬

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

১০৭

তোমার মঙ্গলকার্য
তব ভৃত্য-পানে
অযাচিত যে প্রেমেরে
ডাক দিয়ে আনে,
যে অচিন্ত্য শক্তি দেয়,
যে অক্লান্ত প্রাণ,
সে তাহার প্রাপ্য নহে—
সে তোমারি দান।

১০৮

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে—
অনেক দূরের থেকে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে—
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

১০৯

তোমারে হেরিয়া চোখে,
মনে পড়ে শুধু এই মুখখানি
দেখেছি স্বপ্নলোকে।

১১০

দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা
মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল— আজ ভুবনে
আকাশ-ভরা ছুটি।

১১১

দিগন্তে পথিক মেঘ
চ'লে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু
লেখে আকাশেতে।

১১২

দিগ্‌বলয়ে
নব শশীলেখা
টুক্‌রো যেন
মানিকের রেখা।

১১৩

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি সঙ্গীহারা
একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
কমল-সাগরে।

ডোবে না সে, নেবে না সে,
ঢেউ দিলে সে যায় না তবু স'রে—
যেন আমার বিফল রাতের
চেয়ে থাকার স্মৃতি
কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিতি।
মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ওই যে ছায়াখানি।

১১৪

দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার
বহি কর্মভার।
দিনান্ত ভরিছে তরী রঙিন মায়ায়
আলোয় ছায়ায়।

১১৫

দিবসরজনী তন্দ্রাবিহীন
মহাকাল আছে জাগি—
যাহা নাই কোনোখানে,
যারে কেহ নাহি জানে,
সে অপরিচিত কল্পনাতীত
কোন্ আগামীর লাগি।

১১৬

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।

১১৭

দুঃখ এড়াবার আশা
নাই এ জীবনে।
দুঃখ সহিবার শক্তি
যেন পাই মনে।

১১৮

দুঃখশিখার প্রদীপ জ্বেলে
খোঁজো আপন মন,
হয়তো সেথা হঠাৎ পাবে
চিরকালের ধন।

১১৯

দুখের দশা শ্রাবণরাতি—
বাদল না পায় মানা,
চলেছে একটানা।
সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ
ক্ষণহাসির দূত।

১২০

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

১২১

দোয়াতখানা উলটি ফেলি
পটের 'পরে
'রাতের ছবি এঁকেছি' ব'লে
গর্ব করে ।

১২২

ধরণীর খেলা খুঁজে
শিশু শুকতারা
তিমিররজনীতীরে
এল পথহারা ।
উষা তারে ডাক দিয়ে
ফিরে নিয়ে যায়,
আলোকের ধন বুঝি
আলোকে মিলায় ।

১২৩

নববর্ষ এল আজি
দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে,
আনে নি আশার বাণী,
দেবে না সে করুণ প্রশ্রয় ।
প্রতিকূল ভাগ্য আসে
হিংস্র বিভীষিকার আকারে ;
তখনি সে অকল্যাণ
যখনি তাহারে করি ভয় ।
যে জীবন বহিয়াছি
পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা ;
দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে
শোধ করি তার শেষ দেনা ।

১২৪

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পুরাতে পারো না তাও,
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও !

১২৫

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণকপোলতলে
রাতের বিদায়চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে ।

১২৬

নিরুদ্যম অবকাশ শূন্য শুধু,
শান্তি তাহা নয়—
যে কর্মে রয়েছে সত্য
তাহাতে শান্তির পরিচয় ।

১২৭

নূতন জন্মদিনে
পুরাতনের অন্তরেতে
নূতনে লও চিনে ।

১২৮

নূতন যুগের প্রত্যূষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে—
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে ।
নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়
দুঃসাহসের পথে,
বিঘ্নই তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজানা অদৃষ্টেরে ।

১২৯

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন ।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পুরা ।

১৩০

পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি
রবির করের লিখন ধরিবে বলি ।
সায়াহ্নে রবি অস্তে নামিবে যবে
সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে !

১৩১

পরিচিত সীমানার
বেড়া-ঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে :
বিপুল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে ।
সেথাকার বাঁশিরবে
অনামা ফুলের মৃদুগন্ধে
জানা না-জানার মাঝে
বাণী ফিরে ছায়াময় ছন্দে ।

১৩২

পশ্চিমে রবির দিন
হলে অবসান
তখনো বাজুক কানে
পূরবীর গান ।

১৩৩

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাত-রবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান ।
ফুল ফুটে বনমাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন
আপনি সে জানে না যে ।

১৩৪

পায়ে চলার বেগে
পথের-বিঘ্ন-হরণ-করা
শক্তি উঠুক জেগে ।

১৩৫

পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ, অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তের প্রভাতে সন্ধ্যায়
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত অনন্ত-অধ্যায় ।
মহান সে গ্রন্থপত্র, তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে রাখিবে কি লিখে—
তব শৃঙ্গশিলাতলে দুদিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের আনন্দের মেলা ।

১৩৬

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি 'পরে দিনরাতি
লেখে নানামত আপন নামের পাঁতি।
নূতনে পুরাণে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি আঁকে।

১৩৭

পুষ্পের মুকুল
নিয়ে আসে অরণ্যের
আশ্বাস বিপুল।

১৩৮

পেয়েছি যে-সব ধন,
যার মূল্য আছে,
ফেলে যাই পাছে।
যার কোনো মূল্য নাই,
জানিবে না কেও,
তাই থাকে চরম পাথেয়।

১৩৯

প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে :
তৃণে তৃণে উষা সাজালো শিশিরকণা।
যারে নিবেদিল তাহারি পিপাসী কিরণে
নিঃশেষ হল রবি-অভ্যর্থনা।

১৪০

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়—
আবার ফুটায়ে তুলে।

১৪১

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক
সুন্দর পরিমলে।
সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য
মধুরসে-ভরা ফলে।

১৪২

প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে
শুভ্রতম তেজে,
পৃথিবীতে নামে সেই নানা রূপে রূপে
নানা বর্ণে সেজে।

১৪৩

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

১৪৪

ফাগুন এল দ্বারে,
কেহ যে ঘরে নাই—
পরান ডাকে কারে
ভাবিয়া নাহি পাই।

১৪৫

ফাগুন কাননে অবতীর্ণ,
ফুলদল পথে করে কীর্ণ।
অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি,
নিমেষে নিমেষে অনাসৃষ্টি।

১৪৬

ফুল কোথা থাকে গোপনে,
গন্ধ তাহারে প্রকাশে।
প্রাণ ঢাকা থাকে স্বপনে,
গান যে তাহারে প্রকাশে।

১৪৭

ফুল ছিঁড়ে লয়
হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে
পাওয়া—
আনমনে তার
পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে
যাওয়া।

যে সেই ধুলার
ফুলে
হার গেঁথে লয়
তুলে
হেলার সে ধন
হয় যে ভূষণ
তাহারি মাথার
চুলে।

শুধায়ো না মোর
গান
কারে করেছিনু
দান—
পথধুলা-'পরে
আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে
মান।

১৪৮

ফুলের অক্ষরে প্রেম
লিখে রাখে নাম আপনার—
ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার।
পাথরে পাথরে লেখা
কঠিন স্বাক্ষর দুরাশার
ভেঙে যায়, নাহি ফেরে আর।

১৪৯

ফুলের কলিকা প্রভাতরবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

১৫০

বইল বাতাস,
পাল তবু না জোটে—
ঘাটের খাপে
নৌকো মাথা কোটে।

১৫১

'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি ।

১৫২

বড়ো কাজ নিজে বহে
আপনার ভার ।
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে
সান্ত্বনা তাহার ।
ছোটো কাজ, ছোটো ক্ষতি,
ছোটো দুঃখ যত—
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ
করে কণ্ঠাগত ।

১৫৩

বড়োই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা,
আপন আলোকে
আপনি দিয়েছে ধরা ।

১৫৪

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া ।
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া ।

১৫৫

বরষে বরষে শিউলিতলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি :
এ কথাটি মনে জানো—
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান,
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি ।

সিন্দুকে রহে বন্ধ,
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ ।

১৫৬

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্‌প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

১৫৭

বসন্ত, আনো মলয়সমীর,
ফুলে ভরি দাও ডালা—
মোর মন্দিরে মিলনরাতির
প্রদীপ হয়েছে জ্বালা।

১৫৮

বসন্ত, দাও আনি,
ফুল জাগাবার বাণী—
তোমার আশায় পাতায় পাতায়
চলিতেছে কানাকানি।

১৫৯

বসন্ত পাঠায় দূত
রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তার
নিশ্বাস বহিয়া।

১৬০

বসন্ত যে লেখা লেখে
বনে বনান্তরে
নামুক তাহারই মন্ত্র
লেখনীর 'পরে।

১৬১

বসন্তের আসরে ঝড়
যখন ছুটে আসে
মুকুলগুলি না পায় ডর,
কচি পাতারা হাসে।
কেবল জানে জীর্ণ পাতা
ঝড়ের পরিচয়—
ঝড় তো তারি মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়।

১৬২

বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায়
নৃত্য উঠে পাতায় পাতায় ।
এই নৃত্যে সুন্দরকে অর্ঘ্য দেয় তার,
'ধন্য তুমি' বলে বার বার ।

১৬৩

বস্তুতে রয় রূপের বাঁধন,
ছন্দ সে রয় শক্তিতে,
অর্থ সে রয় ব্যক্তিতে ।

১৬৪

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু ।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু ।

১৬৫

বাতাস শুধায়, 'বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে ।'
কমল কহিল, 'আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে ।'

১৬৬

বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি
খসায়ে ফেলিল যেই,
অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ
থেকেও আর সে নেই ।

১৬৭

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা

সুখ-অবসানে আসে
সম্ভোগের সীমা,
দুঃখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

১৬৮

বায়ু চাহে মুক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ—
দুই বিরুদ্ধের যোগে
মঞ্জরীর নাচ।

১৬৯

বাহির হতে বহিয়া আনি
সুখের উপাদান—
আপনা-মাঝে আনন্দের
আপনি সমাধান।

১৭০

বাহিরে বস্তুর বোঝা,
ধন বলে তায়।
কল্যাণ সে অন্তরের
পরিপূর্ণতায়।

১৭১

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে
পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে—
কত রূপে রূপে কত-না অলংকারে
অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে,
বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে।

১৭২

বিকেলবেলায় দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পুবগগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ?
লক্ষকোটি আলোবছর-পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে

হয়তো তারি কেন্দ্র-মাঝে
যাত্রা আমার হবে—
অস্তবেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে ?

১৭৩

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থরথর !
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপিচুপি করে মরমর !

১৭৪

বিদায়রথের ধ্বনি
দূর হতে ওই আসে কানে ।
ছিন্নবন্ধনের শুধু
কোনো শব্দ নাই কোনোখানে ।

১৭৫

বিধাতা দিলেন মান
বিদ্রোহের বেলা,
অন্ধ ভক্তি দিনু যবে
করিলেন হেলা ।

১৭৬

বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্রপ্রাণের গীতি ।

১৭৭

বিশ্বের হৃদয়-মাঝে
কবি আছে সে কে !
কুসুমের লেখা তার
বার বার লেখে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
বার বার মোছে,
অশান্ত প্রকাশব্যথা
কিছুতে না ঘোচে ।

১৭৮

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল,
প্রেমরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ভূমি—
জীবনতরুতে ফলে কল্যাণের ফল,
মাধুরীর পুষ্পগুচ্ছে উঠে সে কুসুমি।

১৭৯

বেছে লব সব-সেরা,
ফাঁদ পেতে থাকি—
সব-সেরা কোথা হতে
দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান
থাকি করজোড়ে—
সব-সেরা আপনিই
বেছে লয় মোরে।

১৮০

বেদনা দিবে যত
অবিরত দিয়ো গো।
তবু এ ম্লান হিয়া
কুড়াইয়া নিয়ো গো।
যে ফুল আনমনে
উপবনে তুলিলে
কেন গো হেলাভরে
ধুলা-'পরে ভুলিলে।
বিঁধিয়া তব হারে
গেঁথো তারে প্রিয় গো।

১৮১

বেদনার অশ্রু-ঊর্মিগুলি
গহনের তল হতে
রত্ন আনে তুলি।

১৮২

ভজনমন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে কোরো না অপমান।
যে ঈশ্বরে ভক্তি করো,
হে সাধক মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।

১৮৩

ভেসে-যাওয়া ফুল
ধরিতে নারে,
ধরিবারই ঢেউ
ছুটায় তারে।

১৮৪

ভোলানাথের খেলার তরে
খেলনা বানাই আমি।
এই বেলাকার খেলাটি তার
ওই বেলা যায় থামি।

১৮৫

মনের আকাশে তার
দিকসীমানা বেয়ে
বিবাগি স্বপনপাখি
চলিয়াছে ধেয়ে।

১৮৬

মর্তজীবনের
শুধিব যত ধার
অমরজীবনের
লভিব অধিকার।

১৮৭

মাটিতে দুর্ভাগার
ভেঙেছে বাসা,
আকাশে সমুচ্চ করি
গাঁথিছে আশা।

১৮৮

মাটিতে মিশিল মাটি,
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন।

১৮৯

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টকপথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি
রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি ।

১৯০

মানুষেরে করিবারে স্তব
সত্যের কোরো না পরাভব ।

১৯১

মিছে ডাকো— মন বলে, আজ না—
গেল উৎসবরাতি,
ম্লান হয়ে এল বাতি,
বাজিল বিসর্জন-বাজনা ।
সংসারে যা দেবার
মিটিয়ে দিনু এবার,
চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা ।
শেষ আলো, শেষ গান
জগতের শেষ দান
নিয়ে যাব— আজ কোনো কাজ না ।
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

১৯২

মিলন-সুলগনে,
কেন বল্,
নয়ন করে তোর
ছলছল্ ।
বিদায়দিনে যবে
ফাটে বুক
সেদিনও দেখেছি তো
হাসিমুখ ।

১৯৩

মুকুলের বক্ষোমাঝে
কুসুম আঁধারে আছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে
প্রকাশের সুন্দর এ বাধা ।

১৯৪

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে ঊর্ধ্ব-পানে
সেই এসে বসে মোর গানে।

১৯৫

মুহূর্ত মিলায়ে যায়
তবু ইচ্ছা করে—
আপন স্বাক্ষর রবে
যুগে যুগান্তরে।

১৯৬

মৃতেরে যতই করি স্ফীত
পারি না করিতে সঞ্জীবিত।

১৯৭

মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে
বাঁধে বৃক্ষটারে,
আকাশ আলোক দিয়ে
মুক্ত রাখে তারে।

১৯৮

মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের
মূল্য দিতে হয়
সে প্রাণ অমৃতলোকে
মৃত্যু করে জয়।

১৯৯

যখন গগনতলে
আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে ঊষা
চয়ন করিল তারাগুলি।

২০০

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি এক-রোখে।

দিনের শেষে পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে—
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

২০১

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর-আকাশে-আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

২০২

যা পায় সকলই জমা করে,
প্রাণের এ লীলা রাত্রিদিন।
কালের তাণ্ডবলীলাভরে
সকলই শূন্যেতে হয় লীন।

২০৩

যা রাখি আমার তরে
মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে
সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে
সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে,
রাখে তারে সবে।

২০৪

যাওয়া-আসার একই যে পথ
জান না তা কি অন্ধ?
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

২০৫

যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে
গিরি হয়ে যায় ঢিবি।
মরণে মরণে নূতন আয়ুতে
তৃণ রহে চিরজীবী।

২০৬

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

২০৭

যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।

২০৮

যে ছবিতে ফোটে নাই
সবগুলি রেখা
সেও তো, হে শিল্পী, তব
নিজ হাতে লেখা।
অনেক মুকুল ঝরে,
না পায় গৌরব—
তারাও রচিছে তব
বসন্ত উৎসব।

২০৯

যে ঝুমকোফুল ফোটে পথের ধারে
অন্যমনে পথিক দেখে তারে।
সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

২১০

যে তারা আমার তারা
সে নাকি কখন্ ভোরে
আকাশ হইতে নেমে
খুঁজিতে এসেছে মোরে।
শত শত যুগ ধরি
আলোকের পথ ঘুরে
আজ সে না জানি কোথা
ধরার গোধূলিপুরে।

২১১

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

২১২

যে বন্ধুরে আজও দেখি নাই
তাহারই বিরহে ব্যথা পাই ।

২১৩

যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি,
পরানের তলে
স্বপনতিমিরতটে
তারা হয়ে জ্বলে ।

২১৪

যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘশ্বাস ।
সে যেন রাতের আঁধার দ্বিপ্রহর—
পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর ।

২১৫

যে যায় তাহারে আর
ফিরে ডাকা বৃথা ।
অশ্রুজলে স্মৃতি তার
হোক পল্লবিতা ।

২১৬

যে রত্ন সবার সেরা
তাহারে খুঁজিয়া ফেরা
ব্যর্থ অন্বেষণ ।
কেহ নাহি জানে, কিসে
ধরা দেয় আপনি সে
এলে শুভক্ষণ ।

২১৭

রজনী প্রভাত হল—
পাখি, ওঠো জাগি,
আলোকের পথে চলো
অমৃতের লাগি ।

২১৮

রাখি যাহা তার বোঝা
কাঁধে চেপে রহে ।
দিই যাহা তার ভার
চরাচর বহে ।

২১৯

রাতের বাদল মাতে
তমালের শাখে :
পাখির বাসায় এসে
'জাগো জাগো' ডাকে ।

২২০

রূপে ও অরূপে গাঁথা
এ ভুবনখানি—
ভাব তারে সুর দেয়,
সত্য দেয় বাণী ।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা
নিত্য কানাকানি ।

২২১

লুকায়ে আছেন যিনি
জীবনের মাঝে
আমি তাঁরে প্রকাশিব
সংসারের কাজে ।

২২২

লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি
ওই কি স্মরণমুরতি রচিলে ধূলি—
দূর ফাগুনের কোন্ চরণের
সুকোমল অঙ্গুলি !

২২৩

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে
দ্বিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে
লিখিল আলোক,
ধরণী শ্যামল পত্রে
বুলাইল তুলি
লিখিল আলোর মিল
নির্মল শিউলি ।

২২৪

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসী মেঘে ।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন ।

২২৫

শিকড় ভাবে, 'সেয়ানা আমি,
অবোধ যত শাখা ।
ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি,
আলোকলোক ফাঁকা ।'

২২৬

শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়
ভিক্ষু মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় যদি
পায় সকলেরে ।

২২৭

শূন্য পাতার অন্তরালে
লুকিয়ে থাকে বাণী,
কেমন করে আমি তারে
বাইরে ডেকে আনি ।
যখন থাকি অন্যমনে
দেখি তারে হৃদয়কোণে,
যখন ডাকি দেয় সে ফাঁকি—
পালায় ঘোমটা টানি ।

২২৮

শেষ বসন্তরাত্রে
যৌবনরস রিক্ত করিনু
বিরহবেদনপাত্রে ।

২২৯

শ্যামলঘন বকুলবন-
ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর বাজে মধুর
পায়ে পায়ে ।

২৩০

শ্রাবণের কালো ছায়া
নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌ললনার
গলিত-কাজল-বরিষনে ।

২৩১

সখার কাছেতে প্রেম
চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি
চাহে শয়তান ।

২৩২

সংসারেতে দারুণ ব্যথা
লাগায় যখন প্রাণে
'আমি যে নাই' এই কথাটাই
মনটা যেন জানে ।
যে আছে সে সকল কালের,
এ কাল হতে ভিন্ন—
তাহার গায়ে লাগে না তো
কোনো ক্ষতের চিহ্ন ।

২৩৩

সত্যেরে যে জানে, তারে
সগর্বে ভাণ্ডারে রাখে ভরি ।
সত্যেরে যে ভালোবাসে
বিনম্র অন্তরে রাখে ধরি ।

২৩৪

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথ-চাওয়া নয়নের বাণী ।

২৩৫

সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়
নাম সই ক'রে ।
লেখা তার মুছে যায়,
মেঘ যায় সরে ।

২৩৬

সফলতা লভি যবে
মাথা করি নত,
জাগে মনে আপনার
অক্ষমতা যত।

২৩৭

সব-কিছু জড়ো ক'রে
সব নাহি পাই।
যারই মাঝে সত্য আছে
সব যে সেথাই।

২৩৮

সব চেয়ে ভক্তি যার
অস্ত্রদেবতারে
অস্ত্র যত জয়ী হয়
আপনি সে হারে।

২৩৯

সময় আসন্ন হলে
আমি যাব চলে,
হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে—
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তের
আনন্দের আশা রাখিলাম
আমি হেথা নাই থাকিলাম।

২৪০

সারা রাত তারা
যতই জ্বলে
রেখা নাহি রাখে
আকাশতলে।

২৪১

সিদ্ধিপারে গেলেন যাত্রী,
ঘরে বাইরে দিবারাত্রি
আস্ফালনে হলেন দেশের মুখ্য।
বোঝা তাঁর ওই উষ্ট্র বইল,
মরুর শুষ্ক পথে সইল
নীরবে তার বন্ধন আর দুঃখ।

২৪২

সুখেতে আসক্তি যার
আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা ।
কঠিন বীর্যের তারে
বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা ।

২৪৩

সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে
মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া
সোনার খেয়ালে ।

২৪৪

সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই ।

২৪৫

সেই আমাদের দেশের পদ্ম
তেমনি মধুর হেসে
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে
অন্য সুদূর দেশে ।

২৪৬

সেতারের তারে
ধানশি
মিড়ে মিড়ে উঠে
বাজিয়া ।
গোধূলির রাগে
মানসী
সুরে যেন এল
সাজিয়া ।

২৪৭

সোনায় রাঙায় মাখামাখি,
রঙের বাঁধন কে দেয় রাখি
পথিক রবির স্বপন ঘিরে ।
পেরোয় যখন তিমিরনদী
তখন সে রঙ মিলায় যদি
প্রভাতে পায় আবার ফিরে ।

অস্ত-উদয়-রথে-রথে
যাওয়া-আসার পথে পথে
দেয় সে আপন আলো ঢালি ।
পায় সে ফিরে মেঘের কোণে,
পায় ফাগুনের পারুলবনে
প্রতিদানের রঙের ডালি ।

২৪৮

স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে, অচৈতন্য, যা রহে না জেগে
ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে ।
যে নদীর ক্লান্তি ঘটে মধ্যপথে সিন্ধু-অভিসারে
অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে ।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভৃতে স্তিমিত যেই বাতি
নির্জীব আলোক তার লুপ্ত হয় না ফুরাতে রাতি ।
পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আঁলো জাগ্রত নিশীথে
জানে না সে আঁধারে মিশিতে ।

২৪৯

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,
ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা ।
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে
গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা ।

২৫০

স্নিগ্ধ মেঘ তীব্র তপ্ত
আকাশেরে ঢাকে,
আকাশ তাহার কোনো
চিহ্ন নাহি রাখে ।
তপ্ত মাটি তৃপ্ত যবে
হয় তার জলে
নম্র নমস্কার তারে
দেয় ফুলে ফলে ।

২৫১

স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা,
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
অতীতের অর্চনা ।

২৫২

হাসিমুখে শুকতারা
লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী
আঁধারের শেষপাতে।

২৫৩

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা
স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন,
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে
বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষারনির্ঝরিণী
রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে
অন্তহীন আনন্দের গীতা।

২৫৪

হে উষা, নিঃশব্দে এসো,
আকাশের তিমিরগুণ্ঠন
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তরে থেকে
মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও,
জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি-তামসের
মোহযবনিকা, হে আত্মন্,
করো উন্মোচন।

২৫৫

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
'ভালো বেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।'

২৫৬

হে পাখি, চলেছ ছাড়ি
তব এ পারের বাসা,
ও পারে দিয়েছ পাড়ি—
কোন্ সে নীড়ের আশা ?

২৫৭

হে প্রিয়, দুঃখের বেশে
আস যবে মনে
তোমারে আনন্দ ব'লে
চিনি সেই ক্ষণে ।

২৫৮

হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে
পাতায় কুসুমে ডালে,
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি
ফুটিতেছে সুরে তালে ।

২৫৯

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার—
মর্তের নয়নে আনো মূর্তি অমরার ।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায় ।

২৬০

হেলাভরে ধুলার 'পরে
ছড়াই কথাগুলো ।
পায়ের তলে পলে পলে
গুঁড়িয়ে সে হয় ধুলো ।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

১৪।।৫

গল্পগুচ্ছ

বদনাম

প্রথম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ ; সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্‌স্‌পেক্টার বিজয়বাবু। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমরবন্ধ, হাফ-প্যান্টপরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নি এসে খুলে দিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন— "এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি ! তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই। দেশসুদ্ধ লোক তোমার এই দশা দেখে হেসে খুন, এ যেন সার্কাসের খেলা হচ্ছে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার বললেন, "আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস। ও বেলে খালাস আসামীই বটে, তবু পুলিসে না রিপোর্ট করে কোথাও যাবার হুকুম নেই, তাই আমাকে সেদিন চিঠিতে জানিয়ে গেল— 'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু, ভয় পাবেন না, সভার কাজ সেরেই আমি ফিরে আসছি।' কোথায় সভা তার কোনো সন্ধান নেই। পুলিসে ও যেন ভেলকি খেলছে।"

স্ত্রী সৌদামিনী বললে, "শোনো তবে আজ রাত্তিরের খবর দিই, শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে। লোকটার কী আস্পর্ধা, কী বুকের পাটা ! রাত্তির তখন দুটো, আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি, একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই তোমাদের অনিল ডাকাত, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে ? ফোঁটা নিতে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্তু ফোঁটা আমি চাই, ছাড়ব না, এই বসলুম।'··· সত্যি কথা তোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল স্নেহ। মনে হল এক রাত্তিরের জন্যে আমি ভাইকে পেয়েছি। সে বললে, 'দিদি, আজ তিনদিন কোনোমতে আধপেটা খেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। আজ তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অন্ন নিয়ে আবার আমি উধাও হব।' তোমার জন্যে যে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে খাওয়ালুম। বললুম, 'এই বেলা তুমি পালাও, তাঁর আসবার সময় হয়েছে।' লোকটা বললে, 'কোনো ভয় নেই, তিনি আমারই সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বসে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারব।' বলে তোমারই জন্যে সাজা পান টপ করে মুখে নিলে তুলে। তার পরে বললে কিনা— 'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু হাভানা চুরুট খেয়ে থাকেন ; তারই একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব যেখানে আমার সব দলের লোক আছে, তারা আজ সভা করবে।' তোমার ঐ ডাকাত অনায়াসে, নির্ভয়ে, সেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু বললেন, "নামটা কী শুনতে পারি কি ?"

সদু বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শখের

একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জ্বালিয়ে দিব্যি সুস্থ মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্ দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সদু উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, কী ! এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হল ! আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব। তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার চিনতেন তাঁর স্ত্রীকে ভালো করে। খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বসে নিশ্বেস ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন সুযোগটাও কেটে গেল !"

বসে বসে তাঁর নবাবি ছাঁদের গোঁফ-জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফুঁসে উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্য তৈরি দ্বিতীয় দফার খিচুড়ি তাঁর মুখে রুচল না।

এই গেল এই গল্পের প্রথম পালা।

দ্বিতীয়

সদু স্বামীকে বললে, "কী গো, তুমি যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছ ! আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিস্ট্রিক্ট্ পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাগাল পেয়েছ নাকি।"

"পেয়েছি বৈকি।"

"কিরকম শুনি।"

"আমাদের যে চর, নিতাই চক্রবর্তী, সে ওদের ওখানে চরগিরি করে। তার কাছে শোনা গেল আজ মোচকাঠির জঙ্গলে ওদের একটা মস্ত সভা হবে। সেটাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারী জঙ্গল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোমাদের বুদ্ধির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো ফুটোই থাকবে। অনেক বার তো লোক হাসিয়েছ, আর কেন। এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"সে কি কথা সদু। এমন সুযোগ আর পাব না।"

"আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো— ও মোচকাঠির জঙ্গল ও-সব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।"

"তা, তুমি যদি লুকিয়ে তাদের ঘরের খবর দাও, তা হলে সবই সম্ভব হবে।"

"দেখো, অমন চালাকি কোরো না। বোকামি করতে হয় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিন্তু নিজের ঘরের বউকে নিয়ে—"

কথাটা চাপা পড়ল চোখের উপর আঁচল চাপার সঙ্গে।

"সদু, আমি দেখেছি যে এই একটা বিষয়ে তোমার ঠাট্টাটুকুও সয় না।"

"তা সত্যি, পুলিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছু খেয়ে নেবে কি না বলো।"

"তা নেব, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো, আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা যা কানাকানি কর তা যদি জানতে পারতুম তা হলে ওদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া কর্তব্য মনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু শুনেছ নাকি তুমি।"

"তোমাদের সংসারে চোখ কান খুলে রাখতেই হয়, কিছু কানে যায় বৈকি।"

"কানে যায়, আর তার পরে ?"

"আর তার পরে চণ্ডীদাস বলেছেন, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ' ।"

তোমার ঐ ঠাট্টাতেই তুমি জিতে যাও, কোন্‌টা যে তোমার আসল কথা ধরা যায় না।"

"তা বুঝবার বুদ্ধিই যদি থাকত তবে এই পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরি কাজ তুমি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাজেই সরকার বাহাদুর তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীর পদে, বক্তৃতা দিতে দিতে দেশে-বিদেশে জাল ফেলতে।"

"সর্বনাশ, তা হলে সেই যে মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।"

"ঐ দেখো, কুকুরটা চেঁচিয়ে মরছে। তাকে খাইয়ে ঠাণ্ডা করে আসি।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্ষুনি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিস্তলের গুলি।"

সদু তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কখ্‌খনো তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন।"

"তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে টুঁটি ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবে। ও বড়ো বদমাইস কুকুর। ও কেবল আমাকেই চেনে।"

"একটা খবর পেয়েছি সদু, সেই অনিল লোকটা হরবোলা, ও সব জন্তুরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি দুটোর সময়ে ঐ-যে তোমায় ডাক দিচ্ছে না তাই বা বলি কী করে।"

সদু একেবারে জ্বলে উঠে বললে, "অ্যাঁ, শেষকালে আমাকে সন্দেহ! এই রইল তোমার ঘরকন্না পড়ে, আমি চললুম আমার ভগ্নীপতির বাড়িতে।"

এই বলে সে উঠে পড়ল।

"আরে, কোথায় যাও! ভালো মুশকিল! নিজের ঘরের স্ত্রীকে ঠাট্টা করব না, আমি ঠাট্টার জন্যে পরের ঘরের মেয়ে কোথায় খুঁজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।"

ব'লে ওকে জোর করে ধরে বসালেন।

সদু কেবলই চোখ মুছতে লাগল।

"আহা, কী করছ, কাঁদ কেন, সামান্য একটা ঠাট্টা নিয়ে!"

"না, তোমার এই ঠাট্টা আমার সইবে না, আমি বলে রাখছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যস্— রইল, এখন তুমি আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কুকুরকে খাইয়ে এসো। ও আবার কাটলেট নইলে খায় না, পুডিং না হলে পেট ওর ভরে না। সামান্য কুকুর নিয়ে তুমি অত বাড়াবাড়ি কর কেন আমি বুঝতেই পারি না।"

সদু বললে, "তোমরা পুরুষমানুষ বুঝবে না। পুত্রহীনা মেয়ের বুকে যে স্নেহ জমে থাকে সে যে-কোনো একটা প্রাণীকে পেলে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। ওকে একদিন না দেখলে আমার মনে কেবলই, ভয় হতে থাকে, কে ওকে কোন্ দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল। তাই তো আমি ওকে এত যত্নে ঢেকেঢুকে রাখি।

"কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সদু, কোনো জানোয়ার এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।"

"তা, যতদিন বাঁচে ভালো করেই বাঁচুক।"

বিজয়বাবু বিশ্রাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুলিসের দলবল জুটল, চলল সবাই আলাদা আলাদা রাস্তায় মোচকাঠির দিকে। বহু দূরের পথ, প্রায় রাত পুইয়ে গেল যেতে-আসতে।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় মুখ শুকিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার বাড়িতে এসে কেদারাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। বললেন, "সদু, বড়ো ফাঁকি দিয়েছে! তোমার কথাই সত্যি। পুলিসের লোক ঘেরাও করলে বন, সে বনে জনমানব নেই। হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে; চীৎকার করে বলতে লাগলে,

'কোথায় আছ বের হও, নইলে আমরা গুলি চালাব।' অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চলল, কোনো সাড়া নেই। পুলিসের লোক খুব সাবধানে বনের মধ্যে ঢুকে তল্লাস করলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। রব উঠল, 'ধর্ সেই নিতাইকে, বদমাইস্‌কে।' নিতাইয়ের আর টিকি দেখা যায় না। একখানা চিঠি পাওয়া গেল, কেবল এই কটি কথা—'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। অনিল।' দেখো দেখি কী কাণ্ড, এর মধ্যে আবার তোমার নাম জড়ানো কেন, শেষকালে"—

"শেষকালে আবার কী। পুলিসের ঘরের গিন্নি কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পারে না। সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপ-মারা। আমি আর কিছু বলব না। এখন তুমি একটু শোও, একটু ঘুমোও।"

ঘুম ভাঙল তখন বেলা দুপুর। স্নান করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিজয় বসে বসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর তোমাকে বলব। ও দলবল নিয়ে চার দিকে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে— এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। গ্রামের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে— ও একজন সিদ্ধপুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্য খাবার রেখে দেয়— রীতিমত নৈবেদ্য। সকাল-বেলা উঠে দেখে তার কোনো চিহ্ন নেই। হিন্দু পাহারাওয়ালারা তো ওর কাছে ঘেঁষতেই চায় না। একজন দারোগা সাহস করে হিজলাকান্দির দাঙ্গার পরে ওকে গ্রেপ্তার করেছিল। হপ্তা খানেকের মধ্যে তার স্ত্রী বসন্ত হয়ে মারা গেল। এর পরে আর প্রমাণের অভাব রইল না। সেইজন্য এবারে যখন মোচকাঠিতে ওর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, পাহারাওয়ালারা ঠিক করলে যে ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে। ও তার একটি সাক্ষীও রেখে গেছে— একটা জলা জায়গায় পায়ের দাগ দেখা গেল, দু-হাত অন্তর এক-একটি পদক্ষেপ— দেড় হাত লম্বা। হিন্দু পাহারাওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ে আর-কি ! এই লোককে সম্পূর্ণ মন দিয়ে ধরপাকড় করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি মুসলমান পাহারাওয়ালা আনাব, কিন্তু দেশের হাওয়ার গুণে মুসলমানকে যদি ছোঁয়াচ লাগে তবে আরো সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে। কোন্ পলাতকার এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। এখন এ লোকটাকে কী করা যায়। এই কিছুদিন বেলে খালাস পেয়েছিল, সেই সুযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁওয়া লাগিয়ে দিলে। এ দিকে পিছনে প্রোপাগাণ্ডা চলছেই, নানা-রকম ছায়া নানা জায়গায় দেখা যায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাওয়া গেছে বলে আমার ভক্ত কনেস্টবল অত্যন্ত গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে। সেটা যে শণের দড়ি সে কথা বিচার করবার সাহসই হল না। ক'দিনের মধ্যে চারদিকে একেবারে গুজবের ঝড় উঠে গেল। মোচকাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে ব'লে একজন ধনী মাড়োয়ারি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। একজন ভক্ত পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিস্ট্রিক্ট জজ। তাঁর কাছে বসে অনিল-ডাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে— লোকটার পড়াশুনা আছে। এমনি করে ভক্তি ছড়িয়ে যেতে লাগল। এবারকার বেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পর ওর নামে সাক্ষী জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল-ডাকাতকে নিয়ে এই তো আমার এক মস্ত সমস্যা বাধল।

"সদু, তুমি জান বোধ হয় এ দিকে আর-এক সংকট বেধেছে। আমার মামাতো ভাই গিরিশ সে হাতিবাঁধা পরগনায় পুলিসের দারোগাগিরি করে। কর্তব্যের খাতিরে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছিল। সেই অবধি গ্রামের লোকেরা তাকে জাতে ঠেলবার মন্ত্রণা করছে। এ দিকে তার মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, যে পাত্রই জোটে তাকে ভাগিয়ে দেয় গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে পুরুত জোটে না। দূর গ্রাম থেকে পুরুতের সন্ধান পেল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে কখন দিয়েছে দৌড়। এবারে একটা কিনারা পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে হঠাৎ আমার হেড কনেস্টবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে, সদ্‌ব্রাহ্মণ খাইয়ে-দাইয়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে

খুশি করাচ্ছি। তাঁকে রাজি করানো গেছে। এখন গ্রামের লোকের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সদু, তুমিও এ কাজে সাহায্য করো।"

"ওমা, করব না তো কী ! ও তো আমার কর্তব্য। আহা, তোমাদের গিরিশের মেয়ে, আমাদের মিনু। সে তো কোনো অপরাধ করে নি। তার বিয়ে তো হওয়াই চাই। আনো তোমার বৃন্দাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর-যত্ন করতে হয়।"

এলেন বৃন্দাবনবাসী। বুকে লুটিয়ে পড়ছে সাদা দাড়ি, নারদ মুনির মতো। সদু ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক তার প্রণামের ঘটা দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী মুচকে হেসে বললেন, "সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তোমার এত ভক্তি হঠাৎ জেগে উঠল কী করে।"

সদু হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে যান। মিনুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।"

ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল, উলুর সঙ্গে বর আসার শব্দ এল চার দিক থেকে। কনেকে একটি চেলী-জড়ানো পুঁটুলির মতো করে এয়োর দল নিয়ে এল ছাঁদনাতলায়। নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হল। বর কনে বাবাজিকে প্রণাম করে অন্দরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন বাবাজি আশীর্বাদ শেষ করে বিজয়বাবুকে আর সভার সবাইকে বললেন, "মশায়, আমার খবরটা এবারে দিয়ে যাই। পুরুতের কাজ আমার পেশা নয়। আমার যা পেশা সে আপনার সমস্ত দারোগা-কনেস্টবলদের ভালো করেই জানা আছে। এখন আপনাদের পুরুতের দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। সে পর্যন্ত আমার আর সবুর সইবে না। অতএব আপনারা বিদায় করবার আগেই আমি বিদায় নিলেম।"

এই ব'লে সন্ন্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে তিন লাফে চণ্ডী-মণ্ডপের পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও।

সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রইল। বিজয়বাবুর মুখে কথা নেই।

বিয়ের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, পাড়াপড়শী গেছে যে যার ঘরে। বরবধূ বাসর ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সদু স্বামীকে বললে, "তুমি ভাবছ কী, যেমন করে হোক কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গিয়ে তোমাদেরই তো কাজ হালকা করে দিয়ে গেল। এখন বাসিবিয়ের আয়োজন করতে হবে, চোর-ডাকাতের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না। কিন্তু সেই মেয়েটির কোনো খোঁজ পেলে কি।"

"দুঃখের কথা বলব কী, এখন একটি মেয়ের জায়গায় রোজ আমার থানার সামনে পঁচিশটি মেয়ের আমদানি হচ্ছে চাল কলা নৈবেদ্য নিয়ে। এখন কোন্‌টি যে কে খোঁজ করা শক্ত হয়ে উঠল।"

"সে কী, তোমার দরজায় এত মেয়ের আমদানি তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজি সেজে বসেছ নাকি।"

"না, লোকটার চালাকির কথা শোনো একবার, অবাক হবে। একদিন হঠাৎ কিষণলাল এসে খবর দিলে আফিসের সামনের রাস্তায় একটি পাথর বেরিয়েছে। তার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁদুর লাগাচ্ছে, চন্দন মাখাচ্ছে ; কেউ চাইতে এসেছে সন্তান, কেউ স্বামীসৌভাগ্য, কেউ আমারই সর্বনাশ। এই ভিড় পরিষ্কার করতে গেলেই খবরের কাগজে মহা হাঁউমাউ করে উঠবে যে এইবার হিন্দুর ধর্ম গেল। আমার হিন্দু পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যবসা খুব জমে উঠল। টাকাগুলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোখ পড়ল। একদিন দেখা গেল— না আছে পাথরটা, না আছে টাকার থালা। আর সেই পাগলা গোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা-ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গুজব শোনা যেতে লাগল। মুশকিল এই— হিন্দুধর্মের পাহারাওয়ালারা হাংগার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে। এই নিয়ে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তা হলে আবার সকলের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এখন কোন্‌ দিক সামলাই ! আর-এক উৎপাত ঘটেছে, একদিন ছেদীলাল এসে পড়ল পুলিসের থানার দরজায় দড়াম করে। হাঁউমাউ করে

বললে যে, ভোলানাথের একশিঙওয়ালা ভৃঙ্গীবাবা ষাঁড়ের মতো গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে তো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠি নে, কেননা মেয়েরা ওর সহায়। ও তাদের সব বশ করে নিয়েছে।"

সদু হেসে বললে, "ওর গল্প যতই শুনি আমারই তো মন টলমল করে ওঠে।"

"দেখো, সর্বনাশ কোরো না যেন।"

"না, তোমার ভয় নেই, আমার এত সৌভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলো-আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা— এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল-না কেন— সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো বলে থাকে 'সদু বড়ো লক্ষ্মী,' অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা বেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা-কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে— হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের-তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সদুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।"

"তোমার মুখে ওরকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার, তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।"

"যাই হোক-না-কেন, আমি জানি আমি যাই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষমানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা স্তব করব না— পুলিসের কাজে তোমার খবরদারির শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সব সময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এইজন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সদু আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে, এখন তোমার ঐ কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও, বড্ড চেঁচাচ্ছে— ও আমাকে ঘুমোতে দেবে না। আমি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে।"

সদু হেসে বললে, "তুমি ইন্‌স্‌পেক্টরি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজি সেজে বোসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছু বখরা পাব।"

"সব তাতেই তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, আমার ভালো লাগে না।"

"ও আমার স্বভাব, তোমার খুনী ডাকাতদের জন্য আমি চিন্তা করতে পারব না। একা তোমার চিন্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে যোগ না দিয়ে আমি করব কী। তোমার এই পুলিসের থানায় স্বদেশীদের নিয়ে অনেক চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একটু হেসে বাঁচছে। এইজন্যই অনিলবাবুকে সবাই দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছে, তুমি ছাড়া। আমি দুশ্চিন্তার ভান করব কী করে বলো দেখি।"

তৃতীয়

"দেখো, সদু, এবারে আমি তোমার শরণাপন্ন।"

সদু বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপন্ন নও, শুনি। এইজন্য তো তোমাকে সবাই স্ত্রৈণ বলে। দু জাতের স্ত্রৈণ আছে। এক দল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না, তারা কাপুরুষ। আর-এক দল আছে তারা সত্যিকার পুরুষ, তাই তারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়। তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়ো। এই দেখো-না আমার কত বড়ো সুবিধে— তোমাকে যখন খুশি যেমন খুশি ঠকাতে পারি, তুমি চোখ বুজে সব নাও।"

"সদু, কী পষ্ট পষ্ট তোমার কথাগুলি গো।"

"সে তোমারই গুণে কর্তা, সে তোমারই গুণে।"

"এবারে কাজের কথাটা শুনে নাও— ও-সব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই। নইলে আমার আর মান থাকে না। পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই জেনেছে এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে। ওরা বলছে সে এই পাড়ারই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন করে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে ভাব করতে হবে।"

সদু বললে, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে! আচ্ছা, তাই হবে, মেয়েকে দিয়ে মেয়ে ধরার কাজে লাগা যাবে, নইলে তোমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি এই ভার নিলুম। দুদিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।"

"পরশু হল শিবারাত্রি, খবর পেয়েছি অনিল-ডাকাত সিদ্ধেশ্বরী তলার মন্দিরে জপতপ করে রাত কাটাবে। তার মনে তো ভয়-ডর কোথাও নেই। এ দিকে ও ভারি ধার্মিক কিনা, ও মেয়েটা থাকবে তার কিরকম তান্ত্রিক মতের স্ত্রী হয়ে।"

"তোমরা পুলিসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেব। কিন্তু রাত্রি একটার আগে যেয়ো না। তাড়াহুড়ো করলে সব ফসকে যাবে।"

অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের-জুতো-খোলা দুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এ দিকে ও দিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু মন্দিরের দরজার কাছে।

একজন চুপিচুপি তাঁকে ইশারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে, "সেই ঠাকরুনটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারও চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শুনেছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারি দিকে। হুজুর, আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকরুনের গায়ে হাত দিতে পারব না। এমন-কি, চোখে দেখতেও পারব না— এ বলে রাখছি। আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।"

একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ— বিজয়বাবু যত বড়ো একেলে লোক হোন-না কেন, তাঁর যে ভয় করছিল না এ কথা বলা যায় না। তাঁর বুক দুর্‌দুর্ করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলি গলায় গুন্ গুন্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং!

বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন কী করা যায়। এক সময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা। ভাঙা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড়হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে সাহস হল মনে, বললেন— "সদু, অবশেষে তোমার এই কাজ!"

"হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব বলেই আজ

এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই-একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা যায়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই-সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনো হুকুম কখনো ঠেলতে পারি নি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম— এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড়ো রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কিরকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতুরী করে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বড়ো যাঁরা তাঁদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠুরতার অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

সদুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, "বিজয়বাবু, আজ আমি ধরা দেব বলেই স্থির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি সদুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি অসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোনো ফাঁক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সদু সম্বন্ধে কিচ্ছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন। আর আমি অন্য দিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এইসঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবিঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ—

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে!"

হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরেব ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্‌স্পেক্টারবাবু।

"এই গান অনেক বার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্থানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই।"

হঠাৎ বিজয়ের হাত কেঁপে উঠল, টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল হাত থেকে। মুখের উপরে দুই হাত চেপে বসে পড়লেন। প্রদীপটাও দমকা বাতাসে শেষ হয়ে গেছে আগেই।

১১-২১ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৪৮

প্রগতিসংহার

এই কলেজে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বরঞ্চ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। এরা প্রায় সবাই ধনী ঘরের— এরা পয়সার ফেলাছড়া করতে ভালোবাসে। নানারকম বাজে খরচ করে মেয়েদের কাছে দরাজ হাতের নাম কিনত। মেয়েদের মনে ঢেউ তুলত, তারা বুক ফুলিয়ে বলত— 'আমাদেরই কলেজের ছেলে এরা'। সরস্বতী পুজো তারা এমনি ধুম করে করত যে, বাজারে গাঁদা ফুলের আকাল পড়ে যেত। এ ছাড়া চোখ-টেপাটেপি ঠাট্টা তামাসা চলেইছে। এই তাদের মাঝখানে একটা সংঘ তেড়েফুঁড়ে উঠে মেলামেশা ছারখার করে দেবার জো করলে।

সংঘের হাল ধরে ছিল সুরীতি। নাম দিল 'নারীপ্রগতিসংঘ'। সেখানে পুরুষের ঢোকবার দরজা ছিল বন্ধ। সুরীতির মনের জোরের ধাক্কায় এক সময়ে যেন পুরুষ-বিদ্রোহের একটা হাওয়া উঠল। পুরুষরা যেন বেজাত, তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ। কদর্য তাদের ব্যভার।

এবার সরস্বতী পুজোতে কোনো ধুমধাম হল না। সুরীতি ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের বলেছে জাঁক-জমকের হুল্লোড়ে তারা যেন এক পয়সা না দেয়। সুরীতির স্বভাব খুব কড়া, মেয়েরা তাকে ভয় করে। তা ছাড়া নারীপ্রগতিসংঘে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে যে-কোনো পালপার্বণে তারা কিছুমাত্র বাজে খরচ করতে পারবে না। তার বদলে যাদের পয়সা আছে পূজা-আর্চায় তারা যেন দেয় গরিব ছাত্রীদের বেতনসাহায্য বাবদ কিছু-কিঞ্চিৎ।

ছেলেরা এই বিদ্রোহে মহা খাপা হয়ে উঠল। বললে, 'তোমাদের বিয়ের সময় আমরা গাধার পিঠে বরকে চড়িয়ে যদি না নিয়ে আসি, তবে আমাদের নাম নেই।'

মেয়েরা বললে, 'এরকম জুড়ি গাধা, একটার পিঠে আর-একটা, আমাদের সংসারে কোনো কাজে লাগবে না। সে দুটি আমরা তোমাদের দরবারে গলায় মালা দিয়ে আর রক্তচন্দন কপালে পরিয়ে পাঠিয়ে দেব। তাদের আদর করে দলে টেনে নিয়ো।'

যাই হোক, এ কলেজে ছেলেতে মেয়েতে একটা ছাড়াছাড়ি হবার জো হল। ছেলেরা কেউ কাছে এসে কথা বলতে গেলেই মেয়েরা নাক তুলে বলতে আরম্ভ করলে 'এ বড্ড গায়ে-পড়া'। ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের পাশে বসে সিগারেট খেত— এখন সেটা তাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ছেলেদের উপর রূঢ় ব্যবহার করা ছিল যেন মেয়েদের আত্মগরিমা। কোনো ছেলে বাসে মেয়েদের জন্য জায়গা করে দিতে এগিয়ে এলে বিদ্রোহিণী বলে উঠত— 'এইটুকু অনুগ্রহ করবার কী দরকার ছিল! ভিড়ের মধ্যে আমরা কারো চেয়ে স্বতন্ত্র অধিকারের সুযোগ চাই নে।'

ওদের সংঘের একটা বুলি ছিল— ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বুদ্ধিতে কম। দৈবাৎ প্রায়ই পরীক্ষার ফলে তার প্রমাণ হতে থাকত। কোনো পুরুষ যদি পরীক্ষায় তাদের ডিঙিয়ে প্রথম হত, তা হলে সে একটা চোখের জলের ব্যাপার হয়ে উঠত। এমন-কি, তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করা হয়েছে, স্পষ্ট করে এমন নালিশ জানাতেও সংকোচ করত না।

আগে ক্লাসে যাবার সময়ে মেয়েরা খোঁপায় দুটো ফুল গুঁজে যেত, বেশভূষার কিছু-না-কিছু বাহার করত। এখন তা নিয়ে এদের সংঘে ধিক্ ধিক্ রব ওঠে। পুরুষের মন ভোলাবার জন্যে মেয়েরা সাজবে, গয়না পরবে, এ অপমান মেয়েরা অনেকদিন ইচ্ছে করে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর চলবে না। পরনে বেরঙা খদ্দর চলিত হল। সুরীতি তার গয়নাগুলো দিদিমাকে দিয়ে বললে— 'এগুলো তোমার দান-খয়রাতে লাগিয়ে দিয়ো, আমার দরকার নেই, তোমার পুণ্যি হবে।' বিধাতা যাকে যেরকম রূপ দিয়েছেন তার উপরে রঙ চড়ানো অসভ্যতা। এ-সমস্ত মধ্য আফ্রিকায় শোভা পায়। মেয়েরা যদি তাকে বলত— 'দেখ্ সুরীতি, অত বাড়াবাড়ি করিস নে। রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা পড়েছিস তো? চিত্রাঙ্গদা লড়াই করতে জানত, কিন্তু পুরুষের মন ভোলাবার বিদ্যে তার জানা ছিল না, সেখানেই তার হার হল।' শুনে সুরীতি জ্বলে উঠত, বলত— 'ও আমি মানি নে। এমন অপমানের কথা আর হতে পারে না।'

এদের মধ্যে কোনো কোনো মেয়ের আত্মবিদ্রোহ দেখা দিল। তারা বলতে লাগল, মেয়ে-পুরুষের এইরকম ঘেঁষাঘেষি তফাত করে দেওয়া এখনকার কালের উলটো চাল। বিরুদ্ধবাদিনীরা বলত, পুরুষেরা যে বিশেষ করে আমাদের সমাদর করবে, আমাদের চৌকি এগিয়ে দেবে, আমাদের রুমাল কুড়িয়ে দেবে, এই তো যা হওয়া উচিত। সুরীতি তাকে অপমান বলবে কেন। আমরা তো বলি এই আমাদের সম্মান। পুরুষদের কাছ থেকে আমাদের সেবা আদায় করা চাই। একদিন ছিল যখন মেয়েরা ছিল সেবিকা, দাসী। এখন পুরুষেরা এসে মেয়েদের স্তবস্তুতি করে— এই সমাদর, সুরীতি যাই বলুক, আমরা ছাড়তে পারব না। এখন পুরুষ আমাদের দাস।'

এইরকম গোলমাল ভিতরে ভিতরে জেগে উঠল সকলের মধ্যে। বিশেষ করে সলিলার এই নীরস ক্লাসের রীতি ভালো লাগত না। সে ধনী ঘরের মেয়ে, বিরক্ত হয়ে চলে গেল দার্জিলিঙে ইংরেজি কলেজে। এমনি করে দুটো-একটি মেয়ে খসে যেতেও শুরু করেছিল, কিন্তু সুরীতির মন কিছুতেই টলল না।

মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত সুরীতির, এই গুমর ছেলেদের অসহ্য হয়ে উঠল। তারা নানারকম করে ওর উপর উৎপাত শুরু করলে। গণিতের মাস্টার ছিলেন খুব কড়া। তিনি কোনোরকম ছ্যাবলামি সহ্য করতেন না। তাঁরই ক্লাসে একদিন মহা গোলমাল বেধে গেল। সুরীতির ডেস্কে তার বাপের হাতের অক্ষরে লেখা লেফাফা— খুলবামাত্রই তার মধ্য থেকে একটা আরসোলা ফরফর করে বেরিয়ে এল। মহা চেঁচামেচি বেধে গেল। সে জন্তুটা ভয় পেয়ে পাশের মেয়ের খোঁপার উপরে আশ্রয় নিলে। সে এক বিষম হাঁউমাউ কাণ্ড। গণিতের মাস্টার বেণীবাবু খুব কড়া কটাক্ষপাত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু আরসোলার ফর্‌ফরানির উপরে তাঁর শাসন খাটবে কী করে। সেই চেঁচামেচিতে ক্লাসের মানরক্ষা আর হয় না। আর-একদিন— সুরীতির নোট বইয়ের পাতায় পাতায় ছেলেরা নস্যি দিয়েছে ভরে, খুব কড়া নস্যি। বইটা খুলতেই ঘোরতর হাঁচির ছোঁয়াচে উৎপাত বেধে গেল। সে গুঁড়ো পাশের মেয়েদের নাকে ঢুকে পড়ল। সকলকে নাকের জলে চোখের জলে করে দিলে। আর ঘন ঘন হ্যাঁচ্চো শব্দে পড়াশুনা বন্ধ হয় আর-কি। মাস্টার আড়চোখে দেখেন— দেখে তাঁরও হাসি চাপা শক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন রব উঠল কোনো মহারাজা কলেজ দেখতে আসবেন, বিশেষ করে মেয়েদের ক্লাস। কানে কানে গুজব রটল— তাঁর এই দেখতে আসার লক্ষ্য ছিল বধূ জোগাড় করা। একদল মেয়ে ভান করলে যে, তাদের যেন অপমান করা হচ্ছে। কিন্তু ওরই ভিতরে দেখা গেল সেদিনকার খোঁপায় কিছু শিল্পকাজ, সেদিনকার পাড়ে কিছু রঙ। লোকটি তো যে-সে নয়, সে ক্রোড়পতি। মেয়েদের মনের মধ্যে একটা হুড়োমুড়ি ছিল সকলের আগে তাঁর চোখে পড়বার। তার পরে ক্লাস তো হয়ে গেল। একটা দূত এসে জানালে যে তাঁর পছন্দ ঐ সুরীতিকেই। সুরীতি জানে, এ রাজার তহবিলে অগাধ টাকার জোরে পুরুষ জাতির সমস্ত নীচতা কোথায় তলিয়ে যায়। ভান করলে এ প্রস্তাবে সে যে কেবল রাজি নয় তা নয়, বরঞ্চ সে অপমানিত বোধ করছে। কেননা, মেয়েদের ক্লাস তো গোহাটা নয়, যে, ব্যবসায়ী এসে গোরু বাছাই করে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে-মনে ছিল আর-একটু সাধ্যসাধনার প্রত্যাশা। ঠিক এমন সময় খবর পাওয়া গেল, মহারাজা তাঁর সমস্ত পাগড়ি-টাগড়ি-সমেত অন্তর্ধান করেছেন। তিনি বলে গিয়েছেন, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একটাকেও বাছাই করে নেবার যোগ্য তিনি দেখলেন না। এর চেয়ে তাঁদের পশ্চিমের বেদের মেয়েরাও অনেক ভালো।

ক্লাস-সুদ্ধ মেয়েরা একেবারে জ্বলে উঠল। বললে, কে বলেছিল তাঁকে আমাদের এই অপমান করতে আসতে! সেদিন তাদের সাজসজ্জার মধ্যে যে একটু কারিগরি দেখা গিয়েছিল সেটা লজ্জা দিতে লাগল। এমন সময়ে প্রকাশ পেল— মহারাজটি তাদেরই একজন পুরোনো ছাত্র। বাপ-মায়ের বিষয়-সম্পত্তি জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে টাকাওয়ালা মেয়ে। মেয়েদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুরীতি বার বার করে বলতে লাগল— সে একটুও বিশ্বাস করে নি। সে প্রথম থেকেই কেবল যে বিশ্বাস করে নি তা নয়, সে কলেজের প্রিন্সিপাল্‌কে এই পড়ার ব্যাঘাত নিয়ে নালিশ করতে

পর্যন্ত তৈরি ছিল। হয়তো ছিল, কিন্তু তার তো কোনো দলিল পাওয়া গেল না।

এমনি করে একটার পর আর-একটা উৎপাত চলতেই লাগল। এই সমস্ত উপদ্রবের প্রধান পাণ্ডা ছিল নীহার।

একবার ডিগ্রি নিতে যাচ্ছিল যখন সুরীতি, তার পাশে এসে নীহার বললে, "কী গো গরবিনী, মাটিতে যে পা পড়ছে না!"

সুরীতি মুখ বেঁকিয়ে বললে, "দেখুন, আপনি আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।"

নীহার বললে, "তুমি বিদুষী হয়ে একে ঠাট্টা বলো, এ যে বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা! এমন সম্মান কি আর কোনো নামে হতে পারে!"

"আমাকে আপনার সম্মান করতে হবে না।"

"সম্মান না করে বাঁচি কী করে! হে বিকচকমলায়তলোচনা, হে পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা, হে স্মিতহাস্যজ্যোৎস্নাবিকাশিনী, তোমাকে আদরের নামে ডেকে যে তৃপ্তির শেষ হয় না।"

"দেখুন, আপনি আমাকে রাস্তার মধ্যে যদি এরকম অপমান করেন, আমি প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করব।"

"নালিশ করতে হয় কোরো, তবে অপমানের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়ো। এর মধ্যে কোন্ শব্দটা অপমানের? বল তো আমি আরো চড়িয়ে দিতে পারি। বলব— হে নিখিলবিশ্ব-হৃদয়-উন্মাদিনী"—

রাগে লাল হয়ে সুরীতি দ্রুতপদে চলে গেল। তার পিছন দিকে খুব একটা হাসির ধ্বনি উঠল। ডাক পড়তে লাগল, "ফিরে চাও হে রোষারুণলোচনা, হে যৌবনমদমত্তমাতঙ্গিনী"—

তার পরের দিন ক্লাস আরম্ভ হবার মুখেই রব উঠল, "হে সরস্বতী-চরণকমল-দলবিহারিণী-গুঞ্জনমত্ত-মধুব্রতা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননী"—

সুরীতি রেগে গিয়ে পাশের ঘরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট গোবিন্দবাবুকে বললে, "দেখুন, আমাকে কথায় কথায় অপমান করলে আমি থাকব না।"

তিনি এসে বললেন ক্লাসের ছেলেদের, "তোমরা কেন ওকে এত উপদ্রব করছ।"

নীহার বললে, "এ'কে কি উপদ্রব বলে! যদি কেউ নালিশ করতে পারে, তবে পূর্ণচন্দ্রই করতে পারতেন যে তাঁকে আমি ঠাট্টা করেছি। আমাদের ক্লাসে যোগেশ বলে— ওগুলো বাদ দিয়ে শুধু ওকে নিভাননা বললেই হয়, কেননা কলমের নিভের মতন সুতীক্ষ্ণ ওর মুখ। শুনে বরং আমি বলেছিলুম 'ছি, এরকম করে বলতে নেই, ওঁরা হলেন বিদুষী'— কথাটা চাপা দিয়েছিলুম। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রনিভাননাতে আমি তো দোষের কিছু দেখি নি।"

ছেলেরা বললে, "আপনি বিচার করে দেখুন, আমরা মনের আনন্দে আউড়ে গিয়েছিলুম— হে সরস্বতীচরণকমলদলবিহারিণী গুঞ্জনমত্তমধুব্রতা! প্রথমত কথাটা নিন্দার নয়, দ্বিতীয়ত সেটা যে ওরই প্রতি লক্ষ করে বলা এত বড়ো অহংকার ওর কেন হল। ঘরেতে আরো তো ছাত্রী আছে, তারা তো ছিল খুশি।"

সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন, "অস্থানে অসময়ে এরকম সম্ভাষণগুলো লোকে পরিহাস বলেই নেয়। দরকার কী বলা!"

"দেখুন সার, মন যখন উতলা হয়ে ওঠে তখন কি সময় অসময়ের বিচার থাকে। তা ছাড়া আমাদের এ সম্ভাষণ যদি পরিহাসই হয়, তা হলে তো এটা কেউ গায়ে না নিয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। আর আপনার কলেজে এত বড়ো বড়ো সব বিদুষী, এঁরা কি পরিহাসের উত্তরে পরিহাস করতেও জানেন না? এদের দন্তরুচিকৌমুদীতে কি হাস্যমাধুরী জাগবে না। তা হলে আমরা সব তৃষিত সুধাপিপাসু পুরুষগুলো বাঁচি কী করে।"

এইরকম কথা-কাটাকাটির পালা চলত যখন তখন। সুরীতি অস্থির হয়ে উঠল— তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আর টেঁকে না। সে ঠাট্টা করতে জানে না, অথচ কড়া জবাব করবার ভাষাও তার আসে না।

সে মনে-মনে জ্বলে পুড়ে মরে। সুরীতির এই দুর্গতিতে দয়া হয় এমন পুরুষও ছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু তারা ঠাঁই পায় না।

আর-একদিন হঠাৎ কী খেয়াল গেল, যখন সুরীতি কলেজে আসছিল তখন রাস্তার ওপার থেকে নীহার তাকে ডেকে উঠল— "হে কনকচম্পকদামগৌরী!"

লোকটা পড়াশুনা করেছে বিস্তর, তার ভাষা শিখবার যেন একটা নেশা ছিল। যখন তখন অকারণে সংস্কৃত আওড়াত, তার ধ্বনিটা লাগত ভালো। পাঠ্য পুস্তকের পড়ায় সুরীতি তাকে এগিয়ে থাকত, মুখস্থ বিদ্যেয় সে ছিল ওস্তাদ। কিন্তু পাঠ্যের বাইরে ছিল নীহারের প্রচুর পড়াশুনা। সুরীতি একেবারে প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে ছুটে গোবিন্দবাবুর ঘরে গিয়ে বললে, "রাস্তায় ঘাটে এরকম সম্ভাষণ আমার সহ্য হয় না।"

নীহার বললে, "আমার অন্যায় হয়েছে। কাল থেকে ওকে বলব 'মসীপুঞ্জিতবর্ণা', কিন্তু সেটা কি বড্ড বেশি রিয়ালিস্টিক হবে না।"

সুরীতি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল।

নীহারের চরিত্রে একটা নিরেট নিষ্ঠুরতা ছিল। যথোপযুক্ত ঘুষ দিয়ে তবে সেটাকে শান্ত করা যেত। এ কথা সবাই জানে।

একদিন নীহার জাপানি খেলনা— কট্‌কটে-আওয়াজ করা কাঠের ব্যাঙ দিয়ে ছেলেদের পকেট ভর্তি করে আনলে। ঠিক যে সময়ে প্লেটোর দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার পালা এল— সমস্ত ক্লাসে কট্‌কট্ কট্‌কট্ শব্দ পড়ে গেল। শব্দটা যে কোথা থেকে হচ্ছে তাও স্পষ্ট বোঝা শক্ত। সেদিন কট্‌কটে ব্যাঙের শব্দে প্লেটোর কণ্ঠ একেবারে ডুবে গেল। শেষকালে খানাতল্লাসি করে দেখা গেল, দশটা কাঠের ব্যাঙ সুরীতির ডেস্কের ভিতরে।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, "এ কখনো আমার নয়। অন্যরা কেউ আমার ডেস্কে দুষ্টুমি করে ভরে রেখেছে।"

ছেলেরা মহা তেরিয়া হয়ে বলে উঠল, "আমাদের উপর এরকম অন্যায় দোষ দিলে আমরা সইতে পারব না। এরকম ছেলেমানুষি খেলবার শখ কখনো পুরুষদের হতেই পারে না। এ-সমস্ত মেয়েদেরই খুকির ধর্ম।"

কিছুক্ষণ ক্লাসঘর নীরব। তার পরে হঠাৎ অপর কোণ থেকে অদ্ভুত শব্দ উঠল, একসঙ্গে সব ছেলেরা পা ঘষতে শুরু করেছে সিমেন্টের উপর। এতগুলো জুতো ঘষার শব্দে একটা উৎকট কন্‌সার্টের সৃষ্টি হল। ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, সুরীতির পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা চলল না। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে রইল, এক সময়ে হঠাৎ দড়াম করে একটা শব্দ হওয়ার পর ছেলেরা উঃ হুঃ শব্দে সানাইয়ের আওয়াজ নকল করতে লাগল।

তখন সুরীতি বলে উঠল, "সার, অনুগ্রহ করে ওদের গোলমাল করতে বারণ করবেন কি! আমরা এখানে পড়তে এসেছি, কিন্তু সংগীতচর্চার জায়গা এটা নয়। যদি কারও ক্লাস করতে ইচ্ছে না হয়, তবে ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।"

সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে রব উঠল, 'শেম', 'শেম' এবং লেফ্‌ট রাইট মার্চ্ করতে করতে ছেলেরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেদিনকার মতো ক্লাস আর জমল না। মেয়েরা যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে কমনরুমে বসেছে, একটি পিয়ন এসে খবর দিল— সুরীতিকে সেক্রেটারিবাবু ডেকেছেন। মেয়েরা সব কানাকানি করতে লাগল। সুরীতি সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে দেখলে সেখানে তাদের সেদিনকার প্রফেসার বসে আছেন আর নীহার পাশে দাঁড়িয়ে। সেক্রেটারি সুরীতিকে বললেন, "ছেলেরা নালিশ করেছে তোমার আজকের ব্যবহারে তারা অপমান বোধ করেছে। তোমার দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো।"

সুরীতি বললে, "সার, ওরা যে প্রফেসারের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করল, আমাদের সঙ্গে অভদ্রতা করল, তাতে কি আমাদেরই অপমান হয় না।"

যাই হোক, সেক্রেটারি ও প্রফেসার উভয় পক্ষের কথা শুনে বিবেচনা করে নীহারকে বললেন, "সব দিক থেকে প্রমাণ হল ক্লাসে তুমিই প্রথম উৎপাত শুরু কর এবং তুমিই ছিলে দলের অগ্রণী। এ ক্ষেত্রে তোমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

নীহার বললে, "সার, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়, তার চেয়ে অনুমতি দিন— আমি কলেজ ছাড়তে রাজি।"

সেক্রেটারি বললেন, "তোমাকে সময় দিচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখো।"

সে তথাস্তু ব'লে খাতাপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। সেদিন ক্লাসের শেষে ছেলেমেয়েরা বাইরে নেমে দেখলে, নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙানো রয়েছে— আজ থেকে পুজোর ছুটি আরম্ভ হল।

সলিলার সঙ্গে নীহারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সে নীহারকে প্রস্তাব করলে, "তুমিও দার্জিলিঙে চলে এসো।"

নীহার বললে, "আমার বাপ তো তোমার বাপের মতো লক্ষপতি নয়। দার্জিলিঙে পড়াশুনা করি এমন শক্তি কোথায়।"

শুনে সে মেয়ে বললে, "আচ্ছা, আমি দেব তোমার খরচ।"

নীহারের এই গুণ ছিল, তাকে যা দেওয়া যায় তা পকেটে করে নিতে একটুও ইতস্তত করে না। সে ধনী ছাত্রীর খরচায় দার্জিলিঙে যাওয়াই ঠিক করলে।

এ দিকে যত অহংকারই সুরীতির থাক্, নীহারের মনের টান যে সলিলার দিকে সেটা তার মনে বাজল। নীহার ধনী মেয়ের আশ্রয়ে সুরীতির প্রতি আরো বেশি যখন-তখন যা-তা বলতে লাগল। সে বলত, 'পুরুষের কাছে ভদ্রতার দাবি করতে পারে সেই মেয়েরাই, যারা মেয়েদের স্বভাব ছাড়ে নি।' পুরুষের কাছ থেকে এই অনাদর সুরীতি ঘাড় বেঁকিয়ে অগ্রাহ্য করবার ভান করত। কিন্তু তার মনের ভিতরে এই নীহারের মন পাবার ইচ্ছাটা যে ছিল না, তা বলা যায় না। নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মাসোহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা ক'রে ও কেউ কেউ ঘৃণা ক'রে নীহারকে বলত 'ঘরজামাই'। নীহার তা গ্রাহ্যই করত না। তার দরকার ছিল পয়সার। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ফিরপোর দোকানে বন্ধুদের নিয়ে পিক্‌নিক্ করবার খরচ চলত এবং নানাপ্রকার শৌখিন ও দরকারী জিনিসের সরবরাহ্ সুসাধ্য হয়ে উঠত, ততদিন পর্যন্ত সেই মেয়ের আশ্রিত হয়ে থাকতে তার কিছুমাত্র সংকোচ হত না। দরকার হলেই নীহার সলিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাত। এই যে তার একজন পুরুষ পোষ্য ছিল, তার প্রতিভার উপর সলিলার খুব বিশ্বাস ছিল। মনে করেছিল এক সময়ে নীহার একটা মস্ত নাম করবে। সমস্ত বিশ্বের কাছে তার প্রতিভার যে একটা অকুণ্ঠিত দাবি আছে— নীহার সেটার আভাস দিতে ছাড়ত না, সলিলাও তা মেনে নিত।

সলিলা দার্জিলিঙে থাকতে থাকতেই এক সময়ে তার ডবল নিমোনিয়া হল, চিকিৎসার ত্রুটি হল না, কিন্তু যমদূতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। মৃত্যু হল সলিলার। শেষ পর্যন্ত নীহার তাকিয়ে ছিল হয়তো উইলে তার নামে কিছু দিয়ে যাবে। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন মিলল না, তখন সলিলার উপরে বিষম রাগ হল। বিশেষত যখন সে শুনল সলিলা তার দাসীকে দিয়ে গিয়েছে একশো টাকা, তখন সে সলিলাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল— কিরকম নীচতা! ইংরেজিতে যাকে বলে 'মীন্‌নেস'!

যে মেয়েকে নীহার স্তব করে বলত 'জগদ্ধাত্রী', পুরুষ-পালনের পালা তিনি সাঙ্গ করে নীহারকে নৈরাশ্যের ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন। দার্জিলিঙের খরচ আর তো চলে না, আবার নীহার ফিরে এল কলকাতার মেসে। ছেলেরা একদফা খুব হাসাহাসি করে নিলে। নীহারের তাতে গায়ে বাজত না। ওর আশা ছিল দ্বিতীয় আর-একটি জগদ্ধাত্রী জুটে যাবে। একজন বিখ্যাত উড়িয়া গণৎকার তাকে গনে বলেছিল কোনো বড়ো ধনী মেয়ের প্রসাদ সে লাভ করবে। সেই গণনাফলের দিকে উৎসুকচিত্তে সে তাকিয়ে রইল। জগদ্ধাত্রী কোন্ রাস্তা দিয়ে যে এসে পড়েন তা তো বলা যায় না। অত্যন্ত টানাটানির দশায় পড়ে গেল।

দার্জিলিং-ফেরত নীহারকে হঠাৎ কলেজে দেখে সুরীতিও আশ্চর্য হয়ে গেল— বললে, "আপনি হিমালয় থেকে ফিরলেন কবে।"

নীহার হেসে বললে, "ওগো সীমন্তিনী, কিছু হাওয়া খেয়ে আসা গেল। কালিদাস বলেছেন : মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ। ঐ দেবদারুর চেয়ে ঢের বেশি কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের রোগা হাড়, এই দেখো-না কম্বল জড়িয়ে ভুটিয়া সেজে এসেছি।"

সুরীতি হেসে বললে, "কেন, সাজ তো মন্দ হয় নি আর আপনার চেহারাও তো দেখাচ্ছে ভালো, ভুটিয়া বকুর সাজসজ্জাতে আপনাকে ভালো মানিয়েছে।"

নীহার বললে, "খুশি হলুম, এখন তো আর শীতের থেকে রক্ষা পাবার কথা ভাবতে হবে না, এখন কী দিয়ে তোমাদের চোখ ভোলাব এইটেই হচ্ছে সমস্যা— সেটা আরো শক্ত কথা।"

সুরীতি। তা চোখ ভোলাবার দরকার কী। পুরুষমানুষের সহায়তা করে তার বিদ্যে তুমি জান তো তোমার মধ্যে তার অভাব নেই।

নীহার। এইটে তোমাদের ভুল। নিউটন বলেছিলেন তিনি জ্ঞানসমুদ্রের নুড়ি কুড়িয়েছেন, আমি তো কেবলমাত্র বালুর কণা সংগ্রহ করেছি।

সুরীতি। বাস্ রে! এবার পাহাড় থেকে দেখছি তুমি অনেকখানি বিনয় সংগ্রহ করে এনেছ, এ তো তোমার কখনো ছিল না।

নীহার। দেখো, এ শিক্ষা আমার স্বয়ং কালিদাসের কাছ থেকে, যিনি বলেছেন : প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ।

সুরীতি। এই-সব সংস্কৃত শ্লোকের জ্বালায় হাঁপিয়ে উঠলুম, একটু বিশুদ্ধ বাংলা বলো।

এর মধ্যে আশ্চর্যের কথা এই যে, সলিলার মৃত্যুর উল্লেখমাত্রও সে করল না।

এ দিকে ক্লাসের ঘণ্টার শব্দে দুজনকেই দ্রুত চলে যেতে হল, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলো সুরীতির মনের ভিতরে দেবদারুর মতোই মুহুর্মুহু কম্পিত হতে লাগল। সে দেখেছে আজকাল নীহারের ঠাট্টা আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানো অন্য মেয়েরা খুব পছন্দ করে। তারা তাই নিয়ে ওকে প্রশংসা করে, তাই সেও বুঝেছে ওতে পরিহাসের কড়া স্বাদ নেই। সেইজন্য ইদানীং নীহারের হঠাৎ সংস্কৃত আবৃত্তিকে ভালো লাগাবার চেষ্টা করত।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল যাতে ছাত্রছাত্রীদের মিলে মিশে কাজ করবার একটা সুযোগ হল। সর্বন ইউনিভার্সিটির একজন ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আসবেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির নিমন্ত্রণে। ছেলেমেয়েরা ঠিক করেছিল পথের মধ্যে থেকে তারাই তাঁকে অভ্যর্থনা করার গৌরব সর্বপ্রথমে লুটে নেবে। আগে ভাগে অধ্যাপকের কাছে গিয়ে তাঁকে ওদের প্রগতিসংঘের নিমন্ত্রণ জানালে। তিনি ফরাসী সৌজন্যের আতিশয্যে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলেন। তার পরে কে তার অভিনন্দন পাঠ করবে, সেটা ওরা ভালো করে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ বলছিল সংস্কৃত ভাষায় বলবে, কেউ বলছিল ইংরেজি ভাষাই যথেষ্ট— কিন্তু তা কারও মনঃপূত হল না। ফরাসী পণ্ডিতকে ফরাসী ভাষায় সম্মান প্রকাশ করাই উপযুক্ত ঠিক করল। কিন্তু করবে কে। বাইরের লোক পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাতে তো সম্মান রক্ষা হয় না। এমন সময়ে নীহার রঞ্জন বলে উঠল, "আমার উপর যদি ভার দাও, আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব এবং ভালোরকমেই পারব।"

মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের নীহাররঞ্জনের উপর বিশেষ টান, তারা বললে— দেখা যাক্-না।

সুরীতির বিশেষ আপত্তি, সে বললে— একটা ভাঁড়ামি হয়ে উঠবে।

দলের মেয়েরা বললে, "আমরা বিদেশী, যদি বা আমাদের ভাষায় কিংবা বক্তৃতায় কোনো ত্রুটি হয় তা ফরাসী অধ্যাপক নিশ্চয়ই হাসিমুখে মেনে নেবেন। ওঁরা তো আর ইংরেজ নন, ইংরেজরা বিদেশীদের কাছ থেকেও নিজেদের আদবকায়দার স্খলন সইতে পারেন না, এমন ওঁদের অহংকার। কিন্তু ফরাসীদের তা নয়, বরঞ্চ যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে সেটা হেসে গ্রহণ করবে। দেখা যাক্-না—

নীহাররঞ্জনের বিদ্যের দৌড় কতদূর। শুনেছি ও ঘরে বসে বসে ফরাসী পড়ার চর্চা করে।”

নীহাররঞ্জনের বাড়ি চন্দননগরে। প্রথম বয়সে ফরাসী স্কুলে তার বিদ্যাশিক্ষা, সেখানে ওর ভাষার দখল নিয়ে খুব খ্যাতি পেয়েছিল, এ-সব কথা ওর কলকাতার বন্ধু-মহল কেউ জানত না। যা হোক, সে তো কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। কী আশ্চর্য, অভিনন্দন যখন পড়ল তার ভাষার ছটায় ফরাসী পণ্ডিত এবং তাঁর দু-একজন অনুচর আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন— এরকম মার্জিত ভাষা ফ্রান্সের বাইরে কখনো শোনেন নি। বললেন, এ ছেলেটির উচিত প্যারিসে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে আসা। তার পর থেকে ওদের কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে ধন্য ধন্য রব উঠল ; বললে— কলেজের নাম রক্ষা হল, এমন-কি, কলকাতা ইউনিভারসিটিকেও ছাড়িয়ে গেল খ্যাতিতে।

এর পরে নীহারকে অবজ্ঞা করা কারও সাধ্যের মধ্যে রইল না। 'নীহারদা' 'নীহারদা' গুঞ্জনধ্বনিতে কলেজ মুখরিত হয়ে উঠল। প্রগতিসংঘের প্রথম নিয়মটা আর টেকে না। পুরুষদের মন ভোলাবার জন্য রঙিন কাপড়-চোপড় পরা ওরা ত্যাগ করেছিল। সব-প্রথমে সে নিয়মটি ভাঙল সুরীতি, রঙ লাগালো তার আঁচলায়। আগেকার বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়ে নীহাররঞ্জনের কাছে ঘেঁষতে তার সংকোচ বোধ হতে লাগল, কিন্তু সে সংকোচ বুঝি টেকে না।

দেখলে অন্য মেয়েরা সব তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ-বা ওকে চায়ে নিমন্ত্রণ করছে, কেউ-বা বাঁধানো টেনিসন এক সেট লুকিয়ে ওর ডেস্কের মধ্যে উপহারে রেখে যাচ্ছে। কিন্তু সুরীতি পড়ছে পিছিয়ে। একজন মেয়ে নীহারকে যখন নিজের হাতের কাজ-করা সুন্দর একটি টেবিল-ঢাকা দিলে, তখন সুরীতির প্রথম মনে বিঁধল, ভাবল, 'আমি যদি এই-সব মেয়েলি শিল্পকার্যের চর্চা করতাম।' সে যে কোনোদিন সুঁচের মুখে সুতো পরায় নি, কেবল বই পড়েছে। সেই তার পাণ্ডিত্যের অহংকার আজ তার কাছে খাটো হয়ে যেতে লাগল। 'কিছু-একটা করতে পারতুম যেটাতে নীহারের চোখ ভুলতে পারত'— সে আর হয় না। অন্য মেয়েরা তাকে নিয়ে কত সহজে সামাজিকতা করে। সুরীতির খুব ইচ্ছে সেও তার মধ্যে ভরতি হতে পারত যদি, কিন্তু কিছুতেই খাপ খায় না। তার ফল হল এই— তার আত্মনিবেদন অন্য মেয়েদের চেয়েও আরো যেন জোর পেয়ে উঠল। সে নীহারের জন্য কোনো অছিলায় নিজের কোনো একটা ক্ষতি করতে পারলে কৃতার্থ হত। একেবারে প্রগতিসংঘের পালের হাওয়া বদলে গেল।

অন্য মেয়েরা ক্রমে নিয়মিতভাবে তাদের পড়াশুনায় লেগে গেল, কিন্তু সুরীতি তা পেরে উঠল না। একদিন ডেস্কের উপর থেকে দৈবাৎ নীহারের ফাউন্‌টেনপেনটি মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, সর্বাগ্রে সেটা সে তুলে ওকে দিলে। এর চেয়ে অবনতি সুরীতির আর কোনোদিন হয় নি। একদিন নীহার বক্তৃতায় বলেছিল— তার মধ্যে ফরাসী নাট্যকারের কোটেশন ছিল— 'সব সুন্দর জিনিসের একটা অবগুণ্ঠন আছে, তার উপরে পরুষদৃষ্টির হাওয়া লাগলে তার সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা যে পারতপক্ষে পুরুষদের কাছে দেখা দিত না, তার প্রধান কারণ এই যে, দেখা দেওয়ার দ্বারা মেয়েদের মূল্য কমে যায়। তাদের কমনীয়তার উপরে দাগ পড়তে থাকে।' অন্য মেয়েরা এই কথা নিয়ে বিরুদ্ধ তর্কে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বললে, এমনতরো করে ঢেকেঢুকে কমনীয়তা রক্ষা করবার চেষ্টা করা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। সংসারে পরুষস্পর্শ, কী স্ত্রী, কী পুরুষ, সকলেরই পক্ষে সমান আবশ্যক। আশ্চর্য এই, আর কেউ নয়, স্বয়ং সুরীতি উঠে নীহারের কথার সমর্থন করলে।

এই এক সর্বনের ধাক্কায় তার চালচলন সম্পূর্ণ বদলে যাবার জো হল। এখন সে পরামর্শ নিতে যায় নীহারের কাছে। যখন শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক সিনেমাতে দেখানো হয়, তখন তাও কি মেয়েরা কোনো পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারে না। নীহার কড়া হুকুম জারি করলে— তাও না। কোনোক্রমে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে নিয়ম আর রক্ষা করা যায় না।

প্রত্যেকবারেই সুরীতি ভালো কিছু দেখবার থাকলে সিনেমাতে যেত। এখন তার কী হল! এত বড়ো আত্মত্যাগ তো কল্পনা করা যায় না, এমন-কি, আজকালকার দিনে যে সামাজিক নিমন্ত্রণে স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া চলত, সেখানে সে যাওয়া ছেড়ে দিলে। সনাতনীরা খুব তার

প্রশংসা করতে লাগল। প্রগতিসংঘ থেকে সে নিজেই আপনার নাম কাটিয়ে নিলে।

সুরীতি চাকরি নেবে, নীহারের অনুমতি চাইল— স্কুলে পুরুষ ছাত্র খুব ছোটো বয়সের হলেও তাদের পড়ানো চলে কি না।

নীহার বললে, না, তাও চলে না। তার ফল হল সে অর্ধেক মাইনে স্বীকার করে মাস্টারি নিয়ে বললে, তার বাকি বেতন থেকে ছেলেদের আলাদা পড়াবার লোক রাখা হোক। স্কুলের সেক্রেটারিবাবু অবাক।

সুরীতির মনের টান ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। এক সময়ে কোনোরকম করে আভাস দিয়েছিল, তাদের বিয়ে হতে পারে কি না। একদিন যে সমাজের নিয়মকে সুরীতি মানত না, সেই সমাজের নিয়ম অনুসারে শুনতে পেল ওদের বিয়ে হতে পারে না কোনোমতেই। অথচ এই পুরুষের আনুগত্য রক্ষা করে চিরকাল মাথা নিচু করে চলতে পারে তাতে অপরাধ নেই, কেননা বিধাতার সেই বিধান।

প্রায়ই সে শুনতে পেত— নীহারের অবস্থা ভালো নয়, পড়বার বই তাকে ধার করে পড়তে হয়। তখন সুরীতি নিজের জলপানি থেকে ওকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগল। নীহারের তাতে কোনো লজ্জা ছিল না। মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষদের যেন অর্ঘ্য নেবার অধিকার আছে। অথচ তার বিদ্যার অভিমানের অন্ত ছিল না। একবার একটি কলেজে বাংলা অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। সুরীতির অনুরোধে নীহারকে সে পদে গ্রহণ করবার প্রস্তাবে অনুকূল আলোচনা চলছিল। তাতে নীহারের নাম নিয়ে কমিটিতে এই আলোচনায় তার অহংকারে ঘা লাগল।

সুরীতি নীহারকে বললে, "এ তোমার অন্যায় অভিমান। স্বয়ং ভাইসরয় নিযুক্ত করবার সময়েও কাউন্সিলের মেম্বারদের মধ্যে তা নিয়ে কথাবার্তা চলে।"

নীহার বললে, "তা হতে পারে, কিন্তু আমাকে যেখানে গ্রহণ করবে সেখানে বিনা তর্কেই গ্রহণ করবে। এ না হলে আমার মান বাঁচবে না। আমি বাংলা ভাষায় এম· এ তে সব-প্রথম পদবী পেয়েছি। আমি অমন করে কমিটি থেকে ঝাঁট দিয়ে নেওয়া পদ নিতে পারব না।"

এ পদ যদি নিত তা হলে সুরীতির কাছ থেকে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন চলে যেত নীহারের। পদকে সে অগ্রাহ্য করলে, কিন্তু এই প্রয়োজনকে না। সুরীতির জলখাবার প্রায় বন্ধ হয়ে এল। বাড়ির লোকে ওর ব্যবহারে এবং চেহারায় অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই ওর শরীর ভালো নয়, তার উপরে এই কষ্ট করা— এ তপস্যা কার জন্য সে কথা যখন তারা ধরতে পারলে তখন তারা নীহারকে গিয়ে বললে, "হয় তুমি একে বিবাহ করো, নয় এর সঙ্গ ত্যাগ করো।"

নীহার বললে, "বিবাহ করা তো চলবেই না— আর ত্যাগের কথা আমাকে বলছেন কেন, সঙ্গ ইচ্ছে করলেই তো তিনি ত্যাগ করতে পারেন, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।"

সুরীতি সে কথা জানত। সে জানত নীহারের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই, নিজের সুবিধাটুকু ছাড়া। সেই সুবিধাটুকু বন্ধ হলে তাকে অনায়াসে পথের কুকুরের মতো খেদিয়ে দিতে পারে। এ জেনেও যতরকমে পারে সুবিধে দিয়ে, বই কিনে দিয়ে, নতুন খদ্দরের থান তাকে উপহার দিয়ে, যেমন করে পারে তাকে এই সুবিধার স্বার্থবন্ধনে বেঁধে রাখলে। অন্য গতি ছিল না ব'লে এই অসম্মান সুরীতি স্বীকার করে নিলে।

এক সময়ে মফস্বলে বেশি মাইনের প্রিন্সিপালের পদ পেয়েছিল। তখন তার কেবল এই মনের ভিতরে বাজত, 'আমি তো খুব আরামে আছি, কিন্তু তিনি তো ওখানে গরিবের মতো পড়ে থাকেন— এ আমি সহ্য করব কী করে।' অবশেষে একদিন বিনা কারণে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় অল্প বেতনে এক শিক্ষয়িত্রীর পদ নিলে। সেই বেতনের বারো-আনা যেত নীহাররঞ্জনের পেট ভরাতে, তার শখের জিনিস কিনে দিতে। এই ক্ষতিতেই ছিল তার আনন্দ। সে জানত মন ভোলাবার কোনো বিদ্যে তার জানাই ছিল না। এই কারণেই তার ত্যাগ এমন অপরিমিত হয়ে উঠল। এই ত্যাগেই সে অন্য

মেয়েদের ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তা ছাড়া আজকাল উলটো প্রগতির কথা সে ক্রমাগত শুনে আসছে যে, মেয়েরা পুরুষের জন্য ত্যাগ করবে আপনাকে এইটাই হচ্ছে বিধাতার বিধান। পুরুষের জন্য যে মেয়ে আপনাকে না উৎসর্গ করে সে মেয়েই নয়। এই-সমস্ত মত তাকে পেয়ে বসল।

কলকাতায় যে বাসা সে ভাড়া করল খুব অল্প ভাড়ায়— স্যাঁৎসেতে, রোগের আড্ডা। তার ছাদে বের হবার জো নেই, কলতলায় কেবলই জল গড়িয়ে পড়ছে। তার উপরে যা কখনো জীবনে করে নি তাই করতে হল— নিজের হাতে রান্না করতে আরম্ভ করল। অনেক বিদ্যে তার জানা ছিল, কিন্তু রান্নার বিদ্যে সে কখনো শেখে নি। যে অখাদ্য অপথ্য তৈরি হত, তা দিয়ে জোর করে পেট ভরাত। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝে কাজ কামাই করতে বাধ্য হল ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে। এত ঘন ঘন ফাঁক পড়ত কাজে যে অধ্যক্ষরা তাকে আর ছুটি মঞ্জুর করতে পারলেন না। তখন ধরা পড়ল ভিতরে ভিতরে তাকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। বাসা থেকে তাকে সরানো দরকার, আত্মীয়-স্বজনরা মিলে তাঁকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভরতি করে দিলে। কেউ জানত না কিছু টাকা তার গোপনে সঞ্চিত ছিল, সেই টাকা থেকেই তার বরাদ্দ-মতন দেয় নীহারের কাছে গিয়ে পৌঁছত। নীহার সব অবস্থাই জানত, তবু তার প্রাপ্য ব'লে এই টাকা সে অনায়াসে হাত পেতে নিতে লাগল। অথচ একদিন হাসপাতালে সুরীতিকে দেখতে যাবার অবকাশ সে পেত না। সুরীতি উৎসুক হয়ে থাকত জানলার দিকে কান পেতে, কিন্তু কোনো পরিচিত পায়ের ধ্বনি কোনোদিন কানে এল না। অবশেষে একদিন তার টাকার থলি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল আর সেইসঙ্গে তার চরম আত্মনিবেদন।

১১-২১ জুন ১৯৪১ আশ্বিন ১৩৪৮

শেষ পুরস্কার

খসড়া

সেদিন আই· এ· এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কার বিতরণের উৎসব। বিমলা ব'লে এক ছাত্রী ছিল, সুন্দরী ব'লে তার খ্যাতি। তারই হাতে পুরস্কারের ভার। চার দিকে তার ভিড় জমেছে আর তার মনে অহংকার জমে উঠেছে খুব প্রচুর পরিমাণে। একটি মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলে কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সাহস করে একটু কাছে এল যেই, দেখা গেল তার পায়ে হয়েছে ঘা, ময়লা কাপড়ের ব্যান্ডেজ জড়ানো। তাকে দেখে বিমলা নাক তুলে বললে, "ও এখানে কেন বাপু, ওর যাওয়া উচিত হাসপাতালে।"

ছেলেটি মন-মরা হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে তার স্কুলঘরের কোণে বসে কাঁদছে, জলখাবারের থালা হাতে তার দিদি এসে বললে, "ও কী হচ্ছে জগদীশ, কাঁদছিস কেন।"

তখন তার অপমানের কথা শুনে মৃণালিনী রাগে জ্বলে উঠল ; বললে, "ওর বড়ো রূপের অহংকার, একদিন ঐ মেয়ে যদি তোর এই পায়ের তলায় এসে না বসে তা হলে আমার নাম মৃণালিনী নয়।"

এই গেল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। দিদি এখন ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ অব স্কুল্‌স্। এসেছেন পরিদর্শন করতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের এই দুঃখের কাহিনী মেয়েদের শোনালেন। শুনে মেয়েরা ছি ছি করে উঠল ; বললে, কোনো মেয়ে কখনো এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে না— তা সে যত বড়ো রূপসীই হোক-না কেন।

মৃণালিনী মাসি বললেন, জগতে যা সত্য হওয়া উচিত নয়, তাও কখনো কখনো সত্য হয়।

আজ আবার পুরস্কার বিতরণের উৎসব। আরম্ভ হবার কিছু আগেই মৃণালিনী মাসি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সেদিন সেই-যে ভালোমানুষ ছেলেটিকে অপমান করে বিদায় করা হয়েছিল, সে আজ কী হলে তোমরা খুশি হও।"

কেউ বললে, কবি ; কেউ বললে, বিপ্লবী ; বাইরে থেকে নিমন্ত্রিত একটি মেয়ে বললে, হাইকোর্টের জজ।

ঘণ্টা বাজলো, সবাই প্রস্তুত হয়ে বসল। যিনি প্রাইজ দেবেন তিনি এসে প্রবেশ করলেন, জগদীশপ্রসাদ— হাইকোর্টের জজ। তিনি বসতেই সেই নিমন্ত্রিত মেয়ে যে মজঃফরপুর মেয়েদের হাইস্কুলে তৃতীয় বর্গে অঙ্ক কষাত, সে এসে প্রণাম করে তাঁর পায়ে ফুলের মালা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিলে। জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "এ আবার কিরকমের সম্মান !"

মাসি বললেন, "নতুনরকমের বলছ কেন— অতি পুরাতন। আমাদের দেশে দেবতাদের পুজো আরম্ভ হয় পায়ের দিক থেকে। আজ তোমার সেই পদের সম্মান করা হল।"

এইবার পরিচয়গুলো সমাপ্ত করা যাক। এই মেয়েটি এককালকার রূপসী ছাত্রী বিমলাদিদি, বোর্ডিং স্কুলের অহংকারের সামগ্রী ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে আজ ক্লাস পড়াবার ভার নিয়েছে ; আর এ দিক ও দিক থেকে কিছু টিউশনি করে কাজ চালায়। যে পা'কে একদিন সে ঘৃণা করেছিল সেই পা'কে অর্ঘ্য দেবার জন্য আর তার বিশেষ করে নিমন্ত্রণ হয়েছে। মৃণালিনী মাসি— সেই সেদিনকার দিদি। আর সেই তার ভাই জগদীশপ্রসাদ, হাইকোর্টের জজ।

এটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কখনো কখনো গল্পও সত্যি হয়। আর যে লোকটা এই ইতিহাসটা লিখছে সে হচ্ছে অবিনাশ, সেদিন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বড়ো বড়ো পরীক্ষা ডিঙিয়ে চলত— সেও উপস্থিত ছিল সেই প্রথমবারকার পুরস্কারের উৎসবে। সেদিন নানারকম খেলা হয়েছিল— হাইজাম্প, লম্বা দৌড়, রশি-টানাটানি— তার মধ্যে এই অবিনাশ আবৃত্তি করেছিল রবিঠাকুরের 'পঞ্চনদীর তীরে'। কবিতার ছন্দের জোর যত, তার গলায় ছিল জোর চার গুণ বেশি। সেই-ই সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার পেয়েছিল। আজ সে জজের অনুগ্রহে সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় হেড-কেরানির পদ পেয়েছে।

৫-৬ মে ১৯৪১ শ্রাবণ ১৩৪৯

মুসলমানীর গল্প

খসড়া

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলই চোখের জলের দোহাই পাড়তে হত। শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে।

এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত 'পোড়ারমুখী বিদায় হলেই বাঁচি'। সেইরকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন-মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে।

কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, সেইসঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে।

তার কাকি কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ্ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে। কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারি দিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে। ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোন্‌দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল একরকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেইজন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।"

ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন— বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্ ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল— তার এক স্ত্রী আছে আর একটি নবীন বয়েসের সন্ধানে সে ফিরছে। কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ।

কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ।"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম জানো তো মা!"

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হল তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনাবাদ্দি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, "বাবাজি, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।"

শুনে সে আবার ভগ্নীপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।"

কাকা বললে, "বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তার পর মেয়ে এখন তোমার— তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও। আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।"

ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই।"

ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে সব লাঠি হাতে।

কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার। সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই।

কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, "বাবাসকল তফাত যাও, আমি হবির খাঁ।"

ডাকাতরা বললে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যাবসা মাটি করলেন কেন।"

যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হল।

হবির এসে কমলাকে-বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের

জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।"

কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো— যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।"

কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।"

হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট-মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ-জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।"

কমলা কেঁদে বললে, "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।"

হবির বললে, "বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। নাহয় একবার পরীক্ষা করে দেখো।"

হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।"

বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।"

কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কাকি এসে দেখে বলে উঠল, "দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!"

কাকা বললে, "উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।"

মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তার পর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল। চিরদিনের মতো বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পূজা-আর্চা, হিন্দুঘরের আচার-বিচার, মেনে চলতে পারবে।"

এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ণ। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয় নি, কিন্তু সে মাকে পূজা করত অন্তরে। সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে এইরকম সমাজবিতাড়িত অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেত না। সেখানে কাকি তাকে 'দূর ছাই' করত— কেবলই শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে ম'লেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকির ভয়ে

সেটা গোপন করতে হত। রাজপুতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারি দিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে-মনে বাঁধা পড়ে গেল।

তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে, "বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা— তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি— আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না— আমার নাহয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এ দিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে— ওর নাম হল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হল পূর্বের মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে দুঃখ তাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়।

কিন্তু তারই পিছন পিছন আর এক হুঙ্কার এল, "খবরদার!"

"ঐরে, হবির খাঁর চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিলে।"

কন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।

সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন! যিনি কারও জাত বিচার করেন না।—

"কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভয় নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করে নি। কাকিকে বোলো অনেকদিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়েছি, সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব তা ভাবি নি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখনো দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

২৪-২৫ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৬২

ভিখারিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি-দুইটি শীর্ণকায় চঞ্চল ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটিরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলটপালট করিয়া, নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী নিস্তরঙ্গ সরসী— লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈললক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘনবৃক্ষবেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎশস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউকথাকও মর্মের বিষণ্ন গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক-বালিকার বড়োই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রাম্যশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত ; বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত ; শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদমালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমলদুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধতরুচ্ছায় শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শবর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুলস্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দান্ত রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। দশমবর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণনেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপকাহিনী শুনিয়া পক্ষ্মরেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড়ো অভিমানিনী ছিল ; কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত। অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে, বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত। পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না ; কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত— এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভালো নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল। ক্রমে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক, জীবনরক্ষারও কোনো সম্বল নাই— আদরিণী কন্যাটি কী করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিবে ? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও

কমলকে কোনোমতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের আর দুই-এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের কত কী সুখের কাহিনী শুনাইত— বড়ো হইলে দুইজনে ঐ শৈলশিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপিচুপি গম্ভীরভাবে তাহারই পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ-ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক-বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে, রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈলশিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন, "কমল, আমি তো চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে।"

বালিকা ছলছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখ কমল, এই অস্তমান সূর্য আবার কাল উঠিবে, কিন্তু তোর কুটিরদ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না। তবে বল্ দেখি, আর কাহার সহিত খেলা করিবি।"

কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল।

অমর কহিল, "সখী, যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে—"

কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; কহিল, "আমি যে তোমাকে ভালবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন।"

অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল ; তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কমল আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে— আজ এই শেষবার তোকে কুটিরে পৌঁছাইয়া দিই।"

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে একটির পর আর-একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটিরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল। গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল ; দেখিল— শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই-একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে। অমর দেখিল কমলদেবীর লতাপাতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটিরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে। ভাবিল ঐ কুটিরে হয়তো এতক্ষণে শূন্যহৃদয়া মর্মপীড়িতা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল।

অজিতসিংহ কহিলেন, "রাজপুত-বালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস!"

অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে। গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা শৈলশিখর কুটির বন নির্ঝর হ্রদ শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষসকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। দারুণ তীব্র শীতে হিমালয়গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শীতসন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া, একটি ম্লানমুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময়

নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তুষারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে। হতভাগিনী কমল করুণনেত্রে এক-একবার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে। কী বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রুসলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষারস্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে।

কুটিরে রুগ্‌ণা মাতা অনাহারে শয্যাগত। সমস্তদিন বালিকা এক মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই— বালিকা কখনো ভিক্ষা করে নাই, কী করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কী বলিতে হয় জানে না। আলুলিত কুন্তলরাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখখানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহখানি দেখিলে, পাষাণও বিগলিত হইত।

ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল। নিরাশ বালিকা ভগ্নহৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটিরে ফিরিয়া যাইতেছে— কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না ; অনাহারে দুর্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথপ্রান্তে তুষারশয্যায় শুইয়া পড়িল। শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল। বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে। মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; জোড়হস্তে কহিল, "মা ভগবতী, আমাকে মারিয়া ফেলিয়ো না, আমাকে রক্ষা করো, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে।"

ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল। কমল আলুলিতকুন্তলে শিথিল-অঞ্চলে তুষারে অর্ধমগ্না হইয়া বৃন্তচ্যুত মলিন ফুলটির মতো পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে। এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বরফ জমিতে লাগিল। বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভগ্ন কুটিরে রোগশয্যায় শয়ান। জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই। কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদশব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন না। কত কী আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন ; অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন, 'আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন। কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মতো দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল ? ক্ষুদ্র বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না— সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কী করিয়া বাঁচিবে।'

উঠিতে পারেন না— অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই-একজন প্রতিবাসী বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল, বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতরভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথহারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে যাও।"

তাহারা বলিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে, আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।"

বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "একবার যাও— আমি অনাথ, দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কী দিব বলো। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্তদিন কিছু খায় নাই— তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও— ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।"

কেহ শুনিল না। সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জীবভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কমল, মা, আইলি ?"

একজন বাহির হইতে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে আছে।"

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ[১] হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল এবং কমলের মাতাকে কী কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তুষারক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল— একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্তত বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ, সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোকদীপ্ত কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার কৃপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতকগুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল।

আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই।"

কমল ভীতিকম্পিত মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কমল।"

সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন।"

বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আজ আমার মা সমস্ত-দিন আহার করিতে পান নাই—"

সকলে হাসিয়া উঠিল— তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। দস্যুদের হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল ; সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও।"

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম, প্রভৃতি জানিয়া লইল। অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী। তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি, সে যদি নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।"

কমল কাঁদিয়া কহিল, "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন। তিনি অতি দরিদ্র। তাঁহার আর কেহ নাই— আমাকে মারিয়ো না, আমাকে মারিয়ো না, আমি কাহারও কিছু করি নাই।"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে— আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব— যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পারো তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।"

এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়। একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলংকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন। তথাপি নির্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই। অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন— মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক,

১ পার্বত্য লোক চীড়বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই বা হউক, কখনো সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন— মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে— কিন্তু অশ্রুময়নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন।

সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক-একখানি অস্থিও ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না।

অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিনদিন যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দুস্য আসিবে। আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন, তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে।

কিন্তু অর্থ পাইলেন না। ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন— কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিত না। অমরসিংহ যদিও বালক, কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়। দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত। এই অন্ধকার কারাগৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশভাবে ব্যবহার করিত না। সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোনো কথারই উত্তর দিত না, দুস্য কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যুপতির পুত্র। সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোনো আপত্তি আছে। এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরু কমল কোনো কথারই উত্তর দিত না। একদিন গেল ও দুইদিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এ দিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা-কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সকলই দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছুই নাই, যাহা-কিছু ছিল সকলই দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।"

দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিল। কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে। তবে চলিলাম— আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে, নির্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নরশোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।"

বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণহৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন, "যাইয়ো না, আর একটু অপেক্ষা করো, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হাওয়াতে মোহন মনে-মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন, "এ কী অপূর্ব ব্যাপার! এত দিনের পর দরিদ্রের কুটিরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা। উপহাস করিয়ো না। আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।

মোহন। কী হইয়াছে।

বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, আমাকে কী করিতে হইবে।"

বিধবা। কমলের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।

মোহন। কেন, অমরসিংহ এখানে নাই?

বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না করো, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন। আইস, তবে তোমাকে একটি কথা বলি। কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর তো কোনো আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কী করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মতো আমার অবস্থা নহে।

বিধবা। অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন। যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারও সহিত কিছু কথা হয় নাই। এ দিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ো না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন। রোসো, কাজ সারিয়া ফেলি।

অবশেষে যদি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্তদিনে কাজ সারা হইত কি না সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ত্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার বাহুপাশে মুখখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল।

কিন্তু অনাথিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর-এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল। যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিতসিংহ হত ও অমর কারারুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল।

মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত। কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দুমাত্র অশ্রু নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভর্ৎসনার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈলশিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষারদর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সৈনিকবেশে অমরসিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথায়।"

শুনিলেন, স্বামীর আলয়ে।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কী আশা করিয়াছিলেন— ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন, যুদ্ধের উন্মত্ত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন, তিনি যখন অতর্কিতভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈলশিখরের উপর বসিয়া কমলকে যুদ্ধ-গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুমকুঞ্জে সমস্ত জীবন সুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল, তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুলবনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতেই শূন্যমনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর-একদিন সে বাল্যকালের খেলেনাগুলি বাহির করিয়াছিল— আর খেলিতে পারিল না, নিরাশার নিশ্বাস ফেলিয়া সেগুলি তুলিয়া রাখিল। অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে তবে আবার দুইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দুইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্যসখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্মপীড়িতা কমল এক-একবার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক-একদিন রাত্রিকালে গৃহে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে— খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়াস্থল সেই শৈলশিখরের উপর গিয়া দেখিত— ম্লানবদনা বালিকা অসংখ্যতারাখচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলিতকেশে শুইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বলিয়া মোহন বড়োই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, 'দিনকতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক্, তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।'

মাতৃভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথবায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই।

একদিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কত দিনকার কত কী ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈলশিখরের উপরে সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক-একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা, অস্ফুট স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন— সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না— অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায়, তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকাতাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুলকুঞ্জের পত্র মর্মরিত করিয়া বিষাদের গম্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর নির্ঝরের মৃদু বিষণ্ণ ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু-হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্মভেদী একতানবাহী যে-একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে, তাহাই শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন অন্ধকারের সমুদ্রতলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরস্থ শ্মশানক্ষেত্রে দুই-একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ্র স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার।

সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল, "ভাই অমর"---

এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন— কমল। মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল, "ভাই অমর"—

অচলহৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কী কথা বলিল, অমর কমলকে দুই-একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্লহৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল যাইবার সময় সেইরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

কমল ভাবিয়াছিল সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্যকর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল। অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এত দিনের পর সে বাল্যসখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছুকাল রাজসভার আড়ম্বর-রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণকুটিরবাসিনী ভিখারিনী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কী আছে। এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, 'আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে! তাঁহাকে ভালোবাসিব কোন্ অধিকারে। আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব!'

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈলশিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কী ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল— পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই— তথাপি ঐ মর্মে-লুক্কায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল।

বালিকা আর কাহারও সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্তদিন সমস্তরাত্রি ভাবিত। কাহারও সহিত মিশিত না। হাসিত না, কাঁদিত না। এক-একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত পথপ্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীনহীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আর উঠিতে পারে না— বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত দূর শৈলশিখরের উপর বকুলপত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক সুরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার আর কোনো বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে 'মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই'।

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্ছার পর মূর্ছা হইতে লাগিল। শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে

পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি জোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে। শৈলবাসীরা অনেকদিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কুটির টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্তত কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হতভাগিনী নিরাশহৃদয়ে নিরাশাব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্ছা ভাঙিল, মূর্ছা ভাঙিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। অনেকদিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল— বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টিধারায় সিক্ত বসন হইতে বারিবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্যগম্ভীরমূর্তি অমরসিংহ।

বিহ্বলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই রুগ্‌ণ শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোকবিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাসশূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শোকবিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটিরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪

করুণা

ভূমিকা

গ্রামের মধ্যে অনূপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না। অতিথিশালানির্মাণ, দেবালয়প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি নানা সৎকর্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্ধুক-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশবিখ্যাত যশ ছিল ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবনকাল ধন উপার্জন করিয়া অনূপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই— তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখি ছিল, সেই পাখিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী ভগ্নী কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য-সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে, অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা-কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখিটিকে তাহাই শুনানো হইত। এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যুষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনূপের অনুগত কোনো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনূপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনূপের বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনূপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড়ো প্রীতিজনক ছিল না কিন্তু সে কাহারও সহিত মিশিত না, খেলিত না ও কথা কহিত না বলিয়া, ভালোমানুষ বলিয়া তাহার বড়োই সুখ্যাতি হইয়াছিল। পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মতো শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ির ছেলেদের প্রত্যেক কাজেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত।

কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভালো ছেলে নও।' কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোনোমতে ভালো লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল্যবৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভালো লাগে না।

অনূপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভালোবাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনূপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী। করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত এবং পিতার কাছে যে-সকল গল্প শুনিয়াছিল তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখিটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনারচিত কত কী অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহাকিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কী মন্দ! বালক বাটীতে গিয়া অনূপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনূপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড়ো হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে।

তখন দুই-এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত। কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে। পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কনস্টেবলদের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত,

গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে— অতি নিরীহ, আসিয়াই অনুপকে টীপ্ করিয়া প্রণাম করে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে, নতমুখে, অতি দীনভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনুপ সর্বদা যাতায়াত করেন সেইখানে একটি ওয়েবস্টার ডিক্‌সনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোনো দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কত কী গল্প শুনাইত। বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারও কাছে কোনো নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এইরূপ ছেলেমানুষিতে নরেন্দ্রের বড়োই হাসি পাইত, কখনো কখনো সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথাপ্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিতমহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমনকি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম-নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশলসংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই-একজন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এ বিষয় লইয়া গম্ভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের টিকিটি নির্বিঘ্নে ছিল।

এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল।

অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্ত করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না। অনুপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে ; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিতমহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর সার্বভৌমমহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এতদিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এতদিনে তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় দুয়ের কোনোটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখির সঙ্গে কত কী কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পা-দুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে ভালোবাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুট ভাবে ভোর হইয়া যাইবে— সেই বালিকা বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মতো কিছুই হয় না। অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসে— যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখি রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়। করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কী বলিতে আসে, সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে। করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোনো ছল করিয়া চলিয়া যায়। নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জীবভাবে এমন নীরসভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্তভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে

যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি— বালিকার আর বুঝি পাখির সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না।

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনোই বনিতে পারে না। দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত। নরেন্দ্র করুণার সেই ভালোবাসার কত কী অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে-মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢলঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা, সে অত কী বুঝিবে! সে ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল। তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না— সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোনো কথাই বলা হইল না।

একদিন নরেন্দ্রকে বেশ পরির্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কলিকাতায়।"

করুণা। কলিক্যতায় কেন যাইবে।

নরেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না।"

একটা বিড়ালশাবক ছুটিয়া গেল। করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেকক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না। অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই?"

নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল, "সরো, দেখো দেখি, আর একটু হলেই ডিক্যান্টারটি ভাঙিয়া ফেলিতে আর কি।"

করুণা। দেখো, তুমি কলিকাতায় যাইয়ো না। পণ্ডিতমহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।

নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিস্ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখিটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবত এমন প্রফুল্লহৃদয় যে, বিষাদ অধিকক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক, করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়েমহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়োই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল— 'বুড়াধাড়ি মেয়ে'র অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভালো লাগিত না। এ-সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কী? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখির কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতো ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলসেকে— বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনূপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনূপের জীবদ্দশায় খেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাকসবজী ফলমূলে দৈনিক আহারব্যয়

যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা-অর্চনা দানধ্যান ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোনো ব্যয়ই ছিল না। অনুপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জ্বালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্যকে রীতিমত অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিত এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছিন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্‌পেনসরি স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রান্ডি কিনিবার অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। গবর্নমেন্টের সস্তা দোকান হইতে রায়বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্য ঘোড়দৌড়ের চাঁদা পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃতবাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া এক পত্র লেখে। তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃপ্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্রলোকের অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না। নরেন্দ্রের একজন সমাজসংস্কারক বন্ধু তাঁহার 'মরাল করেজ' লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। একদিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন।— নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাত, সেদিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি চোখ রগড়াইতেছেন, তখনো আন্তরিক ইচ্ছা আর-এক ঘুম দেন। যাহাই হউক নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু, কবিতা-কুসুমমঞ্জুরীপ্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্রবাবু, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধরবাবু কহিলেন, "দেখুন মশায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড়ো শোচনীয়।"

এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্রবাবু কহিলেন— 'deplorable'। নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া।"

অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "কিন্তু এটা কতদূর হতে পারে তাই দেখা যাক। তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়োই আপত্তি করিবে। ভাঙিয়া ফেলা দূরে থাক্‌, একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড়ো সন্তুষ্ট হয় নাই।"

অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্যসত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না— তাহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধরবাবু কহিলেন, "কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীনপত্নী স্বামী জীবিত-সত্ত্বেও বৈধব্যজ্বালা সহ্য করিতেছে।"

স্বরূপবাবু কহিলেন, "এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড়ো ভালো সমালোচনা করেছে। দেখো নরেন্দ্রবাবু, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ ? চাঁদ যখন ঢলঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ্য করেছ। তা যদি করে থাকো তবে বলো দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না।"

নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল। অনেকক্ষণের পর

কহিলেন, "আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন কথা হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্টমোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে। এসো, আজ থেকেই এ বিষয়ের চেষ্টা করা যাক।"

নরেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি মনে-মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন, এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে। গদাধরবাবু কহিলেন, "স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সেদিন বলেছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক। এ বিষয়ে যা-কিছু বাধা আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। যেমন এক একটা পোষা পাখি শৃঙ্খলমুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।"

নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারও কোনোপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণপোষণ বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও জন্মেজয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জ্যোৎস্না-রাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র এতদিন বেশ ভালো ছিল। ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বি. এ. পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছুদিন পড়িলেই পাস হইত— কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভালো করিয়া কথা কয় না— এ-সব তো ভালো লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্তন যে কেন হইল আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যাকর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন তাহা মহেন্দ্রের বড়ো মনোনীত হয় নাই। মনোনীত না হইবারই কথা বটে। তাহার নাম রজনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার ; তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা নয় ; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারি কখনো কাহারও কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষত তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহার কাছে তাহাকে নিগ্রহ সহিতে হইত। কখনো কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই। একদিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল; সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারি কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহরাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এ দিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদুস্বভাব, এমন সদ্‌বন্ধু ছিল, এমন আমোদদায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভালোবাসিত, তাহাকেও সকলে ভালোবাসিত। রজনীর কপালদোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয় তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে ইহা তো কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম। আমি বলিলাম, 'রজনীর ইহাতে কী দোষ আছে। তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়ত তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী। তবে বিনা অপরাধে বেচারিকে কেন কষ্ট দাও।' মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল তাহা বুঝাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় নাই। পোড়ো জমিতে কাঁটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লৌহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজকর্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা-কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে। মহেন্দ্র যেরূপ কৃতবিদ্য, লেখাপড়ায় সে তো অনেক আমোদ পাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বইগুলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাটকা বাহির হইয়াই আর-একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভালো হইত। মহেন্দ্র এখন একটু-আধটু করিয়া শেরী খায়। কিন্তু তাহাতে কী হানি হইল। কিন্তু হইল বৈকি। মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত— এক-একবার বড়ো ভয় হইত, এক-একবার অনুতাপ করিত, এক-একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক-একদিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক-এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মদ্যটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো জানিতাম না এমন-সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সেই ভালো মানুষ মহেন্দ্র, স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে 'বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে'। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না। কাজ কী। কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কী করিব। কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন। এই কথা শুনিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল, খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দূষ্য কিছু নয়— মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ কী। এখনো তো বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত। মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ-বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভালো ছিল— কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই-সকল অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া গদাধরবাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপবাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানবজাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড়ো বিষণ্ণ হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত,

নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এইসকল দেখিয়া মোহিনী বড়ো ভালো বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা

'এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম দূর হোক্ গে, ও দিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজকাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কী দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি। আচ্ছা, নাহয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন। লোকে কী বলিবে। আমার বড়ো লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কী করি। আর কেনই বা না যাইব। সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে-সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী। হানি হয় হউক গে, আমি তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে। আর এ-সকল ভালোবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়'— এই তো গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে— 'আমি তো রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী তো একদিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যেদিকে থাকি, সেদিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্তভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়— এমন করিলে বড়ো কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভালোবাসে। ভালো না বাসুক, যত্ন করে। কিন্তু আজকাল অমন করে কেন। এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কী দোষ আছে। মোহিনীকে তো আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভালোবাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ তো কিছু মনে করে না।'

একদিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'মোহিনী! মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর-একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্মাক্তললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।

মোহিনী শশব্যস্তে কহিল, "সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।"

সেইদিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কী সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রজনীকে অকারণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই-তিন বার মারিতে উদ্যত হইল ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপবাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বে রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার অনূপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোনো বিষয় মিল ছিল না— তিনি খুব টসটসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খট্‌খটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায়-আদায়ের কোনো আশাই রাখিতেন না। কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত ; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মতো তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমশাই বড়োই ভালোমানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বালকেরা তাঁহার উপর বড়োই অত্যাচার করিত। পণ্ডিতমহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন। এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চশমার ঠুঙিটি চুরি করিয়া লইত। একে তো পণ্ডিতমহাশয় অতিশয় আলগা লোক, তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটীতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোনোমতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্যপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়নগৃহে বোলতায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন ; সে ঘরে তিন পরিবার বোলতায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত করিল, মাকড়সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমুখ পর্বত যেরূপ, পণ্ডিতমহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোনো বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আলগা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় অনেকদিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিণীটি বড়ো প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহপ্রকৃতি সার্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন ও সার্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো !' পণ্ডিতমহাশয় মরণকে বড়ো ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাসদোষে দিনকতক বড়ো কষ্ট অনুভব করিতেন।

যাহা হউক, অনেক কারণে পণ্ডিতমহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিতমহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি সহস্রমিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারও বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিতেন না। কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয়ের এক ভট্টাচার্যবন্ধু ছিলেন ; তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে তিনি বড়োই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্যীয় ভঙ্গি ও স্বরে সার্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন, "ওহে ভায়া, শাস্ত্রে আছে—

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্ধোভবেৎ পুমান্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতঃ শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্।

কিন্তু তোমাতে তদ্‌বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীবিয়োগের পর আবার দেখতে দেখতে শরীর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখছে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশানসমান হয়, কিন্তু বালক-কর্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশানসমান হয়েছে।"

এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোখ টিপিতেন ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুরমুহু নস্য লইতেন।

ওপারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় বড়ো মনের স্ফূর্তিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোনো দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোশাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই-সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সঙ সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্রপরিসর পাগড়িটি পণ্ডিতমহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে পণ্ডিতমহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেকক্ষণের পর বেশভূষা সমাপ্ত হইলে পর সার্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোশাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড়ো তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢলঢলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড়ভরতের মতো এক স্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড়-বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টাখানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইল।

ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোশামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিতমহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং মেজেস্টোর সায়েবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতে ও চতুরতাপূর্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের সমানই হউক বা কিছু কমই হউক।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায় সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ 'অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি'। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব করিতেন। গল্পবাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি বড়ো অনুকূল। কারণ, নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিতমহাশয়ের মতো আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডালপালা ছাঁটিয়া-ছুটিয়া দিলে সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়— নিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখাপড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই যে নিধির মতো গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পালকি আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটিকতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্তাদিগের সম্মুখেই পালকিতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন, 'ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েচেন।' নিধি কহিলেন, 'না দাদা, আজ সাহেব সকাল-সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখাপড়া আছে, আজ আর হচ্ছে না।'

কন্যাকর্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম করে, লেখাপড়াও জানে। তাহার পরদিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি— পাড়ার একটি এনট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিয়ো বিশপ্স্ কলেজে।' দৈবক্রমে বিবাহসভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কালেজে। ভাগ্যে কন্যাকর্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। 'ওরে ও'— 'ওরে তা'— এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার— এটা ওল্‌টাইয়া, ওটা পাল্‌টাইয়া— দুই-একটা বাসন ভাঙিয়া, দুই-একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া— পাড়া-সুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। কোনো কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল মহা ব্যস্ত। চটিজুতা চট্ চট্ করিয়া এ ঘর ও ঘর, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া ও পাড়া করিতেছেন— কোনোখানেই দাঁড়াইতেছেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ইহাকে দু-একটি উহাকে দুই-একটি কথা বলিয়া আবার সট্ সট্ করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব— সার্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি যে-কে-সেই, তবে পূর্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল— ঝাঁটার আঘাতে, লোকজনের কোলাহলে, তিন-ঘর বোলতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল— চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাটে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিতমশায়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় দশ দিন আর অরিক্ষত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ও যাইবার সময় ঘটী ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিতমহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুরানো সেই ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দনচর্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিতমহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, সকলই তো হইল, এখন নৌকায় উঠিবেন কী করিয়া। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; বিশ-বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই-এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে নিধিরামকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন। সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি 'আর পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়িমুখা হইব না' বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোশামোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্বভৌমমহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড়ো কম ভয় করিতেন না, যদি কন্যাকর্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ-ছয়-জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোনোক্রমে তো নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়েচড়ে পণ্ডিতমহাশয় ততই ছট্‌ফট্ করেন, পণ্ডিতমহাশয় যতই ছট্‌ফট্ করেন নৌকা ততই টল্‌মল্ করে; মহা হাঙ্গাম, মাঝিরা বিব্রত, পণ্ডিতমহাশয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার-ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই। তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তুলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিতমহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই-এক জায়গায় তরঙ্গবেগে নৌকা একটু টল্‌মল্ করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে

আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্বভৌমমহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতমহাশয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যায় আর-কি, রোষে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকাযাত্রা আর কখনো দেখে নাই। তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগতপ্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিতমহাশয় এক ঘটি জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত। পণ্ডিতমহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাসদোষে দারুণ ঢুলিতেছেন। মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে। পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক-একটি গুঁতা মারিতেছে ; সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিতমহাশয় আবার ধড়্‌ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোখ-টেপাটেপি করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারই টোল-আউট শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কী ! এবং লজ্জা করিবার যে কোনো প্রয়োজন নাই এ কথা তিনি স্কন্দ ও কল্কিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌমমহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটা ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিতমহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন পুরোহিত বাবাজি চাল-কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল। উঠিবার সময় সার্বভৌমমহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহসভায় ভূমিসাৎ হইলেন। বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙিয়া গেল। শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সাত-আট জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাশুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিতমহাশয় মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই-একটি কী কথা বলিলেন তাহার অর্থ বুঝা গেল না। একবার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অতঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি 'নাঃ— কিছু হয় নাই' বলিলেন ও অন্দরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙুলে বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা আরসুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বিকটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি-চারিটি কান-মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসিলেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী আচার করিবার সময় পণ্ডিতমহাশয় এমন উপর্যুপরি হাঁচিতে লাগিলেন যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর-ঘরের বিপদ হইতে কী করিয়া উদ্ধার হইবেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয় অনেক ভাবিয়াছিলেন ; সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-ঘরে যাইবার কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক, ভালোমানুষ বেচারি অতিশয় গোলে পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দুটি-একটি কী কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়াছিলেন 'কোথায় তারিণী মা গো বিপদে তারহ সুতে'। এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্যমহাশয় রাগিণীর দিকে বড়ো একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁতি পড়িতেন সেই সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক কষ্টে বিবাহরাত্রি অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না। এমন-কি, সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনীশক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড়ো মৃদুস্বভাব লোক— হাসিবার সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না। সে কাহারও কথায় সায় দিতে হইলে 'হাঁ' বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে 'হাঁ'ও বলিত না, 'না'ও বলিত না। এ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড়ো ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারকমহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহনিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এ ভাবের তাৎপর্য যদিও গদাধরবাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই-একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন ; অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন এবং আপনাকে একজন উপন্যাস নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে-মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোনো প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতাপথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজি শাস্ত্রে লেখে : Charity begins at home। তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার শুরু। সংস্কারকমহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন। বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, যোলো বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয় এবং তাহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দয় দেশাচারসমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন-কি, মহেন্দ্র মনে-মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল। গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না ; ভাবিল, 'আরো দিনকতক যাক, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।'

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়েছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। গদাধর আর-একবার পূর্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোকলজ্জা অবশিষ্ট ছিল না, যে এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারও নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো

বকিতে থাকে তখন রজনীর কী মর্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে রজনী তাহাকে কোনো ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই-না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী মহেন্দ্রকে কোনো কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোনোমতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোনো উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, 'রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে।'

একদিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানালায় বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখনো সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল; পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, 'এখানে কী করিতেছ। ঘুমাও গে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল; মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত এবং সে অল্পস্বল্প যাহা-কিছু মাসহারা পাইত তাহা মহেন্দ্রের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ-সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ করিত, এমন-কি, বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না— যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে। মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি-পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুইজন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একজন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুইজনেরই অবস্থা বড়ো ভালো নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কী বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্য কী কষ্ট না সহ্য করা যায়, এমন-কি এখনই যদি বজ্র পড়ে গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনই তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন; বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বৃষ্টিবজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালো নয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এ দিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরের দিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই খস্ খস্ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "মোহিনী! দেখ্ তো বিড়াল বুঝি!"

দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন। সরিতে গিয়া একরাশি

হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন। হাঁড়ির উপর কলসি পড়িল, কলসির উপর হাঁড়ি পড়িল এবং কলসি হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল। হাঁড়িতে কলসিতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল এবং কলসি হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। বাড়ির ঘরে ঘরে 'কী হইল' 'কী হইল' শব্দ উপস্থিত হইল। মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ারমুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল। দেখিল মহেন্দ্র ; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, "পালাও ! পালাও !"

মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল। দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কানে বড়ো ঠিক ছিলেন। মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস মোহিনী।"

দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়িসুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র তো অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এ দিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছিলেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালির ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সভায় গভর্নর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া শেক্‌হ্যানড করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল। ধড়্‌ফড়িয়া উঠিলেন ; একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কী করিতেছিস। কে তুই।"

গদাধর জড়িত স্বরে কহিলেন, "দেশ ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোনো অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্বত্রই কোনো বাধা মানিবে না, কোনো বিঘ্ন মানিবে না— কেবল ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু ! অতএব"—

আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না ; প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙানিচ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনেস্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এইজন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িশুদ্ধ লোকের বড়োই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনোমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা চাপা থাকিবার নহে। মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কাজ। এই তো পাড়াময় টী টী পড়িয়া গেল ! পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়। না কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারও হাস্যমুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে। অথচ মোহিনীর ইহাতে কোনো দোষ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন তখনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেকক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায় লজ্জায় বিরক্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কত কী কথা মনে পড়িতে লাগিল ; শৈশবের এক-একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কী মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল— কত মহান আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শস্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কী পরিণাম হইল। তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সংকোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে— সর্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কী কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে। মনে-মনে কহিল, 'তোমার কী হইয়াছে বলো, যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয় তবে আমি তাহাও দিব।' রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কী হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল। রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না ; কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও !"

মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্যমনে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পরসংলগ্ন অন্ধকার নারিকেলকুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার রজতরেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণীতীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই— এক স্নেহহাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল 'সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারও কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে। কেহ এমন কাজ করে নাই যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতি মুহূর্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্মে মর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম ! আমার যদি মনের মতো বিবাহ হইত, গৃহস্থের মতো বিনা দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভালোবাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম! কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তিময় জীবন বহন করিতে হইতে না। আহা— কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী ! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে ; যেন

তাহাদের বুকের ভিতর কী একটি কথা লুকানো রহিয়াছে। তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।'

মহেন্দ্র কতক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল— 'আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভালো করিয়া ভোগ করা হইল না।'

মহেন্দ্র সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভালোবাসিয়াছে সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে। এ কথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না— ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত-কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রামপথ আঁধার করিয়া দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার পথ দিয়া ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র একখানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যে দিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল। বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্নাসুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করুণা ভাবে এ কী দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন। অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানী ভবির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কী জানে।

করুণা কহিল, "না, তুই জানিস।"

ভবি কহিল, "ওমা, আমি কী করিয়া বলিব।"

করুণা কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। ভবির বলিতেই হইবে নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোনো উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিলেই যে নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোনো সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে। না আসিলে ভাঙিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেকদিন দেশে আসে নাই। কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনই দেশে আসে তখনই গোটা দুই-তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই-চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে। তাহারা দুই-তিন দিনের মধ্যে পাড়াসুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় এই কুকুরগুলা দেখিলে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড়ো হাসিতামাসা চলিতেছে। কিন্তু ভট্টাচার্যমহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধুঁয়ায়, গোটাকতক নস্যের টিপে এবং নবগৃহিণীর অভিমানকুঞ্চিত ভ্রূমেঘনিক্ষিপ্ত দুই-একটি বিদ্যুতালোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিতমহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চশমাটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে সূক্ষ্মশুভ্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্‌সা নাকি আজকাল মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের নামে পূর্বে কখনো এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের

রসিকতার যে দুই-একটা নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার; প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিতমহাশয় ভাবে ভরপুর হইয়া আছেন। এই তো গেল পণ্ডিতমহাশয়ের অবস্থা।

আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়েমহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারও সামর্থ্য নাই। হাত-পা নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন। একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা শহরটা কী প্রকার তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড়ো বড়ো মাঠ, সায়েবরা চাষ করে, রাস্তার দু ধার সিপাহি শান্তিরি গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গোরু কাটে ইত্যাদি। আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিরিক্ত ছিল এবং এই পতিভক্তি-সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইব এমন আর কাহারও কাছে নয়। পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনক্ষত্র পর্যন্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার আর-একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছামিছি পরের চর্চা তাঁর কোনোমতে ভালো লাগে না আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড়োবউ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরানীকে দেখিতে মন্দ ছিল না— তবে চলিবার, বলিবার, চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের। তা হউক গে, অমন এক-একজনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে-সকল কথা কে বলে বলো দেখি। সে বেচারি কেমন বিশ্বস্তচিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কী। কিন্তু সে অত শত বুঝেও না, অত কথায় কানও দেয় না। কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুই-একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই একবার মলিন হইয়া যায়— নয় তো কী! কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না। তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, তো, অন্য কথা! কিন্তু করুণার এ ভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড়ো একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভালোবাসিয়া যে যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারও না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে, পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত, ছিল ভালো। চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। সর্বদাই খিট্‌খিট্ সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও ভালো মুখে কথা কহিতে জানে না— অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে, তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারও ঘেঁষিবার জো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক, করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই— এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল।

ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই, আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক, করুণা আর বড়ো একটা খেলা করে না, বেড়ায় না, সেই পাখিটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক-একদিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্নারাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কী ভাবিতেছে জানি না— ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক— পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে-সকল খেয়ালই আসে নাই। একটু-আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা-একটা জিনিস বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলা অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না ; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এ দিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই ; পণ্ডিতমহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কী হইবে। করুণা কোনো প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোনো নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল ; পণ্ডিতমহাশয় মহা বিব্রত হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণবৃদ্ধি হইয়াছে যে চারি দিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, গতিক ভালো নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহারও সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারও প্রবেশ করিবার জো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ রুষ্ট ও যেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর-বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাদ্যাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল ; নরেন্দ্র মহা রুক্ষ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল। এ কথার উত্তর আর কী হইতে পারে। তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়— পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে, সে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যে করুণার এমন আকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কী বলিব ! নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্য রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি তোমার কী করিয়াছি।"

নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

একবার ঋণের আবর্ত মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনই কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত সুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। একদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারি করুণা না খাওয়া, না দাওয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া একাকার করিয়া দিল। কী করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কী করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; নিধি জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে। সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলংকার অল্পই ছিল— পূর্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলংকার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোনো কোনোটা বা বিনা মূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিতমহাশয় তো কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা-কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিতমহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোনো প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্‌ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যেরকম করিয়াই হউক-না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও জুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুর সংস্কার প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক-না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। ইচ্ছা আছে এখানেও দুই-একটি সৎ উদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্ব-পরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন। তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল।

গদাধরের হস্তে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরানীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোনো হৃদয়সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না— বিশেষত সমাজসংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য, তাহারা সমাজের এ-সকল অন্যায় অবিচার কোনোমতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এ প্রকার অন্যায়রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য সংস্কারকদিগের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর, যখন স্বরূপবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে 'রাহুগ্রাসে চন্দ্র' নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহবর্ণনা লিখিত ছিল ; আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরানীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্তদিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রার্থনা করিল— যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়; এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়; নারীজন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল— তাহার মরণ হউক, তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকণ্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কী করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই। সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে— তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্‌ফিনে ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু, সমস্তই আছে— কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্যপটুতা কিছুমাত্র নাই; তাহার সকলই উলটাপালটা, গোলমাল। গুছাইয়া কী করিয়া খরচপত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাবপত্রের কোনো সম্পর্কই নাই, কী করিতে যে কী করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কী গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে। নরেন্দ্র তাহাকে কোনো সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র— নিজে যে কী দরকার, কী অদরকার, কী করিতে হইবে, কী না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কী করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহার কিছু যদি জানে।

ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল সে করুণার এই দুর্দশায় বড়ো কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজহস্তে মানুষ করিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহারুষ্ট হইয়া কহিত, "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!"

সে কহিত, "তোমার মতো পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্ প্রাণে চলিয়া যাই?"

অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই-চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর্ গর্ করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোনো কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না। যাহা-কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড়ো ভালোবাসিত; যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মতো কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কী হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপবাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে তিনিই দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার সহিত কোনো সংস্রবে আসিয়াছেন তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কী বলিব।

স্বরূপবাবু সর্বদা এমন কবিত্বচিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা 'অ্যাঁ' বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়তো অনেক সময়ে কোনো পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান

নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়তো থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই-এক খণ্ড তাঁহার কবিতা-লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও ! এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে তাহার আর একখানা নকল থাকে। কিন্তু লোকে বলে যে,না, অনেক বড়ো বড়ো কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারও দেখি নাই। কাগজপত্র কোথায় যে কী ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে ! কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা বা অন্য কোনো বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান নাই। স্বরূপবাবুর আর-একটি রোগ আছে, তিনি যে-কোনো কবিতা লিখেন তাহার উপরে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে লিখিত' বলিয়া লিখা থাকে। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ-দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের স্বরূপবাবু বড়ো প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয় ; ইহাতে তিনিও কষ্ট পান আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপবাবু দিবারাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন। মাঝে মাঝে আড়ালে-আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড়ো গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন— সুতরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোকরায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কী— পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য, শ্মশান হইয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায় ! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই— এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল তাহাতে আর তাহা নাই ! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল। তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া মধ্যস্থ-নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই, এইবার পড়িয়াছে। স্বরূপবাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্বক বা দৈবক্রমেই হউক, এক খণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটিদুয়েক কবিতা লিখা আছে। অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোনো গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে তো কিছু ছিল। নিধির সে কবিতাগুলি বড়ো ভালো ঠেকিল না। ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলই বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজবুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধরূপে নির্ভর করিয়া এক-এক সময়ে যেমন সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

'দিদি, কেমন আছ দেখিতে আসিয়াছি' বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনূপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে। নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা স্বরূপবাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি

আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল 'হুঁ হুঁ— বুঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠানো কেন! গদাধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও তো চলিত।'

একদিন করুণা ভবিকে কী কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল করুণা যেন একবার 'স্বরূপবাবু' বলিয়াছিল— আর-একটি প্রমাণ জুটিল। আর একদিন নরেন্দ্র স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানালা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল। নিধি এই তো তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ। শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ বিষণ্ণ রুগ্‌ণ হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাঁহার কারণ আর কিছুই নয়— স্বরূপের ভাবনা।

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, "করুণা তো, ভাই, তোমার জন্য একেবারে পাগল।"

স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী করিয়া জানিলে।"

নিধি মনে মনে কহিল, 'হুঁ-হুঁ, আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কী করিয়া সন্ধান পাইলাম ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈকি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।' কহিল, "জানিলাম, এক রকম করিয়া।"

বলিয়া চোখ টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, "করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।"

স্বরূপ কহিল, "সেকি! করুণার সহিত একবারও তো আমার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হয় নাই।"

নিধি মনে মনে কহিল, 'নিশ্চয় দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন।' ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে, 'হাঁ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল' তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক, নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটি নিগূঢ় বার্তা নিধি আপনার বুদ্ধিকৌশলে জানিতে পারিয়াছে, এ কথা কি সে আর গোপনে রাখে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কী। 'তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি'— চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়োই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, 'রামহরিবাবু বড়ো সৎলোক' অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কী বলিতেছ। কে সৎলোক। রামহরিবাবু? ও'— এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এ বুঝি রামহরিবাবুর ভিতরকার কী একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, 'সে অনেক কথা।' নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে, এইরূপ মনে মনে স্থির করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন ধরিয়া ছোটো ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে না তো কী। কিছুরই তো নিয়ম, নাই। করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা তো দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণবাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে ফি দিবার সময় তিনি কহিলেন, 'থাক্‌, থাক্‌, পীড়া অগ্রে সারুক।' পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র ডাক্তারটি বুঝি ফি লইতে রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লানবদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ও পাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমিদারি হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারই স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারই হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার জো নাই— গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠানো হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দু বেলায় যাতায়াতের দরুন যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুলহৃদয়ে সকলেই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কই?' সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই তো অবাক। মুখ চোখ শুকাইয়া পণ্ডিতমহাশয় তো ঘামিতে লাগিলেন ; নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন, "এখন উপায় কী।"

নিধি কহিল, "টাকার জোগাড় করা হউক।"

সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। এ দিকে পীড়ার অবস্থা ভালো নহে, যত কালবিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে। মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারি কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা-কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল।

অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লান বদনে কহিলেন, "ছেলে বাঁচিবে না।"

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কী বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল— পণ্ডিতমহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্ধ-হতজ্ঞান হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহা, বিষণ্ণ করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কতদিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভালো করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না ; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ, শীর্ণ ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে ; মুখশ্রী এমন দীন করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে যাহা-কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কী করিয়া সংসার চলিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের সাহায্যে কোনোমতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাবুটি কী করে বলিতে পারো।"

নরেন্দ্র। কেন বলো দেখি।

নিধি। ও লোকটিকে আমার তো বড়ো ভালো ঠেকে না।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে।

নিধি। না, কিছুই হয় নাই, তবে কিনা— সে কথা থাক্— বাবুটির বাড়ি কোথায়।

নরেন্দ্র। কলিকাতা।

নিধি। আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে, বলোই-না।

নিধি। আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, "কী কথা বলিতেই হইবে।"

নিধি কহিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিয়ো, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।"

নরেন্দ্র। সেকি কথা, স্বরূপ তো বাড়ির ভিতরে যায় নাই।

নিধি। সে কি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র অবাক হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধি কহিল, "আমি তো ভাই, আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্তব্য হয় করো।"

নরেন্দ্র ভাবিল, এ-সকল তো বড়ো ভালো লক্ষণ নয়।

স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল এ কথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল ; বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, 'তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল এ কথাও তো তাহাকে জানানো উচিত।' স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিন-রাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্নারাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেলবনটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে আর দুইজন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপিচুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কী করে।

করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে। চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেও।"

স্বরূপ কহিল, "আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই!"

করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল, "হতভাগিনী, বাহির হইয়া যা!"

করুণা কিছুই কহিল না।

"এখনই দূর হইয়া যা!"

করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল। করুণা কহিল, "কোথায় যাইব।"

নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল ; কহিল, "এখনই দূর হইয়া যা।"

ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কোথায় দূর হইয়া যাইবে।"

এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটী নহে।

নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্বরে কহিল, "তুই কী করিতে আইলি।"

ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল ও কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অনূপের বাটী হইতে বাহির করিতে পারো দেখি!"

নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে, "পুলিসে খবর পাঠাইয়া দিই গে।"

ভবি কহিল, "ইহা তো আর মগের মুলুক নহে।"

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।"

ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল, "সেকি মা, কোথায় যাইবে। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আর তোমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"

বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন তো কোনো প্রকারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাঁহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে ; এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে মনে হয় না এ গ্রামে এমন কেহ আছে যে এমন রাত্রে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!

করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারি ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল, "আমি উহাকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কিনা বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন! আজ রাত্রে যে বড়ো বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে? স্বরূপ তো এখানে নাই।"

করুণা মনে করিল এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল— জিজ্ঞাসা করিবে— কিন্তু কী কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল, "আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে পাইবি না।"

করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে 'ভবির সহিত দেখা করিয়াই যাই', কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জনপ্রাণী নাই। মনে করিল— সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে তাহার বড়ো ভয় হইতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না। কিন্তু মুখে কথা সরিল না। ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল। নরেন্দ্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিসের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।"

দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পর উঠিল। মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য

নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল— তাহার সেই বাগানের গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল— দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কতদিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কতক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে।

সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল— দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন কাত্যায়নী ঠাকুরানী গৃহে নাই। ভাবিলেন গৃহিণী বুঝি পাড়ার কোনো মেয়েমহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাহার দেখা নাই। তা, মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় আর বেশিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে-যেখানে ঠাকুরানীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল ; কহিল, 'মিন্‌সা এক দণ্ড আর কাত্যায়নী-পিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ! কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু পুরুষমানুষের অতটা ভালো দেখায় না।' তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন তবে বড়ো সুখের হইত।

যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেখানে তো পণ্ডিতমহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিল না সেখানেও খুঁজিতে গেলেন— সেখানেও পাইলেন না। এই তো পণ্ডিতমহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন।

নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন ? মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন ? দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন ? এইরূপে মুখুজ্জে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত প্রায় সকলগুলিরই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল-তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষণ্ন বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধরবাবু কোথায়।"

সে কহিল, "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজও আসেন নাই— বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।"

নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "যদি খুঁজিতে হয় তো কলিকাতায় গিয়া খোঁজো গে।"

পণ্ডিতমহাশয় তো এ কথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ ?"

পণ্ডিতমহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।"

পণ্ডিতমহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তিনি এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভালো করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর-একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লানবদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

নিধি কহিল, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।"

কিন্তু তিনি পূর্বে কোনোদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই।

সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরানী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন এমন নহে, যত-কিছু গহনাপত্র টাকাকড়ি ছিল তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিতমহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন।

নিধি কহিল, "এ সমস্তই নরেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিশ করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার করিয়া দিব।"

নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিশ করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিতমহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিতমহাশয়ের শ্রান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশায় কোনোপ্রকারে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু ও তাঁহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সে রমণীটি তাঁহারই কাত্যায়নী ঠাকুরানী!

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন— কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, "কে রে মিন্‌সে। গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে! মরণ আর-কি!"

এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার 'চোখের মাতা' খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্টীকের বাড়ি পণ্ডিতমহাশয়কে দুই একটা গোঁজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাষায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজি অর্ধস্ফুট স্বরে 'পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা' করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

পাহারাওয়ালা আসিল ও পণ্ডিতমহাশয়কে ঘিরিয়া দশ সহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে।

পণ্ডিতমহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন ও কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিলেন, "না বাবা, আমি লই নাই। তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।"

'চোর চোর' বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারি দিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল— পণ্ডিতমহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, "বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি— আমাকে রক্ষা করো।"

ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল।

এমন সময়ে নিধি চোখ মুখ রাঙাইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক-সুট

চাপকান পেন্টুলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান-পেন্টুলুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান-পেন্টুলুন-পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল 'কোন্ হ্যায় রে!' তখন অমনি চারি দিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার নম্বর কত ও সে কোন্ থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছ্যাকরা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "লালদিঘির এন্ড্রু-সাহেবের বাড়ি জানো?"

পাহারাওয়ালা ভাবিল না জানি এন্ড্রুসাহেব কে হইবে ও দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে 'বাবু বাবু' করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথায়। নাম কী।"

বাবুটি গোলমালে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় লজ্জায় দুঃখে কষ্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা-চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিতমহাশয় কোনোমতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, "এ গ্রামে থাকিয়া আর কী করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জন করিব।"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘর দুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই।

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভালোমানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে কে জানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, 'আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ!'

মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোনো কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে; আসিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখী ভালো এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!"

রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষসী, তুই এ সংসার ছারখার করিয়া দিলি!"

রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন, "হতভাগিনীর সহিত দাদার কী কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!"

রজনী একটি কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রণায় সে মনে করিল— বুঝি ইহার একটি কথাও অন্যায় নহে। সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলও না। এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর— অতিশয় শান্ত— যেন মনে-মনে কী একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে-মনে কী একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে।

এই দুই মাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে গিয়াছে— এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কী একটা

ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর অতি শান্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। যেন কী কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কী রজনী। কি বলিতে আসিয়াছিস।"

রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আমার একটি কথা রাখতে হবে।"

মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, "কী কথা বলো।"

রজনী কতবার 'না বলি' 'না বলি' করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে। মহেন্দ্রকে। কী লিখিতে হইবে। না, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন, তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই-একজন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশির স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোনো রাখাল মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা যে কোনো কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারও কাছে কোনো প্রার্থনা করিবে, সে স্বভাবেরই নয়। কী করিলে কী হইবে, কী বলিতে হয়, কী কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে। এক-একজন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে—'এইবার এই বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোনো দুরভিসন্ধি আছে!' বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধুলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা একদিনের মধ্যে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষণ্ণ বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ঐ একজন পথিক আসিতেছে। দেখিয়া ভালো মনে হইল না। করুণার দিকে তার ভারি নজর—বিদ্যাসুন্দরের মালিনী-মাসির সম্পর্কের একটা গান ধরিল— কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভালো অবসর নয় বুঝিয়া সে তো গান গাইতে গাইতে পিছনে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর-একজন, আর-একজন, আর-একজন— এইরূপ এক এক করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক একজনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কী সর্বনাশ। ঐ একজন প্যান্টলুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে। অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরও নয়। ঐ দেখো, করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে। করুণা তো ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি তো, বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া, সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন। বসিতে কি আর জায়গা ছিল না। পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না।

পথিকটি স্বরূপবাবু। স্বরূপবাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে-যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণ তো বিস্ময় ও আনন্দের

তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "করুণা।"

করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল, দেখিল স্বরূপবাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত।

করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখরাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল। সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চিরজীবন দুঃখী করিবার জন্য বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন— তাহার কোনো আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল। কহিল— আরো ভালোই হইয়াছে, তাহাদের দুইজনের যে প্রেম, যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবে। আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত তাহা হইলে অনেক বড়ো বড়ো নভেলের রাজপুত ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত। কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে যাইবে, তাই স্টেশনে যাইতেছিল। পথের মধ্যে এই-সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক, তাহা হইলে আর কোনো ভাবনা ভাবিতে হবে না।

করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে, কী করিবে। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। আজিকার দিন তো প্রায় যায়-যায়— রাত্রি আসিবে, তখন কী করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, এই-সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলেবেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনো যায় নাই, সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কী করিয়া সহিবে বলো। সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে, যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল, 'এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব।' কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে কত সহিবে বলো— এ ভাবনা আর বেশিক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল।

করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেনের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কী অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙিয়াছে, এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভালোবাসে না। সে ভাবিতেছে 'একি উৎপাত! এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম— সকলই ব্যর্থ হইল!' সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল এতদিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড়োসড়ো আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল, 'একি উৎপাত! এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি।' ভাবিল দিন-কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালোবাসা হইবে। স্বরূপ তো তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালোবাসার কোনো চিহ্ন দেখিল না।

করুণা বেচারির তো আরাম বিশ্রাম নাই। এক তো সর্বক্ষণ পরের বাড়িতে অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছে বলিয়া সর্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তাহা ছাড়া স্বরূপের ভাব-গতিক দেখিয়া সে তো ভয়ে আকুল— সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে,

অবশেষে মহা রুক্ষভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, ভয়ে বেচারি সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট্ খিট্ করে, এমন-কি, করুণাকে মাঝে মাঝে ধম্‌কাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে।

এইরূপে কত দিন যায়, স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে, 'এখন করুণাকে লইয়া কী করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব। না, এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এতদিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব। আরো দিন-কতক দেখা যাক।'

অনেক ভাবিয়া-সাবিয়া করুণাকে তো ডাকিল। করুণা ভাবিল, 'যাইব কি না। কিন্তু না যাইয়াই বা কী করি। এখানে কোথায় থাকিব। এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব। দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।'

করুণা চলিল। উভয়ে স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরি আছে। জিনিসপত্র পুঁটুলি-বোঁচকা লইয়া যাত্রিগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে-কলম-গোঁজা রেলওয়ে ক্লার্কগণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্তত ফর্ ফর্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ তো অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল।

করুণা উঠিয়া যাইবে-যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে এখানে!"

করুণা পণ্ডিতমহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নির্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমার ভাগ্যে কী ছিল!"

পণ্ডিতমহাশয় তো আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না। গদ্‌গদ্ স্বরে কহিলেন, "মা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আর ভাবিয়ো না। আমি প্রয়াগে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আইস। পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই— যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আমার কাছে থাকো, ততদিন আর তোমার কোনো ভাবনা নাই।"

করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিতমহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এ জন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল; কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, একটা কথা আছে।"

পণ্ডিতমহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?"

পণ্ডিতমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন— স্বরূপ। নিধি কহিল, "দেখিলেন। করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন! ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্তার নামটা একেবারে ডুবাইল!"

পণ্ডিতমহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে হাত উল্‌টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রাং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

নিধি কহিল, "আহা, নরেন্দ্র এমন ভালো লোক ছিল। ঐ রাক্ষসীই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।"

নরেন্দ্র যে ভালো লোক ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণটা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিতমহাশয় ভাবিলেন, আর না— স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে, স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।

নিধি লাল হইয়া কহিল, "দেখুন দেখি, মহাশয়, পাপাচারণ করিবার আর কি স্থান নাই। এই কাশীতে !"

এ কথা পণ্ডিতমহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই। শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ; ভাবিলেন, 'সত্যই তো !'

একটা ঘণ্টা বাজিল, মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন। এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল— পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া সট্ করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতরস্বরে পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "মা, অনেক প্রতারণা সহিয়াছি— মনে করিয়াছি বৃদ্ধবয়সে আর কোনো দিকে মন দিব না— দেবসেবায় কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব।"

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল ; কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পূরিয়া আসিল ; ভাবিলেন, 'যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে— ইহাকে তো ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।'

নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল, "এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কী হইবে। গাড়ি যে চলিয়া যায় !"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পুরিয়া দিল।

করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া মুখচক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেইখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখাসাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেকক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। স্টেশনে আর বড়ো লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে-সকল পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি নিম্নে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম—

ভাই ! যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই। সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতেছিলাম— কোনো কারণ নাই, কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো গম্য স্থান নাই— তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিরজীবন চলিতে হইবে— চলিয়া, চলিয়া, চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না— রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভালো করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেশে ফিরিবার জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম, কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কী দেখিলাম কী করিলাম কিছু যদি মনে আছে ! চোখের উপর কত পর্বত নদী অরণ্য মন্দির অট্টালিকা গ্রাম উঠিত, কিন্তু সে-সকল যেন কী। কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মতো, যেন মায়ার মতো, যেন মেঘের পর্বত-অরণ্যের মতো। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এইরূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না— আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে, কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি।

এখানকার একজন বাঙালিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না। কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কী অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কী ঘৃণা হইয়াছে তাহা কি করিয়া প্রকাশ করিব। যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে একদিনও ভাবি নাই, যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি— যত দিন চলিয়া গিয়াছে— হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনই দেশে ফিরিয়া যাই, তাহাকে যত্ন করি, তাহাকে ভালোবাসি, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়তো এতদিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কী বলিয়া দাঁড়াইব। না ভাই, আমি তাহা পারিব না।...

মহেন্দ্র

আমি দেখিতেছি, যে-সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে-সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত হইয়াছে ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভালোবাসে নাই— এমন মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ স্বভাব, তাহাকে ভালোবাসে না এমন পিশাচ আছে! কেন, তাহাকে দেখিতেই বা কী মন্দ! মন্দ? কেন, অমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না, বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা-কিছু ভালো তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা-কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভালো বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভালো বলিয়া বুঝিল, আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে, আমি ভাবিয়া পাই না কী করিয়া তাহার খরচ চলিত!

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়োই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়োই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে— 'আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন, যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়তো আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।'

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণতর হইতেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "দিদি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না।"

মোহিনী কহিল, "সেকি রজনী, ও কথা বলিতে নাই।"

রজনী বলিল, "হাঁ দিদি, আমি জানি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না। যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিয়ো। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।"

মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চুপ কর, ও-সব কথা বলিস নে।"

মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া মনে মনে কহিল, 'মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, তবে আমার তাতে কোনো দোষ নাই।'

হাত-অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন, নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এইরূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে— তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্রবিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই-যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভালো আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যত দূর জানি তাহাতে তো এক-একবার আমার মনে হয়— এই-যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান কালে, রজনী যেদিন কোনো দোষ না করিত সেদিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরানো কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 'বাবা'কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে— 'তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কাঙাল! রজনী দেখিতে ভালো নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়।'

কিন্তু রজনীর আজকাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ত্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে, ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য-সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত— প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন রজনী সংবাদ পাইল মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আহ্লাদ! মহেন্দ্র তো তাহাকে সেই ঘৃণাচক্ষে দেখিবে। তাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্য মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল— যে কারণেই হউক, মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীর স্টেশনে করুণা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, একজন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান— তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম— সেই ভদ্রলোকটি মহেন্দ্র।

লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই-সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে, করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ

করিল। মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না— কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন।

এখন করুণাকে লইয়া যে কী করিবে মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল। কহিল— তাহাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাচীর-দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর উপরে একটি বাঁধানো শানের ঘাট। কহিল— তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী— তেমন কোমলহৃদয়— তেমন ক্ষমাশীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনো পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভবির দেখা পাইবে! মহেন্দ্র ভবির সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাঁহাকে ভ্রাতার মতো দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এতদিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বার বার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিতমহাশয়ের তাহার উপর রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কে কী বলিবে, কে কী করিবে, কখন কী হইবে— এই-সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কী উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কী প্রতিবিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে— এই-সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সংকোচে অভিভূত হইয়া, পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোনোমতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

কতবার সাত-পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড়োমা'কে খবর দিতে গেল। বড়োমা তখন রজনীর সুমুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আর-একটি নূতন বধূ লইয়া তাহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন।

মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া উলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে-সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড়ো ভালো লাগে নাই। মহেন্দ্রের সম্মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই-সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের-পিতার অতিরিক্ত আনা-দুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই-চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসীদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই।

রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাঁহার শ্বশুর শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড়ো দুর্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন। আশ্চর্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কী। আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে!"

মহেন্দ্রের মা'ও অবাক, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন— পরে ঠুঙি হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন— যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কি না! এ মহেন্দ্র ঝুঁটা মহেন্দ্র কি না! মহেন্দ্র অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্‌ ফুস্‌ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল যে, 'আমি এখনই যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।' যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কী ভাগ্য! বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে। কেন রজনী।"

আর কি উত্তর দিবার জো আছে।— "আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

ওকি মহেন্দ্র! অমন করিয়া বলিয়ো না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে— "বলো, তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে। সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একবার বলো ক্ষমা করিলে।"

রজনী ভাবিল— সেকি কথা। মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেননা তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে— তাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কী, সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই। সে কি ক্ষমার যোগ্য। মহেন্দ্র রজনীর দুর্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল। রজনী ভাবিল, 'এই সময়ে যদি মরি তবে কী সুখে মরি!' তাহার কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারির নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কত কী কথা বলিল, সে-সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিল 'এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে— এই মুহূর্তে মরিতে পাইলে কী সুখী হই! কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে!' রজনীর এ সংকোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কত কী কথা কহিল— কত অশ্রুজল, কত কথা, কত হাসি, সে বলিবার নহে।

মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর-একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনো করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্তন! যে সুখ সে কখনো আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে— আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল— সে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রজনী, কী হয়েছে।"

সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কী অন্যায়াচরণ করিয়াছে।

রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল— শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই-এক মাসের মধ্যে যে কোনো ব্যাধি বা দুর্বলতা হইয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই— শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর গিন্নিপনা করে কাজ নেই, দুদিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচি নে।"

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক— রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারে নি বলিয়া তাহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনই রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুইজনের ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল— তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার সামান্য

যত্ন, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে— তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তো দুইজনেরই ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কী যে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়তো সে-সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়তো হাসিবেন, হয়তো মনে করিবেন এ-সব কোনো কাজেরই কথা নয়। কিন্তু সে বালিকারা যে-সকল কথা লইয়া অতি গুপ্তভাবে অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে, সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না— সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন করে সে রজনীর কথা শুনিবে! তাহার কি একটা-আধটা কথা। তাহার পাখির কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প— সে কবে কী স্বপ্ন দেখিয়াছিল— তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল— এ-সমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত তখন তাহাই বা থামায় কে। আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য। রজনীবেচারির বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশি কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক-এক সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে— তা, তাহাতে করুণার কী ক্ষতি। করুণার বলা লইয়া বিষয়।

করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড়ো ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড়ো কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর— এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো দেখেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলেমেয়েরা সবাই খৃস্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন সে কথা মিছা নয়, মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন, 'আজ বাগানে বড়ো গলা বাহির করা হইতেছিল! লজ্জা করে না!' কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ তো করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কী করিতেন বলিতে পারি না।

আবার এক-একবার যখন বিষণ্ণ ভাব করুণার মনে আসিত তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে— রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষ্মী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ণ হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন্দ্র কোথায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি তো জানি না।"

করুণা কহিল, "কেন জান না।"

কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল।

কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। একদিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা-রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন— 'তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে

আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী হবে।"

মহেন্দ্র কহিল কোনো ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা-উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড়ো খোঁজ-খপর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র তো তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না— 'একদিন কী অপরাধ করিয়াছিলাম ত্াহার জন্য কি দুইজনের এ জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইবে?' সে মনে করিল হয়তো মোহিনী রাগ করিয়াছে, হয়তো মোহিনী তাহাকে ভালোবাসে না। পাঠকেরা শুনিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালোবাসার পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারও আর কথা কহিবার জো থাকিবে না। সে বলে, 'মানুষকে ভালোবাসিতে দোষ কী। আমি তো মোহিনীকে তেমন ভালোবাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসি— আমি কখনো তাহার অধিক তাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভালোবাসে। সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত। ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক-একবার অল্প-অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত, 'আপনার ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কী। বরং না আসিলেই দোষ। কেন, মোহিনী তো আর-সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন। যেন সত্য-সত্যই আমাদের মধ্যে কোনো সমাজবিরুদ্ধ ভাব আছে— কিন্তু তাহা তো নাই, নিশ্চয় তাহা নাই, তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি, সকলের অপেক্ষা ভালোবাসি— আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।' মহেন্দ্র এইরূপে মনের মধ্যে সকল কথা তোলাপাড়া করিত। এমন-কি, রজনীকেও তাহার এই-সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল। রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ-সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে-মনে কহিল, 'সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।' মোহিনী ভাবিল— আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।

কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত একবার দেখা করিল। করুণা কহিল, "তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিয়ো আমি ভালো আছি।"

করুণা জানিত যে, পণ্ডিতমহাশয় নিশ্চয় তাহার কুশলসংবাদ পাইবার জন্য আকুল আছেন।

করুণা যাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিতমহাশয়ের এমন অনুতাপ হইয়াছিল যে অনেকবার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'গারোয়ান' যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতরস্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন 'কাজটা ভালো হইল না'। দুই-চার-বার এইরূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে আর-কিছু বলিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নস্য সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল গাড়িতে নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার-বার ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার আর অনুতাপের পরিসীমা রহিল

না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে একদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল।

মোহিনী কহিল, "তোমাদের পণ্ডিতমহাশয়কে তো আমি চিনি না, যদি চিনাশুনা হয়, তবে বলিব।"

করুণা একেবারে অবাক হইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয়কে চিনে না! সে জানিত পণ্ডিতমহাশয়কে সকলেই চিনে। সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিতমহাশয়ের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিতমহাশয়কে চিনিল না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক হইয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষা কাল। দুই দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসংকোচ পথিকদের সর্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড়ো রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা-একটা খোলার ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাঙা হাঁড়ি, পচা ভাত, আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে।

একটি দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর তীরে আস্তাবল-রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছেন। হুঁচট খাইতে খাইতে— কখনো-বা এক-হাঁটু কাদায় কখনো-বা এক-হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেন্টলুন্‌টাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে— সর্বাঙ্গে কাদামাখা দুই-চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর-আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটীতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মতো মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর-কয়েকের মধ্যে পুলিসের কনস্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর-কোনো অতিথি আসে নাই— এইজন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন।

দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধ-ময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোটো ছোটো চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সংকুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন স্যাঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখনো দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপসা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এক কালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাসজনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশু-নৃশংসতানিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত)— তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়।"

মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী

দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া সে দাসীটি মনে-মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না, সে যেন তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল— এমন পরিবর্তন সে আর কাহারও দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য হইতে হয়— তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজকর্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্তভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছেন— মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই।

মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল। সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ মশায়, সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছি।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "তা, আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কী। উপার্জনের ভার তো আপনার হাতে। আর, তিনি অর্থ পাইবেন কোথা।"

নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল, "সেকি কথা! আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিনকতক স্বরূপবাবু তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, শুনিলাম আজকাল আর কোনো বাবুর আশ্রয়ে আছে।"

মহেন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটীতেই আছেন।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "আপনারই বাটীতে? সে তো ভালোই।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তা যদি হয়, তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।"

মহেন্দ্র যেরূপ ভালো মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাঁহার কর্ম নয়। বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন— নরেন্দ্র যদি তাঁহার কু-অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।

নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল; কহিল, "কু-অভ্যাস কী মশায়! নূতন কু-অভ্যাস তো আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা অভ্যাস আছে সে তো আপনি সমস্ত জানেন।"

এই কথায় ভালোমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভালো উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সংকোচ অনুভব করিত— সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য বদল হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে একশিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়াছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই-তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিল— সেই কটাক্ষের প্রভাবে, মলয়-সমীরণে, চন্দ্রকিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকাকড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিঙ ভাঙিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যকমত টাকাটা-শিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধারগুলি শুধিতে না হয় এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসি শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আর ঘুচিল না। ঘুচিবে কিরূপে বলো। মাসি যখন সন্তোষজনকরূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো করুণা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি কেমন-ধারা গা ?' সে যে কেমন-ধারা করুণা তাহার কোনো হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোনো পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক-এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে, সে সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত— রজনী-সুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক-এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না।

কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে— হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত— সে একদিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয়দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছিল— সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এইরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে তখন রজনীর বড়ো কষ্ট হয়— সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্তদিন তাহার কেমন কোনো কাজই হয় না।

নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল, সে বাড়ি অনেক দূরে। করুণা বলিল, তা হোক্। মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড়ো খারাপ। করুণা কহিল, তা হোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই। করুণা উত্তর দিল, তা হোক্! সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই 'তা হোক' শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভালো বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন।

বাড়িভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক, নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না।

এই বার্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে সহসা এক-একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। কেন, এতদিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই। নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল। কে জানে, করুণার বড়ো লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারি করুণা বড়োই আশা করিয়াছিল যে বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়তো এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না! করুণার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল— যে ভাবনা করুণার মতো বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল, এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া ওঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোকজন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়। সে মনে করে, 'আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি।' সে সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারি কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে— বর্ষার সলিলসেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে, আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না।

কিন্তু একি সংবাদ! মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি। মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্তি হওয়া সহজ নহে— করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল— যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেন কেমন শূন্য-শূন্য হইয়া গেল। সেই যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না। সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি একদিনের জন্যও আর শুনা গেল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভালো থাকিত। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোনো অসদ্‌ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না— দুই-এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভালো হইত। তাহার অবর্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই। কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সারবে না গা। কী যন্ত্রণা!"

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল। নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আর কাহারও নয়। এমন-কি, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ত্রুটি করিত না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে। করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত— দুজনেই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিনযাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্তি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামি করিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই-সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন একপ্রকারের ভাব হইয়াছে— সে মনে করে যাহা হইতেছে হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক! দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর্‌ গর্‌ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত; করুণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না। নরেন্দ্র আবশ্যকমত গৃহসজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না— অর্থসাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। করুণা বেচারি কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে 'যে যাহা করে করুক— আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক', না, তাহাকে লইয়াই এই-সমস্ত হাঙ্গাম! সে কী করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বার বার এমন কী করিয়া লিখিবে।

মহেন্দ্রের নিকট হইতে বার বার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্কর্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিয়ো না।"

সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল, সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল— কহিল, "তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাকলে গিলবে কী।"

নরেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "লিখিতেই হইবে।"

করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষমা করো, আমি লিখিতে পারিব না।"

"লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?"

ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিতমহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্বল করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিতমহাশয় নিধির টানাটানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনোই ভালো ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কী হইল! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য-সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন। প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন— বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্ছার পর হইতে করুণার বার বার মূর্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত; পণ্ডিতমহাশয় যখন অনুতপ্তহৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিককার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি', তখন করুণা অশ্রুপূর্ণনেত্রে অতি ধীরস্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত 'নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে?' সে কহিত, "কাজ নাই।"

সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র।

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধিপ্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

আশ্বিন ১২৮৪-ভাদ্র ১২৮৫

প্রবন্ধ

আত্মপরিচয়

আত্মপরিচয়

১

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারও কোনো লাভ দেখি না।

সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই— এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই— সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য— এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয় যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষমাত্র সে কথা গোপনে থাকে— বর্তমানের গৌরবেই

সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত ; কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনাসম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই— অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা-কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র— তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে ? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না। সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে— কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই-যে সুরটা, সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে-একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, 'বলো বলো, তোমার কথাটাই বলো। ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।' এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন ; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমারই কথার ভিতর দিয়া কী-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন— তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই— সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে—
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে।

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার

সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন— সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি ;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারি দিক পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে—
তোমার-আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী—
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।...
লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণকিরণকণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিনু কে বা জানে ?
কী মুরতি-মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে ?
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে— সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে— সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্‌বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখে সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।

আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে-একটি নিত্যপ্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখদুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্‌ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

এইখানে আমার একটি পুরাতন চিঠি হইতে একটা জায়গা উদ্‌ধৃত করিয়া দিই—

ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়— একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব— আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরমসত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে— প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্য সূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তাঁর চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়— সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম?… আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষা-সম ।
কত যে বরন, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব ।

আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কী অনন্ত মাধুর্য আছে, যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্যচন্দ্রগ্রহতারকার সমস্ত শক্তি দ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়াছি— আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি— আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না ?

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে ।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে ?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে ?
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে ?

কী দেখিছ বঁধু মরমমাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত,
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।

যদি এমন হয় যে, আমার বর্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, যে আগুন তিনি জ্বালাইয়া রাখিতে চান আমার বর্তমান জীবনের ইন্ধন যদি ছাই হইয়া গিয়া আর তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তবে এ আগুন তিনি কি নিবিতে দিবেন ? এ অনাবশ্যক ছাই ফেলিয়া দিতে কতক্ষণ ? কিন্তু তাই বলিয়া এই জ্যোতিঃশিখা মরিবে কেন ? দেখা তো গিয়াছে, ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে। অন্তরে অন্তরে তো বুঝা গিয়াছে, ইহার উপরে অনিমেষ আনন্দের দৃষ্টির অবসান নাই।

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

নিজের জীবনের মধ্যে এই-যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে— যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি ; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে। তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল;
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্‌বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই—

তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।

আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই— বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে ;
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।

আশা করি, পাঠকেরা ইহা হইতে এ কথা বুঝিবেন, আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্রসূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্যচন্দ্র-

মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্তজীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল— ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্যকে যাহা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি কাহাকে বলে ! পৃথিবীকে যাহারা 'জলরেখাবলয়িত' মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায় !

প্রকৃতিসম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব—

...এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতি দিন চলে যাচ্ছে— এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে ! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশ-ব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য— এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে ! কতবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা ! এতবড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না ! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি ! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না ! মনটা যেন আরো শতলক্ষ যোজন দূরে ! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না !...যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে— পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এইজন্যে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে— বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য ! এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে !

...এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ-ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

...এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।... আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন— তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম— নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত

হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীতহিরণ্য অঞ্চল প'রে ওই নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন— আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন— আমার দিকে তেমন লক্ষ করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।

প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে— সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে ; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ-বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন, কেহ-বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বুঝি-বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে— সকলই এই জগৎ সংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই ; যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে— প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন— আর-কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আমি বালকবয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম— তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না— কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে

পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।

হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায় ?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।
পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যাজিয়া ;
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্ধ্বে যায়,
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি—

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে— সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে।

নিজের সম্বন্ধে আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিল, এইবার শেষ কথাটা বলিয়া উপসংহার করিব—

মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে ; সর্বকর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।

সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।
কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি!

আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটা কতক কবিতা উদ্‌ধৃত করিয়া, কতক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কি না জানি না— কারণ, বোঝানো-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই— যিনি বুঝিবেন তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ। বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায় আমার জীবনে এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন যাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ তবে আমার কাব্য আমার জীবন পৃথিবীর কাহারও কোনো কাজে লাগিবে না— সে আমারই ক্ষতি, আমারই ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই, আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব— আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎপরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র— সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে— জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে— যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে— যাহা অশরীরভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে— তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।...
যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারি,
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে?

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?

১৩১১

২

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি সে একটি অকালের ফল— এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সেবকদের মতো সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকি এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মতো কিছু কিছু যশের খোরাকি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন— নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ-খোরাকি বন্দোবস্ত— তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই তো গেল দিনের খোরাক— ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে তো মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড়ো সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিসটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির-দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে, সে দালালি আদায় করিয়া লয়। কবি যতবড়ো কবিই হউক, তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার-সঙ্গে সঙ্গে যে-একটি অহং লাগিয়া থাকে, সকল-তাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়! তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভর্তি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং-পুরুষটার বালাই থাকে না, তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্যই তো ঐ দুর্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এইজন্যই তো মনু বলিয়াছেন— সম্মানকে বিষের মতো জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভালো।

আমার তো বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে তো কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব, সে কেবল ত্যাগ-শিক্ষারই জন্য। এ সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেইখানেই নামাইতে

হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে, আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তাহাকে আমার অহংকারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে— কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায়, প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য তো ঘোড়া আর প্রবীণতাই সারথি। সারথিহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথমবিকাশের লাবণ্যপ্রভাতে। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে এখনো খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরমরহস্যময়ী— তখনই কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু-অবসানের দিনান্তকালেও অনন্তজীবনের পরমরহস্যের জ্যোতির্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কী?

অতএব বার্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীণ বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এ বয়সেও তরুণের প্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্ত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাবকিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেক কাল বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি— তবে আমার আর সংকোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই— যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কতবড়ো আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা সস্তা জিনিস নহে। আমরা ভৃত্যকে যে বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে জিনিসটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না— কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি— ভুলচুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারংবার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই-সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই-সমস্ত কঠোরতা-বিরুদ্ধতার ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম প্রবল সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি— তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিস্ট্, তাঁহারা মানসিক নির্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কাছে

ঘেঁষিতে দেন না। তাঁহারা যাহা-কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশি নাই, এইজন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়াছে— ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্বরথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠি, মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি ; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মালচালানের পরীক্ষাশালা সেই কস্টম্‌হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্তগুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না। যেমন এক দিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর-এক দিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন-কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান দেওয়া গেছে, তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোনো ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল তো এই দেখিতেছি, অন্তত প্রাচুর্যের দ্বারাতেও বর্তমানকালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্বচেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে ক্ষণকালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে। অদ্যকার সম্বর্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুরপরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর ব্যর্থতা দিয়া ওজন ভারী করিয়া তোলা যায়— যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি— দর অপেক্ষা দস্তুরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-কারবারে সেই-সকল ফাঁকি জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সে কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে, সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না, আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে, বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে ছন্দে যে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম— ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুশি করা যায়— কিন্তু সেই খুশিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে— সেই সুলভ খুশির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ-বিদায় তাহাও আমাকে বার বার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনোদিন স্থায়ী কল্যাণ লাভ করিতে পারে

না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরি-উপরি অনেকবারই ঘটিল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই; এইজন্য দুর্গতির দিনের যে-কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই— এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অতিশয় মর্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এইজন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মানবৃদ্ধি হয়। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন— যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয়, সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি-সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোক গায়ে ধুলা দেয় তবে সেই ধুলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ, যেখানে সত্য, সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্বাদের মতো মাথায় করিয়া লইলাম— ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে, ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহংকারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।

ফাল্গুন ১৩১৮

৩

সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন ধর্মটি তার? যে ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর-প্রাণের চেয়ে বড়ো— সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। এইজন্যে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেইসঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে।

সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে একে সম্পূর্ণ নষ্ট করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানি নে কেন, তবু অন্য-সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনোমতেই লুপ্ত করতে পারি নে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি-না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি; যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে, তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন-কি, তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয়, তা হলে চমকে উঠতে হয়।

আমার সেই অবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে, তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বলত আমার প্রেতমূর্তিটা দেখা যাচ্ছে, তা হলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্তলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা শুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বললে এই বোঝায় যে, আমার বর্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয়, আমার অতীতটাই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চলছে— কিন্তু মাঝে থেকে কোনো-এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায়, এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্বে অন্য একটি কাগজে অন্য একজন লেখক আমার রচিত ধর্মসংগীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচাবয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেছি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এইজন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিস্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়তো যার মূলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েছে। সেইরকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। যখনই সেই ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনই জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্য তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না মেলে তা হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। 'আপনাকে জানো' এই কথাটাই শেষ কথা নয়, 'আপনাকে জানাও' এটাও খুব বড়ো কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎ জুড়ে রয়েছে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না— নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানারকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেছে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তা হলে মৃত্যুর

পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কী এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে তো চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চলছে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন-কিছু বলেন যা আমার মতে সংগত নয়, তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চল্‌তি পথিকের নোটবইয়ের টোকা কথার মতো। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুশকিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন, কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেরোয়।

কথা উঠেছে আমার ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত, তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারও কারও পক্ষে ধর্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন-একটা ছুটি নেওয়া যে ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন-কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চোকে, ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতকগুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ একদল এমন-একটি শান্তি চান যে শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্যদল এমন-একটি স্বর্গ চান যে স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না যে অর্থ তাকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে বিরাজ করছে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না-করা ; আর-এক, মনের মতো খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু-রকম দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আর-এক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম-পালনটাতেই আশ্রয় পায়— তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমত, ঠিক সময়মত, উপরওয়ালার আদেশমত যন্ত্রবৎ কাজ করে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে, তার বাইরে

কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন-কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেছে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানছে বলেই সে যে মুহূর্তে দুঃখকে পাচ্ছে সেই মুহূর্তে দুঃখকে অতিক্রম করছে, যে মুহূর্তে নিয়মকে মানছে সেই মুহূর্তে তার মন তার থেকে মুক্তিলাভ করছে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি। সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে, সমস্ত দুঃখকে, সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানছে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়ো, সে আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়ো। সে আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়ো, সে আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়ো।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি কোন্ ধর্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন 'আমার ধর্ম' কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃস্টান সে যে খৃস্টের অনুরূপ হতে পেরেছে তা নয়— তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃস্টানধর্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এতবড়ো মিথ্যা কথা বলতে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্মের আদর্শটি কী।

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে— আমি তো কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

আমি যে সব নিতে চাই রে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মতো— তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বতটি যেন বীজকোষ— চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মতো এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এরকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে— সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়— বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে— শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের— ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড়বৃষ্টিরৌদ্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায়

ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড়ো পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোটো-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয় ; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাই নে। তখন প্রাণপণে কেবলই সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোটো ছোটো ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে— তখন—

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের,
ধূমাঙ্কিত কালি।

এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্যে'—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করছে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে—

ওই কে বাজায় দিবসনিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানবমানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী। সেই হচ্ছে

শিবম্। এই-যে মঙ্গল এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ-শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যে'র দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।

১

মাতৃস্নেহবিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে— প্রকৃতির বুকে
লালনললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে, প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে-মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

২

আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিককার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ—

যেদিন জগতে চলে আসি.
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি— তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান?

এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান ; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক ; রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই—

হবে, হবে হবে জয় হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি র'ব জাগি—
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম আমার উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বার বার, হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখছে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলছে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চলতে চলতে যে একটি বোধ কবির সামনে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই-এক অংশ তুলে দিই—

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে ?

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে—

> হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন
> সহজ প্রবল।
> জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
> বাহিরায় ফল—
> পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
> অপূর্ব আকারে
> তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
> প্রণমি তোমারে।
> তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
> অক্লান্ত অম্লান'।
> সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
> কিছু নাহি জানো।
> উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
> জ্বলদর্চিরেখা—
> করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
> কী তাহাতে লেখা।
> হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
> ঝনন রনন,
> বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
> সুতীব্র স্বনন।
> হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
> করহ আহ্বান।
> আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
> অর্পিব পরান।
> চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
> হেরিব না দিক,
> গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
> উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলংকার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা-রকম রঙ ফুটতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিক্‌মিক্ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্ করতে শুরু করে, সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলংকারিক। কিন্তু তাতে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মিড় টেনে এখনই অশান্ত সুরের ঝংকারে বেজে উঠবে। এমনি করে ধর্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলংকারেই প্রকাশ

পাচ্ছিল, তা মানসপ্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানাপ্রকার রঙ ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল, নির্জনে অরণ্যে পর্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্র ভীষ্মপর্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে 'পাগল'[১] বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কী কথাটা কল্পনার অলংকারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।—

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে। আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত— আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। ...নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে— ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইহার নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।...

আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলো। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে, সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে— আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয়

১· দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ, রচনাবলী ৫, সুলভ তৃতীয় খণ্ড

পাই, তখন রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

তার পরে আমার রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে— জীবন এই দুঃখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেশের অসীমের আবির্ভাব—

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ !
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।...

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

'খেয়া'তে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে ? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল— এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

ঐ 'খেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না— তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা

করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গে শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ— ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে— সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্ব যে এই দুঃখতপস্যায় রত ; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে— ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে ; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা ; তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু

তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি— দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি, তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়— কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্‌পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল— তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল— তাই তো যে ছিল রানী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই 'গীতালি'র একটি গানে আছে—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
        আর-এক হাতে হার।
    ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
        পরানটি তোমার।
    ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ওই
        আসছে জীবনমাঝে
    ও যে আসছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে
যা আছে সব একেবারে
        করবে অধিকার।
    ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

এই-যে দ্বন্দ্ব, মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ— এই-যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়— যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয় সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন দেখি, যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়— তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলছে—

যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।... যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— 'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তা হলে বসন্তের দশা কী হত।'

বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হত— তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে— যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।—

চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি।... সেই আমাদের সর্দার। বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও তো নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না?... তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।... তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড়ো করে, নূতন করে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেছে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেছে—

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া,
বন্যা ছুটেছে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে,
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে,
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে— অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, উদ্‌ঘাটিত ক'রে, স্থির ক'রে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব— কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি— কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ববিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। ইহুদী পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা-ভালোমন্দ-জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা-দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটিতে পারে কোথায় ? অন্তরের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে— জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে— অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন— তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে ; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে— তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়— শেষ হচ্ছে প্রেম আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও

বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের এক দিকে দ্বৈত আর এক দিকে অদ্বৈত, এক দিকে বিচ্ছেদ আর-এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর-এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম যে আগমনীর গান গায় সে এই—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

৪

নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তা হলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই— একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাই নে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক'— সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্রনিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য ; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি— যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা— এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে— তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই আমার একমাত্র পরিচয়। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন— কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল-মাস্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবলমাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুল-মাস্টারকে এড়িয়ে এসেছি— মাস্টারি পদটাও আমার নয়। বাল্যে নানা সুরের ছিদ্র-করা বাঁশি হাতে যখন পথে বেরলুম তখন ভোরবেলায় অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেইদিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি ; প্রভাতের বাণীবন্যা সেদিন আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙেছিল, দোল লেগেছিল চিত্তসরোবরে। ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠছে নিখিলের চিত্ত, তারই তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজও তার বিরাম নেই। সত্তর বৎসর পূর্ণ হল, আজও এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্মার ফর্মাশের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চিরচঞ্চল। গাম্ভীর্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোওয়াতে পারি নে। এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর। আমি কী করেছি, কী রেখে যেতে পারব সে কথা জানি নে। স্থায়িত্বের আবদার করব না। খেলেন তিনি কিন্তু আসক্তি রাখেন না— যে খেলাঘর নিজে গড়েন তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় এই আম্রকাননে যে আল্পনা দেওয়া হয়েছিল চঞ্চল তা এক রাত্রের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নতুন করে আঁকতে হল। তাঁর খেলাঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করি নে। ভাঙা খেলনা আবর্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙবে, কিন্তু তাই বলে ভোজ তো দেউলে হবে না। সত্তর বৎসর

পূর্ণ হবার দিন, আজ আমি রসময়ের দোহাই দিয়ে সবাইকে বলি যে, আমি কারও চেয়ে বড়ো কি ছোটো সেই ব্যর্থ বিচারে খেলার রস নষ্ট হয় ; পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করছে, তাদেরকে ভোলা চাই। লোকালয়ে খ্যাতির যে হরির লুঠ ধুলোয় ধুলোয় লোটায় তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাই নে। মজুরির হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার, এর যে যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা তা চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইঁটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠছে সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি সেটা গৌণ। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই-যে প্রথম আরম্ভ-রূপ এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষারুণদীপ্তি, যে নবোদ্‌গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস— না হলে আইনকানুন-সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হত। এই-সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজন্য আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হতে পারব না। শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

৫

বটগাছের দেহগঠনের উপকরণ অন্যান্য বনস্পতির মূল উপকরণ থেকে অভিন্ন। সকল উদ্ভিদেরই সাধারণ ক্ষেত্রে সে আপন খাদ্য আহরণ করে থাকে। সেই-সকল উপকরণকে এবং খাদ্যকে আমরা ভিন্ন নাম দিতে পারি, নানা শ্রেণীতে তাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। কিন্তু অসংখ্য উদ্ভিদ্‌রূপের মধ্যে বিশেষ গাছকে বটগাছ করেই গড়ে তুলছে যে প্রবর্তনা, তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, সেই অদৃশ্যকে সেই নিগূঢ়কে কী নাম দেব জানি নে। বলা যেতে পারে সে তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয়কে নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব। সমস্ত গাছের সত্তায় সে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই রহস্যকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। ঘ্রাজিরেকস্য দদৃশ্যে ন রূপম্— সেই একের বেগ দেখা যায়, তার কাজ দেখা যায়, তার রূপ দেখা যায় না। অসংখ্য পথের মাঝখানে অভ্রান্ত নৈপুণ্যে একটিমাত্র পথে সে আপন আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য সংগোপনে রক্ষা করে চলেছে ; তার নিদ্রা নেই ; তার স্খলন নেই।

নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা আমরা সহজে চিন্তা করি নে, কিন্তু আমি তাকে বার বার অনুভব করেছি। বিশেষভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁচেছি তখন তার উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে বুঝতে পারছি সে প্রাণস্য প্রাণং, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ। আমার মধ্যে সে যে সহজে যাত্রার পথ পেয়েছে তা নয়, পদে পদে তার প্রতিকূলতা ঘটেছে। এই জীবনযন্ত্র যে-সকল মাল-মসলা দিয়ে তৈরি ; গুণী তার থেকে আপন সুর সব সময়ে নিখুঁত করে বাজিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছি, মোটের উপর আমার মধ্যে তাঁর যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কী। নানা দিকের নানা আকর্ষণে মাঝে মাঝে ভুল করে বুঝেছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মন অন্য পথে, মাঝে মাঝে হয়তো অন্য পথের শ্রেষ্ঠত্বগৌরবই আমাকে ভুলিয়েছে। এ কথা ভুলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। 'নটীর পূজা' নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।

আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে সেইরকম সৃষ্টিসাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দেশ করে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য, বাধার মধ্যে দিয়ে, আত্মপ্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরই প্রেরণায় অর্ঘ্যপাত্রে জীবনের নৈবেদ্য আপন ঐক্যকে বিশিষ্টতাকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে তুলতে পারে যদি তার সেই সৌভাগ্য ঘটে। অর্থাৎ যদি তার গুহাহিত প্রবর্তনার সঙ্গে তার অবস্থা তার সংস্থানের অনুকূল সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, যদি বাজিয়ের সঙ্গে বাজনার একাত্মকতায় ব্যবধান না থাকে। আজ পিছন ফিরে দেখি যখন, তখন আমার প্রাণযাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি ; সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্পধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলছে।

আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারি দিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়েছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচারবিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধসংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। এ কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয় নি।

এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারি দিকেই আছে, অনির্বচনীয়তা ; তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, কোনো বিশেষ পার্বণবিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হতে পেরেছে এই জগতের। বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয়, তার মন্ত্র নিজেই রচনা করে এসেছি।

বাল্যবয়সের শীতের ভোরবেলা আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাত্রের অন্ধকার যেই পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে আমি তাড়াতাড়ি গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়েছি। বাড়ির ভিতরের প্রাচীর-ঘেরা বাগানের পূর্বপ্রান্তে এক-সার নারকেলের পাতার ঝালর তখন অরুণ-আভায় শিশিরে ঝলমল করে উঠেছে। একদিনও পাছে এই শোভার পরিবেশন থেকে বঞ্চিত হই সেই আশঙ্কায়

পাতলা জামা গায়ে দিয়ে বুকের কাছে দুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা করে ছুটে যেতুম। উত্তর দিকে ঢেঁকিশালের গায়ে ছিল একটা পুরোনো বিলিতি আমড়ার গাছ, অন্য কোণে ছিল কুলগাছ জীর্ণ পাতকুয়োর ধারে— কুপথ্যলোলুপ মেয়েরা দুপুরবেলায় তার তলায় ভিড় করত। মাঝখানে ছিল পূর্বযুগের দীর্ণ ফাটলের রেখা নিয়ে শেওলায়-চিহ্নিত শান-বাঁধানো চানকা। আর ছিল অযত্নে উপেক্ষিত অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, নাম করবার যোগ্য আর-কোনো গাছের কথা মনে পড়ে না। এই তো আমার বাগান, এই ছিল আমার যথেষ্ট। এইখানে যেন ভাঙা-কানা-ওয়ালা পাত্র থেকে আমি পেতুম পিপাসার জল। সে জল লুকিয়ে ঢেলে দিত আমার ভিতরকার এক দরদী। বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এজন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি 'ভালো লাগল আমার'। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নামবামাত্র পুবের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তেতলার ছাদের উপরকার আকাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এসেছে ঘননীলবর্ণ মেঘের পুঞ্জ। মুহূর্তমাত্রে সেই মেঘপুঞ্জের চেয়ে ঘনতর বিস্ময় আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এক দিকে দূরে মেঘমেদুর আকাশ, অন্য দিকে ভূতলে-নতুন-আসা বালকের মন বিস্ময়ে আনন্দিত। এই আশ্চর্য মিল ঘটাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে ছন্দ মেলে না। জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে-দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করেছি। এ দেখা তো নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতা নয়। এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।

ঋগ্‌বেদে একটি আশ্চর্য বচন আছে—

অভ্রাতৃব্যো অনাত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে।

হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই, তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

যতবড়ো ক্ষমতাশালী হোন-না কেন সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে তাই তো এত অসংখ্য আয়োজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, রেখার থেকে রূপের অপরূপতা। সে যে কী আশ্চর্য সে আমরা ভুলে থাকি।

এ কথা বলব, সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে, এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।

অন্তি সন্তং ন জহাতি
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি।

কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য; সে কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না।

জন্তুদের উপর সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়া অব্যবহিত। তার থেকে তারা সরে এসে তাঁকে দেখতে পায় না। কেবলমাত্র নিয়মের সম্বন্ধে মানুষের সঙ্গে তাঁর যদি সম্বন্ধ হত তা হলে সেই জন্তুদের মতোই কেবল অপরিহার্য ঘটনার ধারার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানুষ তাঁকে পেত না। কিন্তু দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি তিনি আবির্ভূত। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ।

এই প্রকাশের কথায় ঋষি বলেছেন—

অবির্ বৈ নাম দেবতর্ তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ।।

সেই দেবতার নাম অবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরিবৃত— এই-যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা।

ঋষি কবি দেখতে পেয়েছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সবুজের মালা-পরা এই আবির আবির্ভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা যায় না কেন খুশি করে দিলেন। এই খুশি সকল পাওনার উপরের পাওনা। এর উপরে জীবিকাপ্রয়াসী জন্তুর কোনো দাবি নেই। ঋষি কবি বলেছেন, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর অর্ধেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিখিল জগৎ। তার পরে ঋষি প্রশ্ন করেছেন, তদস্যার্ধ্য কতমঃ স কেতুঃ, তাঁর বাকি সেই অর্ধেক যায় কোন্ দিকে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর জানি। সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, এই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোন্‌খানে। সৃষ্টির উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক। অত্যন্ত কাছের সংস্রবে কাব্যকে পাই নে, কাব্য আছে রূপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়। এই বিরাট অবাস্তবে ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রসখার ভাবের মিলন ঘটে। ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে।

নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারি দিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি; কিন্তু এই-সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে; এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।

একদিন আমি বলেছিলুম—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

ঋগ্‌বেদের কবি বলেছেন—

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি।

প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব; আমাকে স্বস্তি দিয়ো।

এই তো বন্ধুর কথা, বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেয়ে স্তবগান কি আর-কিছু আছে। দেবস্য পশ্য কাব্যম্। মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ দেখার অন্ত চিন্তা করা যায় না।

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর সঙ্গে কি আমার কর্মের যোগ হয় নি।

হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সে লোহালক্কড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়। কর্মরূপে সেও কাব্য। একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে; আহ্বান করেছিলুম এখানকার জল স্থল আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসবপ্রাঙ্গণে উদ্‌বোধিত করেছিলুম।

এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির স্বত-উদ্ভাবনার তত্ত্ব। আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।

বেদে আছে—

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগমিন্বতি।

অর্থাৎ, যাঁকে বাদ দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না তিনি বুদ্ধিযোগের দ্বারাই মিলিত

হন, মন্ত্রের যোগে নয়, জাদুমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়। তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।

এখানে যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়। কবির সাহিত্যিক কাব্য যে ছন্দ ও ভাষাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় সে একান্তই তার নিজের আয়ত্তাধীন। কিন্তু যেখানে বহু লোককে নিয়ে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকার্যের বিশুদ্ধতা-রক্ষা সম্ভব হয় না। মানবসমাজে এইরকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্যা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর-হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না।

জানি নে আর কখনো উপলক্ষ হবে কি না, তাই আজ আমার আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। তাই নিজেকে দেখতে হয় অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে। আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি 'পশ্য দেবস্য কাব্যম্', মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার ; তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়। যাঁরা প্রথম অবস্থায় আমাকে এই আশ্রমের মধ্যে দেখেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ জানেন এই আশ্রমের স্বরূপটি আমার মনে কিরকম ছিল। তখন উপকরণবিরলতা ছিল এর বিশেষত্ব। সরল জীবনযাত্রা এখানে চার দিকে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান করেছি তখন তাঁকে দেখা সহজ ছিল কর্মে। কেননা, কর্ম ছিল সহজ, দিনপদ্ধতি ছিল সরল, ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প, এবং অল্প যে-কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন, এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ— এই অক্ষরপুরুষে আকাশ ওতপ্রোত। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্— সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয় মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বুদ্ধিতে নয় আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থদৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জ্বলতা।

সেই একদিন তখন বালক ছিলাম। জানি নে কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল। যদিও সে আলোক প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতায় অনতিবিলম্বে বিলীন হয়ে গেল, তবু মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদয়াচলে সেই জ্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম। এই আশ্রমে একদিন যে যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেখানকার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে 'অতিথিদেবো ভব'। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা। কর্মসফলতার অহংকার মনকে অধিকার করে নি তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম করে উদ্‌বেল হয়েছে আত্মোৎসর্গের চরিতার্থতা। এখানে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি

বুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধিকে নিষ্কাম সাধনায় সম্মিলিত করতে।

সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে এখানে আমি শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখবার শুভ অবকাশ ব্যর্থ করি নি। বার বার কামনা করেছি—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৭

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

ওঁ

বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন —

আমার কাছে আমার ছবি একখানাও নাই, অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। Hop Sing কোম্পানী আমার ছবি তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে পাইতেও পারেন।

আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবনচরিত লিখিবার কহিবার যোগ্য নহে।

আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ। ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাইয়াছি। নিতান্তই লেখার তাড়না ছিল তাহার শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি, যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী পত্রিকা বাহির হয়। প্রথমতঃ এই পত্রিকায় আমার গদ্য লেখার অভ্যাস হয়।

আমার ১৭ বছর বয়সে মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাই — এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। ঐ লণ্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপক হেনরী মর্লির ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলাম।

এক বৎসরের কিছু উপরকাল বিলাতে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসি। তাহার পরে উত্তরোত্তর নানা রকম লিখিতে শুরু করি — দেশে আমার আদর লাভ হয়। এই সময়কালের মধ্যে সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ২৩

বৎসর বয়সে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়।

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, চিত্রা ও নদী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগুলি পরে পরে বাহির হইয়াছে। তাহাদের প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি আমার মনে নাই।

সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন — চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয় কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত — কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র বড়াল প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হইবার কিছু দিন পরে একবৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদকভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই, অল্পবয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।

এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন - তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুরমাত্রও কোনোদিন দেখি নাই - তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোমান্‌ক্যাথলিক খৃষ্টানধর্ম্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। গোড়াকারই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ লাভপ্রদ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের দুই এক বৎসর চলার পর ১৩০৯ সালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

তাহার পর দশবৎসর চালাইয়া তাহার সমস্ত খরচ যোগাইয়া করিয়াছি। এক্ষণে বিদ্যালয় লইয়া নিযুক্ত আছি।

উপাধ্যায় মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন - কিছুকাল ইহাতে তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমার কাব্যগ্রন্থাবলী নিজের ভাবে Edit করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে বিষয় ভেদ অনুসারে আমার সমস্ত কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

— ৮ —

আমার জীবন ও লেখার ইতিহাস সংক্ষেপে উপরে লিখিয়া দিলাম। সব তারিখের কোনো ঠিক পাইনা। আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়াছিলেন - তখন বোধ হয় আমার বয়স ১১/১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই একবৎসর পূর্ব্বে আমার

পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃত-
সর হইতে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে ভ্রমণ
করিতে যান — সেই আমার বাহিরের
জগতের সহিত প্রথম পরিচয়।
সেই ভ্রমণটি আমার জীবনের মধ্যে
নিঃসন্দেহ সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া
ছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের
সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার
নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃতভাষা
শিক্ষা করিতাম এবং মুখে মুখে
জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র
পরিচয়ে আমার অনেক সময় কাটিত।
এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত
প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া-
ছিলাম ইহাতেই যখন আবার
বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন
হইয়া গেল। এই অল্প বয়সে বিদ্যা
স্কুলত্যাগ করিয়া তাহার শাস্তি দিতেছি-
এখন আমার আর পাণ্ডিত্যের
পথ নাই- অগত্যাও পাইয়াছি
সর্ব্বদাই পাণ্ডিত্যের পথ না
ঘেঁষে সেইজন্যে আমার বুদ্ধি +
ইতি ২৮ শে ভাদ্র ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের স্বরূপ

কবিতা ব্যাপারটা কী, এই নিয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে ফর্মাশ এসেছে।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই কোথাও কোথাও করেছি। সেটা অন্তরের উপলব্ধি থেকে ; বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়। কবিতা জিনিসটা ভিতরের একটা তাগিদ, কিসের তাগিদ সেই কথাটাই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। যা উত্তর পেয়েছি সেটাকে সহজ করে বলা সহজ নয়। ওস্তাদমহলে এই বিষয়টা নিয়ে যে-সব বাঁধা বচন জমা হয়ে উঠেছে, কথা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায় ; নিজের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ঐগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।

গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় 'সুন্দর' কথাটা নিয়ে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। কনে দেখবার বেলায় বরের অভিভাবক যে আদর্শ নিয়ে কনেকে দাঁড় করিয়ে দেখে, হাঁটিয়ে দেখে, চুল খুলিয়ে দেখে, কথা কইয়ে দেখে, সে আদর্শ কাব্যযাচাইয়ের কাজে লাগাতে গেলে পদে পদেই বাধা পাওয়া যায়। দেখতে পাই, ফল্‌স্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফল্‌স্টাফকে বাদ দিলে। দেখা গেল, সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে, কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান— তার যত বড়ো লাঙ্গুল তত বড়োই সে মর্যাদা পেয়েছে। এইরকম সংশয়ের সময়ে কবির বাণী মনে পড়ে, Truth is beauty, অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি— জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব— যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে অগ্নিশর্মা হয়ে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত। আমাদের কালো-কালো আধবুড়ো নীলমণি চাকরটা, যে মানুষ এক বুঝতে আর বোঝে, এক করতে আর করে, বকলে ঈষৎ হেসে বলে 'ভুল হয়ে গেছে', সে বেনারসি-জোড় প'রে বরবেশে এলে দৃশ্যটা কিরকম হয় সে কথা তুচ্ছ, কিন্তু সে অনেক বেশি বাস্তব অনেক নামজাদার চেয়ে এই প্রসঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। অর্থাৎ, যদি কবিতা লেখা যায় তবে এ'কে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ককে করার চেয়ে। খুব বেশি চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব। ঠিক কী গুণে যে, তা বিশ্লেষণ করে বলা কঠিন। বলা যেতে পারে, তারা জৈব, তারা organic ; তাদের আত্মসাৎ করতে রুচি বা ইচ্ছার বাধা থাকতে পারে, অন্য বাধা নেই। যেমন ভোজ্য পদার্থ, তাদের কোনোটা তিতো, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা কটু ; ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও তাদের সকলেরই মধ্যে একটা সাম্য আছে— তারা জৈবিক, দেহতন্তুর নির্মাণে তারা কাজে লাগবার উপযোগী। শরীরের পক্ষে তারা হাঁ-এর দলে, স্বীকৃতির দলে, না-এর দলে নয়।

সংসারে আমাদের সকলেরই চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে— এই বাস্তবদের আবেষ্টন ; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে, বিস্তীর্ণ হয়েছে ;

তারা কেবল মানুষ নয়, তারা কুকুর বেড়াল ঘোড়া টিয়েপাখি কাকাতুয়া, তারা আসশেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুর, তারা গোঁসাইপাড়ার পোড়ো বাগানে ভাঙাপাঁচিল-ঘেঁষা পালতে-মাদার, গোয়ালঘরের আঙিনায় খড়ের গাদার গন্ধ, পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটে যাওয়ার গলি রাস্তা, কামারশালার হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ, বহুপুরোনো ভেঙেপড়া ইঁটের পাঁজা যার উপরে অশথগাছ গজিয়ে উঠেছে, রাস্তার ধারের আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাসপাশার আড্ডা, আরো কত কী— যা কোনো ইতিহাসে স্থান পায় না, কোনো ভূচিত্রের কোণে আঁচড় কাটে না। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর চারি দিক থেকে নানা ভাষায় সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল। ভাষার বেড়া পেরিয়ে তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় খুশি হয়ে বলি 'বাঃ বেশ হল', অর্থাৎ মিলছে প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাজাবাদশা আছে, দীনদুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে, সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে ; এইসঙ্গে আছে অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, কোনো কালে বিধাতার হাত পড়ে নি যাদের উপরে, প্রাণীতত্ত্বের সঙ্গে শরীরতত্ত্বের সঙ্গে যাদের অস্তিত্বের অমিল, প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর। আর আছে তারা যারা ঐতিহাসিকতার ভড়ং ক'রে আসরে নামে, কারও-বা মোগলাই পাগড়ি, কারও-বা যোধপুরী পায়জামা, কিন্তু যাদের বারো-আনা জাল ইতিহাস, প্রমাণপত্র চাইলে যারা নির্লজ্জভাবে বলে বসে 'কেয়ার করি নে প্রমাণ— পছন্দ হয় কি না দেখে নাও'। এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা— দুঃখ-সুখ বিচ্ছেদ-মিলন লজ্জা-ভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা। এরা তৈরি করে সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল— এইখানে রৌদ্রবৃষ্টি, এইখানে আলো-অন্ধকার, এইখানে কুয়াশার বিড়ম্বনা, মরীচিকার চিত্রকলা। বাইরে থেকে মানুষের এই আপন ক'রে-নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার-সঙ্গে-মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী— বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক— এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর, ভালো মন্দ, সংগত অসংগত, সুরওয়ালা এবং বেসুরো, সবই আছে ; যখনই নিজের মধ্যেই তারা এমন সাক্ষ্য নিয়ে আসে যে তাদের স্বীকার করতে বাধ্য হই, তখনই খুশি হয়ে উঠি। বিজ্ঞান ইতিহাস তাদের অসত্য বলে বলুক, মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব, সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

বিষয়ের বাস্তবতা-উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর-একটা দিক আছে, সে তার শিল্পকলা। যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করতে চাই। যা প্রমাণযোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। 'খুশি হয়েছি' এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গি। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই-কাজে। এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হলে চলে না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।

অনেক সময়ে এই শিল্পকলা শিল্পিতকে ডিঙিয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই মুখ্য করে তোলে। কেননা, তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রেরণা। লীলায়িত অলংকৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়— সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে। বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝংকারের তির্যক ভঙ্গিতে, যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে। কিন্তু ছন্দের নেশা, ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা, অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে ; গদ্‌গদ আবিলতা নামে ভাষায়— স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।

শেষ কথা হচ্ছে ; Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়। কাব্যের রূপ যদি ট্রুথ-রূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয় তা হলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে। মন ভোলাবার আসরে তার অলংকারপুঞ্জ যদি-বা অত্যন্ত গুঞ্জরিত

হয়, অর্থাৎ সে যদি মুখর ভাষায় সুন্দরের গোলামি করে, তবু তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে। আর এতেই যারা বাহবা দিয়ে ওঠে, রূঢ় শোনালেও বলতে হবে, তাদের মনের ছেলেমানুষি ঘোচে নি।

শেষকালে একটা কথা বলা দরকার বোধ করছি। ভাবগতিকে বোধ হয়, আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে 'যা-তা'। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে নিজের বাছাই-করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চার-পাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্য-বর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।

পাড়ায় মদের দোকান আছে, সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুরাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দেবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেন নি— অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি— কেননা, আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যত দূরে ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে, কল্পনার পরশমণিস্পর্শে, মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, সুধাপানসভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে, ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে 'হাঁ, কবি বটে', বলবে 'একেই তো বলে রিয়ালিজম্'।— আমি বলছি, বলে না। রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তা-ভরা আদিরস করুণরস এবং বীভৎসরসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড়দুটো এক ঘাটে একসঙ্গে আছাড় খেয়ে খেয়ে নির্মল হয়ে উঠছে, অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ বিষয়টা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানানসই হতে পারে। কিন্তু বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজ্‌ম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করুন, রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক ব'লে নয়, কবিতা বলেই। পূর্বোক্ত বিষয়টা যদি পছন্দ না হয় তো আর-একটা বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি— বহু দিনের বহুপদাহত ঢেঁকির আত্মকথা। প্রাচীন যুগে অশোক গাছে সুন্দরীর পদস্পর্শ -ব্যাপারের চেয়েও হয়তো একে বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন, বিশেষত যদি চরণপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়। আর যদি শুকিয়ে-পড়া খেজুর গাছের উপর কিছু লিখতে চান তা হলে বলতে পারবেন, ঐ গাছ আপন রসের বয়সে কত ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের নেশার সঞ্চার করেছে— তার মধ্যে হাসিও ছিল, কান্নাও ছিল, ভীষণতাও ছিল। সেই নেশা যে শ্রেণীর লোকের তার মধ্যে রাজাবাদশা নেই, এমন-কি, এম· এ· পরীক্ষার্থী অন্যমনস্ক তরুণ যুবকও নেই যার হাতে কব্জী-ঘড়ি, চোখে চশমা এবং অঙ্গুলিকর্ষণে চুলগুলো পিছনের দিকে তোলা। বলতে বলতে আর-একটা কাব্যবিষয় মনে পড়ল। একটুকু-তলানি-ওয়ালা লেবেল-উঠে-যাওয়া চুলের তেলের নিশ্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে তার হারা জগতের অন্বেষণে, সঙ্গে সাথি আছে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি আর শেষ ক্ষয় ক্ষয়ে-যাওয়া সাবানের পাতলা টুকরো। কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'আধুনিক রূপকথা'। তার ভাঙা ছন্দে এই দীর্ঘনিশ্বাস জেগে উঠবে যে, কোথাও পাওয়া গেল না সেই খোয়ানো জগৎ। এই সুযোগে সেদিনকার দেউলে অতীতের এই তিনটি উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে; বলতে পারে, 'শৌখিন মরীচিকার ছদ্মবেশ প'রে বাবুয়ানার অভিনয় করত ঐ মহাকালের

নাট্যমঞ্চের সঙ— আজ নেপথ্যে উঁকি মারলে তাকে আর চেনাই চায় না ; এমন ফাঁকির জগতে সত্য যদি কাউকে বলা যায় তবে তার প্রতীক বাজার-দরের বাইরেকার আমরা ক'টিই, এই তলানিতেলের শিশি, এই দাঁতভাঙা চিরুনি আর ক্ষয়ে-যাওয়া পাতলা সাবানের টুকরো ; আমরা রীয়ল, আমরা ঝাঁটানি-মালের ঝুড়ি থেকে আধুনিকতার রসদ জোগাই। আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায়, নটে গাছটি মুড়িয়েছে।' কালের গোয়ালঘরের দরজা খোলা, তার গোরুতে দুধ দেয় না, কিন্তু নটে গাছটি মুড়িয়ে খায়। তাই আজ মানুষের সব আশাভরসা-ভালোবাসার মুড়োনো নটে গাছটার এত দাম বেড়ে গেছে, কবিত্বের হাটে। গোরুটাও হাড়-বের করা, শিঙভাঙা, কাকের-ঠোকর-খাওয়া-ক্ষতপৃষ্ঠ, গাড়োয়ানের মোচর খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল-ল্যাজ-ওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তা হলে মিডভিক্টোরীয়-যুগবর্তী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।

বৈশাখ ১৩৪৫

সাহিত্যের মাত্রা

বর্তমান যুগে পূর্ব যুগের থেকে মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না। এখনকার মানুষ জীবনের যে-সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তাপ্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এইজন্যে তার মননবস্তু জমে উঠেছে বিচিত্র রূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ স্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেক কালে তাঁতি যখন কাপড় তৈরি করত তখন চরকায় সুতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্যন্ত সমস্তই সরল গ্রাম্য জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্যপদ্ধতিতে চলছে প্রভূত পণ্য-উৎপাদন। তার জন্য প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির দরকার। চার দিকের মানবসংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এইজন্যে এক-একটা কারখানার শহর পরিস্ফীত হয়ে উঠছে, ধোঁয়াতে কালিতে যন্ত্রের গর্জনে ও আবর্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেইসঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েছে মজুর-বস্‌তি। এক দিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্য দিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানাঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক, আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানাহাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারছে না। এই অপ্রাণপদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোণঠাসা করে। উপন্যাসসাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। বলতে পার, বর্তমানে এটা অপরিহার্য ; তাই বলে বলতেপার না, এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, তাই বলে বলতে পার না, সেটাই লোকালয়।

এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে, সে কথা অস্বীকার করব না। তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলছে। চসর্-এর 'ক্যান্টরব্‌রি টেল্‌স্'এ তখনকার কালের মানবসংসারের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এখনকার মানুষের মধ্যে যে সেই পরিচয় একেবারেই নেই তা নয়। অনুভবের দিকে অনেক পরিমাণে আছে, কিন্তু চিন্তায় মানুষ তার সেদিনকার গণ্ডি অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা যায়, তখন ভাবে চলায় বলায় সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসংগত হবে। তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্‌গত হয়ে

উঠবেই। অতএব, আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রসসম্ভোগের যে নিয়ম আছে তা মানুষের নিত্যস্বভাবের অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না, সজীব মানব-চরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক। কিন্তু কালের গতিকে আমার সেই ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্‌সে। তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ ক'রে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্‌সের বচন শুনতে পেলে পুলকিত হয়ে ওঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি নে। অবশ্য গল্পে পলিটিক্‌স্‌প্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিক্‌সের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে প'ড়ে চরিত্ররচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। চরিত্রসৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশি চড়াও হয়ে উঠেছে তার কারণ, আধুনিক কালে জীবনসমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত। এইজন্যে তাকে খুশি করতে দরকার হয় না যথার্থ সাহিত্যিক হবার। প্রহ্লাদ বর্ণমালা শেষবার শুরুতেই ক অক্ষরের ধ্বনি কানে আসবামাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করেই অভিভূত হয়ে পড়ল। তাকে বোঝানো আবশ্যক যে, বিশুদ্ধ বর্ণমালার তরফ থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, ক অক্ষর কৃষ্ণ শব্দেও যেমন আছে তেমনি কোকিলেও আছে, কাকেও আছে, কলকাতাতেও আছে। সাহিত্যে তত্ত্বকথাও তেমনি, তা নৈর্ব্যক্তিক ; তাকে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে চরিত্রের বিচার আর এগোতে চায় না। সেই চরিত্ররূপই রসসাহিত্যের, অরূপ তত্ত্ব রসসাহিত্যের নয়।

মহাভারত থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে। এটা স্পষ্টই দেখা যায়, ভীষ্মের চরিত্র ধর্মনীতিপ্রবণ— যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথাপরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনো-এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতিপ্রবল ছিল। এইজন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়। এখনকার উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করো। মুশকিল এই যে, এই-সকল নীতিকথা তখনকার কালের চিত্তকে যেরকম সচকিত করেছিল এখন আর তা করে না। এখনকার বুলি অন্য, সেও কালে পুরাতন হয়ে যাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যে যে-কোনো তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও, সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে তাকে মাপ করা চলবে না। ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয় নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সৎকথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠতার কোনো কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিকরূপে সুসংগত করে সাজানো হয় নি, অর্থাৎ কোনো-একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁত প্রমাণ দেবার কাজে তিনি পাঠক-আদালতে সাক্ষীরূপে দাঁড়ান নি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদি-বা শাস্ত্রিক বুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্মনৈতিক। তার পরে বিশেষ উপলক্ষে রামচন্দ্র সীতা সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকে নি। বাঙালি

সমালোচক যেরকম আদর্শের ষোলো-আনা উৎকর্ষ যাচাই করে সাহিত্যে চরিত্রের বিচার করে থাকে সে আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনো-একটা মতসংগতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানান নি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে ; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রব্‌লেম। সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তাঁর অগ্নিপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে ঐ জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনো মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

আজকের দিনের একটা সমস্যার কথা মনে করে দেখা যাক। কোনো পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রী মুসলমানের ঘরে অপহৃত হয়েছে। তার পরে তাকে পাওয়া গেল। সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রব্‌লেম্‌টাকে নিয়ে আপন কক্ষের সমর্থনরূপে তাঁদের নভেলে লম্বা লম্বা তর্ক স্তূপাকার করে তুলতে পারেন। এরকম অত্যাচার কাব্যে গর্হিত কিন্তু উপন্যাসে বিহিত, এমনতরো একটা রব উঠেছে। খাঁটি হিঁদুয়ানি রক্ষার ভার হিন্দু মেয়েদের উপর কিন্তু হিন্দু পুরুষদের উপর নয়, সমাজে এটা দেখতে পাই। কিন্তু হিঁদুয়ানি যদি সত্য পদার্থই হয় তবে তার ব্যত্যয় মেয়েতেও যেমন দোষাবহ পুরুষেও তেমনি। সাহিত্যনীতিও সেইরকম জিনিস। সর্বত্রই তাকে আপন সত্য রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবি করবই ; অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে, তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক্‌, তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে। নভেলে কোনো-একজন মানুষকে ইন্‌টেলেকচুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্‌টেলেকচুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম এ· পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র করে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থিসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী। কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ মুসলমানের ঘর থেকে প্রত্যাহৃত স্ত্রীকে আপন স্বভাব অনুসারে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, গল্পের বইয়ে তার নেওয়াটা বা না-নেওয়াটা সত্য হওয়া চাই, কোনো প্রব্‌লেমের দিক থেকে নয়।

প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে, এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য, সার্থকতা, তার শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবর্দস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি, এই পালোয়ানি বিস্ময়কর কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, সুন্দর তো নয়ই। এই পালোয়ানি সীমালঙ্ঘন করবার দিকে তাল ঠুকে চলে, দুঃসাধ্য-সাধনও করে থাকে, কিন্তু এক জায়গায় এসে ভেঙে পড়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। সভ্যতা স্বভাবকে এত দূরে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলই পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলই সে করছে পালোয়ানি। প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে তার সমস্ত বোঝা এবং স্তূপাকার হয়ে পড়ছে তার আবর্জনা। অর্থাৎ, মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলছে। আজ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কিছুতেই তাল পৌঁচচ্ছে না শমে। এতদিন দুন-চৌদুনের বাহাদুরি নিয়ে চলছিল মানুষ, আজ অন্তত অর্থনীতির দিকে বুঝতে পারছে বাহাদুরিটা সার্থকতা নয়— যন্ত্রের ঘোড়দৌড়ে একটা একটা করে ঘোড়া পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে। জীবন এই আর্থিক বাহাদুরির উত্তেজনায় ও অহংকারে এতদিন ভুলে ছিল যে, গতিমাত্রার জটিল অতিকৃতির দ্বারাই জীবনযাত্রার আনন্দকে সে পীড়িত করছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আধুনিক অতিকায় সংসার, প্রাণের ভারসাম্যতত্ত্বকে করেছে অভিভূত।

পশ্চিম-মহাদেশের এই কায়াবহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা ক'রে

ইনটেলেক্‌চুয়েল কসরতের কাজে লেগেছে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ, এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়করূপে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল; প্রয়োজন-সাধকও হতে পারে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবান নয়। পৃথিবীর অতিকায় জন্তুগুলো আপন অস্থিমাংসের বাহুল্য নিয়ে মরেছে, এরাও আপন অতিমিতির দ্বারাই মরছে। প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা। লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না; লোভ 'উপকরণবতাং জীবিতং' যা তাকেই জীবিত বলে, অমৃতকে বলে না। উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্যে। তার হঠাৎ-নবাবি আপন ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল অত্যাড়ম্বরে; সেটা যথার্থ আভিজাত্য নয়, সেটা স্বল্পায়ু মরণধর্মী। মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত। ওর মধ্যে থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্যভাবে গৌণ। রঘুবংশকাব্যে কালিদাস স্পষ্টই আপন উদ্দেশ্যের কথা ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। রাজধর্মের কিসে গৌরব, কিসে তার পতন, কবিতায় এইটের তিনি দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এইজন্য সমগ্রভাবে দেখতে গেলে রঘুবংশকাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মতো তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই। কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রবলেম হিসাবে ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পরে স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্‌লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্‌লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। প্রব্‌লেমের গ্রন্থি-মোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট্‌ এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়।

তোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা গোরা ঘরে-বাইরে প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ করেছ। নিজের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার নেই, তাই বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারব না। আমার এই দুটি নভেলে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে। আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। গোরা-গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক-না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্‌লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে, জোড়াতাড়া জিনিস সাহিত্যে বেশিদিন টিকবে না। প্রথমত আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তার পরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তা হলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জনারূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। ইব্‌সেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি। কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে। মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস; বুদ্ধিবিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। তখনো সাহিত্য যদি তাকে ধরে রাখে তা হলে মৃতের বাহন হয়ে তার দুর্গতি ঘটে। প্রাণ কিছু পরিমাণে অপ্রাণকে বহন করেই থাকে— যেমন আমাদের বসন, আমাদের ভূষণ, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে রফা করে চলবার জন্যে তার ওজন প্রাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেছে অতিপরিমাণে; সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেও সেই দশা। আপন প্রবল গতিবেগে য়ুরোপ এই প্রভূত বোঝা আজও বইতে পারছে, কিন্তু বোঝার চাপে এই গতির বেগ ক্রমশ কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। অসংগত অপরিমিত প্রকাণ্ডতা প্রাণের কাছ থেকে এত বেশি মাশুল আদায় করতে থাকে যে, একদিন তাকে দেউলে করে দেয়।

শ্রাবণ ১৩৪০

সাহিত্যে আধুনিকতা

সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এরকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে, যদি তার সজীবতা না থাকে। এবারে আমারই পুরোনো তর্জমা ঘাঁটতে গিয়ে এ কথা বার বার মনে হয়েছে। তুমি বোধ হয় জান, বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তারই গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধ-ক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্তি— তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয় তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের দশা ঘটে, মিল্টনের পর ড্রাইডেন-পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসিবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল— তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয় নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে কেবল বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যসম্পদও আপন উদ্ভবস্থানকে অতিক্রম ক'রে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, যদি তাতে আতিথ্যধর্ম না থাকে, তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই উপভোগ্য হোক-না কেন, সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে ইংরাজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বজাতিক লোহার সিন্ধুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসিবিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্মই হোক, রাজশক্তিই হোক, যা-কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা-কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায়, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ; সে মুক্তদ্বার-সাহিত্য সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য; সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতির ও পরজাতির মর্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্বত্র সর্ব বিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা, তাদেরই ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠছিল; সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয়স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলে না।

তার পর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে— প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয়, যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠছে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখি নে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম— অকস্মাৎ দেখতে পাই, সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত

হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠছে ; হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন্ প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন-কি, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্বরতাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের আভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই-যে আপন মনুষ্যত্বের খর্বতা মাথা হেঁট করে স্বীকার করছে, আত্মরক্ষার উপায়রূপে নির্মাণ করছে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করছে না। ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বিদেশীরা যে নিঃসংকোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আজ কি তা আর আছে। এ কথা বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য ; কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর-নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে তোলে ; তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্বমানবের চিত্তক্ষেত্রে।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বলতে পারি তা আমার ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থাকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলছি— অথবা তাও নয়, একজনমাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলছি— আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণ হবে যে, এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাকতে পারে কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে। বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি ; তার মধ্যে এমন উদ্‌বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে ; এর কাছে এমন বাণী পাই নে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারই বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই-একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা বললে অন্যায় হবে।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময় একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য, যে প্রেম, যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্‌বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই ; কোনো আইন্‌স্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না

'বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন'। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে যদি পূজনীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধ। সাহিত্য সর্ব দেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ-বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে, বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী-ভাবে নূতন। যে তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদির রসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারি নে—

> জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন ন গেল—

তাকে যেন সত্যই নূতন ব'লে ভ্রম না করি, সে আপন সদ্যজন্মমুহূর্তে আপনই জরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তার আয়ুঃস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।

মাঘ ১৩৪১

কাব্য ও ছন্দ

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে— এ কথা স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। পদ্যের ভাষাবিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয়, সে গৃহীর থেকে পৃথক; ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে— নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে, আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয়— যে কাপড়ে বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে, স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে; আর-এক হচ্ছে, পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ

চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারে অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা, প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন, যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহু দূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ, লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায়, পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ির সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না— এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বে প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য— কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল ? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা— পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি, তার হাজার প্রমাণ আছে ; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে ; আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মন-ভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে, এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায়, আসল কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়— এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে ; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

১২ নভেম্বর ১৯৩৬ পৌষ ১৩৪৩

গদ্যকাব্য

কতকগুলি বিষয় আছে যার আবহাওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিছুতেই সহজে প্রতিভাত হতে চায় না। ধরা-ছোঁওয়ার বিষয় নিয়ে তর্কে আঘাত-প্রতিঘাত করা চলে। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন অনির্বচনীয়ের কোঠায় এসে পড়ে তখন কী উপায়ে বোঝানো চলে তা হৃদ্য কি না। তাকে ভালোলাগা মন্দলাগার একটা সহজ ক্ষমতা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাকে বলা যেতে পারে সাধনদুর্লভ, তাকে পাওয়ার বাঁধা পথ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। সহজ ব্যক্তিগত রুচি-অনুযায়ী বলতে পারি যে, এই আমার ভালো লাগে।

সেই রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র ব্যাপক ও সূক্ষ্মবোধশক্তিমান হয় তা হলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভসম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁচেছে কি না তাও মেনে নিতে অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে যে মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, 'মতের অধিকার নেই আমার।' সাহিত্য ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেইজন্যে রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে। তাই বররুচির আক্ষেপ মনে পড়ে, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ। স্বয়ং কবির কাছে অধিকারীর ও অনধিকারীর প্রসঙ্গ সহজ। তাঁর লেখা কার ভালো লাগল, কার লাগল না, শ্রেণীভেদ এই যাচাই নিয়ে। এই কারণেই চিরকাল ধরে যাচনদারের সঙ্গে শিল্পীদের ঝগড়া চলেছে। স্বয়ং কবি কালিদাসকেও এ নিয়ে দুঃখ পেতে হয়েছে, সন্দেহ নেই ; শোনা যায় নাকি, মেঘদূতে স্থূলহস্তাবলেপের প্রতি ইঙ্গিত আছে। যে-সকল কবিতায় প্রথাগত ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করা হয় সেখানে অন্তত বাইরের দিক থেকে পাঠকদের চলতে ফিরতে বাধে না। কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ কোনো রসের অনুসন্ধানে কবি অভ্যাসের পথ অতিক্রম করে থাকে। তখন অন্তত কিছুকালের জন্য পাঠকের আরামের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে তারা নূতন রসের আমদানিকে অস্বীকার করে শাস্তি জ্ঞাপন করে। চলতে চলতে যে পর্যন্ত পথ চিহ্নিত হয়ে না যায় সে পর্যন্ত পথকর্তার বিরুদ্ধে পথিকদের একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেই অশান্তির সময়টাতে কবি স্পর্ধা প্রকাশ করে ; বলে, 'তোমাদের চেয়ে আমার মতই প্রামাণিক।' পাঠকরা বলতে থাকে, যে লোকটা জোগান দেয় তার চেয়ে যে লোক ভোগ করে তারই দাবির জোর বেশি। কিন্তু ইতিহাসে তার প্রমাণ হয় না। চিরদিনই দেখা গেছে, নূতনকে উপেক্ষা করতে করতেই নূতনের অভ্যর্থনার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিছুদিন থেকে আমি কোনো কোনো কবিতা গদ্যে লিখতে আরম্ভ করেছি। সাধারণের কাছ থেকে এখনই যে তা সমাদর লাভ করবে এমন প্রত্যাশা করা অসংগত। কিন্তু সদ্য সমাদর না পাওয়াই যে তার নিষ্ফলতার প্রমাণ তাও মানতে পারি নে। এই দ্বন্দ্বের স্থলে আত্মপ্রত্যয়কে সম্মান করতে কবি

বাধ্য। আমি অনেকদিন ধরে রসসৃষ্টির সাধনা করেছি, অনেককে হয়তো আনন্দ দিতে পেরেছি, অনেককে হয়তো-বা দিতে পারি নি। তবু এই বিষয়ে আমার বহুদিনের সঞ্চিত যে অভিজ্ঞতা তার দোহাই দিয়ে দুটো-একটা কথা বলব ; আপনারা তা সম্পূর্ণ মেনে নেবেন, এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই।

তর্ক এই চলেছে, গদ্যের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কি না। এতদিন যে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে এবং সে দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্যকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন, করে ; আমি মনে করি, করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যানমাত্র— কাব্য-বিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন, কারণ এ তো অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ কথা মানতেই হবে যে, সলোমনের গান, ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।

যজুর্বেদে যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাকে আমরা পদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান তা নয়, ধ্বনিমানও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন, কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।

একদা কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন-কি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ ক'রে এমন-সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন তখন সে কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।

মনে পড়ে, একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, 'ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।' সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনার চেষ্টা করেছিলুম 'লিপিকা'য় ; অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। 'লিপিকা' লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি বলেই।

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে ; তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেইজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন-কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য-অতিলালিত্যের মাদকতা

থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে, ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম— অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।

আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে-একজন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্যকবিতার রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল। এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে। আবার ধরুন, এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি। কথা উঠতে পারে, গদ্যকাব্য কী। আমি বলব, কী ও কেমন জানি না, জানি যে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক, তাকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।

শান্তিনিকেতন। ২৯ আগস্ট, ১৯৩৯ — মাঘ ১৩৪৬

সাহিত্যবিচার

সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন-আদালতে বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয়, তার আপিল-আদালতের রায়ও তথৈবচ। এ স্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে, শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্যপরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর-কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না; তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভান করে থাকেন; কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়— ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিতমত যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহির করেন তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুরস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই; তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে, বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে; গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়রও নিষ্কৃতি

লাভ করেন নি। পণ্যের মূল্যনির্ধারণকালে ঝগড়া করে তর্ক করে, কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এ স্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তা হলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্পনিপুণ হয় তা হলে মানদণ্ডই সাহিত্যভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার ; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই, কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠক-সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপ্‌লিঙের মরসুম। এমন নয় যে, ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসংঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হতে থাকে, অবশেষে কখন একসময় ঋতুপরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারে এরকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান করে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ লাগা মরসুম হতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এইরকম বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সর্ষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সর্ষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি, যেন আমি, অন্তত কোথাও কোথাও, আধুনিক পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে, যখন আমি 'ক্ষণিকা' লিখেছিলেম তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তা হলে কারও বলতে বাধত না যে, ঐ-সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনামহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য, কেননা লিরিক-কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমারসভা' ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ— কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।...

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে

ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়— এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি, তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালি পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি। মুশকিল এই যে, বাঙালি কাউকে কোনো-একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য-আলোচনাসভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব, সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এ-সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি, বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে, সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি চ'ড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি ব'লে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশে আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদীবংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নীচে পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এরা-অল্প কালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে, তার পরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ কথা সত্য, এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে, অন্তত আমাদের কালে, একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়োলোকের প্রহসন অভিনয় করি নি। অতএব, আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ প'ড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন, বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এরকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে 'তরুণ' শব্দটা এইরকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এইরকম জাতে-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কো গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পঙ্‌ক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই, এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে 'গল্পগুচ্ছ' বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্ব নেই। জাতে-ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয়, এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি, সেইজন্য যদি ব'লে বসি 'যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে', তা হলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না— সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তা হলে বলতে হয়, যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে।...

শান্তিনিকেতন। ১৩৪৭ ? আষাঢ় ১৩৪৮

সাহিত্যের মূল্য

সেদিন অনিলের সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যের আদর্শের নিরন্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেম ; সেইসঙ্গে বলেছিলেম যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন, কালে কালে সেই ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেজন্য তার ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতার কেবলই তারতম্য ঘটতে থাকে। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক।

আমার মতো গীতিকবিরা তাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ ক্রমশই শুষ্ক নদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এইজন্য রসের ব্যাবসা সর্বদা ফেল হবার মুখে থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর-একটা দিক আছে, যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়— তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা-কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেক্‌স্‌পীয়রে লুক্রিস এবং ভিনস অ্যান্ড্ অ্যাডোনিসের কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে, সে কথা সাহস করে বলি বা না বলি ; কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথ অথবা কিং লীয়র অথবা অ্যান্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তা হলে বলব, তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেক্‌স্‌পীয়র মানব-চরিত্রে চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি, কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে, তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই ; কিন্তু সখী-পরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনো যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে ; মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি, সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে,

কিন্তু রইল তার ভাঁড়ুদত্ত। মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রীম নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে, কিন্তু ফল্‌স্টাফের প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।

জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য— ধন্য ডন কুইক্‌সট, ধন্য রবিন্‌সন ক্রুসো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে ; আঁকা পড়ছে, জীবনশিল্পীর রূপরচনা। কোনো-কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো-কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ ক'রে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্বমাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনা-কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তা হলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না। 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে—

তোমার ওই মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতন। দুপুর। ২৫ এপ্রিল ১৯৪১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয় তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। তার কোনোটা-বা ফিকে হয়ে এসেছে ; ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নপত্র তার আপন কালের স্রোতের সীমানায়, তার বাইরে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না। আর কতকগুলি আছে চিরকালের মতন সকল মানুষের চোখের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে। আমরা একটি ছবির সঙ্গে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্যে নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এত বড়ো মিথ্যা ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়। কিন্তু যে লক্ষ্মণ আপন হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে অমিল হলে অধৈর্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতেন শাস্ত্রের উপদেশ এবং দাদার পন্থার অনুসরণ, অথচ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নিষ্ঠুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যার মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই— সেই সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ছবি তাঁর দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ও দিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই, অথচ কৌরবসভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীক মাত্র হয়ে। ও দিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার, অথচ অতিসাধারণ মানুষের মতন বার বার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত। এ দিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক ; এত নিখুঁত যে, সে কেবল কথাই কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না। অপর পক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি

মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি— মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা বুলোনো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।

রূপসাহিত্যে তাই যখন দেখি, কবি তাঁর নায়কের পরিমাণ বাড়িয়ে বলবার জন্যে বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেছেন, আমরা তখন স্বতই সেটাকে শোধন করে নিই। আমাদের সত্যলোকের ভীম কখনোই তালগাছ উপড়ে লড়াই করেন নি, এক গদাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। রূপের রাজ্যে মানুষ ছেলে ভুলিয়েছিল যে যুগে মানুষ ছেলেমানুষ ছিল। তার পর থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বটে কিন্তু কালের হাতে ছাঁকাই পড়ে মনের মধ্যে তার সত্য রূপটুকু রয়ে গেছে। তাই হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাই নে, কেননা আমাদের দৃষ্টির বদল হয়ে গেছে।

রসের ভোজেও এই কথা খাটে। সেখানে সেই ভোজে, যেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই। শিশু কৃষ্ণ চাঁদ দেখবার জন্য কান্না ধরলে পর যে সাহিত্যে তার সামনে আয়না ধ'রে তার নিজের ছবি দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিল সেখানে এই রচনানৈপুণ্যে ভক্তরা যতই হায় হায় করে উঠুক, শিশুবাৎসল্যের এই রসের কৃত্রিমতা কোনো দেশের অভ্যাসের আসরে যদি-বা মূল্য পায়, মহাকালের পণ্যশালায় এর কোনো মূল্য নেই। এই কাব্যের কৃত্রিমতার কুস্বাদ যদি বদল করতে চাও তা হলে এই কবিতাটি পড়ো—

দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ,
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান॥
কহে, শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী,
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রানী দিল পুরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
হেরি হরষিত ভেল মায়॥

নন্দ দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড, উথলিল মহানন্দ,
সঘনে দেই করতালি॥
দেখো দেখো রোহিণী, গদ গদ কহে রানী,
যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।
ঘনরাম দাসে কয়, রোহিণী আনন্দময়,
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥

এ যে আমাদের ঘরের ছেলে, এ চাঁদ তো নয়। এ রস যুগে যুগে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। মা চিরকাল একে লোভ দেখিয়ে নাচিয়েছে, 'চাঁদ' দেখিয়ে ভোলায় নি।

রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন বলে 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' তখন মন বলে, এই মিথ্যে কথার চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয় 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল' তখন মন বলে, যে হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ ; রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়, আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে।

তাই দেখি, সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সেখানে লোকখ্যাতির অনিশ্চয়তা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো— আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন তাঁদের কারও-বা নাম জানা আছে, কারও-বা নেই, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তাঁদের স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার— রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্‌খানে আমার নাম কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত তা হলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।

শান্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত, এ কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর-কিছু নই, কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত ; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যসৃষ্টির কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়। একবার যাওয়া যাক কবিজীবনের গোড়াকার সূচনায়।

শীতের রাত্রি— ভোরবেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমাদের ব্যবহার গরিবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই ছিল না। গায়ে একখানামাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছটা পর্যন্ত গুটিসুটি মেরে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিদ্র। তার প্রধান সম্পদ ছিল পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে এক সার নারকেল গাছ। সেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম, সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তা হলে সর্বজনীন

বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদের থেকে এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ এইটে জানতে পারলে আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার হত না। কিন্তু কিছু বয়েস হলেই দেখতে পেলুম, আর কোনো ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার জন্য এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়ত না তা আমি দেখলুম। শুধু তারা কেন, চার দিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকত তা হলে সকালবেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেত, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ত দৃশ্যটাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে সে এইখানেই। স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার উর্ধ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে, কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখে নি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস— এই গাধাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয় নি আদিকাল থেকে— আর-একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই-যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চিত জানি, সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে ঐ দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয় নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ সেখানে ব্রিটিশ সব্‌জেক্ট ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানা ভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষদে আছে : ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি— আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়, তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু-বা ইতিহাস জোগায়, কিছু-বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে। অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ— তাই তো বলেছে, আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায় এ কী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তা হলে সমস্ত দেশ জুড়ে 'কথা ও কাহিনী'র হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে, এই কারণে, কবির এই

সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই-সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করে নি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে— কখনো-বা মোগলরাজত্বে কখনো-বা ইংরেজরাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব-প্রকাশ নিত্য চলেছে— সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল 'গল্পগুচ্ছে', কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো-আনা পরিমাণ আমি জানিই নে। বোধ করি, সেইজন্যই আমার বিশেষ করে রাগ হয়। আমার মন বলে, 'দূর হোক গে তোমার ইতিহাস।' হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখদুঃখকে যে আত্মসাৎ করে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হল না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগযুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটেকেই বড়ো করে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে— ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে এ কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।

শান্তিনিকেতন। মে ১৯৪১ আশ্বিন ১৩৪৮

সত্য ও বাস্তব

মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয় নি। সে তার পড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন ; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের-মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের-মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের-মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি ; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই-যে তার মনের মতো রূপ, এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে। বড়ো বড়ো মহাকাব্যে মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে, আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প, তার সাহিত্য। দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। যদি সে কোনো অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞাভরে তার গৌরবকে উপহাস করে তবে সমস্ত সমাজকে নামিয়ে দেয়। সাহিত্যশিল্পকে যারা কৃত্রিম ব'লে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার

নানা জোড়াতাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম ; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার শিল্প, একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।

শান্তিনিকেতন। জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৪৮

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে, মানচিত্র এঁকে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে ; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এ হল পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে ; সেটা নঙর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষ ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরো কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবু খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ করে শত্রুর আগমন হল। আর্যরা ঐ পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশ-সুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীয়; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হল না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়মুড় করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পর্টুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্‌বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমার্থিক পুণ্য-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে যেখানে যথার্থ দৈন্য ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাণ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমণ্ডলীর এই মুক্তিকামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এঁদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এইরকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, 'গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু করবেন না কেন।' আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন: বললেন, 'কী! যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায়! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ঐ সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব!' এই কথাটি যিনি বলেছিলেন, তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে-বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে। যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় ব'লে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে

ধিক্কৃত জীবন যাপন করেছিল ; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানগৌরবের অধিকারী ; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও-দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এতদিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অনুভূত হয়ে আমরা যখন পড়েছিলুম তখন রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আশ্চর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরো অনেকে কাজ করেন নি। কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত ম্লান তাদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনো-বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনো তীক্ষ্ণ কখনো সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমগোত্রীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ খুব বড়ো স্বার্থ, তবু স্বার্থের যা পঙ্কিলতা তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান ব'লে একটা জাত আছে তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অজস্র মিথ্যা বলতে পারে ; তারা এত হিংস্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দেবার অছিলায় অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশ একদিন যে মুষল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মস্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয়, আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজম বলছে সেই পেট্রিয়টিজ্‌মই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নির্জীব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন করে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে ; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স্‌ থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক। তাঁরা মনে করেন যে, কার্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিশ্যানদের এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ

একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য লাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই যে তাদের গৌরব এ গর্ব টিকবে না তো। আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসাপ্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা মানি কি। মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব— এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন; তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চাত্য দেশে খৃস্টধর্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃস্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে; ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত দুঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন— এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন তাকে অন্ন দিতে হবে এ কথা খৃস্টধর্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজি এমন একজন খৃস্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃস্টানধর্মের অহিংস্রনীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের যিনি সংস্কারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্রনীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খৃস্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদূ, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে— যা নির্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নির্বিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃস্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়; আর খৃস্টানজাতি বলে, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি; কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায় যে, ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের

অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যে দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩৪৩

অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

গান্ধীজি

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এইরকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা ছুটি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরকম চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষের গভীর তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার সুযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন করেন ; আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক্, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই ; ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল— তৎসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন বুঝি, আজকের উৎসবে যাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোন্‌খানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে ; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল ; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার-আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে, আস্থাহীনতার দৈন্য।

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগন্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিত্তধারা সেইটেই হবে ম্লান, যেন সেইটেই আকস্মিক— এর চেয়ে দুর্গতির কথা আর কী হতে পারে। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি। শাসনকর্তাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মুখ্য ; আর আমরাই হলুম গৌণ— মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অল্প কাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সকলকে তামসিকতায় জড়বুদ্ধি

করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মতো জনকতক সাহসী পুরুষ জড়তত্ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিধান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।

এত কাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যাবসা চালিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেত না যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সবচেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুগিয়েছি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না— এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে— কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠা করে তুলেছে, এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো— এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্যপরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, আমাদের ম্লানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোদীপ্ত সাধকের মূর্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে তাঁকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যত দিন আমরা চালিত হতে থাকব ততদিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি-আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনো এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিকে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করছি

এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন ; তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

শান্তিনিকেতন,
১৫ আশ্বিন ১৩৩৮

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

চৌঠা আশ্বিন

সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কত বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায়, তখনই ইঁটকাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় ; মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেছেন— এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারও মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মানুষ আর-এক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে।

আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করছে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করছে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে। যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এতদিন এইভাবে চলছিল ; ভালো করে বুঝি নি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে মুক্তিসাধনার তাপস যাঁরা তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর-এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ করে সেই পশ্চাদ্‌বর্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ী ভাবে যখনই পিছিয়ে রাখা যায় তখনই পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনই অপমানবিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভার-সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই ; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেকদিন থেকে আমাদের লক্ষ নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয় নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েছি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে

ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস ক'রে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানি নে। আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায়-অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি— আয়র্লন্ড যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়র্লন্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারও কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলন্ডে প্রটেস্টান্ট ও রোমান-ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দুসমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেস্টান্ট ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে ; সেজন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজির যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেছেন আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

শান্তিনিকেতন
৪ আশ্বিন ১৩৩৯

কার্তিক ১৩৩৯

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই ; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি ; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয় ; কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেজন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে 'তিনি আমার'। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয় বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই-যে এত মার খেয়েছেন, উলটে কিছু বলেন নি কখনো, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েছেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারও কারও হয়তো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে ; একটি নাম দিয়েছে— মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যার আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্তলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃস্টানশাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যিশুখৃস্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের। যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়। সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না। আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীরুতা, আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না। গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সংকোচ, এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তার মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি, আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত।' তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে।

আমরা এই কথাই বলে থাকি যে, বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করছে; কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব। এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে, কারও মনে ভয় নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মুহূর্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেকদিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের

চতুর্দিকে বন্ধুরা রয়েছেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম্ল জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁচেছে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। প্রয়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েছে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্রব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটে নি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না, কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না— দূরত্বের বাধা, ইটকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা। বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করছি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্নের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েছে ইটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দু-চারজন শুভ্র-খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারও ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো-সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেন্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার ; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রবুদ্ধির রচনা সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector-General of Prisons— যিনি গবর্মেন্টের পত্র নিয়ে এসেছেন— অনুরোধ করলেন, রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে

হল। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী-আশ্রমবাসীগণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল, সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটে নি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে ; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্নের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন, এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতা-নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁচেছে। কিছুদিন পূর্বেও এমন দুরূহ সংকল্পে এত সহস্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেকক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইছেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসছে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলছে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।

আজ যে-মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্র।

মুক্তিসাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেইদিন আজ সমাগত।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমরা যাদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেইসঙ্গেই ছিল স্ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই-সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকতায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল- শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল— কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান— অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে, যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপুল ও দ্রুত করবার জন্যেই আধুনিককালে যন্ত্রযোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্তু প্রাণবান নয়, হাইড্রলিক জাঁতার চাপে তাদের কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটার ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পীড়িত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।

একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শখ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমাত্র নিপুণ মালীর সঙ্গে প্রকৃতির এই স্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাহুল্য মানুষ-মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ

সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজন-শক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাঁদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুশি নেই, তাঁদের দোসরা পথ।

পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার সুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী-যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাকার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা শস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।

আর-একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছট্‌ফট্ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্— এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গ্‌সঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে, কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা আছে— তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটলী হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গোরু চরানো, গো দোহন, সমিধ্ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নৃত্য-প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে কেবলই যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালন ; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সম্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোরু চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুশি হত সন্দেহ নেই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তবু শরীর মন খাটাবার কাজ বিস্তর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায় রে, পড়া মুখস্থ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্‌জুগেশন্ অফ ইংরেজি ভর্ব্‌স্। তা হোক, আমি যে

বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়ামুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্ছৃঙ্খল এবং মলিন হতে থাকে, সেখানে তার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যের মধ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। এই সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড় বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে সুবিহিতভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার সুযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।

আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, যেখানে নালিশ কথায় কথায় মুখর হয়ে ওঠে সেখানে সঞ্চিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন একদল বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে নালিশ করেছিল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির সৃষ্টি হয়। আমি বললুম, তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিন্তামাত্র তোমাদের মনে আসে না, তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এইরকম ছেলেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খুঁতখুঁতের বিস্তার ক'রে নিজের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার লজ্জাকে দশ দিকে গুঞ্জরিত করে তোলে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসংগত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ-প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রদৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে, অনায়াসে প্রয়োজনের

জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত ; আমরাই বয়স্কলোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশা-গ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অল্প নিয়ে চলতে পারে। শরীর-মনের শক্তির সম্যক্‌রূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্‌ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখাভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। প্রত্যাশা করেছিলুম প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ওটার দিকে ভালো করে তাকালো। ওরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে ওটাকে মন দিয়ে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে ওর একটা নকলও বানিয়েছে। মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছপালা পশুপাখির প্রতিও। স্রোতের শ্যাওলার মতো ওদের মন ভেসে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেঁচে আছে— তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে ওঠা যায় ; আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্তবিক্ষেপের কোনো আশঙ্কা নেই। এরা পদবী অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে— সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে, যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।

সব শেষে বলব আমি যেটাকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাঁদের প্রতি সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হওয়া এবং বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। যাকে বিচার করা যায় তার যদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাদের আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়ে মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে

প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মানুষ হবার পক্ষে এমন বাধা অল্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দায়ী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্খতার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্যাতন ঘটে তার বারো-আনা অংশ গুরুমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। বিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিজে ছিলুম তখন শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে ছাত্রকে রক্ষা করা আমার দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। অপ্রিয়তা স্বীকার করে আমাকে এ কথা বোঝাতে হয়েছে, শিক্ষার কাজটাকে বলের দ্বারা সহজ করবার জন্যেই যে শিক্ষক আছেন তা নয়। আজ পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্যে অনুতাপ করতে হয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসন-নীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।

আষাঢ় ১৩৪৩

২

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাধা শালগাছ। মাধবীলতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পুব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকীবনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর-একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারই মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরো-কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর-একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়িঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারি দিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী, সর্দার ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকাবাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচয় নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা-কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্যপ্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারই ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না

থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম-ভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর-কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইনপরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে-সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই-সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি

তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না তবুও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পথ থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন

শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দের নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

আষাঢ় ১৩৪৮

৩

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত— হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলেভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম ; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারি দিকের

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয় ; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে-সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না ; মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সম্যকরূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাত শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, যে সমাজে আমরা মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌঁছতে পারত না, এমন-কি, তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে-সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাসগুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে— কোনোদিন-বা ফিরে এসেছে সমস্তদিন পরে অপরাহ্ণে। তা নিয়ে ঘরে উদ্‌বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নীচে তখন আমি তাকে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু এক দিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্য দিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল ; তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুন্ন রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নামধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে-সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল ; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে

গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সুলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলাদেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইঁট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না— তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না ; সমস্তই গেল ভেসে ; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে ; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো ; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে

আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। এক দিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি— এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি— সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্ত-গঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটি প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায় আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ-সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবন-যাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই-তিনদিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনা-মন্দির লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে

এবং বায়ুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইঁটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোক-চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসিপ্রশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল ; সে ফরাসি রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বুড়োগোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতায় কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশুভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর, কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল ; এখানে না আছে কোনো জীব-জন্তুর বাসা ; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা

যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর, আর নীচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল ; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাব-দিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মসলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর-একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী, এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্রশাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতি-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্র বংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

একদা এই দুটিমাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দানগ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রাভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্‌ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্‌ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।

তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে

দূরে খুঁজতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ার-জলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না— যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবল-ভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমত কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিতপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি. এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী বলে জেনেছিলেম বলেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব্‌জেক্‌টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সংবরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার

কাজে নিন। খুব খুশি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি. এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই-সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ— তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।[১] তার পরে সেই কবি-বালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

বি· এ· পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে-সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা

১ কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে— অন্তঃপুরে সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না— এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত— সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ায় মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্রশ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভ-কালের প্রথম সংকলন, তার দুঃখ তার আনন্দ তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা— আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত— অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল— প্রণাম করে যাই তাকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

আশ্বিন ১৩৪০

বিশ্বভারতী

॥ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ॥

বিশ্বভারতী

১

মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল— এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়— নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

বৈশাখ ১৩২৬

২

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না ; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য-সকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য ; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয় ; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে ; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে

মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে ; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে ; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে— সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন-কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতি প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পৌঁছে না দেয় তা হলে কী জানি কী হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগলাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনে পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন-কি, তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনো অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে

যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে— আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি তা হলেও সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য-সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য-সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই ; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র -অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির ; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত, আর আছেন ভীমশাস্ত্রী-মহাশয়। ওদিকে এন্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ

করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশুর বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে ; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

১৮ আষাঢ় ১৩২৬
শান্তিনিকেতন

শ্রাবণ ১৩২৬

৩

আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন, আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরো সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধি রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে-সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি ; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের পরমসুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যে-সকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেন্টের দ্বারা যে-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে ; এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি।

এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া ; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান ; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের ; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না ? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই ? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না ? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব ?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে ? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই ? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

৮ পৌষ ১৩২৮ মাঘ ১৩২৮
শান্তিনিকেতন

৪

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম ?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে

পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনো কখনো বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল ; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনো রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলেকয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময় নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।'— তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনো তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলোই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি— আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে— জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার

কথা এই যে, সব চেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটা ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার একপ্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল ; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্কুলবয়’ ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে

উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান-গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্ত্রীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

২০ ফাল্গুন ১৩২৮
শান্তিনিকেতন

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

৫

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার

প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমন-কি, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিংবা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে ; আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যে-সব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্বভারতীতে আমরা যে চিন্তা করছি, যে সত্য সন্ধান করছি, সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্প পরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম, কিন্তু অতি সসংকোচে ; কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রূপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ডাকে কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা

পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এই-সকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে— প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা ; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ-পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এ-সব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এ-সব অধ্যাপকদের আনানো ; ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারো আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিংবা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন— এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সংবর্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না— ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে ; জলে স্থলে দেশে দেশে যে-সকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে-সব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশ-যানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এত-বড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস ; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে— নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এ-সব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়,

সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে— বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

১ ভাদ্র ? ১৩২৯ পৌষ ১৩২৯
কলিকাতা

৬

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে করে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনো-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর, কখনো-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায়-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।' তখনো এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরে ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্পলোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানসি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এই-সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি-পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যা-তারায়-জ্বলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এ-সব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যে-সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনোরকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এ-সবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই-সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই, তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেই-সব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই-সকল অবারিত সাহিত্য-রচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো সুবিধা ছিল যে,

সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পশরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্যরচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়বন্ধুদের যা একটু-আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তার পরে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করি নি। আমি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্যসৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে— সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না— সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনো উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি; তার মধ্যে যে সত্যও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে

রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য-করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এই-সব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানববিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং— তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্মজ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে ; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং— দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃউৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না ; কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল

হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদের সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে ? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি। আমরাই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে ?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে, য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তরপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিস্মৃতির গর্তে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না। এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্তত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকটসম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম। তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতদের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না ; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন ; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মনি সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি, কিন্তু এক

হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চাত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশেই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্রসমাজেই উঠতে পারল না। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না; তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে, 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গৌরব আমাদের। মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

৪ ভাদ্র ১৩২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২
কলিকাতা

৭

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন— 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্ত-মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ

বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহ্যশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে— 'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও ; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'— সে আর গোপন থাকে না অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্‌গময়'— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও ; 'আবিরাবীর্ম এধি'— হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার সৃষ্টিশক্তিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইনকানুন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার সৃষ্টি। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল। এমন-কি, যে-সব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মানুষ নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গণ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা ; এর আশুফল খুব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই সৃষ্টিশক্তি ; সেই ত্যাগ যতটুকু পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্দৃষ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সত্যকে সংকীর্ণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে ; যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে ; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণখাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্র্যে এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ুরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে ; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'— আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজে আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন ব'লে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের

প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

১ বৈশাখ ১৩৩০ ভাদ্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

৮

অল্প কিছুকাল হল কালিঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্যনদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে— তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বড়ো নগর হয়েছে— সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড়ো ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশি হল না। যদিও এখনো লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে রইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না ; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না ; সেখানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মেছি— সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেন্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্বান আছে। বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়। সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলবার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের সুরুলের পল্লীবিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে। যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হারস্‌ট্‌ এই-যে বেদনা অনুভব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই যে, তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অজ্ঞ, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে যে-সমস্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজ, কেউ-বা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পৌঁছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজতক্তায় এসে ঠেকলেন, কেউ-বা লোহার সিন্ধুকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পুণ্যতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব সুরুলে এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকৃতার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জায়গা শুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

৫ বৈশাখ ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

৯

আমাদের অভাব বিস্তর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তান্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে যাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী ; তাঁদের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্র্যের দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছন্ন করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে, আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের যেখানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই দৈনপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণা করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের অমাবস্যা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশ্বের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার পূর্ণিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বুদ্ধদেব যখন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্বিত। সূর্য আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ ; স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মূল্য হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশুচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারতবাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে রাষ্ট্রীয় গৌরব সর্বাগ্রে, তার পরে সত্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপুল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদম্ভ প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অশুভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমত।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্'— আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

পৌষ ১৩৩০

১০

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে ; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে। এই যোগবিচ্ছেদের দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয় তাতে করে মানুষের অকল্যাণ হয়েছে। পৃথিবীতে এই দুর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য, তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতদিন একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি. আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে-- আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয় ; কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

এখানকার এই মুক্ত বায়ুতে আমরা যে মুক্তি পেয়ে গেলুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল, তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মানুষকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিখেছি, এখানে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সৌভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে একান্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শত্রু। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতখানি চিত্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দম্ভে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মরু, এরা মানুষের আত্মাকে কারারুদ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু এ কথা জানতে হবে যে, নীচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ীর যোগ। এই তার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে এমন করে বাংলার শ্যামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেষ্ট ফল লাভ হয় না। বড়ো জায়গার যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না— সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার সপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজমের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট

প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনো হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না ; 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনো বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ন দোহন করতে চেয়েছিল। সুতরাং সে এমন-কিছু সম্পদ রেখে যায় নি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয় রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। সে কেবলই বেনের মতো নিয়েছে, জমিয়েছে, কিছুই দিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা ; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দণ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধন সঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই ; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই ; তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা এর জন্য উৎসাহ চাই, সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কৃপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রূপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও— সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক।

আনন্দস্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে— আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেদাহম্'— জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গণ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

৭ পৌষ ১৩৩০ মাঘ ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

১১

আজ আমার আর-একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর-একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি— এই ছাত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভাবছি, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, যে লোক একেবারে অযোগ্য— মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা— তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল ছিল, গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি নে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে বেরিয়েছে সে যেমন জেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যন্ত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতি মাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে

ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর যে একটি কথা অনেকদিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। কখনো বেতন দিয়ে, কখনো ত্যাগের বিনিময়ে, কখনো-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানি নে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্যসকল অভাব ভুলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরো দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনো ভাবি নি।

আমরা চেষ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্য দেশের যে-সব মনীষী এখানে এসেছিলেন— লেভি, উইন্টারনিট্জ, লেস্নি, তাঁরা যে এমন-কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে শ্রদ্ধা যে উৎসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্তি পাচ্ছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্ব্যাপী পরম শত্রুতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিলুম, আমরা যে জাগলুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দন্তের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বের ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে— মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পূজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয় ; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না ; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে

উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি— ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য— কটিই বা আমাদের ছাত্র, কটিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক— সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র ; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

১৭ ভাদ্র ১৩৩১ কার্তিক ১৩৩১
শান্তিনিকেতন

১২

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গেই যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম— যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' ; বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয়, তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ— যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই

ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন ক'রে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন ক'রে বুঝেছিলেন, তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক্, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল তখন সে-সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য; তাকে বন্ধু সম্ভাষণ করে অশ্রুপাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য; কিন্তু 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ' আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্‌বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম।

তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে-সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সে দিনের সূচনাও কি হয় নি। যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন। সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা একে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে

এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ারূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরূপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বার বার ভ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন-কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্‌ণকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারও ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমন-সকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি; তাদের অর্থ যতই থাক্, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আহরণ করছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'— তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে

গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদ্‌শালী করে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই— পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা ; বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার ; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে ; আর তার সর্বভুক্‌ ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে ; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা -দ্বারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি -দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন— যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই। আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে, ঐশ্বর্য নেই। বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে। দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব ?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন-না, আমাদের মনে যে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্‌, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি ; সে কাজ কি এখনই আরম্ভ হয় নি। অন্য দেশ থেকে যে-সকল মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে-কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্‌ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে

এ-সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ-সমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমন-কি, পরিহাসরসিকেরা বিদ্রূপও করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহংকারের সামগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরো বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারংবার এটা দেখেছি, বিদেশের যে-সব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু আমরা যোলো-আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্ধিত হয়ে উঠি ; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনো যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

৯ই পৌষ ১৩৩২
শান্তিনিকেতন

ফাল্গুন ১৩৩২

১৩

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল— কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরে অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয়, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধতশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, 'ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।'

কাজ শুরু করে দিলুম— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েকজন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিলুম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ— যে প্রভু কেবল বাংলাদেশের নন— সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্রপার হতে এলেন বন্ধু অ্যান্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই-যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত ঊর্ধ্ব বেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ -দ্বারা অনুধাবিত হয়ে গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড়ো করলেন না, প্রভুর আদেশকে

বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে তুললেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দূরে পৌঁছত না। যিনি সমুদ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেছেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তো খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেননা সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আনুকূল্য পেয়েছে, সেই তো আশীর্বাদ— সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলাদেশাভিমান বর্জন করে বাইরে আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েছি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃতলোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডির, আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। যা সকল মানুষের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক— এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণসৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

১৪

বহুকাল আগে নদীতীরে সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেছি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি— কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয় ; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম ব'লে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই ; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল. এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমশ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহুদূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারংবার মনে ভেবেছি, আমার সত্যসংকল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পারছি, এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা চলে না, অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে ; অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না, এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না— কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহংকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণবেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কখনো হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ'— নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক ; আন্তরিক গরিমায় তার

যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্তর সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সাথকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১৫

আমার মধ্য-বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনাকর্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালক-মনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ-বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে— মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্তসাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মানুষ একদিন আগুনের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল। আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম, তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়— এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য -পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা কবব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সেই সংকল্পটি আছে, তা স্মরণ করতে হবে। শুধু কেবল আনুষঙ্গিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃঙ্খলা-পারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের খর্বতা হবে।

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি তখনো ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যে-সব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেই-সকল ছাত্র পরে কৃতিত্বলাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি এবং এই-যে কাজ শুরু করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা— এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।'

এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যে ভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে— যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রসসঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশু-বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল— সভাসমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অল্পপরিসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোখে তার স্পষ্ট প্রতিরূপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিগ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতুষ্টি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে ; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা— এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খুশি হয়েছি। এই-যে এরা ভালোবেসে ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনতা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, খবরের কাগজের লক্ষগোচর কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে স্পর্শ করল। মনে হল, দীপ জ্বলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মানুষের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হল।

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চেষ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপায়ে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভয় নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি— এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যা সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্যসাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই— সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মানুষের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কখনো কখনো বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদপত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এই সময়ে নিভৃতে দুঃখ পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি ; বরং অখ্যাতিই ছিল। মনু বলেছেন— সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের পুরস্কার-স্বরূপে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহযোগিতার আশা ছেড়েই দিয়েছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্যজনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেষ্টা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অন্ত্যেষ্টি-সংকার হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মুক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহ-ধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা ॥

৯ পৌষ ১৩৩৯ জানুয়ারি ১৯৩৩
শান্তিনিকেতন

১৬

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত— তার ভাবরূপ তখনো অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি— যেমনতর সূর্য যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে-কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলিবিলীন; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব করে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্তি অক্ষুণ্ণ হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগের তার অকিঞ্চনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো জামগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা— এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন-কি খ্যাতিরও না— অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটো-বড়ো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত ক'রে রটনা করে, তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে

সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্‌ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না— চাইও নি। এইজন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন— পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে— সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে ; একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা— সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে ; নানা ভুলত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে— এ-সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে ; আমি যখন থাকব না, তখনো অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্‌ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি ; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো— আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠেছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটি আদিম বেগ ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না— তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি— সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই ; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে ; কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়— নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে

পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু— তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে— কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনো বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য— সেরকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্‌ভাবন করি নি ; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক্। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে ; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন, অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সত্য। আমার বিশ্বাস, সেই দৃষ্টিমান অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন— এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন, তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন, কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ্ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজন্যই আহ্বান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনো সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন— এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

৮ পৌষ ১৩৪১ ফাল্গুন ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

১৭

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে— বিশেষ করে আমার— কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই ; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ে

সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনো ভাবি নি, আমার দ্বারা এর কোনো উপায় হবে। তবু একদিন নদীতীর ছেড়ে এখানে এসে আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়— সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না— তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল ; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি ; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি— তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এইসব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে— অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম— মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়— তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে— শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে ; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।

ছাত্রসংখ্যা তখন অল্প ছিল, এও একটা সুযোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি ; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়— শিক্ষার যে-সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনস্টিট্যুশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো— যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে ; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কনস্টিট্যুশনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে

যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না— কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরো ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না— বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছি— আশা করি আমার এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দুঃখ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা শুনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিদ্র, কী দেখাতে পারি— তবুও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী— কী না তিনি দিয়েছেন। অ্যান্ড্রুজ, দরিদ্র তবু তিনি যা পেয়েছেন দিয়েছেন— আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনো তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্‌নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য সকল ক্ষতির দুঃখে সান্ত্বনা। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

৮ পৌষ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

ভাদ্র ১৩৪৯

১৮

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান— ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়— সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এই-সকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে

থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে উর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে— আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন ; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই-সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র ; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্‌ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা ; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যে-সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই-সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল ; তেমনি যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়— এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি পাঁচ-ছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে— এইটেই আমার সার্থকতা। এই-যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্যসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিয়তিশয় শান্তি ও

আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে ; বলতে হবে ওঁ— আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করেছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কখনো পীড়িত মনে, কখনো উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু-একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

৮ পৌষ ১৩৪৫ মাঘ ১৩৪৫
শান্তিনিকেতন

১৯

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মানদীর নির্জন তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যূষের আভা। কখন এক উদ্‌বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি ; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবেছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি— অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরো চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনো বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশবাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব-কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্‌দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা-দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের

শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী -উদ্ধারচেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

৮ শ্রাবণ ১৩৪৭
শান্তিনিকেতন

ভাদ্র ১৩৪৭

পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই-আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'-এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্রবৃষ্টিবাতাসে বালকবালিকারা লালিতপালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে— বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ক'রে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himself ও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্তী তেমনি আমিও তার মধ্যবর্তী ; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে— সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে ?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেনশন, প্যাক্ট-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপ্‌ল্‌ অ্যালায়েন্স হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আরবিট্রেশন কোর্ট এবং হেগ-কন্‌ফারেন্সে হল না, শেষে লীগ অব নেশনস্‌-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু

আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরো অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে ; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জন্য নূতন হিউম্যানিজ্‌মের রিলিজ্যস মুভ্‌মেন্ট্‌ হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে মেশিনারি হবে তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না। পার্লামেন্টসমূহের জয়েন্ট সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন People-এরও কন্‌ফারেন্‌স্‌ হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে— mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না ; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কনফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপ-এর উপর স্থাপিত ; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক individual-এ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা ; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশনস্‌-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality-তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশনস্‌-এর ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অব নেশনস্‌-এ এই extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্‌ডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল ; শেষে ইন্‌ডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে, এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। গ্রুপ প্যার্সনালিটির ভিতর ইন্‌ডিভিজুয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইনডিভিজুয়াল

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

হে সৌম্য মানবগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন ; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে ? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন ? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়োমানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যে-সব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তা হলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়িজুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত ক'রে নমস্কার করা নয়— তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন— মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন— কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন-একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন-একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজা-মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমন-কি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই— বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিংবা রাজা হরণ করতে

পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত— কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতা-জুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন— কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁর সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না— প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন— তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন

কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তা হলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই-সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে— তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই— সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে— কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য ব'লে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না— কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে— তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ ক'রে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

৭ পৌষ ১৩০৮ মাঘ ১৩০৮

প্রথম কার্যপ্রণালী

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ-সব কার্য ফরমাসমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়— অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা এমন-কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে…র পুত্র…র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে— সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও

শৌখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া খেলা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে, ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে-অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তক্‌তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনোমতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু-আচার-বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি। সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সে ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা রূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে

ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব :

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতা নোঽসি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর করো, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই-সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে[১] লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন— যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

---

১ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নষ্ট হইলে, হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে, রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গোরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।[১] জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-সম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

১ বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন ; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রাস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।—

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে

বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম— এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়। কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না— এবং এ-সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়। আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই— বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি— সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা-বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না— কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এ-সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে— এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ-সমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই— এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই-সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকটে কোনো আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে— ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও

পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ-সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এনট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে ; প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়— যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্‌বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ-নির্দেশ নাই ; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি

ভূমিকা

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এইখানেই প্রাণের নিকেতন ; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

সেই আসন অনেককাল প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা বহুকাল ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই। শ্রীহীন অনাদৃত দেশে যমরাজের শাসন দিনে দিনে রুদ্রমূর্তিতে প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লিভূমির রিক্তস্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহার নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ; ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, সেবা-দ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন -দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিনসঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দেবতার অভিশাপকে সেই সাধকেরা দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন এই আমি একান্তমনে কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি

সমবায় ১

সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। তাই, যখন আমরা পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দিই; বিধাতা কিংবা মানুষ যদি বাহির হইতে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধূলার উপর আধ-মরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিজের হাতে যে কোনো উপায় আছে, এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এইজন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে— শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, হার মানিবার ধর্ম নয়। মানুষ যেখানে আপনার সেই ধর্ম ভুলিয়াছে সেইখানেই সে আপনার দুর্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ দুঃখ পায় দুঃখকে মানিয়া লইবার জন্য নয়, কিন্তু নূতন শক্তিতে নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিবার জন্য। এমনি করিয়াই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি কোনো দেশে এমন দেখা যায় যে সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ অচল হইয়া পড়িয়া দৈবের পথ তাকাইয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানুষ সে দেশে মানুষের হিসাবে খাটো হইয়া গেছে।

মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরের মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পূরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো-আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামি এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আঁটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

মানুষ যে পরস্পর মিলিয়া তবে সত্য মানুষ হইয়াছে তার গোড়াকার একটা কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। মানুষ কথা বলে, মানুষের ভাষা আছে। জন্তুর ভাষা নাই। মানুষের এই ভাষার ফলটা কী। যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অন্যের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা কওয়ার জোরে আমার মন দশজনের হয়, দশজনের মন আমার হয়। ইহাতেই

মানুষ অনেকে মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড়ো হইয়া উঠে। এই বড়ো ভাবনার ঐশ্বর্যেই মানুষের মনের গরিবিয়ানা ঘুচিয়াছে।

তার পরে মানুষ যখন এই ভাষাকে অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে শিখিল তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠিল। কেননা, মুখের কথা বেশি দূর পৌঁছায় না। মুখের কথা ক্রমে মানুষ ভুলিয়া যায়; মুখে মুখে এক কথা আর হইয়া উঠে। কিন্তু লেখার কথা সাগর পর্বত পার হইয়া যায়, অথচ তার বদল হয় না। এমনি করিয়া যত বেশি মানুষের মনের যোগ হয় তার ভাবনাও তত বড়ো হইয়া উঠে; তখন প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার মানুষের ভাবনার সামগ্রী লাভ করে। ইহাতেই তার মন ধনী হয়।

শুধু তাই নয়, অক্ষরে লেখা ভাষায় মানুষের মনের যোগ সজীব মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়, যে মানুষ হাজার বছর আগে জন্মিয়াছিল তার মনের সঙ্গে আর আজকের দিনের আমার মনের আড়াল ঘুচিয়া যায়। এত বড়ো মনের যোগে তবে মানুষ যাকে বলে সভ্যতা তাই ঘটিয়াছে। সভ্যতা কী। আর কিছু নয়, যে অবস্থায় মানুষের এমন-একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতি মানুষের শক্তি সকল মানুষকে শক্তি দেয় এবং সকল মানুষের শক্তি প্রতি মানুষকে শক্তিমান করিয়া তোলে।

আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না। য়ুরোপে যখন প্রথম আগুনের কল বাহির হইল তখন অনেক লোক, যারা হাত চালাইয়া কাজ করিত, তারা বেকার হইয়া পড়িল। কলের সঙ্গে শুধু-হাতে মানুষ লড়িবে কী করিয়া? কিন্তু য়ুরোপে মানুষ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না। সেখানে একের জন্য অন্যে ভাবিতে শিখিয়াছে; সে দেশে কোথাও ভাবনার কোনো কারণ ঘটিলেই সেই ভাবনার দায় অনেকে মিলিয়া মাথা পাতিয়া লয়। তাই বেকার কারিগরদের জন্য সেখানে মানুষ ভাবিতে বসিয়া গেল। বড়ো বড়ো মূলধন নহিলে তো কল চলে না; তবে যার মূলধন নাই সে কি কেবল কারখানায় সস্তা মাহিনায় মজুরি করিয়াই মরিবে এবং মজুরি না জুটিলে নিরুপায়ে না খাইয়া শুকাইতে থাকিবে? যেখানে সভ্যতার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে দেশের কোনো-এক দল লোক উপবাসে মরিবে বা দুর্গতিতে তলাইয়া যাইবে ইহা মানুষ সহ্য করিতে পারে না; কেননা, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগে সকলের ভালো হওয়া, ইহাই সভ্যতার প্রাণ। এইজন্য য়ুরোপে যাঁরা কেবল গরিবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তাঁরা এই বুঝিলেন যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোনো উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড়ো হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে কাজ আপনিই বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। গরিবের সংগতিলাভের উপায় এই-যে মিলনের রাস্তা য়ুরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো উপার্জনের রাস্তা হইবে।

আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পরে খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এই-সব জমি চাষ করে। কারও-বা দুই বিঘা জমি, কারও-বা চার, কারও-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয়, হালের গোরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টর চেয়ে বেশি, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকাবাঁকা সীমানায় হাল বার বার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায়

তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে ; প্রত্যেক গৃহস্থে স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি মুনফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। এইজন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থাকিত না।

এইরূপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া যতই কান্নাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

এ কথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এ-সব কথা পরের কারখানাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে-কলমে ব্যবহার করিলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই হুহু করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল-লাঙলে অল্প জমিতে অল্প একটু আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়তো কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় দুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাটা যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।

কিন্তু কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরিব চাষীদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মস্ত একটা মরণের গর্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া, সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যাবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যাবসা চালাইতে

পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যাবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেনমার্ক্‌ প্রভৃতি ছোটো-ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে। এমনি করিয়া শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় সে বড়ো হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কোঅপারেটিভ-প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায় ; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায় ; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ্‌ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। কোন্‌ কাজটা বিশেষ দরকারি এ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সবসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া— বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বমানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে— আর-এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক দিকে তাহারা দুর্বল ও একঘরে হইয়া আছে। এখানেও তাহাদিগকে মানুষের বড়ো সংসারের মহাপ্রাঙ্গণে ডাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে তাহাদিগকে বাড়োমানুষ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা যাহাতে মাটির দিকে তাহারা প্রশস্ত অধিকার পায় এবং ডালপালার দ্বারা বাতাস ও আলোকের দিকে তাহারা পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাই করা চাই। তাহার পরে ফলফুল আপনিই ফলিতে থাকিবে, কাহাকেও সেজন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

শ্রাবণ ১৩২৫

সমবায় ২

মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোলো-আনা পেয়ে থাকে।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ ক্রোধ মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন। কেননা, এই-সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের মনকে দখল ক'রে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল সে আপনার নিজের লাভকেই বড়ো করে দেখে, এই অংশে সে অন্য সকলকে খাটো করে দেখে; তখন অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে দুঃখ দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়। এইরকম যে-সকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অন্যের কথা ভুলে যাই, তারা যে কেবল অন্যের পক্ষেই শত্রু তা নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু; কেননা, সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই-যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহুমানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না; পোস্ট অফিস জিনিসটি বহু মানুষের সংযোগ-সাধনের ফল, সেই ফল এতই বড়ো যে তাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোস্ট অফিসের যোগে ধর্মে অর্থে শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মানুষের কী প্রভূত উপকার করছে হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার কত-যে অনুষ্ঠান চলছে তা বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই; সকলেরই তা জানা আছে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায়-বশত সেই সুযোগে কোনো বাধা ঘটে সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা, পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে, মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম-উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই হচ্ছে ধর্ম এবং বিদ্যা প্রকৃতির ন্যায় ধনেও কল্যাণের দাবি খাটে, না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেয়ে তা উপরের জিনিস। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবর্দস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি ক'রে, রক্তপাত ক'রে ধনীর ধন অপহরণ ক'রে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ-সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের

উপর তার আস্থা বেশি ; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানবসমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড়ো মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবলমাত্র তাঁর নিজের চিঠি-চালাচালির বন্দোবস্ত করতে চান তা হলে সামান্য চাষার চেয়েও তাঁকে ঠকতে হবে ; অথচ পূর্বকালে এমন এক দিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনো ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম-উপদেশ দিতেন তবে হয়তো তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরো কয়েকজনের চিঠিপত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্রচালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবন্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এক দিকে রাজশক্তি অন্য দিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। রাজার প্রতি ধর্ম-উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গলসাধনই তাঁর কর্তব্য। সে কথা কেউ-বা শুনতেন, কেউ-বা আধাআধি শুনতেন, কেউ-বা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখসম্ভোগ, নিজের প্রতাপবৃদ্ধিকেই মুখ্য করে প্রজার মঙ্গলসাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ অনেক দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-পার্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই 'য়ুনাইটেড স্টেটস'এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।

এইজন্যে, যথেষ্টপরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা-আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না ; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পাবে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায়-প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকল-রকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়েআছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কস্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি ক'রে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।...

ফাল্গুন ১৩২৯

ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা

বহুদিন পূর্বে, এখানে আজ যারা উপস্থিত আছেন তাঁরা যখন অনেকেই বালক ছিলেন বা জন্মান নি, তখন একদা ভেবেছিলাম যে, পূর্বকালে আমাদের সমাজদেহে প্রাণক্রিয়ার একটা বিশেষ প্রণালী সুস্থ ও অব্যাহত ভাবে কাজ করছিল। পাশ্চাত্য মহাদেশে এক-একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রাণশক্তিকে সংহত করে জনচিত্ত আর্থিক ও পারমার্থিক ও বুদ্ধিগত ঐশ্বর্য সৃষ্টি করছে। সেই-সকল কেন্দ্র থেকেই তাদের শক্তির যথার্থ উৎস। ভারতবর্ষে সর্বজনচিত্ত ধর্মে কর্মে ভোগে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছিল। সেইজন্যেই নানা কালে বিদেশী নানা রাজশক্তির আঘাত অভিঘাত তার পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে নি। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এই-সকল পাঠশালার অধিষ্ঠানস্থল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আবহমান আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরই ছিল। তখনকার কালে ঐশ্বর্যের ভোগ একান্ত সংকীর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। এক-একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহুশাখাবিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানা দিকে প্রসারিত হত। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনি ভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয় নি, অন্নের অভাব হয় নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি। সেইটাতে আঘাত করলে যখন ইউরোপীয় আদর্শে নগরগুলিই দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠতে লাগল। আগে গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই যে একটা সামাজিক যোগ ছিল বাইরের আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল খণ্ড খণ্ড হওয়াতে গ্রামে গ্রামে আমাদের প্রাণদৈন্য ঘটল। একদিন যখন বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে আমার নিত্যসংস্রব ছিল তখন এই চিন্তাটিই আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। সেদিন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখেছি যে, যে ব্যাপক ব্যবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণকে সকল রকমে মানুষ করে রেখেছিল আজ তাতে ব্যাঘাত হচ্ছে, দেশের সর্বত্র প্রাণের রস সহজে সঞ্চারিত হবার পথগুলি আজ অবরুদ্ধ। আমার মনে হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টা ভিত্তিহীন, আমাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই কথাই আমি তখন (১৩১১ সালে) 'স্বদেশী সমাজ'-নামক বক্তৃতায় বলেছি।[১] কিন্তু কেবলমাত্র কথার

১ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে (সুলভ দ্বিতীয়) এবং 'সমূহ' ও 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত।

দ্বারা শ্রোতার চিত্তকে জাগরিত করে আমাদের দেশে ফল অল্পই পাওয়া যায়, তাই কেজো বুদ্ধি আমার না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো গ্রাম নিয়ে সেগুলিকে ভিতরের দিক থেকে সচেতন করার কাজে আমি নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন তরুণ যুবক সহযোগীরূপে ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে একটি জিনিস আমার শিক্ষা হয়েছে সেটি এই— দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞান হোক, মানুষ যে গভীর দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরে যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে ; এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনই বিকৃত হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই তার জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেত্রে শস্য সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনাকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যেই সে সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

গ্রামে আগুন লাগল। দেখা গেল, সে আগুন সমস্ত গ্রামকে ভস্ম করে তবে নিবল। এটি হল বাইরের কথা। ভিতরের কথা হচ্ছে, অন্তরের যোগে মানুষে মানুষে ভালো করে মিলতে পারল না ; সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধিকে জীর্ণ করে, সাহসকে কাবু করে, সকল রকম কর্মকেই বাধা দেয়, এইজন্যেই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না ; এইজন্যেই জ্বলন্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে কেবল হাহাকারেই কণ্ঠ মিলিয়েছে, আর কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয় নি।

পর্বে পর্বে মানবসভ্যতা এগিয়েছে। প্রত্যেক পর্বেই মানুষ প্রশস্ততর করে এই সত্যটাকেই আবিষ্কার করেছে। মানুষ যখন অরণ্যের মধ্যে ছিল তখন তার পরস্পরের মিলনের প্রাকৃতিক বাধা ছিল। পদে পদে সে বাইরের দিকে অবরুদ্ধ ছিল। এইজন্যে তার ভিতরের দিকের অবরোধও ঘোচে নি। অরণ্যের থেকে যখন সে নদীতে এসে পৌঁছল সে এমন-একটা বেগবান পথ পেলে যাতে দূরে দূরে তার যোগ বাইরের দিকে ও সেই সুযোগে ভিতরের দিকে প্রসারিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই উপায়ে মানুষ আপন সত্যকে বড়ো করে পেতে চলল। অরণ্যের বাইরে এই নদীর মুক্ত তীরে সভ্যতার এক নূতন অধ্যায়। প্রাচীন ভারতে গঙ্গা সভ্যতাকে পরিণতি ও বিস্তৃতি দেওয়ার পুণ্যকর্ম করেছে। পঞ্চনদের জলধারায় অভিষিক্ত ভূখণ্ডকে একদা ভারতবাসী পুণ্যভূমি ব'লে জানত, সেও এইজন্যেই। গঙ্গাও আপন জলধারার উপর দিয়ে মানুষের যোগের ধারাকে, সেইসঙ্গেই তার জ্ঞান ধর্ম কর্মের ধারাকেও, ভারতের পশ্চিমগিরিতট থেকে আরম্ভ করে পূর্বসমুদ্রতট পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। সে কথা আজও ভারতবর্ষ ভুলতে পারে নি।

সভ্যতার আরণ্যপর্বে দেখি মানুষ বনের মধ্যে পশুপালনদ্বারা জীবিকানির্বাহ করছে ; তখন ব্যক্তিগত ভাবে লোকে নিজের নিজের ভোগের প্রয়োজন সাধন করেছে। যখন কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হল তখন বহু লোকের অন্নকে বহু লোকে সমবেত হয়ে উৎপন্ন করতে লাগল। এই নিয়মিত ভাবে প্রচুর অন্ন-উৎপাদনের দ্বারাই বহু লোকের একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হল। এইরূপে বহু লোকের মিলনেই মানবের সত্য, সেই মিলনেই তার সভ্যতা।

এক কালে জনকরাজা ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি। তিনি এই সভ্যতার অন্নময় ও জ্ঞানময় দুটি ধারাকে নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। কৃষি ও ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। এই দুয়ের মধ্যেই ঐক্যসাধনার দুই পথ। সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন না। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞসম্ভবা রামায়ণের সীতা তেমনি কৃষিসম্ভবা। হলবিদারণ-রেখায় জনক তাকে পেয়েছিলেন। এই সীতাই, এই কৃষিবিদ্যাই, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাক্ষসদমন বীরের সঙ্গিনী হয়ে সে-সময়কার সভ্যতার ঐক্যবন্ধনে আর্য-অনার্য সকলকে বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল। ধর্মসাধনায় ব্রহ্মবিদ্যার সেই একই কাজ। যখন প্রত্যেক স্তবকারী আপন স্তবমন্ত্র ও বাহ্যপূজাবিধির মায়াগুণে আপন দেবতার উপরে বিশেষ প্রভাব-বিস্তারের আশা করত— তখন

দেবত্ববোধের ভিতর দিয়ে মানুষ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের ঐক্যবোধ সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক মহলে এক কালে প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র সৃষ্টির মত প্রচলিত ছিল। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তখন মানুষের ধারণা ছিল খণ্ডিত। ডারুইন যখন জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মূলগত ঐক্য আবিষ্কার ও প্রচার করলেন তখন এই একটি সত্যের আলোক বৈজ্ঞানিক ঐক্যবুদ্ধির পথ জুড়ে জীবে অবারিত করে দিলে।

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকল-প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপারে ঐক্যবোধের যোগে য়ুরোপের জ্ঞান ও শক্তির আশ্চর্য উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এত উন্নতি মানুষের ইতিহাসে কোথাও আর-কখনো হয়েছে বলে আমরা জানি নে। এই উৎকর্ষলাভের আর-একটি কারণ এই যে, য়ুরোপের জ্ঞানসমৃদ্ধিকে পরিপূর্ণ করবার কাজে য়ুরোপের সকল দেশের চিত্তই মিলিত হয়েছে।

আবার অন্য দিকে দেখতে পাই, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতায় য়ুরোপ মানুষের ঐক্যমূলক মহাসত্যকে একেবারেই অস্বীকার করেছে। তাই এই দিকে বিনাশের যজ্ঞহুতাশনে য়ুরোপ যেরকম প্রচণ্ড বলে ও প্রকাণ্ড পরিমাণে নররক্তের আহুতি দিতে বসেছে মানুষের ইতিহাসে কোনোদিন এমন কখনোই হয় নি। সত্যবিদ্রোহের মহাপাপে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ আর শান্তি নেই। জগৎ জুড়ে সর্বত্রই মানুষের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিত্ত মিথ্যায়, কপটতায়, নরঘাতী নিষ্ঠুরতায় নির্লজ্জ ভাবে কলুষিত। দেখে মনে হয়, সত্যবিচ্যুত মানুষ একটা বিশ্বব্যাপী আত্মসংহারের আয়োজনে তার সমস্ত ধনজন জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সামাজিক দিকে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিকে করে নি। অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে; এইখানেই সে আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অনিচ্ছুক। এইখানে তার মনের ভাবটা একলা-মানুষের ভাব, এইখানে তার নৈতিক দায়িত্ববোধ ক্ষীণ।

এই নিয়ে যখন আমরা বিপ্লবোন্মত্ত ভাব ধারণ করি তখন সাধারণত ধনিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ নিয়েই উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ খাটে, অনেক সময়ে সে কথা ভুলে যাই। একজন আইনজীবী হয়তো একখানা দলিল মাত্র পড়ে কিংবা আদালতে দাঁড়িয়ে গরিব মক্কেলের কাছে পাঁচ-সাত শো, হাজার, দু হাজার টাকা দাবি করেন; সেখানে তাঁরা অন্যপক্ষের অজ্ঞতা-অক্ষমতার ট্যাক্‌সো যথাসম্ভব শুষে আদায় করে নেন। কারখানার মালিক ধনিকেরাও ঠিক তাই করেন। পরস্পরের পেটের দায়ের অসাম্যের উপরেই তাঁদের শোষণের জোর। আমাদের দেশে কন্যাপক্ষের কাছে বরপক্ষ অসংগত পরিমাণে পণ দাবি করে; তার কারণ, বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য। কন্যার বিবাহ করতেই হবে, বরের না করলেও চলে, এই অসাম্যের উপর চাপ দিয়েই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর দণ্ড দাবি করতে বাধা পায় না। এ স্থলে ধর্মোপদেশ দিয়ে ফল হয় না, পরস্পরের ভিতরকার অসাম্য দূর করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমান যুগে ধনোপার্জনের অধ্যবসায়ে প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের নানা রুদ্ধ কক্ষ খোলবার নানা চাবি যখন থেকে বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে তখন থেকে যারা সেই শক্তিকে আয়ত্ত করেছে এবং যারা করে নি তাদের মধ্যে অসাম্য অত্যন্ত অধিক হয়ে উঠেছে। এক কালে পণ্য-উৎপাদনের শক্তি, তার উপকরণ ও তার মুনফা ছিল অল্পপরিমিত সুতরাং তার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হতে পারে নি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজের অন্য সকল সম্পদকেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটা বিপুল অসাম্য সৃষ্টি করছে যাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পড়ছে। ধন আজ যেন মানবশক্তির সীমা লঙ্ঘন করে দানবশক্তি হয়ে দাঁড়ালো, মনুষ্যত্বের বড়ো বড়ো দাবি তার কাছে হীনবল হয়েছে। যন্ত্রসহায় পুঞ্জীভূত ধন আর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধারণ

মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জস্যের সুযোগটা যাদের পক্ষে তারাই অপর পক্ষকে একেবারে অন্তিম মাত্রা পর্যন্ত দলন করে নিজের অতিপুষ্টি সাধন করে এবং ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠে সমাজদেহের ভারসামঞ্জস্যকে নষ্ট করতে থাকে।

সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনই সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন-সকল রিপু প্রবল হয়— এমন-সকল ব্যবস্থাবিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ, যাতে করে অল্প লোকে বহু লোকের সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে বহু লোকের দুঃখ ও দাস্য-ভারে আধ-মরা হয়ে থাকে নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

য়ুরোপে এই বিদ্রোহের বেগ অনেক দিন থেকেই ক্রমে বেড়ে উঠছে। য়ুরোপে সকল-রকম অসামঞ্জস্য আপন সংশোধনের জন্যে সর্বপ্রথমেই মার-কাটের পথ নেবার দিকেই ঝোঁকে।

তার কারণ য়ুরোপীয়ের রক্তের মধ্যে একটা সংহারের প্রবৃত্তি আছে। দেশে বিদেশে অকারণে পশুপক্ষী ধ্বংস করে তারা এই হিংসাবৃত্তির তৃপ্তি করে বেড়ায়; সেইজন্যেই যখন কোনো-একটা বিশেষ অবস্থার ক্রিয়া তাদের পছন্দ না হয় তখন সেই অবস্থার মূলে যে আইডিয়া আছে তার উপরে হস্তক্ষেপ করবার আগেই তারা মানুষকে মেরে উজাড় করে দিতে চায়। বাতাসে যখন রোগের বীজ ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সেই বীজ যে মানুষকে পেয়ে বসেছে সেই মানুষটাকে মেরে ফেলে রোগের বীজ মরে না। বর্তমান কালে সমাজে অতি পরিমাণে যে আর্থিক অসামঞ্জস্য প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে তার মূলে আছে লোভ। লোভ মানুষের চিরদিনই আছে। কিন্তু যে পরিমাণে থাকলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তার কাজে লাগে, সেই সাধারণ সীমা খুব বেশি ছাড়িয়ে যায় নি। কিন্তু এখন সেই লোভের আকর্ষণ প্রচণ্ড প্রবল; কেননা, লাভের আয়তন প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে। অর্থ-উৎপাদনের উপায়গুলি আগেকার চেয়ে বহুশক্তিসম্পন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত লোভের কারণগুলি বাইরে আছে ততক্ষণ এক মানুষের মধ্যে সেটাকে তাড়া করলে সে আর-এক মানুষের উপর চাপবে; এমন-কি, যে লোকটা আজ তাড়া করছে সেই লোকটারই কাঁধে কাল ভর দিয়ে বসবার আশঙ্কা খুবই আছে। লোভটাকে অপরিমিতরূপে তৃপ্ত করবার উপায় এক জায়গায় বেশি করে সংহত হলেই সেটা তার আকর্ষণশক্তির প্রবলতায় লোকচিত্তকে কেবলই বিচলিত করতে থাকে। সেটাকে যথাসম্ভব সকলের মধ্যে চারিয়ে দিতে পারলে তবে সেই আন্দোলন থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক মানুষের মধ্যে যে অর্থকরী শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বড়ো মূলধন তাদের নিজের আয়ত্ত করে বড়ো ব্যাবসা ফাঁদে; এই সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে হার মানতে হয়। এর একটিমাত্র উপায় বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি যদি স্বতঃই একত্রিত হতে পারে এবং সম্মিলিত ভাবে ধন উৎপাদন করে। তা হলে ধনের স্রোতটা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। ধনীকে মেরে এ কাজ সম্পন্ন হয় না, ধনকে সকলের মধ্যে মুক্তিদানের দ্বারাই হতে পারে, অর্থাৎ ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

প্রাচীন যুগে অতিকায় জন্তুসকল এক দেহে প্রভূত মাংস ও শক্তি পুঞ্জিভূত করেছিল। মানুষ অতিকায় রূপ ধরে তাদের পরাস্ত করে নি। ছোটো ছোটো দুর্বল মানুষ পৃথিবীতে এল। এক বৃহৎ জীবের শক্তিকে তারা পরাস্ত করতে পারল বহু বিচ্ছিন্ন জীবের শক্তির মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি ক'রে। আজ প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্য-শক্তির ঐক্যে বিরাট, শক্তিসম্পন্ন। তাই মানুষ পৃথিবীর জীবলোক জয় করছে।

আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হয়েছে সমবায়-প্রণালীতে ধন-উপার্জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে। আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার-কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে মানবনীতির স্থান ছিল না বলেই এত অশান্তি ছিল সেখানে সেই মানবসত্যের

আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজও দুর্বল হবে জয়ী— প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য ক'রে। সেই জয়ধ্বজা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশের সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডেনমার্কের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি কথা তিনি ভুলেছেন, ভারতবর্ষের অবস্থা ও ডেনমার্কের অবস্থা ঠিক সমান নয়। ডেনমার্ক আজ dairy farm-এ যে উন্নতি করেছে তার মূলে শুধু সমবায় নয়; সেখানকার গবর্মেন্টের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় dairy farm-এর উন্নতির জন্য প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। ডেনমার্কের মতো স্বাধীন দেশেই সরকারের তরফ থেকে সাধারণকে এমন সাহায্য করা সম্ভব।

ডেনমার্কের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, সে দেশ রণসজ্জার বিপুল ভারে পীড়িত নয়। তার সমস্ত অর্থই প্রজার বিচিত্র কল্যাণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হতে পারে। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সম্পদের জন্যও আমাদের রাজস্বের ভারমোচন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রজাহিতের জন্য রাজস্বের যে উদ্‌বৃত্ত থাকে তা শিক্ষাবিধান প্রভৃতি কাজের জন্য যৎসামান্য। এখানেও আমাদের সমস্যা হচ্ছে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির নিরতিশয় অসাম্য। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণের জন্যে সমবায়প্রণালীর দ্বারাই, নিজের শক্তি-উপলব্ধি-দ্বারাই অসাম্যজনিত দৈন্যদুর্গতির উপর ভিতর থেকে জয়ী হতে হবে। এই কথাটি আমি বহুকাল থেকে বার বার বলেছি, আজও বার বার বলতে হবে।

আমাদের দেশে একদিন ছিল ধনীর ধনের উপর সমাজের দাবি। ধনী তার ধনের দায়িত্ব লোকমতের প্রভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হত। তাতে তখনকার দিনে কাজ চলেছে, সমাজ বেঁচেছে। কিন্তু সেই দানদাক্ষিণ্যের প্রথা থাকাতে সাধারণ লোকে আত্মবশ হতে শিখতে পারে নি। তারা অনুভব করে নি যে, গ্রামের অন্ন ও জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও আনন্দ তাদের প্রত্যেকের শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে। সেই কারণেই আজ যখন আমাদের সমাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে, ধনের ভোগ যখন একান্ত ব্যক্তিগত হল, ধনের দায়িত্ব যখন লোকহিতে সহজ ভাবে নিযুক্ত নয়, তখন লোক আপন হিতসাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। আজ ধনীরা শহরে এসে ধনভোগ করছে বলেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে এ কথা বিশ্বাস করবার শক্তি তাদের নেই। গোড়ায় অন্নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থক ভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলেই দেশ ক্রমে সকল দিকেই বাঁচবে। অতএব সমবায়রীতির দ্বারা এই সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য। লঙ্কার বহুখাদ্যখাদক দশমুণ্ডধারী বহু-অর্থ-গৃধ্নু দশ-হাতওয়ালা রাবণকে মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধ শক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্যে সেই প্রেমকে চাই, সেই মিলনকে চাই।

২ জুলাই ১৯২৭ শ্রাবণ ১৩৩৪

সমবায়নীতি

সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশি বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে এই তার গৌরব।

সামাজিকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনোই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই

আলগা হয়ে থাকে। আর-একটা কারণ এই যে, নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে ওঠে। সেখানে মুখ্যত মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। এইজন্যে শহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনাশুনো না থাকলেও লজ্জা নেই। জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাল্যকালে দেখেছি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়িতে আত্মীয় ভাবে নিয়তই মেলামেশা করত। আমাদের পুকুরে আশপাশের সকল লোকেরই স্নান, প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন এবং পূজার ফুল তুলতে কারও বাধা ছিল না। আমাদের বারান্দায় চৌকি পেতে যে যখন খুশি তামাক দাবি করত। বাড়িতে ক্রিয়াকর্মের ভোজে ও আমোদ-আহ্লাদে পাড়ার সকল লোকেরই অধিকার এবং আনুকূল্য ছিল। তখনকার ইমারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আঙিনার ব্যবস্থা কেবল যে আলোছায়ার অবাধ প্রবেশের জন্য তা নয়, সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশের জন্যে। তখন নিজের প্রয়োজনের মাঝখানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত ; নিজের সম্পত্তি একেবারে কষাকষি করে নিজেরই ভোগের মাপে ছিল। ধনীর ভাণ্ডারের এক দরজা ছিল তার নিজের দিকে, এক দরজা সমাজের দিকে। তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারি দিকের লোকের মধ্যে ছিল ছড়ানো। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ম তার মানেই ছিল রবাহূত অনাহূত সকলকেই নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ।

এর থেকে বুঝতে পারি, বাংলাদেশের গ্রামের যে সামাজিক প্রকৃতি শহরেও সেদিন তা স্থান পেয়েছে। শহরের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের চেহারার মিল তেমন না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাতন কালে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আপন নাগরিকতার অভিমান সত্ত্বেও গ্রামগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করত। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর-অন্দরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর বেশি বটে, কিন্তু আরাম এবং অবকাশ অন্দরে; উভয়ের মধ্যে হৃদয়সম্বন্ধের পথ খোলা।

এখন তা নেই, এ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' ; গ্রামগুলি শহরকে চারি দিকেই ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে।

এরকম অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। বলা আবশ্যক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত পাশ্চাত্য হাওয়ায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে এসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এতে যে কেবল মানবজাতির সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণঘাতক। অতএব এই সমস্যার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সে সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ ক'রে বিশেষ শক্তিকে সংহত ক'রে তোলে, সে যেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিঃশেষিত করে। বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক-ঝোঁকা হয়ে ওঠে ; তারই কেন্দ্রবহির্গত ভারে সমস্তটার মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্য। য়ুরোপে সেই ফাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই নানা আকারের আত্মবিদ্রোহে। কু-ক্লু-ক্স্-ক্ল্যান, সোভিয়েট, ফ্যাসিস্ট, কর্মিক বিদ্রোহ, নারী-বিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ আত্মঘাতীরূপে সেখানকার সমাজের গ্রন্থিভেদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে এক্‌স্‌প্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায় ; তাতে ক্ষুদ্রবিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভুত্বের শক্তিচর্চার জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা আবশ্যক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়, এই বিধানে মানবধর্মের চেয়ে যন্ত্রধর্ম প্রবল। এই যন্ত্রব্যবস্থাকে আয়ত্ত যে করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই

কারণে নগর প্রধানত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতাবৃত্তি যথোচিত উৎসাহ পায় না।

শক্তি-উদ্‌ভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখনই তা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তখনই তার ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়। আধুনিক সভ্যতায় সেই পরিমিতি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, এ সভ্যতা বিরলাঙ্গিক নয়, বহুলাঙ্গিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার জন্যে বহু আয়োজনের দরকার ; একে ব্যয় করতে হয় বিস্তর। এই সভ্যতায় সম্বলের স্বল্পতা একটা অপরাধেরই মতো, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাঁড়িয়ে আছে ; যেখানেই অর্থদৈন্য সেখানেই এর বিরুদ্ধতা। বিদ্যাই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, আমোদ-আহ্লাদ হোক, রাস্তাঘাট আইন-আদালত যানবাহন অশন-আসন যুদ্ধচালনা শান্তিরক্ষা সমস্তই বহুধনসাধ্য। এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতিক্ষণেই অপমানিত করে। কেননা, দারিদ্র্য একে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে।

এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত আজকালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধন-অর্জনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারের লোভ। সভ্যতা যখন এখনকার মতো এমন বহুলাঙ্গিক ছিল না তখন পণ্ডিতের গুণীর বীরের দাতার কীর্তিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল, সেই সমাদরের দ্বারা যথার্থ ভাবে মনুষ্যত্বের সম্মান করা হত। তখন ধনসঞ্চয়ীদের 'পরে সাধারণের অবজ্ঞা ছিল। এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতার পূজায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে, আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোনো দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্যবাহুচালনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মথিত এবং এই লোভপরিতৃপ্তির আয়োজন তার অন্য-সকল উদ্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই জানতে হবে যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কারণ, লোভ সামাজিকতার প্রতিকূল প্রবৃত্তি। যাতেই মানুষের সামাজিকতাকে দুর্বল করে তাতেই পদে পদে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, অশান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দেয় না, শেষকালে মানুষের সমাজস্থিতি বিভক্ত হয়ে পঞ্চত্ব পায়।

পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি, যারা ধন-অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাঁদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। মেটবার উপায়ও নেই। কেননা, যে মানুষ টাকা করছে তারও লোভ যতখানি যে মানুষ টাকা জোগাচ্ছে তারও লোভ তার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার সুযোগ যথেষ্টপরিমাণে ভোগ করবার জন্যে প্রচুর ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জায়গায় এসে থামবে, এমন আশা করা যায় না।

লোভের উত্তেজনা, শক্তির উপাসনা, যে অবস্থায় সমাজে কোনো কারণে অসংযত হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-সাধনার দিকে মন দিতে পারে না ; সে প্রবল হতে চায়, পরিপূর্ণ হতে চায় না। এইরকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন জোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন-একটা ভাগ হয় যাতে এক দিকে পড়ে তীব্র আলো, আর-এক দিকে গভীর অন্ধকার। য়ুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্বাঙ্গীণতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে। প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত সভ্যতা তার নগরে সংহত ছিল ; তাতে ক্ষণকালের জন্য ঐশ্বর্যসৃষ্টি করে সে লুপ্ত হয়েছে। প্রভু এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালি ছিল নাগরিক। কিছুকাল সে প্রবল ভাবে শক্তির সাধনা করেছিল। কিন্তু শক্তির প্রকৃতি সহজেই অসামাজিক— সে শক্তিমান ও শক্তির বাহনকে একান্ত বিভক্ত করে দেয়, তাতে ক'রে অল্পসংখ্যক প্রভু বহুসংখ্যক দাসের পরাশিত হয়ে পড়ে, এই পারাশিত্য মানুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক ; সেখানকার লোকে কেবল নিজের দেশে নয়, জগৎ জুড়ে মানবলোককে আলো-অন্ধকারে ভাগ করছে। তাদের এত বেশি আকাঙ্ক্ষা যে, সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি

সহজে তাদের নিজের অধিকারের মধ্যে হতেই পারে না। ইংলন্ডের মানুষ যে ঐশ্বর্যকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে জানে তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরূপে পেতেই হবে ; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অতিভোগী সভ্যতার আদর্শকে খর্ব না করে তার উপায় নেই। যে শক্তিসাধনা তার চরম লক্ষ্য সেই সাধনার উপকরণরূপে তার পক্ষে দাস-জাতির প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমস্ত ব্রিটিশ জাতি সমস্ত ভারতবর্ষের পরাশিতরূপে বাস করছে। এই কারণেই য়ুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এশিয়া-আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে ব্যস্ত ; নইলে তাদের ভোগবহুল সভ্যতাকে আধ-পেটা থাকতে হয়। এই কারণে বৃহদাংশিকের উপর ন্যূনাংশিকের পারাশিত্য তাদের নিজের দেশেও বড়ো হয়ে উঠেছে। অতিভোগের সম্বল সর্বসাধারণের মধ্যে সমতুল্য হতেই পারে না, অল্পলোকের সঞ্চয়কে প্রভূত করতে গেলে বহুলোককে বঞ্চিত হতেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই আজ সবচেয়ে উগ্রভাগে উদ্যত। সেখানে কর্মিক ও ধনিকে যে বিরোধ তার মূলে এই অপরিমিত ভোগের জন্য সংহত লোভ। তাতে করেই ধনিক ও ধনের বাহনে একান্ত বিভাগ, যেমন বিভাগ বিদেশীয় প্রভুজাতির সঙ্গে দাস-জাতির। তারা অত্যন্ত পৃথক্‌। এই অত্যন্ত পার্থক্য মানবধর্মবিরুদ্ধ ; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য যেখানেই পীড়িত সেইখানেই বিনাশের শক্তি প্রকাশ্য বা গোপন ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এইজন্যেই মানবসমাজের প্রভু প্রত্যক্ষ ভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে তার চেয়ে বড়ো মার মারে ; সে ধর্মবুদ্ধিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে সেইটে গোড়া ঘেঁষে সাংঘাতিক ; কেননা অন্নের অভাবে মরে পশু, ধর্মের অভাবে মরে মানুষ।

ঈসপের গল্প আছে, সতর্ক হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিকেই সে বাণ খেয়ে মরেছে। বর্তমান মানবসভ্যতায় কানা দিক হচ্ছে তার বৈষয়িক দিক। আজকের দিনে দেখি, জ্ঞান-অর্জনের দিকে য়ুরোপের একটা বৃহৎ ও বিচিত্র সহযোগিতা, কিন্তু বিষয়-অর্জনের দিকে তার দারুণ প্রতিযোগিতা। তার ফলে বর্তমান যুগে জ্ঞানের আলোক য়ুরোপের এক প্রদীপে সহস্রশিখায় জ্বলে উঠে আধুনিক কালকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছে। জ্ঞানের প্রভাবে য়ুরোপ পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহাদেশের উপর মাথা তুলেছে। মানুষের জ্ঞানের যজ্ঞে আজ য়ুরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিত ; তার হোমানলে সে বহু দিক থেকে বহু ইন্ধন একত্র করছে, এ যেন কখনো নিববে না, এমন এর আয়োজন এবং অভাব। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের এমন বহুব্যাপক সমবায়নীতি আর কখনো দেখা যায় নি। ইতিপূর্বে প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্র ভাবে নিজের বিদ্যা নিজে উদ্‌ভাবন করেছে। গ্রীসের বিদ্যা প্রধানত গ্রীসের, রোমের বিদ্যা রোমের, ভারতের চীনেরও তাই। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয় মহাদেশের দেশপ্রদেশগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, তাদের প্রাকৃতিক বেড়াগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়— অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমি বা উত্তুঙ্গ গিরিমালা দ্বারা তারা একান্ত পৃথক্‌কৃত হয় নি। তার পরে এক সময়ে এক ধর্ম য়ুরোপের সকল দেশকেই অধিকার করেছিল ; শুধু তাই নয়, এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল অনেক কাল পর্যন্ত ছিল এক রোমে।

এক লাটিন ভাষা অবলম্বন করে অনেক শতাব্দী ধরে য়ুরোপের সকল দেশ বিদ্যালোচনা করেছে। এই ধর্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিদ্যার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক, এক খৃস্টের প্রেমই তার কেন্দ্র এবং সর্বমানবের সেবাই সেই ধর্মের অনুশাসন। অবশেষে লাটিনের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ আপন ভাষাতেই বিদ্যার চর্চা করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু সমবায়নীতি অনুসারে নানা দেশের সেই বিদ্যা এক প্রণালীতে সঞ্চারিত ও একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকেই জন্মালো পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমবায়মূলক জ্ঞানের সভ্যতা— বিদ্যার ক্ষেত্রে বহু প্রত্যঙ্গের সংযোগে একাঙ্গীকৃত সভ্যতা। আমরা প্রাচ্য সভ্যতা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্তের সমবায় মূলক নয় ; এর যে পরিচয় সে নেতিবাচক, অর্থাৎ এ সভ্যতা য়ুরোপীয় নয় এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু মেলে নি যে তা নয়, অনেক বিষয় তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সভ্যতার বাহ্যিক রূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতীয় হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া-বাসী সেমেটিকের অত্যন্ত বৈষম্য। এই উভয়ের চিত্তের ঐশ্বর্য পৃথক্‌ ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে এশিয়ার সভ্যতা

প্রাচীন কালের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে খণ্ডিত। ঐতিহাসিক সংঘাতে কোনো কোনো অংশে কিছু-কিছু দেনা-পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এশিয়ার চিত্ত এক কলেবর ধারণ করে নি। এইজন্য যখন 'প্রাচ্য সভ্যতা' শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা স্বতন্ত্র ভাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখতে পাই।

এশিয়ার এই বিচ্ছিন্ন সভ্যতা বর্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, য়ুরোপ পেরেছে ; তার কারণ সমবায়নীতি মনুষ্যত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।

কিন্তু এই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্‌খানে বিনাশের বীজ-রোপণ চলেছে ? যেখানে তার মানবধর্মের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারে নি। সে হচ্ছে তার বিষয়ব্যাপারের দিক। এইখানে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলীকৃত। তার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পরবিরুদ্ধতা জেগেছে। এক দিকে দেখছি মানুষকে বাঁচাবার বিদ্যা সেখানে প্রত্যহ দ্রুতবেগে অগ্রসর— ভূমিতে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব মানুষ এমন করে আর কোনোদিন লাভ করে নি ; এরা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবার আর-এক দিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনোদিন দেখা যায় নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহোৎসাহে প্রবৃত্ত। এত বড়ো আত্মঘাতী অধ্যবসায় এর আগে মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারত না। জ্ঞানসমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে আত্মবিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্যে উদ্যত। মানুষের সমবায়নীতি ও অসমবায়নীতির বিরুদ্ধফলের এমন প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখি নি। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান যুগে মানুষ বাঁচাবার পথে চলেছে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মারবার পথে। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। চতুষ্পদ পশুদের আছে চার পা, হাত নেই ; জীবিকার জন্যে যতটুকু কাজ আবশ্যক তা তারা একরকম করে চালিয়ে নেয়। সেই কোনো একরকমে চালানোতেই দৈন্য ও পরাভব। মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে দুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করবার জন্যে। তাতে তার কাজের শক্তি বিস্তর বেড়ে গেছে। সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীবজগতে অন্য-সব জন্তুর উপরে সে জয়ী হয়েছে ; আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখনই কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্রসাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায় তখনই জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিকটা পশুদের দিক, এর পূর্ণতাই মানুষের। মানুষের এই শক্তিকে খর্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাভব।

শক্তিকে খর্ব করব না, অথচ সংহত শক্তি-দ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কী করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ এক জন বা এক দল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয় তখনই বাকি লোকদের পক্ষে মুশকিল ঘটে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি এক জনের এবং তারই অনুচরদের মধ্যে প্রধানত সংকীর্ণ হয়ে ছিল। এমন অবস্থায় সেই এক জন বা কয়েক জনের ইচ্ছাই আর-সকলের ইচ্ছাকে অভিভূত করে রাখে। তখন অন্যায় অবিচার শাসনবিকার থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্মের দোহাই পাড়তে হত। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। অধিকাংশ স্থলেই শক্তিমানের কান ধর্মের কাহিনী শোনবার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা জোর করে রাজার শক্তি হরণ করেছে। তারা এই কথা বলেছে যে,

'আমাদেরি সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জায়গায় সংহত করার দ্বারাই আমরা বঞ্চিত হই। যদি সেই শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তা হলে আমাদের শক্তি-সমবায়ে সেটা আমাদের সম্মিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।' ইলণ্ডে সেই সুযোগ ঘটেছে। অন্যান্য অনেক দেশে যে ঘটে নি তার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে কর্মে মিলিত করবার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তি সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষ ভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমত করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব' তা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্বলতায় কোনো বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।

বিষয়ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপন মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে আসছে। এই ক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্ত ভাবে আপনারই লোভের বাহন করেছে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের দুঃখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই অসংখ্য দাসকে বল্গায় বেঁধে ও চাবুক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্ছে। আর্তরা ও আর্তবন্ধুরা কেবল ধর্মের দোহাই পেড়েছে, বলেছে 'অর্থও জমাতে থাকো, ধর্মকেও খুইয়ো না'। কিন্তু শক্তিমানের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে, 'আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি নে ; জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত ক'রে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্যে লাভ করা।'

একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোক-ব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা দ্বেষ মিথ্যাচার নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।

পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব-ইতিহাসে মহাবিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনোই করতে পারবে না, অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত-অশক্তের যে ভেদ সেইটেই আজ বড়ো সাংঘাতিক। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানের অধিকার নিয়ে মানুষ প্রাচীর তোলে না, বুদ্ধি ও প্রতিভা দলবাঁধা শক্তিকে বরণ করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে ঘরে ঘরে যে-সব ভেদের প্রাচীর উঠছে তাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেঁট করতে হবে। পূর্বে এই পার্থক্য ছিল, কিন্তু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণত লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল ; সুতরাং মানুষের সামাজিকতা তার ছায়ায় আজকের মতো এমন অন্ধকারে পড়ে নি, লাভের লোভ সাহিত্য কলাবিদ্যা রাষ্ট্রনীতি গার্হস্থ্য সমস্তকেই এমন করে আচ্ছন্ন ও কলুষিত করে নি। অর্থচেষ্টার বাহিরে মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র আরো অনেক প্রশস্ত ছিল।

তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাট্‌কায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই 'পরে। অর্থোপার্জনের

কঠিন-বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বললাভ ক'রে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায়নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেখানে সুবিধা এই যে, মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস সেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা, অন্তত হিন্দুসমাজের লোকে, এই দিকে দুর্বল। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যে মিলনের মূলে অন্নবস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা সে মিলনের পথ দুঃসহ দৈন্যদুঃখের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশ সহজ হতে পারে। নিতান্ত যদি না পারে তবে দারিদ্র্যের হাত থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। না যদি পারে তা হলে কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না।

এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, এক কালে আমাদের জীবনযাত্রা যেরকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা হলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।

এক কালে যা নিয়ে মানুষ কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নতুন উদ্‌ভাবনার দ্বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নূতন কাল মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবি করে ; যারা জোগান বন্ধ করে তারা বরখাস্ত হয়। মানুষ আপনার এই উদ্‌ভাবনী শক্তির জোরে নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতেই পূর্বযুগের চেয়ে তার উপকরণ আপনিই বেড়ে যায়। যখন হাল-লাঙল ছিল না তখনো বনের ফলমূল খেয়ে মানুষের একরকম করে চলে যেত ; এ দিকে তার কোনো অভাব আছে এ কথা কেউ মনেও করত না। অবশেষে হাল-লাঙলের উৎপত্তি হবা মাত্র সেইসঙ্গে জমিজমা চাষ-আবাদ গোলাগঞ্জ আইনকানুন আপনি সৃষ্টি হতে থাকল। এর সঙ্গে উপদ্রব জমেছে অনেক— অনেক মার-কাট, অনেক চুরি-ডাকাতি, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যাচার। এ-সমস্ত কী করে ঠেকানো যায় সে কথা সেই মানুষকেই ভাবতে হবে যে মানুষ হাল-লাঙল তৈরি করেছে। কিন্তু গোলমাল দেখে যদি হাল-লাঙলটাকেই বাদ দিতে পরামর্শ দাও তবে মানুষের কাঁধের উপর মুণ্ডটাকে উলটো ক'রে বসাতে হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো কোনো জাতের মানুষ নূতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরানো সঞ্চয়ের দিকেই উলটো মুখ করে স্থাণু হ'য়ে বসে আছে ; তারা মৃতের চেয়ে খারাপ, তারা জীবন্মৃত। এ কথা সত্য, মৃতের খরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিদ্রসমস্যার ভালো সমাধান। অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্তমান কালে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষের নয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা। বিলাস বলব কাকে ? ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ ছেড়ে কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠন ছেড়ে বিজলি-বাতি ব্যবহার করাকে বলব বিলাস ? কখনোই নয়। দিনের আলো শেষ হলেই কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালাকেই যদি অনাবশ্যক বোধ কর, তা হলেই বিজলি-বাতিকে বর্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে ভেরেণ্ডা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বালতে হয়েছে সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষসাধনের জন্য বিজলি-বাতি। আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেটাই দারিদ্র্য। একদিন পায়ে-হাঁটা মানুষ যখন গোরুর গাড়ি সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়িতে তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ির মধ্যেই আজকের দিনের মোটর গাড়ির তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ মোটর গাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ তাই আর-এক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।

এ কথা সত্য, আধুনিক কালে মানুষের যা-কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্পলোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ তাপ অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতি ক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে

হচ্ছে। ধনকে খর্ব ক'রে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্যতা যোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা, অর্থাৎ সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্যপ্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে, কেউ-বা টাকা জমাতে ভালোবাসে, কারও-বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা একাকারতা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক জগতেও যেমন মানবজগতেও তেমুনি, সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে স্তব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে। অপর পক্ষে অতিবন্ধুরতাও দোষের। কেননা, তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায়। যেখানেই তেমন বাধা সেই গহ্বরেই অকল্যাণ নানা মূর্তি ধ'রে বাসা বাঁধে। পূর্বেই বলেছি, আজকের দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্য চার দিকে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত।

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্যে বিদ্যা স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত অর্থ, উদ্‌বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্বচর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।

আজ সভ্যতার গৌরবরক্ষার ভার অল্প লোকেরই হাতে। কিন্তু এই অত্যল্প লোকের পোষণ-ভার বহুসংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুলসংখ্যক মানুষকে জ্ঞানে ভোগে স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মূঢ় বিকলচিত্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মূঢ়তা ক্লেশ অস্বাস্থ্য আত্মাবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেয়ে রয়েছে ; অভ্যাস হয়ে গেছে বলে, একে অপরিহার্য জেনেছি বলে, এর প্রকাণ্ডপরিমাণ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করি নে। কিন্তু আর উদাসীন থাকবার সময় নেই। আজ পৃথিবী জুড়ে চার দিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ পুঞ্জীভূত শক্তির অতিভারেই এমনতরো দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আজ শক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

আমাদের এই গ্রামপ্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিরলাঙ্গিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো স্বভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল ; কিন্তু এখন ধনীরা আত্মসম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা রচনা করেছে তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে ব্যয়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সংকীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েছে। সে ভালোই হয়েছে ; এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্‌ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। এইজন্যই সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

১৩৩৫

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য ; মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো-একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয় ; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকল-প্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E.-রচিত *National Being* বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবিসাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বৈকি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায় এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না ; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন কেন পারবে না। দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এই থুথু-ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুৎকারপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয় ; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না।

আয়র্লন্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল ; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে *National Being* বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লন্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল করে দেখে ; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

ভাদ্র ১৩৩২

খৃষ্ট

খৃষ্ট

যিশুচরিত

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না ?' সে কহিল, 'না।' কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন।' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।'

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেকদিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র— এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না— এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট

উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্‌টা দিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। পূর্বে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধুলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব— এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জীবতাই যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্‌টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য-সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

এক দিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না— সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও— যাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না— নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধুলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই।

ধর্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এইসকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দুঃখ-দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কুটিলতর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানির মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্বচিহ্ন ধুলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, 'তুমি আমাদের কেহ নও' বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। 'তুমি আমাদের জাতির নও' বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো— 'তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।'

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি— প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ-বা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ-বা দাস্যবৃত্তি, কেহ-বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়— এক মুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরবচূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল মূর্তি, ইহুদিসমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরমদুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল, তবু রাষ্ট্ররক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এইজন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া, পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে— সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে ইহুদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল, মর্তে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল, তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন— ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এইজন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেকদাতা যোহন্‌ যখন ইহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে

পুণ্যকামীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্তলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে ? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিয়া। একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে ? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজ-গৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহা-সাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না ; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন ; যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন-একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্রে ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, 'যাহারা দীন তাহারা ধন্য ; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য ; কারণ, পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।'

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ— আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশ-পালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন

সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই শয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল 'তুমি রাজা' তিনি বলিলেন, 'না, আমি মানুষের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে— অভ্যাসের মোহ-বশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে ; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আকারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না ; কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে ; তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এইজন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়।' ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরসসম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, বস্ত্র দিয়া, স্বর্ণ দিয়া, ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয় ; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবলমাত্র পূজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না ; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন— কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাব মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁর শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড়ো করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দুর্বলের নির্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের

মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে ; কারণ, অহংকারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক— তাহার নিজের মধ্যে স্বত-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে— তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে— যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন— ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

২৫ ডিসেম্বর ১৯১০ ভাদ্র ১৩১৮
শান্তিনিকেতন

খৃষ্টধর্ম

সম্প্রদায় এই বলে অহংকার করে যে, সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রয় করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই ভোলে নিজের বাহ্যরূপকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব তার ততই খর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হয় না ; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃষ্টান খৃষ্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি। এইজন্যে সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে— এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এইজন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃষ্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব— খৃষ্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ' ; অর্থাৎ, আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

বদ্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোচ্ছে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা— তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বদ্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা হলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বদ্ধ চিত্তকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি দিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়— এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃষ্টধর্মের লক্ষ।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দুঃখ পায়, কিন্তু এই বিরোধ হতে মানুষের অকল্যাণ। দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মানুষের। যে অংশে মানুষ পশু সে অংশে অভাবের দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়, যে অংশে মানুষ মানুষ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য-সকল আঘাতের চেয়ে বেশি। তাই মানুষের পশু-অংশ বলে, 'সঞ্চয় করে করে আমি অভাবের দুঃখ দূর করব' ; মানুষের মানুষ-অংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম-ইচ্ছায় উৎসর্গ করব— বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সমুজ্জ্বল করে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরম-ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল দুঃখের চেয়ে বড়ো দুঃখ মানুষের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কলুষ।

অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে। মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন। কিসের খেদে উন্মত্ত হয়ে মানুষ আপন শতবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তার কান্না এই যে, আমার ছোটো আমার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে, বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠান নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো ; সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে নিদারুণ স্পষ্টরূপে দেখতে না পেতুম তা হলে ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেমন করে।

মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে। সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে মারছে। চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়ছে। লোভ কার ধন হরণ করছে। যে কেবলই ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আসবে বলে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়। যার প্রেমের অবধি নেই, পাপ যে তাকেই কাঁদাচ্ছে।

এ যে আমরা চারি দিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো দুষ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া ; কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাঁদছেন তিনি যে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খৃষ্টধর্ম জানাচ্ছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিশেষ দেশকালপাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখলে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারাশৃঙ্খলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে যিনি বড়ো, যিনি আমার হাতে চিরদিন দুঃখ পেয়ে আসছেন, তিনি বলছেন, 'জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে। মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল। বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।'

সেই বড়ো যিনি, তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই যদি চরম সত্য হত তা হলে কি রক্ষা ছিল। বড়োর মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই তো বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে। সে কি তিলমাত্র কিছু ছাড়তে পারে। কেন পারে না। তার আছে কী যে পারবে। তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়।

আমরা তো ভারে ভারে কলুষ এনে জমাচ্ছি। যে বড়ো সে ক্রমাগত তাই ক্ষালন করছে— আপন রক্ত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তখন আমরা কেঁদে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না— তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে ধুলো দিয়েছি— অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসলুম তোমার আসনে, তোমার দুঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও, আমার সব নাও; তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শাস্তি নেন তখন সেই শাস্তির দারুণ দুঃখ আর সহ্য হয় না, তবেই তো পাপের মূল মরে; নরকদণ্ডে তো মরে না।

যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা এই বলেছে— 'তোমার মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না। ক্ষুধা লোভ কাম ক্রোধ এ-যে সব কালো— কিন্তু তুমি কী সুন্দর, কী পবিত্র তুমি, তুমি আমার।'

মানুষের মধ্যে মানুষের এই যে বড়োর আবির্ভাব, যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজছে— এই আবির্ভাব তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই— তাঁর সঙ্গে বিরোধেই মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়ো, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ ক'রে মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।

রূপকের আকারে এই সত্য খৃষ্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।

২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

খৃষ্টোৎসব

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দুইকে মানতে চায় নি। কারণ, দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নীচের যে মিলন, বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড রূপকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপুরুষ বলেছেন যে, কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত যদি না'ও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মানুষ জানুক বা নাই জানুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অস্ফুট কুঁড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনি ভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন, যে. লোক'লোকান্তরে যিনি তাঁর অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভয় নেই। এই বিরাট আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতিপ্রচণ্ড— তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই ; এই-সকলের অন্তর্যামী-নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরম সম্বন্ধ যা শূন্যকে পূর্ণতা দান করছে, মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে, সেই মধুর সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি তিনি বলছেন যে, 'ভয় নেই, সূর্যচন্দ্রের মধ্যে আমার অখণ্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই, তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে এই মাভৈঃ বাণী যাঁরা পৃথিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। এ কথা হতেই পারে না যে, আমাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরমসখা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে মানুষ তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়মযন্ত্রের অধীন বলে জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্বল অশক্ত করছে, কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থ ভাবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্তা ঘোষণা করতে একদিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধৃবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেন নি— তিনি ছিন্ন চীর প'রে পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদবান্‌ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরি পান নি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল পূর্ণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম-আনন্দঃ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বুকে করে

নিয়ে ফিরেছে— অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেছে। এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়ে মানুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্য একদিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরল প্রকৃতির মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম বুঝতে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নিচুই ছিল— কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা যিশুর বাণীর প্রেরণা অনুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধুর রসে তাদের অন্তর আপ্লুত হয়েছিল। এমনি করে যাদের কিছু নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গর্বিত তারা এই পরমা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে— তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃষ্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে। খৃষ্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুষ্ক হয়ে যায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সব চেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে 'পিতা নোঽসি'— তুমি আমাদের পিতা।

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই বলে কেবল সামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়া বিষম ভুল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে খণ্ডিত করে দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যাঁরা মুক্তিলাভ ক'রে অমৃতকে সর্বত্র দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্তলোকেই অমরাবতী সৃজন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমর লোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাত্রিতে সূর্য অস্তমিত হলে মূঢ় যে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নির্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগসূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই।

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ চৈত্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

মানবসম্বন্ধের দেবতা

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত— তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে। অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে। সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নীচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে 'সত্যকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই।

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই। এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্, আমি' যে এঁকে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ— তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা। যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি 'হৃদা মনীষা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, 'আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশুখৃষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব।' পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খৃষ্ট বলেছেন, 'আমাতে তিনি আছেন', প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে 'আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই'। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা। এ কথাটি নূতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরো অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খৃষ্ট বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে আমার পিতারই প্রকাশ। এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রবচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌঁছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খৃষ্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভু', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে, খৃষ্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে সুন্দর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এ দিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খৃষ্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃষ্টীয় সমাজে সাফল্য দেখিয়েছে— এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে

পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খৃষ্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে— মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃষ্টধর্মের বড়ো কথা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন— খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌঁছয় নি যে, যেখানে সূর্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র; সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত ক'রে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মনুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাণ্ডার দুই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌঁছবার পুরা মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমবন্ধু অ্যানড্রুজের চিঠি পেলুম। তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়, তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দুঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিক্‌দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে। মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খৃষ্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররূপে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফলল। কে এতে রসসঞ্চার করে। এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খৃষ্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইন্টরেস্ট অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মানুষ, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব।' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল, না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়। মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃষ্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করেছে।

মানুষ যে বহুমূল্য, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেয়েছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খৃষ্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেছে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬ বৈশাখ ১৩৪০
শান্তিনিকেতন

বড়োদিন

যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদা-প্রভাতের নয়, সে চির-প্রভাতের। আমরা যখনই তাকে দেখি তখনই সে নূতন, কিন্তু তবু সে চিরন্তন। নব নব জাগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে অনাদি আলোককে। জ্যোতির্বিদ্ জানেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তার বহু যুগ পূর্বেই সে যাত্রা করেছে। তেমনি সত্যের দূতকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়— সত্যের প্রেরণা রয়েছে মহাকালের অন্তরে। কোনো কালে অন্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান করে যাঁরা নরোত্তম তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো সুলভে মূল্য চুকিয়ে দেওয়া। তিন শত চৌষট্টি দিন অস্বীকার করে তিন-শত-পঁয়ষট্টিতম দিনে তাঁর স্তব দ্বারা আমরা নিজের জড়ত্বকে সান্ত্বনা দিই। সত্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা মাত্র। এমনি করে মানুষ নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের দ্বারা কর্তব্য রক্ষা করি, সত্যগ্রহণের দুরূহ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে যায়। কর্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, স্তবের মধ্যে সহজ নৈবেদ্য দিয়েই খালাস। যাঁরা এলেন বাহ্যিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির মধ্যে।

আজ আমি লজ্জা বোধ করেছি এমন করে একদিনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সমাধা করবার কাজে আহূত হয়ে। জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নিরতিশয় ব্যর্থতা।

আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে। অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়। যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন— যে তারিখেই আসুক। আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে— আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃষ্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করছে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ। কেমন করে জানব খৃষ্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে। আনন্দ করব কী নিয়ে। এক দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর-এক দিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধুমাত্র কথায়। আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।

তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জন্যে এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাখ্যান করেছি। বেড়েই চলল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপুল আয়োজন।

বেদমন্ত্রে আছে তিনি আমাদের পিতা : পিতা নোঽসি। সেইসঙ্গে প্রার্থনা আছে : পিতা নো বোধি। তিনি যে পিতা এই বোধ যেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বোধ যিনি দান করতে

এসেছিলেন তিনি ব্যর্থ হয়ে, উপহসিত হয়ে, ফিরছেন আমাদের দ্বারের বাইরে— সেই কথাকে গান গেয়ে স্তব করে চাপা যেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২ মাঘ ১৩৩৯
শান্তিনিকেতন

খৃষ্ট

আমাদের এই ভূলোককে বেষ্টন করে আছে ভুবর্লোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়ু সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভুবলোক আছে বলেই আমাদের পৃথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সংগীতসম্পদে সমৃদ্ধ— পৃথিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবর্লোকের দান। এক সময় পৃথিবী যখন দ্রবপ্রায় অবস্থায় ছিল তখন তার চার দিকে বিষবাষ্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্যকিরণ এই আচ্ছাদন ভালো করে ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অসংযত হয়ে জলস্থলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ক্রমশ এই তাপ শান্ত হয়ে গেলে আকাশ নির্মল হয়ে এল, মেঘপুঞ্জ হল ক্ষীণ, সূর্যকিরণ পৃথিবীর ললাটে আশীর্বাদটিকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভুবর্লোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হলে পৃথিবী হল সুন্দর, জীবজন্তু হল আনন্দিত। মানবলোকসৃষ্টিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমণ্ডলকে মোহকালিমা থেকে নিরমুক্ত করবার জন্য, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্য, মানুষকে চলতে হয়েছে দুঃখস্বীকারের কাঁটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টায় মানুষ ভুল করেছে, কালিমা শোধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পৃথিবী যখন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভূকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, বায়ুমণ্ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, লুব্ধতা, দুর্বলকে পীড়ন আজও চলেছে; আদিম কালে রিপুর অন্ধবেগের পথে শুভবুদ্ধির বাধা আরো অল্প ছিল। এই যে বিষনিশ্বাসে মানুষের ভুবর্লোক আবিল মেঘাচ্ছন্ন, এই যে কালিমা আলোকে অবরুদ্ধ করে, তাকে নির্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেষ্টা শুধু নিয়ম-শাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হতে পারে না। নিয়মের বল্‌গায় প্রমত্ত রিপুর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে; কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিয়ম মানে ভয়ে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্বলতা। ভয়দ্বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মানুষকে পশুর তুল্য অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মানুষের অন্তরের বায়ুমণ্ডল মলিনতামুক্ত হয় নি বলেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের অন্তরলোকের মোহাবরণ মুক্ত করবার জন্যে যুগে যুগে মহৎ প্রাণের অভ্যুদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেখানে তার সোনা-রুপার খনি, যেখানে মানুষের অশনবসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্থূল ভূমিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই স্থূল মৃত্তিকাভাণ্ডারই তো পৃথিবীর মাহাত্ম্যভাণ্ডার নয়। যেখানে তার আলোক বিচ্ছুরিত, যেখানে নিশ্বসিত তার প্রাণ, যেখানে প্রসারিত তার মুক্তি, সেই ঊর্ধ্বলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ; সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য। মানবপ্রকৃতিতেও আছে স্থূলতা, যেখানে তার বিষয়বুদ্ধি, যেখানে তার অর্জন এবং সঞ্চয়; তারই প্রতি আসক্তিই যদি কোনো মূঢ়তায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে তা হলে শান্তি

থাকে না, সমাজ বিষবাষ্পে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লুব্ধতা প্রবল হয়ে উঠে মানুষে মানুষে হিংস্রবুদ্ধির আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে স্মরণ করি সেই মহাপুরুষদের যাঁরা মানুষকে সোনা-রুপার ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে আসেন নি, দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড়ো রাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা যাঁরা নন— মানুষের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মুক্তি সেই মুক্তি দান করা যাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন অনেক আছেন এখনো যাঁরা এই পৃথিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে সুন্দর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত করে দেয়। তেমনি মানুষের চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উদ্গার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্রজীবনের সংস্পর্শে। এই শুভচেষ্টা মানবলোকে যাঁরা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রতীক, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব এই বাণী যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই— যাঁরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যাঁর জন্মদিন বলে খ্যাত সেই যিশুর নিকটই উপস্থিত করি জগতে যাঁরা প্রণম্য তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখতে পেয়েছি কয়েকজনের মধ্যে। এই কল্যাণের দূত আমাদের ইতিহাসে অল্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হতে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেননা শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যাঁর কথা স্মরণ করছি তিনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, বিরুদ্ধতা শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্যত্ব চিরকালের মতো দেদীপ্যমান হয়ে আছে এ তো বইপড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল। এ'কে উপলব্ধি করা সহজ; শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাঁদের যাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি। সেই ভক্তির মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। খৃষ্টকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন তাঁরা শুধু একা বসে রিপু দমন করেন নি, তাঁরা দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দূর-দূরান্তরে, পর্বত সমুদ্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এইরকম আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে।

খৃষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। কী দানবতা আজ চার দিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন— তবু বলতে হবে: স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এই বিরাট কলুষনিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন— নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬ চৈত্র ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

পল্লীপ্রকৃতি

পল্লীপ্রকৃতি

পল্লীর উন্নতি

হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা— তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্বোধ নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপালদোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্বে পূর্বে দেখেছি। খেতে বললে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুশকিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল, সুতরাং সাহস বেশি ছিল, সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালির ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর-একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থপক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদি-বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি-চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড়ো একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বলতে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিই নে। সত্য কথাও খামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্তর মধ্যে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আসে। যেই, সময় পেলেই, দেখতে পায় সামনে গর্ত আছে, তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকারই নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল, সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনি নে, ক্ষেত্রও চিনি নে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সামলাতে পারি নে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তা হলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এমন কথা বলেন নি যে, 'এই আমাদের কাজ, এসো আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই।' তাঁরা বলেন নি

'কাজ করো', তাঁরা বলেছেন 'প্রার্থনা করো'। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর করো।

তাঁদের দোষ দিতে পারে নে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইচ্ছা করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখতে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে পথ দিয়ে এসেছি আজ সে পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে বলেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে 'আয় বৃষ্টি হেনে'। আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তা হলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখি নি। একদিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পসলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না। কত বৎসর ধরে কেবলমাত্র চাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হই নি। এমনতরো অদ্ভুত অসামর্থ কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক ছাত্র, দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত, তা হলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কিরকম বীভৎস হত— প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কিরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিসও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা, শাসন করা, এর প্রতি সদ্‌বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্‌ব্যয় হবে না তা নয়, অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারণ, আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা ও ধৈর্য চাই। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা, অমনি তার পরদিনেই কারখানা খুলে বসে সর্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনোরকমের মাল তৈরি করতে পারি নে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরিয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি, তবে দেশের সর্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ, সে অবস্থায় শক্তির কেবলই অপব্যয় হতে থাকবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে শয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্‌ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানছে তাকে আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্য পথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্যোগের চেহারা দেখছি, আমাদের

ফসলের খেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এটি শুভযোগ হয়ে উঠবে।

বস্তুত ফললাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ মাটিতে। এক দিকে মেঘের আয়োজন, এক দিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন সংস্পর্শে, চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠছে। আমাদের বিশেষ করে দেখতে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায়-উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এইজন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য জন্মে না। সেইজন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনোরকম বড়ো ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই সমস্ত নূতন নূতন কেরানিগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসছে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ্‌ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই তো গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা, যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে— বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে, সে দিকে এখনো কারও দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে— আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেইসঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কে হে, শহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কী জান।' আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মানতে পারি নে। কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমাদের দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন

উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানছেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর যাঁরা মানছেন না তাঁরা উদ্যম-সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকলপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই-একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, 'তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল করো।' এজন্য আমি সকলপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করি নি। কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারি নি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উলটো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না— উলটোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণীর অকৃতজ্ঞতা অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে, এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকলপ্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবি করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয় নি, কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক, আমি পারি নি তার কারণ আমাতেই বর্তমান, কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় 'আমিই সব করব'। রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম, এতে লাভ আমারই। এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভালো কাজ করব এ দিকে লক্ষ না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে, বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারি নে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বার বার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করে নি। আমি বললুম, 'তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।' তারা বললে, 'এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?'

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যেই যখন গ্রামের লোক বললে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' তখন তারা এই কথাই জানত যে, এ ক্ষেত্রে যে মাছটা ভাজা হবার

প্রস্তাব হচ্ছে সেটা আমারই পারত্রিক ভোজের, অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জ্বলে যাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দু-তিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনছে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-মোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয়, তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বলো, অন্ন বলো, বিদ্যা বলো, স্বাস্থ্য বলো, যে-কোনো অভাব-মোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন-কি, তার একপ্রকার অহংকার থাকে। সেই অহংকার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে ওঠে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠছে, পারলৌকিক বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়েমহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তার পরে দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন শহরে শহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃতী শহরে যায় কাজ করতে, ধনী শহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী শহরে যায় জ্ঞানের চর্চা করতে, রোগী শহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভালো কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা— এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতা-বৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে, তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড়ো অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে লোক দেবে এবং যে লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। এক দল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর-এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করে নি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্তে যে ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড়ো ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন, যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ছাড়া তাকে কোনোমতেই কোনো দয়ায় বা কোনো বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্য সহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।

দুর্বলতা যে কিরকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বললে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে, তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই— কোনো ধনীর এক পেয়াদা তরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দু-চার জন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর শহরে রটে গেল যে, পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আসছে। বোলপুরে কেউ-বা দরজায় স্ক্রু এঁটে দিলে, কেউ-বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো,

কেউ-বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চার জন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর বাজারে যখন আগুন লাগল তখন কেউ যে কারও সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে, তখন নিজের কলসিটা পর্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসি তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমন-কি, গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝি নে এবং এইটে বুঝি নে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এনট্রেন্স্ স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।

২৮ মার্চ ১৯১৫ বৈশাখ ১৩২২

ভূমিলক্ষ্মী

মাতার কাছে ছোটো ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে যাইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্তত

তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনায় অন্য কাজে কেন পাঠাইতে চাও।' সে বলিল, 'হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতেই আমাদের অভাব স্বচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে।'

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাষী ঠিকমত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিত না। কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল যখন খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হইত সেইখানকার প্রয়োজনেই তাহার খরচ হইত। তখন দেশে রেলের রাস্তা খোলে নাই। গোরুর গাড়ি এবং নৌকার যোগে বেশি পরিমাণ ফসল বেশি দূরে সহজে যাইতে পারিত না। তার পরে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না, সুতরাং তখন মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও ছিল অল্প। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবি বেশি ছিল না, আর সেই দাবি মিটাইবার আয়োজনও সহজ ছিল। তখন চাষ চলিত না এমন বিস্তর জমি দেশে পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি— একদিন যে জমি চাষীকে গছাইয়া দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই জমি দাম দিয়া মেলে না। তখন দুর্ভিক্ষের দিনে চাষী আপন জমিজমা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, প্রজা পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাষী প্রাণপণে জমি আঁকড়িয়া থাকে, কেননা জমির দাম বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তাহার একটা মস্ত কারণ এই যে, চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফসল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে, অথচ সমস্ত জমি চষিয়াও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

জমিও পড়িয়া রহিল না, ফসলেরও দর বাড়িয়া চলিল, অথচ সম্বৎসর দুইবেলা পেট ভরিবার মতো খাবার জোটে না, আর চাষী ঋণে ডুবিয়া থাকে, ইহার কারণ কী ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন কেন হয়— যখনি দুর্বৎসর আসে অমনি দেখা যায় কাহারও ঘরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নাই। কেন এক ফসল নষ্ট হইলেই আর-এক ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাহাকারের অন্ত থাকে না।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবি সামান্য ছিল, যখন অল্প ফসল পাইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তখনো যে নিয়মে চাষবাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে— প্রয়োজন অনেক বেশি হইয়াছে, অথচ প্রণালী সমানই আছে। জমি যখন বিস্তর পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বৎসরে চাষ দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ ছিল। এখন কোনো জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাষের প্রণালী যেমন ছিল তেমনই আছে।

চাষের গোরু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গোরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল ; রাস্তার পাশে, আলের উপরে, যেটুকু ঘাস জন্মে সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে, গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।

মনে করো কোনো গৃহস্থের যদি গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেক দিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুরুনদিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাতনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিংবা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন। ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরো বেশি বাহির করিতে হইবে।

আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি তাহার বেশি পাইব কী করিয়া। এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন-অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে— নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুকুকে ফসল জোগান দিতাম যে প্রণালীকে, সমস্ত পৃথিবীকে ফসল জোগান দিতে হইলে সে প্রণালী খাটিবে না। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, আগেকার মতন ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্যই খাটানো ভালো, ইহা বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া দুই বেলা দুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো আমাদের চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে বর্তমান কালে সে টিকিতে পারিবে না। আমাদের ধন্যধান্য, ধর্মকর্ম, জ্ঞানধ্যান সমস্তই আজ বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করিতেই হইবে ; যাহা কেবলমাত্র আমদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিয়াছে, অয়মহং ভোঃ ! তাহাতে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহ আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডীর মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।

তাই আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়— সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা এই পত্রিকার উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।

আশ্বিন ১৩২৫

শ্রীনিকেতন

সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কথিত

বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ-সমীরণে ; হয়তো কোনো গাছ নির্জীব, এই আহ্বানের সে জবাব দিলে না— সে তার পত্রপুষ্প বিকশিত করলে না, সে মূর্ছিত হয়েই রইল। যে গাছের অন্তরে রসের ধারা আছে, বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে যখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনই তো উৎসব।

আমাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিশ্বসিত। যেখানে সে

বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে একদিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানকে যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলক্ষ করে একটি সৃষ্টির সূচনা হল। কোথায় যে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে না। সূর্যকিরণসম্পাতে পর্বতশিখরে নিশ্চল কঠিন তুষার যেদিন গলে যায়, সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন্ কোন্ দেশকে ফলশালী করে সাগরে গিয়ে পৌঁছবে সেদিন তা কেউ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু গতি যেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেগে আপনার ভাগ্যকে বহন করে চলে। কত বিচিত্র শাখায় যে তার পরিণতি হবে সে তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা যে তার রুদ্ধ শক্তি মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একদা দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন আমরা কোনো-একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলাম, তাই নিয়ে আত্মাভিমানের ছোটো কথাটি আজকের কথা নয়। আমাদের আনন্দ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হবার চেষ্টা জেগেছে ; সেই মিলনসাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আজ তপস্যার দীক্ষাগ্রহণের স্মরণের দিন। আজ মনকে নম্র করো, আপনার মধ্যে যে দীনতা রয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন করো— আনন্দে এবং গৌরবে। আজকে বিচার করে দেখতে হবে, যে কাজের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কী। আমাদের উদ্‌বৃত্তটুকু নিয়ে আমরা দাতাবৃত্তি করতে চাই নি। দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান— বাইরের অপমান তারই আনুষঙ্গিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার শহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ও চীনে, প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ববোধের স্বতশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আমাদের কোন্ ভাগ্যদোষে সমাজের এই ব্যাপক ব্যবস্থার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ! রাজশক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন স্ফূর্তিকে চার দিক থেকে নিরস্ত করে দিলে। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে খাদে সহজে সঞ্চরণ করত, ব্যাবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সুবিধা করবার জন্যে তারই মাঝে মাঝে বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। এই বাঁধগুলিই হচ্ছে শহর। এ আমাদের দেশের প্রাণপ্রকৃতির মূলে ঘা দিয়েছে। শহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তীব্রতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাহিরে ঘন দুঃখের ছায়া কিরূপ অন্তহীন। অন্ন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আনন্দ নেই, আলোর পর আলো একে একে নিবল। যদি দেখতুম যা হারিয়েছি, শহরে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেলুম, তা হলেও সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু যা পাওয়া গেল সে তো কল-কারখানার জিনিস, আপিস-আদালতের জিনিস, বেচা-কেনার জিনিস, সে তো স্বপ্রকাশ প্রাণের জিনিস নয়। তাতে সুবিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেখানে আপনাকে উপলব্ধি করে না— সেখানে যেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীয়ের অভিসারে সে আপন কুল খোয়াতে বসেছে।

এ দুর্গতি কিসে দূর হবে।

ছোটো ছোটো আনুকূল্যের দ্বারা তো হবে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা, সমস্যাকে খণ্ড করে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্‌বোধিত করে। তার থেকে সে যা-কিছু ফল পায়, সে ফল তত মূল্যবান নয় যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্মশক্তির উপলব্ধি। এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে সৃষ্টিকর্তা। আমাদের এই আপন সৃষ্টিশক্তির মধ্যে আমরা বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ পাই। তার সঙ্গে সহযোগিতাতেই আমাদের গৌরব,

আমাদের কল্যাণ। যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ, সেইখানেই আমাদের যত-কিছু দুর্গতি। যেখানে বিশ্বসৃষ্টিতে আমাদের কাজের বিধান নেই, কেবল ভোগের বরাদ্দ, সেইখানে তো আমরা পশু। মানুষ আপন ভাগ্যকে আপনি গড়ে তোলে, সেই তার আপন জগৎ। আত্মকর্তৃত্বের, আত্মসৃষ্টির সেই জগৎ যদি হারিয়ে থাকি, তবে সবই হারিয়েছি। মানুষের মধ্যে যিনি ঈশ্বর আছেন তাঁর উদ্‌বোধন করতে হবে। আমরা এই গ্রামের দ্বারে এসে সেই দেবতাকে ডাকছি, অন্তরের মধ্যে রুদ্ধদ্বার হয়ে রয়েছেন বলে যাঁর পূজা হচ্ছে না। মানুষ জড়ের মতন হয়ে রয়েছে, শুষ্ক কাষ্ঠের মতন, যার ফল নেই, ফুল নেই। মনুষ্যত্বের এত বড়ো অবমাননা তো আর হতে পারে না।

প্রশ্নকারী বলতে পারেন, তেত্রিশ কোটির তোমরা কী করতে পার। কিন্তু বিধাতা তো তেত্রিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেন নি? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কী করছ। যে কার্যক্ষেত্র তোমার, সেখানে তুমি নিজেকে সত্য করেছ কি না।' তেত্রিশ কোটির কী করতে পারি, এ প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁরা সত্যকাজের পথকে রুদ্ধ করেন। দুঃসাধ্যসাধনের চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসাধ্যসাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। যারা আমাদের চার দিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বালতে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন করে চলবে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোটো জায়গায় সার্থক করে তুলি, তা হলে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস কোরো না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হলেও দিগ্‌বিজয়ী। আপনার অন্তরের দীনতাকে দূর করো; তপস্যাকে সার্থক করে তোলো; তা হলে এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে— শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ছায়াদান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পল্লীপ্রকৃতি

মৌমাছি মৌচাক রচনা করলে, তার গোড়াকার কথাটা তাদের অন্নের ব্যবস্থা। ফুলে ফুলে কণা কণা মধু; কোনো ঋতু উদার, কোনো ঋতু কৃপণ, যে মৌমাছিরা দল বেঁধে সংগ্রহ আর দল বেঁধে সঞ্চয় করতে পারলে, মৌচাকে পত্তন হল তাদের লোকালয়। লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়, ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।

অনেকে ভোগ করবার থেকে যেটা আরম্ভ হল অনেকে ত্যাগ করবার দিকে সেটা নিয়ে গেল। নিজের জন্য কাজ করার চেয়ে সকলের জন্যে কাজ করাটা হয়ে উঠল বড়ো, সকলের প্রাণযাত্রার মধ্যেই নিজের প্রাণের সার্থকতা বোধ জন্মাল— এরই থেকে বর্তমান কালকে ছাড়িয়ে অনাগত কালকে সত্য বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হল; যে দান নিজের আয়ু-কালের মধ্যে নিজের কাছে পৌঁছবে না, সে দানেও কৃপণতা রইল না; লোকালয় বলতে এমন একটি আশ্রয় বোঝাল যেখানে নিজের সঙ্গে পরের, বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রসারিত। এই হল অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ অন্ন যেই বৃহৎ হয়েছে অমনি সে স্থূলভাবে অন্নকে ছাড়িয়ে এমন-একটি সত্যকে প্রকাশ করেছে যা মহান। আদিমকালে পশুশিকার করে মানুষ জীবিকানির্বাহ করত, তাতে লোকালয় জমে উঠতে পারে নি; অনিশ্চিত অন্ন-আহরণের চেষ্টায় সকলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন তাদের স্বভাব ছিল হিংস্র, দস্যুবৃত্তি ছিল ব্যবসায়, ব্যবহার ছিল অসামাজিক।

মানুষের অন্নব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও প্রচুর হতে পেরেছে বড়ো বড়ো নদীর কূলে— যেমন নীলনদী,

ইয়াংসিকিয়াং, অক্‌সাস, য়ুফ্রেটিস, গঙ্গা, যমুনা— সেইখানে জন্মেছে বড়ো বড়ো সভ্যতা, অর্থাৎ লোকালয়বন্ধনের সুব্যবস্থা। পলিমাটিতে ভূমিকর্ষণ করে মানুষ যখন একই জায়গায় বৎসরে বৎসরে প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনি অনেক লোক এক স্থানে স্থায়ীভাবে আবাস পত্তন করতে পারল— তখনি পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরকে আনুকূল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেলে। একত্র মেলবার যে সামাজিক মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্নসংস্থানের সুযোগের দ্বারা সেইটে জোর পেয়ে উঠল। মানুষ ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ পেলে, একত্র সবাই পাত পেড়ে বসল, তখন পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের সন্ধান মিলল, বহুপ্রাণ এক-অন্নের দ্বারা এক প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার করল। তখন দেখেতে পেলে পরস্পরের যোগ কেবলমাত্র সুযোগ নয়, তাতে আনন্দ। এই আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিস্বীকার, এমন-কি, মৃত্যুস্বীকারও সম্ভবপর হয়।

পৃথিবীর আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল-খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেই রূপ দেখে মানুষ কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না; সে উৎসবের আয়োজন করে, সে দেখতে পায় লক্ষ্মীকে যিনি একই কালে সুন্দরী এবং কল্যাণী। ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্যের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্যপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপ রস বর্ণ গন্ধ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রণের সৌহার্দ্যের ডাক। পৃথিবীর অন্ন যেমন সুন্দর, মানুষের সৌহার্দ্য তেমনি সুন্দর। একলা যে অন্ন খাই তাতে আছে পেট ভরানো, পাঁচজনে মিলে যে অন্ন খাই তাতে আছে আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার যজ্ঞক্ষেত্রে অন্নের থালি হয় সুন্দর, পরিবেশন হয় সুশোভন, পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।

দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সংকুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েছে মানুষের গ্রাম। মানুষের মধ্যে যা অমৃত তার প্রকাশ হল এই মিলন থেকে— তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মানুষ গভীরভাবে আত্মপরিচয় পেলে, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।

গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উদ্ভব। সেখানে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত; সেখানে সৈনিকের দুর্গ, বণিকের পণ্যশালা, বিদ্যাদান ও বিদ্যা-অর্জনের উদ্দেশে বহু স্থান থেকে এক স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশ, দূর পৃথিবীর সঙ্গে জানাশোনা দেনা-পাওনার যোগ। সেখানে মাটির বুকের 'পরে জগদ্দল পাথর, জীবিকা সেখানে কঠিন, শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা। সেখানে সকল মানুষকে হার মানিয়ে একলা-মানুষ বড়ো হতে চাচ্ছে। বাড়াবাড়ি না হলে তারও ফল মন্দ নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি অতিশয় চাপা পড়ে তা হলে ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষ ঘটে না। সমান-মাথা-ওয়ালা ঝোপগুলোর চাপে বনস্পতি বেঁটে হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অত্যাকাঙ্ক্ষা অগ্নিবাষ্পের ঠেলায় জনসঙ্ঘের সাধারণ আশ্রয়ভূমিকে উঁচুর দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, উৎকর্ষের আদর্শ বেড়ে ওঠে, পরস্পরের নকলে ও রেষারেষিতে মানুষের শক্তির চর্চা অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে থাকে, জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রে নবনবোন্মেষ সম্ভবপর হয়, নানা দেশের নানা জাতির চিত্তসমবায়ে বিদ্যার আয়তন প্রশস্ত হয়ে ওঠে। শহরে, যেখানে সমাজের চাপ অতিঘনিষ্ঠ নয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুযোগ পায়, মানসশক্তি একটা সাধারণ আদর্শের অনুচ্চ সমতলতা ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। এই কারণেই বুদ্ধির জড়তা ও সংকীর্ণতা সকল দেশেই সকল কালেই গ্রাম্যতার নামান্তর হয়ে আছে।

শহরে মানুষ আপন কর্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে; তার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহে প্রাণশক্তি যেমন এক দিকে ব্যাপ্ত, তেমনি আবার এক এক জায়গায় তা বিশেষ ও বিচিত্র -ভাবে সংহত। নিম্নশ্রেণীর জীবদেহে এই মর্মস্থানগুলি সংহত হয়ে ওঠে নি। দেহবিকাশের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ড পাকযন্ত্র বিশেষ বিশেষ দেহক্রিয়ার স্বতন্ত্র যন্ত্র হয়ে উঠল। এইগুলিকে শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শহরগুলি লোকালয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের কেন্দ্র, মানুষের উদ্যম এক এক স্থানে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সংহত হয়ে তাদের সৃষ্টি করেছে। পূর্বকালে ধনসৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন-সাধনে যন্ত্রের হাত ছিল অতি সামান্যই। তখনকার যন্ত্রগুলির সঙ্গে মানুষের শরীর-মনের যোগ সর্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্যে তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারত তা ছিল পরিমিত, আর তার মুনফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। সুতরাং তখন পণ্যরচনায় কর্মশক্তির আনন্দটা ছিল প্রধান, কর্মফলের লোভটা তার চেয়ে খুব বড়ো হয়ে ওঠে নি। তাই তখনকার নগরগুলি মানুষের কীর্তির আনন্দরূপ গ্রহণ করতে পারত।

অন্যান্য সকল রিপুর মতোই লোভটা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি। এইজন্যেই মানুষ তাকে রিপু বলেছে। বাইরে থেকে ডাকাত যেমন লোকালয়ের রিপু, ভিতর থেকে লোভটা তেমনি। যতক্ষণ এই রিপু পরিমিত থাকে ততক্ষণ এতে করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কর্মোদ্যম বাড়িয়ে তোলে, অথচ সমাজনীতিকে সেটা ছাপিয়ে যায় না। কিন্তু লোভের কারণটা যদি অত্যন্ত প্রবল ও তার চরিতার্থতার উপায় অত্যন্ত বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সমাজনীতি আর তাকে সহজে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আধুনিক কালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল করে উঠছে। দেখতে দেখতে চারি দিকে কেবল লড়াই ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। এইরকম অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চলে যায়, শহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

আজ গ্রামের আলো নিবল। শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলল— সে আলোয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সংগীত নেই। প্রতি সূর্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্যাস্তে যে আরতির প্রদীপ জ্বলত, সে আজ লুপ্ত, ম্লান। শুধু-যে জলাশয়ের জল শুকোলো তা নয়, হৃদয় শুকোলো। জীবনের আনন্দে মাঠের ফুলের মতো যে-সব নৃত্যগীত আপনি জেগে উঠত তারা জীর্ণ হয়ে ধুলায় মিলিয়ে গেল। প্রাণের ঔদার্য এতকাল আপনিই আপনার সহজ আনন্দের সুন্দর উপকরণ আপনিই সৃষ্টি করেছে— আজ সে গেল বোবা হয়ে, আজ তাকে কলে-তৈরি আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে— যতই নিচ্ছে ততই নিজের সৃষ্টিশক্তি আরো অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বেশি দিনের কথা নয়, নবাবি আমলে দেখা গেছে, তখনকার বড়ো বড়ো আমলা যাঁরা রাজদরবারে রাজধানীতে পুষ্ট, জন্মগ্রামের সমাজ-বন্ধনকে তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁরা অর্জন করেছেন শহরে, ব্যয় করেছেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেছে— নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হয়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে প্রাণের ধারা শহরে চলে যাচ্ছে, গ্রামের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যোগ আর থাকছে না।

আজ ধূমকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজল, মানুষকে দলে দলে তার স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে। মানুষ আবার ফিরল তার প্রথম আরম্ভের অবস্থায়— সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল ; আপন আপন স্বতন্ত্র ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে লাগল ; তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে। গ্রামে একদিন অনেক মানুষ মিলেছিল, সকলে মিলে সংগ্রহ সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্যে। এখন সংখ্যায় তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ একত্র মিলল, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের ভোগের কেন্দ্র নিজে। তাই সমাজের সহজ বিধানের চেয়ে পুলিসের পাহারা কড়া হয়ে উঠল— আত্মীয়তার জায়গায় আইনের জটিলতা বাইরের শিকল পাকা করে তুলছে। নিজেরা প্রত্যেকেই যেখানে নিজের ভোগের কেন্দ্র, সেখানে আমরা হয় পরের দাসত্ব করি নয় নিজের, কিন্তু দুই-ই দাসত্ব। এই কর্মপাশবদ্ধ মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যারা মিলল, অন্তরের ক্ষেত্রে তাদের মিল নেই বলে এই-সব পরদাস ও আত্মদাসদের মনে ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রবল ; প্রতিযোগিতার মন্থনদণ্ডে মিথ্যা ও হিংসাকে এরা নানা আকারে কেবলই মথিত করে তুলছে। ধনী দরিদ্রে অন্তত আমাদের দেশে বিচ্ছেদ অতিমাত্র ছিল না— তার একটা কারণ, ধনের সম্মান অন্য-সব সম্মানের নীচে ছিল ;

আর-একটা কারণ, ধনী আপন ধনের দায়িত্ব স্বীকার করত। অর্থাৎ, ধন তখন অসামাজিক ছিল না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠত। তখন মান অপমান ও ভোগের তারতম্য ধনকে আশ্রয় করে স্পর্ধিত আত্মম্ভরিতার সঙ্গে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করে নি। আজ অন্নব্রহ্ম লোভের অন্ন হয়ে ছোটো হয়ে যেতেই একদিন যা সমাজ বেঁধেছে আজ তাই সমাজ ভাঙছে— রক্তে ভাসাচ্ছে পৃথিবী, দাসত্বে জীর্ণ করছে মানুষের মন। আজ তাই ধন-অধনের উৎকট অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্যে চার দিকেই উত্তেজনা।

এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের দ্বারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবকে যারা বাহন করে তারা এক অসামঞ্জস্য থেকে আর-এক অসামঞ্জস্যে লাফ দিয়ে চলে, তারা সত্যকে ছেঁটে ফেলে সহজ করতে চায়। তারা ভোগকে রাখে তো ত্যাগকে তাড়ায়, ত্যাগকে রাখে তো ভোগকে দেশছাড়া করে— মানবপ্রকৃতিকে পঙ্গু করে তবে তাকে শাসনে আনতে চায়। আমরা এই কথা বলি যে, সত্যকে সমগ্রভাবে না নিতে পারলে মানবস্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়— বঞ্চিত করলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন-কি, ঐ যে কলের কথা বলছিলুম— তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য করছি বলেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অঙ্গ। এ একেবারেই মানুষের জিনিস। হাতকে দিয়ে ডাকাতি করেছি বলে যে তাকে কেটে ফেললে মঙ্গল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। নিজেকে পঙ্গু করে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনোটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।

আদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির কোনো-একটা শক্তিরহস্য যেই সে আবিষ্কার করে, অমনি যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী করে তাকে আপনার ব্যবহারের করে নেয়। এর থেকেই তার সভ্যতায় এক-একটা নূতন পর্যায়ের আরম্ভ। প্রথম যেদিন যে লাঙল তৈরি করে মাটির উর্বরতাশক্তিকে কর্ষণ করতে পারলে, সেদিন তার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড়ো পর্দা উঠে গেল। সেই উন্মীলিত আবরণ কেবল যে তার অন্নশালাকে বৃহৎ করে অবারিত করলে তা নয়— এতদিন তার মনের যে অনেক কক্ষ অন্ধকার ছিল, তার মধ্যে আলো এনে ফেলল। এই সুযোগে সে নানা দিকেই বড়ো হয়ে উঠল। একদিন পশুচর্ম ছিল মানুষের দেহের আচ্ছাদন— যেদিন চরকায় তাঁতে সে প্রথম কাপড় বুনলে, সেদিন কেবল যে সে সহজে দেহ ঢাকতে পারলে তা নয়, এতে তার শক্তিকে বড়ো করে উদ্‌বোধিত করাতে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হল। তাই শুধু মানুষের দেহ নয়, আজকের দিনের মানুষের মন হচ্ছে কাপড়-পরা মন— মানুষে যে মানবলোক সৃষ্টি করছে কাপড়টা তার একটা বড়ো উপাদান। আজকের দিনে আমাদের দেশে আমরা ন্যাশনাল কাপড়টা খাটো করছি, কিন্তু ও দিকে ন্যাশনাল পতাকাটা বেড়ে চলল। তার মানে কাপড়টা কেবল একটা আচ্ছাদন নয়, ওটা একটা ভাষা। অর্থাৎ কাপড়ে মানুষের মন নিজেকে প্রকাশ করবার একটা নূতন উপাদান পেলে। এ কথা সবাই জানে, পাথরের যুগ থেকে মানুষ যখন লোহার যুগে এল তখন কেবল যে তার বাহ্যশক্তির বৃদ্ধি হল তা নয়, তার আন্তরিক শক্তি প্রসার পেলে। পশুর চার পায়ের অবস্থা থেকে যেদিন মানুষ দুই হাত দুই পায়ের অবস্থায় এল তখনই এর গোড়া-পত্তন। দুই হাত থাকাতে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের বেড়ে গেছে— এই তার দেহশক্তির বিশেষত্ব থেকে তার মনের শক্তি বিশেষত্ব পেলে। সেইদিন থেকে হাতের সাহায্যেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি করে হাতকেই বহুগুণিত করে চলেছে। তাতে করেই বিশ্বের সঙ্গে তার ব্যবহার কেবলই বেড়ে উঠছে, তার থেকেই তার মনের রুদ্ধদ্বার নানা দিকে খুলে যাচ্ছে। কোনো সন্ন্যাসী যদি বলেন যে, বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহারের শক্তিকে সংকুচিত করতে হবে, তা হলে গোড়ায় মানুষের হাত দুটোকেই অপরাধী করতে হয়। ঘোরতর সন্ন্যাসী ততদূর পর্যন্তই যায়। সে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকে ; বলে, 'সংসারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহারই নেই, আমি মুক্ত।' হাতের শক্তিকে খানিক দূর পর্যন্তই এগোতে দেব, তার বেশি এগোতে দেব না— এটা হচ্ছে ন্যূনাধিক

পরিমাণে সেই উর্ধ্ববাহুত্বের বিধান। এত বড়ো শাসনের অধিকার পৃথিবীতে কার আছে। বিশ্বকর্মা মানুষকে যতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসবার জন্যে আহ্বান করেন তাকে ততদূর পর্যন্ত এগোতে দেব না— বিধাতৃদত্ত শক্তিকে পঙ্গু করবার এমন স্পর্ধা কোন্ সমাজবিধাতার মুখে শোভা পায়! শক্তির ব্যবহারের পন্থাই আমরা সমাজকল্যাণের অনুগত করে নিয়মিত করতে পারি, কিন্তু শক্তির প্রকাশের পন্থা আমরা অবরুদ্ধ করতে পারি নে।

মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠে নি, এও সেই একই কারণ।

আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান্ অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে। এ স্থলে আমাদের এই কথাই বলতে হবে— যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল -বিশেষ সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে— শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই। মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডারজাত করে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই এক যুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধরে দিন চালাতে পারব না। আজ আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক।' মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা।

মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আবাহন করে আনতে পারে নি বলেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চার দিকে যা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য। পরাভবের অবসাদে মানুষ নড়তে পারছে না, তাই এত দিকে তার এত অভাব। মানুষ বলছে, 'পারলুম না।' শুষ্ক জলাশয় থেকে, নিষ্ফল ক্ষেত্র থেকে, শ্মশানভূমিতে যে চিতা নিবতে চায় না তার শিখা থেকে কান্না উঠছে, 'পারলুম না, হার মেনেছি।' এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী। আমাদের ফসল-খেতে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটাকতক সতরঞ্চ বুনিয়েছি— আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। যে বড়ো শক্তিকে আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারি নি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি; আজকের এই অল্পকিছু সংগ্রহ যা আমাদের সামনে রয়েছে সেই দানবের সঙ্গে লড়াই করবার যথোচিত উপকরণ তা নয়।

পুরাণে পড়েছি, একদিন দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতারা হেরে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা আপনাদের গুরুপুত্রকে দৈত্যগুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিদ্যা দেবলোকে আনাই ছিল তাঁদের সংকল্প। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেন নি, 'দানবী বিদ্যাকে আমরা চাই নে।' দানবদের কাছ থেকে বিদ্যা নিয়ে তাঁরা দানবপুরী বানাতে ইচ্ছা করেন নি, সেই বিদ্যা

নিয়ে তাঁরা স্বর্গকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হতে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েছে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়— বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।

আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্বদাই শুনতে পাই, য়ুরোপের বিদ্যা আমরা চাই নে এ বিদ্যায় শয়তানি আছে। এমন কথা আমরা বলব না। বলব না, শক্তি আমাদের মারছে, অতএব অশক্তিই আমদের শ্রেয়। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, তাকে ত্যাগ করলে মার বাড়ে বৈ কমে না। সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্য আমাদেরকে বিনাশ করে, তখন তার প্রতি অভিমান করে বলা মূঢ়তা যে 'সত্যকে চাই নে'।

উপনিষদ্ বলেন, যিনি এক তিনি 'বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'— নানা জাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ, অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তা হলেই দানের জিনিস তার নিজের হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই-যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিযোগাৎ'— বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিক্‌গামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন— তারই যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন করে জয় করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক— একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক-না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি করে থাকে ; সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য, যে অশক্তি, তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকেরই শেষে আছে— সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি-দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ বৈশাখ ১৩৩৫

দেশের কাজ

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে কথিত

আমাদের শাস্ত্রে বলে ছটি রিপুর কথা— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তাকেই রিপু বলে, যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে। এমনি করে নিজেকে হারানোই মানুষের সর্বনাশ করে, এই রিপুই জাতির পতন ঘটায়। এই ছটি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে তার প্রাণে, নিরুদ্যম করে দেয় তার আত্মকর্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উলটো হচ্ছে মদ— অহংকারের মত্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি ; আর গর্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড়ো করে তোলে। এ জগতে অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে। স্পর্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। আমাদের মরণ কিন্তু উলটো পথে— আমাদের আচ্ছন্ন করেছে অবসাদের কুয়াশায়।

একটা অবসাদ এসে আমাদের শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এককালে আমরা অনেক কর্ম করেছি, অনেক কীর্তি রেখেছি, সে কথা ইতিহাস জানে। তার পর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল ভারতবাসীর চিত্তে, আমাদের দেহে মনে অসাড়তা এনে দিলে। মনুষ্যত্বের গৌরব যে আমাদের অন্তর্নিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জন্যে যে আমাদের প্রাণপণ করতে হবে, সে আমাদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে আমরা নিজের মরার পথ বাধামুক্ত করেছি, তার পর যাদের আত্মম্ভরিতা প্রবল, আমাদের মার আসছে তাদেরই হাত দিয়ে। আজ বলতে এসেছি, আত্মাকে অবমানিত করে রাখা আর চলবে না। আমরা বলতে এসেছি যে, আজ আমরা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেম। একদিন সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেম। তখন জলাশয়ে জল ছিল, মাঠে শস্য ছিল, তখন পুরুষকার ছিল মনে। এখন সমস্ত দূর হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কোনো উপায় নেই এত বড়ো মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাই-চাপা পড়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। এ কথা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে স্বীকার না করি, তবে বুঝব এটাই মোহ। অর্থাৎ, যা নয় তাই মনে করে বসা।

একটা ঘটনা শুনেছি— হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেইরকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় করব, সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেছি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে প্রাণস্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসো, একত্রে কাজ করি।

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকৃতীর্ণমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥

এই ঐক্য যাতে স্থাপিত হয়, তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আামদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলি-স্খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব-কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব— একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনোই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।

রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী বারোটি গ্রাম একত্র করে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, 'আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়।' যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ। দুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েছি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। চৈতন্যের দুটি পন্থা আছে। এক হচ্ছে মহাপুরুষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে দেন। তখন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তখন সকল কাজই সহজ হয়। আবার দুঃখের দিনও শুভদিন। তখন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তখন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উদ্যত হয়ে উঠি। একান্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কী করে আনুকূল্য দাবি করতে হয় অন্য দেশে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ইংলন্ড আজ যখন দৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত তখন সে ঘোষণা করেছে, দেশের লোকে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবে। পথে পথে ঘরে ঘরে এই ঘোষণা যে, দেশজাত পণ্যদ্রব্যই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বহুদিনের বহু-অন্ন-পুষ্ট জাতের মধ্যে যখনই বেকার-সমস্যা উপস্থিত হল তখনই দেশের ধন নিরন্নদের বাঁচাতে লেগেছে। এর থেকে দেখা যায় সেখানে দেশের লোকের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ্ দেশব্যাপী আত্মীয়তা। তাদের উপরে আনুকূল্য রয়েছে সদাজাগ্রত। তাতে মনের মধ্যে ভরসা হয়। আমরা বেকার হয়ে মরছি অথচ কেউ আমাদের খবর নেবে না, এ কোনোমতেই হতে পারে না, এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাদের এত ভরসা। আমাদের ভরসা নেই। মারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, জাতিকে অবসন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমের সাধনা কই, সেবার উদ্যোগ কোথায়। যে বৃহৎ স্বার্থবুদ্ধিতে বড়ো রকম করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে আমাদের কোথায়।

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে— কোমর বেঁধে বলতে চাই, কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত— অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর হয়, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারত, তা হলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে বলতুম না। কিন্তু আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় কখানা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ চৈত্র ১৩৩৮

উপেক্ষিতা পল্লী

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকৃতীর্ণমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥

এখানে তোমরা, যাহাদের মন বিব্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে এক ভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোবি বঃ।
অন্যোন্য মভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥

তেমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি করো।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমূত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া।

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। এক-গতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বলো।

আজ যে বেদমন্ত্র-পাঠে এই সভার উদ্‌বোধন হল অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা বুঝতে পারি, মানুষের পরস্পর মিলনের জন্যে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীতে কতবার কত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে এবং আবার তাদের বিলয় হল। জ্যোতিষ্কের মতো তারা মিলনের তেজে সংহত হয়ে প্রদীপ্ত হয়েছিল। প্রকাশ পেয়েছিল নিখিল বিশ্বে, তার পরে আলো এল ক্ষীণ হয়ে; মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাদের পরিচয় মগ্ন হল অন্ধকারে। তাদের বিলুপ্তির কারণ খুঁজলে দেখা যায় ভিতর থেকে এমন কোনো রিপুর আক্রমণ এসেছে যাতে মানুষের সম্বন্ধকে লোভে বা মোহে শিথিল করে দিয়েছে। যে সহজ প্রয়োজনের সীমায় মানুষ সুস্থভাবে সংযতভাবে পরস্পরের যোগে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে, ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা সেই সীমাকে নিরন্তর লঙ্ঘন করবার চেষ্টায় মিলনের বাঁধ ভেঙে দিতে থাকে।

বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন-পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল, এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফলফুল-উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায়— তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা। য়িহুদীদের পুরাণে বেবল্-এর জয়স্তম্ভ-রচনার উল্লেখ আছে, সেই স্তম্ভ যতই অতিরিক্ত উপরে চড়ছিল ততই তার উপরে লাগছিল নীচে নামাবার নিশ্চিত আকর্ষণ।

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে ভুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমায় কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে

সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রায় সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা। মানবসভ্যতার প্রধান জীবনীশক্তি তার সামাজিক শ্রেয়োবুদ্ধি, যার প্রেরণায় পরস্পরের জন্যে পরস্পর আপন প্রবৃত্তিকে সংযত করে। যখন লোভের বিষয়টা কোনো কারণে অত্যুগ্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অসাম্য সৃষ্টি করতে থাকে। এই অসাম্যকে ঠেকাতে পারে মানুষের মৈত্রীবোধ, তার শ্রেয়োবুদ্ধি। যে অবস্থায় সেই বুদ্ধি পরাভূত হয়েছে তখন ব্যবস্থা-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা আজ সকল দিকেই প্রবল। বর্তমান সভ্যতা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি করে আপন জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হৃদয়বান মানুষের চেয়ে হিসাব-করা ব্যবস্থাযন্ত্র বেশি প্রাধান্য লাভ করে। একদা যে ধর্মসাধনায় রিপুদমন করে মৈত্রীপ্রচারই সমাজের কল্যাণের মুখ্য উপায় বলে গণ্য হয়েছিল আজ তা পিছনে সরে পড়েছে, আজ এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধি। তাই দেখতে পাই এক দিকে মনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রজাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপর দিকে অন্যোন্যজাতিক শান্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অফ নেশন্‌স্‌। আমাদের দেশেও এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে ; যা-কিছুতে একটা জাতিকে অন্তরে বাহিরে খণ্ড বিখণ্ড করে, যে-সমস্ত যুক্তিহীন মূঢ় সংস্কার মনের শক্তিকে জীর্ণ করে দিয়ে পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে থাকে, তাকে ধর্মের নামে, সনাতন পবিত্র প্রথার নামে, সযত্নে সমাজের মধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্য-বিধি-দ্বারা, পার্লামেন্টিক শাসনতন্ত্র নাম -ধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়, এমন দুরাশা মনে পোষণ করি— তার প্রধান কারণ, মানুষের আত্মার চেয়ে উপকরণের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। উপকরণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কোঠায় পড়ে, শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম। সেই কারণেই যখন লোভরিপুর অতিপ্রাবল্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানাটানিতে মানবসম্বন্ধের আন্তরিক জোড়গুলি খুলে গেছে তখন বাইরে থেকে জটিল ব্যবস্থার দড়াদড়ি দিয়ে তাকে জুড়ে রাখবার সৃষ্টি চলেছে। সেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক। এ কথা মনে রাখতেই হবে, মানবিক সমস্যা যান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব।

বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় এক দল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেইরকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে— অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ-উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। ওই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু নগরে একান্ত কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

আজ য়ুরোপ থেকে রিপুবাহিনী ভেদশক্তি এসে আমাদের দেশে মানুষকে শহরে ও গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। আমাদের পল্লী মগ্ন হয়েছে চিরদুঃখের অন্ধকারে। সেখান থেকে মানুষের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। কৃত্রিম ব্যবস্থায় মানবসমাজের সর্বত্রই এই-যে প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা এনেছে, একদিন মানুষকে এর মূল্য শোধ করতে দেউলে হতে হবে। সেই দিন নিকটে এল। আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনের ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে

যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনাপাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায় যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থসঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাবমোচনের জন্যে লাগছে না। এই যে গায়ের জোরে দেনাপাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। এইরকম অবস্থা ছোটো বড়ো নানা কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর সর্বত্রই পীড়া সৃষ্টি করে বিনাশকে আহ্বান করছে। সমাজে যারা আপনার প্রাণকে নিঃশেষিত করে দান করছে প্রতিদানে তারা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না, এই অন্যায় ঋণ চিরদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পারে না।

অন্তত ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।

এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে— কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে। পরীক্ষায়-পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্তে পড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা ; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ চৈত্র ১৩৪০

অরণ্যদেবতা

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ -উৎসবে কথিত

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারি দিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারি দিকে তাঁর তৃণশষ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয় নি ; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি

সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান ; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ যে হারাল ; সে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইঁটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে ; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে— এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ-আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।

এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদ্‌কে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে ; তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন— মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে ; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ— হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য ; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৪৫ কার্তিক ১৩৪৫

অভিভাষণ

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্‌বোধন

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাগ্রস্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক্‌।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক, অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের স্বভাব অন্যরকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এ দিক-ও দিক করলেই কানে ধরে তাকে শায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ

সেই পথে চলেছে ; তাতে সময় লাগে বেশি, কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতরো. বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহেপ্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে-সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দপ্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ— জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়— তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রি করব না।' এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি ? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের

মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি, যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাব-বশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি— তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমত তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত— সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারি দিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরো লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই-সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ পৌষ ১৩৪৫

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত

আমার যা বলবার ছিল তা অনেকবার বলেছি, কিছু বাকি রাখি নি। তখন শরীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে খর্ব করেছে, এখন আমার কাছে তোমরা বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

আমি এখানে অনেকদিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়— আমার উপস্থিতি ও সঙ্গমাত্র তোমাদের দিতে পারি। প্রথম যখন এই বাড়ি কিনলুম তখন মনে কোনো বিশেষ সংকল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল যে, শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষে শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ বিদ্যার কিছু বেশি দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই-সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ-দুঃখ নালিশ-আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটীর— আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম-বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা-আদায়, জমা-ওয়াশীল— এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলুম না ; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময় আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি, পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমনভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্তদিন তাদের দরবার নিয়ে দিন

কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথনির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে— তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে— মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবাল। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘরভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধরে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বললে, 'ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি!' তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। একজন সম্পন্ন লোক গ্রামের পালক ও আশ্রয়; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার, তাঁরই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করেছি। যারা ধনী, ভারতবর্ষের সমাজ তাদের উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে; পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মন্দিরনির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই-সব কর্তব্যসম্পাদনেই ছিল তাদের সম্মান;

এখনকার মতো খেতাব দেওয়ার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্রে তাদের স্তবগান বেরত না। লোকে খাতির করে তাদের বাবু বা মশায় বলত, এর চেয়ে বড়ো খেতাব তখন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এইরকমের সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে— ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব!'

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্য দিকে এই-সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হলে তাদের ভালো হতে পারে, কিন্তু বর্তমান জীবনের দুঃখদৈন্য থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই মনোবৃত্তি তাদের একান্ত অসহায় করে তুলেছে।

একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুণ্য কাজ বলে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারও কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোনো সুখ কোনো আনন্দ নেই তারা হঠাৎ কোনো বিপদ বা রোগ হলে রক্ষা পায় না। বাইরে থেকে এরা অনেক অত্যাচার অনেকদিন ধরে সহ্য করেছে। জমিদারের নায়েব, পেয়াদা, পুলিস, সবাই এদের উপর উৎপাত করেছে, এদের কান মলে দিয়েছে।

এই-সব কথা যখন ভেবে দেখলুম তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কখনো গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস ক'রে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা করে দিতে হবে।

এইরকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম— অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম,

'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো ; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো ; তা হলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায়-আসে না ; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।' শুনে তারা বললে, খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে। আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তা হলে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর-কিছুই নেই। আমাদের দেশে এক সময় শহরের যুবক ছাত্রেরা গ্রামের উপকার করতে লেগে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোক তাদের উপহাস করত ; বলত, 'ঐ রে চার-আনার বাবুরা আসছে!' কী করে তারা এদের উপকার করবে— না জানে তাদের ভাষা, না আছে তাদের মনের সঙ্গে পরিচয়।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এইরকম নানাভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছুদিন চুপ করে বসেছিলুম। অ্যান্ড্রুজ বললেন, 'বেচে ফেলুন।' আমি মনে ভাবলুম, যখন কিনেছি, তখন তার একটা-কিছু তাৎপর্য আছে— আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন করে হবে, তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোনো শুভলগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তখন অভাব। তার পর, আস্তে আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হত না। এল্‌ম্‌হারস্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।

সবশেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই— চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ'[১] লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

ভাদ্র ১৩৪৬

১ বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১১। রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় (সুলভ দ্বিতীয়)। স্বদেশী সমাজ (১৩৬৯)

হলকর্ষণ

শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ-উৎসবে কথিত

পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্রস্নানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরানে আমরা দেখতে পাই, এখন যে-সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। আর্য ঔপনিবেশিকরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন এই-সব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলে মূলে, আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিদ্রোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মানুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংস্রতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তখন অরণ্য মানুষের পথ রোধ করে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল এক দিকে আশ্রয়, অন্য দিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে তারা অগত্যা ছোটো সীমানায় ছোটো ছোটো দল বেঁধে বাস করেছে। এক দল অন্য দলের প্রতি সংশয় ও বিদ্বেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছে। এইরকম মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠান হয়েছে নরঘাতক। মানুষ মানুষের সবচেয়ে নিদারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজও অবসান হয় নি। এই-সব দুষ্প্রবেশ্য বাসস্থান ও পশুচারণভূমির অধিকার হতে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্য তারা ক্রমাগত নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। পৃথিবীতে যে-সব জন্তু টিকে আছে তারা স্বজাতিহত্যার দ্বারা এরকম পরস্পর ধ্বংসসাধনের চর্চা করে না।

এই দুর্লঙ্ঘ্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্রশক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তার পর কখনো দৈবক্রমে কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম সহায়-আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজও নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজও আগুন নানা মূর্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।

তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহার্যের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার একটা বড়ো যুগ। সেই দিন সখ্যধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল। তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফললাভের কামনায়। ধনসম্পদ্‌ ও শত্রুজয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শক্তি কল্পনা করে তারই সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠান তখন গৌরব পেত। কিন্তু যেহেতু এর লক্ষ্য ছিল

বাহ্য ফললাভ, এইজন্যে এর মধ্যে বিষয়বুদ্ধিই ছিল মুখ্য ; প্রতিযোগিতার সংকীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ ঐক্যবুদ্ধি এর মধ্যে মুক্তি পেত না।

তার পরে এল এক যুগ, তাকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যাবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে— আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান্ বলে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণরেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

যে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল, তাদের শক্তিকে পরাভূত করে তাদের হাত থেকে এই নূতন বিদ্যাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে বিস্তর প্রয়াস করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান -কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।

আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।

কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষায় মানুষকে মানুষ মারত, কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘ যুগের ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর-এক তীর অধিকার করে থাকত। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শতসংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা— সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ্, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট— যা এত বীভৎস রকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।

১২ ভাদ্র ১৩৪৬ আশ্বিন ১৩৪৬

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত

এক সময়ে আমি যখন ইংলন্ডে গিয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুকাল এক পল্লীতে এক চাষী গৃহস্থের ঘরে বাস করবার। আমি শহরবাসী হলেও সেখানকার পল্লীতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলন্ডের পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসন্তুষ্ট ; গ্রামের ভিতর তাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পুষ্টি নেই, তারা কবে লন্ডনে যাবে এইজন্য দিন-রাত্রি তাদের উদ্‌বেগ। জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম— য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আয়োজন শিক্ষা আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা সংহত বড়ো বড়ো শহরে, এইজন্য শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই-যে ভাগ তা প্রধানত পরিমাণগত, শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে, কোনো বিরোধ নেই ; যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে— শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈদ্য-কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, একটা বড়ো ইমারতের মধ্যে বদ্ধ করে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতিসম্পদ্ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে— পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এ দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবেন না বলে পল্লীর উপকার করতে লেগেছিলেন। তারা পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি, পল্লীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারে নি। কী করে মিলবে। মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয় নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক্ করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয় নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পঙ্‌ক্তিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেশনের পাতা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে-যে সমস্ত

দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন সল্প, ওদের মনের মতো করে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান, কী পল্লী কী নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে— সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনোরকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে। মন অহংকৃত হয়; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে।' এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন-সব বিষয়ে মুখস্থ করা উপদেশ দিতে আসেন হয়তো যে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চেয়ে ভালোই জানে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে শিলাইদহে আলুর চাষ বিস্তৃত ভাবে প্রচলন করব। আমার প্রস্তাব শুনে কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ বললেন যে, আমার নির্দিষ্ট জমিতে আলুর চাষ করতে হলে একশো মণ সার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি কৃষিবিভাগের প্রকাণ্ড তালিকা-অনুসারে কাজ করলুম, ফসলও ফলল, কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনোই সামঞ্জস্য রইল না। এ-সব দেখে আমার এক চাষী প্রজা বললে, 'আমার 'পরে ভার দিন বাবু।' সে কৃষিবিভাগের তালিকাকে অবজ্ঞা করেও প্রচুর ফসল ফলিয়ে আমাকে লজ্জিত করলে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ, বড়ো উদ্দেশ্য আছে, তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ফাল্গুন ১৩৪৬

অভিভাষণ

বিশ্বভারতী সম্মিলনী

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তামহাশয় বলেছেন যে আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা-কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মতো। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কতদিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ্ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর-একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মতো বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পক্ষে এই-সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য সে কথা মানি ; তবুও এ কথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার প্রাণময় সত্তার উদ্‌ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড়ো-একটা দেখতে পাই নে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বেশি বাকি নেই।

বক্তামহাশয় বলেছেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জনতাবহুল শহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তাতে করে পূর্বে যে মাটিতে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত অথচ তা দরিদ্র হত না, সে মাটি শহুরে মানুষদের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতাগুলির ক্রমে ক্রমে পতন হতে লাগল। অবশ্য আধুনিককালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে শহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও অন্য জায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানি হচ্ছে। এমনি করে খাওয়া-দাওয়া সচ্ছন্দে চলছে কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে মানুষকে নিশ্চয়ই একদিন কোনোখানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র-আবর্তনের কথা বলা হয়েছে তেমনি মনেরও চক্র-আবর্তন আছে, সেটাকেও অব্যাহত রাখতে হবে সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান, তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা কত ত্যাগ কত তপস্যায় তৈরি, কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে, তা হলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয় ; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান্ প্রাণপ্রদ হতে পারে না, চিত্তশক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা'চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয় তবে তা নির্জীব হয়ে যাবে।

বক্তামহাশয় বলেছেন যে ধানের খড় গাড়ি-বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছে, আর তাতে

করে কৃষকের ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং শহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই শহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লীসমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমি দেখেছি সেখানে কী নিরানন্দ বিরাজ করছে। সেখানে যাত্রা কীর্তন রামায়ণগান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্য দিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের শহুরে জ্ঞানের দ্বারা প্রাণবান্ হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্য যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ-আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ, তাদের দ্বারাই চিত্তক্ষেত্র উর্বর হয়। অথচ শহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। শহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তাবন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তাঁরা বলেন যে সেখানে খাওয়া-দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মতো খোরাক দুষ্প্রাপ্য, অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দশার কথা কেউ ভালো করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কী ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম এমন বিকৃত বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে-সব কথা খুলে বলা যায় না।

এল্‌ম্‌হারস্ট সাহেব আজকার বক্তৃতায় প্রশ্ন করেছেন যে প্রাণরক্ষার উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে। একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে গ্রামে যারা মদ খায় তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে, দরিদ্র লোকদের মদ খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। তাদের অবসাদ আসে— তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায় তাই ভিজিয়ে দুপুর বারোটা-একটার সময়ে খায়, তার পর খিদে নিয়ে বাড়ি ফেরে। যখন দেহপ্রাণে অবসাদ আসে তখন তা প্রচুর ও ভালো খাদ্যে দূর হতে পারে, কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাব-পূরণ হয় না বলে তারা তিন-চার পয়সার ধেনো মদ খায়, তাতে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তারা নিজেদের রাজা-বাদশার মতো মনে করে সন্তুষ্ট হয়— তার পর তারা বাড়ি যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে ; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা-পার্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে, জবরদস্তি করে, ধর্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার দুর্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।

অপর দিকে আমরা শহরে অন্যরূপ মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্প-পরিসরের মধ্যে উন্মাদনার আশ্রয়ে

কর্তব্যবুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষায় লেখায় বা অন্য আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। তাই ক্ষুব্ধ কর্তব্যবুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্য আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই— আর আমার মতো যারা কাব্যরচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না, সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই হাড়িডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে আর আমাদেরও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে জানি তারা নন্-কো-অপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যতদিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ততদিন কাজ চলেছিল, তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়িডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন। পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকালসাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেছেন। এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধির কোনোরূপ খাদ্য তো চাই, সেই খাদ্য প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে তা হলে কাজেই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতে হয়।

আজকাল আমরা সমাজের তিন স্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি— সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশান্ত করবার মতো মদ। হাড়িডোমদের মধ্যে একরকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর-একরকম মদ, আর শহরের শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যেও একপ্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েছে।

১৩২৯

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের এই কাজ উপলক্ষে কী করে মিলন হল একটু বলে রাখি। আমি নিজে অবশ্য ডাক্তার নই, এবং ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে আমার মতের কোনো মূল্য নেই। আপনারা সকলে জানেন আমাদের যে 'বিশ্বভারতী' বলে একটা অনুষ্ঠান আছে, তার অন্তর্গত ক'রে শান্তিনিকেতনের চারি দিকে যে-সমস্ত গ্রাম আছে সে গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের আশ্রমে আমরা প্রধানত বিদ্যাচর্চা করে থাকি বটে, কিন্তু আমার বরাবর এই মত— বিদ্যাকে, স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করলে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে মিশ খায় না, তাকে জীবনের বস্তু করা যায় না। এইজন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি -অনুসারে চেষ্টা করছি চারি দিকের গ্রামের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের বিদ্যানুশীলনের কর্মকে একত্র করতে। এই কাজ আমাদের চলছিল। এখানে এই সভাগৃহে আমাদের এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। যাঁরা সে সভাক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা জানেন কিরকম ভাবে আমাদের কাজ হচ্ছে। এই কাজ হাতে নিয়ে প্রথমে দেখা গেল— রোগের ছবি। আমরা অব্যবসায়ী, আমাদের তখনো সাহস ছিল না যে দেশের লোককে বলি যে, যাঁরা অভিজ্ঞ গ্রামের রোগনিবারণ কাজে তাঁরা

সহায়তা করুন। নিজেরাই যেমন করে পারি চেষ্টা করেছি। এ সম্বন্ধে বিদেশী লোকের কাছে সাহায্য পেয়েছি, সে কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি। আমরা আমেরিকার একটি মহিলাকে সহায়-রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে, সেইটাকে মাত্র নিয়ে তিনি রোগীদের ঘরে ঘরে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন, অতি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন— অত্যন্ত ক্ষত ঘা, যা দেখে ভদ্রসমাজের লোকের ঘৃণা হয়, সে-সমস্ত নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়েছেন— যারা অন্ত্যজ জাতি তাদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, পথ্য খাইয়েছেন— আজ পর্যন্ত তিনি কাজ করছেন, অসহ্য গরমে শরীরের গ্লানি সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্মও তিনি ছাড়েন নি। শরীর যখন ভেঙে পড়ল, শিলং গিয়ে কিছুদিন ছিলেন, ফিরে এসে আবার শরীর নষ্ট করেছেন। এমন করে তাঁকে পেয়েছি। তাঁকে দেশে যেতে হবে, যে-কয়টা দিন আছেন প্রাণপাত করে সেবা করছেন।

আর-একজন সহৃদয় ইংরেজ এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের খরচে বিদেশ থেকে নিজে টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি দিনরাত চতুর্দিকের গ্রামগুলির দুরবস্থা কী করে মোচন হতে পারে, এর জন্য কী-না করেছেন বলে শেষ করা যায় না। যে দুজনের সহায়তা পেয়েছি সে দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন, এঁদের নিয়ে কাজ করছি।

এইটে আপনারা বুঝতে পারেন, পতঙ্গে মানুষে লড়াই। আমাদের রোগশত্রুর বাহনটি যে ক্ষেত্র অধিকার করে আছে সে অতি বিস্তীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ জায়গায় পতঙ্গের মতো এত ক্ষুদ্র শত্রুর নাগাল পাওয়া যায় না। অন্তত ২।৪ জন লোকের দ্বারা তা হওয়া দুঃসাধ্য, সকলে সমবেতভাবে কাজ না করলে কিছুই হতে পারে না। আমরা হাৎড়াচ্ছিলাম, চেষ্টা-মাত্র করছিলাম, এমন সময়ে আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, মেডিকেল কলেজে পড়ে, আমার কাছে এসে বলল, 'গোপালবাবু খুব বড়ো জীবাণুতত্ত্ব-বিদ্‌, এমন-কি, ইউরোপে পর্যন্ত তাঁর নাম বিখ্যাত। তিনি খুব বড়ো ডাক্তার, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। আপনারা ম্যালেরিয়ার সহিত লড়াই করতে যাচ্ছেন, তিনি সে কাজ আরম্ভ করেছেন; নিজের ব্যবসায়ে ক্ষতি করে একটা পণ নিয়েছেন— যতদূর পর্যন্ত সম্ভব বাংলাদেশকে তার প্রবলতম শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবেন।' যখন এ কথা শুনলাম, আমার মন আকৃষ্ট হল। আমাদের এই কাজে তাঁর সহায়তা দাবি করতে সংকল্প করলুম। মশা মারবার অস্ত্র পাব এজন্য নয়; মনে হল এমন একজন দেশের লোকের খবর পাওয়া গেল যিনি কোনোরকম রাগ-দ্বেষে উত্তেজনায় নয়, বাহিরের তাড়নায় নয়, কিন্তু একান্তভাবে কেবলমাত্র দেশের লোককে বাঁচাবার উপলক্ষে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন করে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন— এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ো বিরল। আমার মনে খুব ভক্তির উদ্রেক হল বলে আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় আলোচনা করতে চাই। এমন সময় তিনি স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি কী ভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। তখন এ কথা আমার মনে উদয় হল, যদি এঁর কাজের সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি তা হলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয়— এঁর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।

আপনারা দেখেছেন, যুদ্ধের পর এই-যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার প্রতিভা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দৈহিক দুর্বলতা তার কারণ। যখন ব্লকেড-দ্বারা খাবার বন্ধ করা হয়েছিল সে সময় অনাহারে অনেক মানুষ মরেছে সেইটাই বড়ো কথা নয়। যে-সমস্ত শিশুর দুধ খাওয়ার দরকার ছিল, যে-সমস্ত প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুগের শিশুরা অপরিপুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল। এর ফলে এরা বড়ো হলে তেমন বুদ্ধিশক্তির জোর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই এই হিসাবে দেখতে গেলে মাথা-গণতি অনুসারে লোকসংখ্যা হয় না, যাদের মাথা আছে তাদের কার্যকারিতা কতদূর তা দেখতে হবে। শুধু সংখ্যাগণনা ঠিক গণনা নয়। বাংলাদেশে আমরা ভাবছি না— যেখানে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল উৎস সেখানে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা রোগের বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চিরদুর্বলতা বহন করে আছি। প্রতি বৎসর কত লোক জন্মাচ্ছে, কত লোক মরছে, সংখ্যা

কত বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা বড়ো কথা নয় ; যারা টিকে রইল তারা মানুষের মতো রইল কি না সেইটে বড়ো কথা। তাদের কার্যকারিতা, মাথা খাটাবার শক্তি, আছে কি না সেইটে বড়ো কথা। নতুবা জীবন্মৃতের দল যদি অধিকাংশ হয় , তার বোঝা জাতি বইতে পারবে না। শারীরিক দুর্বলতা থেকে মানসিক দুর্বলতা আসে। ম্যালেরিয়া রক্তের মধ্যে অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও বল পাই না। যার প্রাণের প্রাচুর্য আছে সে প্রাণ দিতে পারে। যার কেবল কোনোরকমে বেঁচে থাকা চলে, জীবনধারণের জন্য যা দরকার তার বেশি যার একটু উদ্‌বৃত্ত হয় না, তার প্রাণে বদান্যতা থাকে না। প্রাণের বদান্যতা না থাকলে বড়ো সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানে প্রাণের কৃপণতা সেখানে ক্ষুদ্রতা আসবে। প্রাণের শক্তির এত বড়ো ক্ষয় কোনো সভ্য দেশে কখনো হয় নি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্গতির কারণ সব দেশেই আছে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব কী। না, সেই দুর্গতির কারণকে অনিবার্য বলে মনে না করে, যখন যাতে কষ্ট পাচ্ছি চেষ্টা-দ্বারা তাকে দূর করতে পারি, এ অভিমান মনে রাখা। আমরা এতদিন পর্যন্ত বলেছি, ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী, তার সঙ্গে কী করে লড়াই করব, লক্ষ লক্ষ মশা রয়েছে তাদের তাড়াব কী করে, গভর্মেন্ট আছে সে কিছু করবে না— আমরা কী করব ! সে কথা বললে চলবে না। যখন আমরা মরছি, লক্ষ লক্ষ মরছি— কত লক্ষ না মরেও মরে রয়েছে— যে করেই হোক এর যদি প্রতিকার না করতে পারি আমাদের কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ম্যালেরিয়া অন্য ব্যাধির আকর। ম্যালেরিয়া থেকে যক্ষ্মা অজীর্ণ প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়। একটা বড়ো দ্বার খোলা পেলে যমদূতেরা হুড়্ হুড়্ করে ঢুকে পড়ে, কী করে পারব তাদের সঙ্গে লড়াই করতে। গোড়াতে দরজা বন্ধ করা চাই, তবে যদি বাঙালি জাতিকে আমরা বাঁচাতে পারি।

আর-একটা কথা আছে, সেইটে আপনারা ভাববেন। এই-যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস এ যদি কোনো-এক জায়গায় মানুষ দূর করতে পারে— সমস্ত অমঙ্গল, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিধিলিপি বলে মেনে আসছি, যদি এর উল্টা কথা কোনো উপলক্ষে বলতে পারি— মস্ত কাজ হয়। শত্রু যত বড়োই হোক, তাকে মানব না, মশাকে রাখব না, যেমন করে পারি উচ্ছেদ করব— এ সাহস যদি হয়, তবে কেবল মশা নয়, তার চেয়ে বড়ো শত্রু নিজেদের দীনতার উপর জয়লাভ করব।

আর-একটা কথা— পরস্পরের মিলনের নানা উপলক্ষ চাই। এমন অনেক উপলক্ষ চাই যাতে আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলতে পারে। দেশ বলতে যা বুঝি সকলে তা বোঝে না, স্বরাজ কী অনেকে তা বোঝে না। কিন্তু মিলন বলতে যা বুঝি, এমন কেউ নেই যে তা বোঝে না। কিন্তু যদি কোনো-একটা গ্রামের সকলে মিলে কিছু পরিমাণেও রোগ কমাতে পারি, তবে বিদ্বান্ মূর্খ সকলের মেলবার এমন সহজ ক্ষেত্র আর হতে পারে না। গোপালবাবু এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এই-যে ইনি মণ্ডলদের নাম করলেন, শুনে সুখী হলাম এঁরা একযোগে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে অতি ক্ষুদ্র শত্রু মশা মারবার জন্য সকলে মিলে লেগেছেন। এর মতো সুলক্ষণ আর নেই। কারণ, প্রত্যেকের হিতের জন্যে সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই ভালো। একটি গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গোরুর গাড়ি চলায় তার একটা জায়গায় গর্ত হয়েছে— ৪।৫ হাতের বেশি নয়— বর্ষার সময় তাতে এক-হাঁটুর উপর কাদা জমে আর সেই কাদার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ হাটবাজার করতে যায়। নিকটবর্তী গ্রামের লোক, যারা সবচেয়ে কষ্ট পায়, তারাও এ কথা বলে না 'কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি ফেলে জায়গাটা সমান করে দিই', তার কারণ তারা ঠকতে ভয় পায়। তারা ভাবে, 'আমরাই খাটব অথচ তার সুবিধে আমরা ছাড়াও অন্য সবাই পাবে, এর চেয়ে নিজেরা দুঃখ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি— একটা গ্রামে বৎসর-বৎসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়া ছিল না, আমি তাদের বললুম, 'তোমরা কুয়ো খোঁড়ো, আমি সে কুয়ো বাঁধিয়ে দেব।' তার বললে, 'বাবু, মাছের তেলে মাছ ভাজতে চাও। অর্থাৎ, অর্ধেক খাটুনি আমাদের, অথচ জলদানের পুণ্যটা সম্পূর্ণ তোমার! তার চেয়ে ইহলোকে আমরা জলাভাবে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি যে সস্তায় সদ্‌গতি লাভ করবে সে সইতে পারব না।'

দেশের মধ্যে এরকম ভাব রয়েছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও আছে অন্য নানা আকারে, সে কথা আলোচনা করতে সাহস করি না। গোপালবাবু যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাতে লোকে এই কথা বুঝতে পারবে যে, পাশের লোকের বাড়ির ডোবায় যে মশা জন্মায় তারা বিনা পক্ষপাতে আমারও রক্ত শোষণ করে, অতএব তার ডোবার সংস্কার করা আমারও কাজ।

গোপালবাবু মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লোভ ক্রোধ বিদ্বেষের উত্তেজনা -বর্জিত নির্মল শুভবুদ্ধি তাঁকে এই কাজে আকৃষ্ট করেছে। মহত্ত্বের এই দৃষ্টান্তটি মশকবধের চেয়েও আমাদের কাছে কম মূল্যবান নয়। এইজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

২৯ অগস্ট ১৯২৩ ভাদ্র ১৩৩০

ম্যালেরিয়া

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

এই-যে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা ও চেষ্টা, আজকে ওঁদের যে-বিষয়ক বিবরণের জন্য এই সভা আহূত হয়েছে, এতে আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছেন। এ কথা আপনাদের অবিদিত নয় যে, আমার কোনো অধিকার নাই এখানে আসন গ্রহণ করবার। একমাত্র যদি থাকে সে এই বলতে পারি আমার শরীর অসুস্থ— আমি রোগী, কিন্তু ম্যালেরিয়া-রোগী নই, সুতরাং সে দিক থেকেও আমার বলবার কথা কিছু নাই। একটা আসল কথা এই— এই ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভার মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ কেহ আছেন, তাঁরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বহু রচনা চারি দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন— এ বিষয়ে তাঁরা কাজ করেন, সুতরাং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অত্যুক্তি না'ও হতে পারে। যা হোক, আমার যা বলবার দু-একটা কথায় বলে বিদায় নেব, আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি, কারণ এ আহ্বানকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নাই।

আমার পূর্ববর্তী বক্তার যা বলবার কথা তার ভিতর অনেক ভাববার বিষয় আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে-সমুদয় ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করেছে তার একটি মাত্র কারণ নয়, প্রশ্নটি বহু জটিল, সহজে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে না। এক দিক থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে গিয়ে আর-এক দিকে ছেঁদা বেরুতে পারে— এ কথা যা বলেছেন অন্যায় বলেন নি, অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। সব দিক থেকে আটঘাট বেঁধে ম্যালেরিয়াকে না ঢুকতে দেওয়া, তাড়া করে বের করে দেওয়া, এর সব দিক আমাদের হাতে নাই। এ কথা সত্য, মস্ত সত্য যে, পূর্বে যেখানে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না সেখানে ম্যালেরিয়া এসেছে। তার একটা কারণ রেলওয়ে এ দেশে তখন ছিল না, স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল না। মশা উৎপন্ন হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই দাঁড়িয়েছে যে, রেলওয়ে লাইন দু ধারের গ্রামগুলিকে অত্যন্ত আঘাত করছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আরো ঘটনা ঘটেছে— যাঁরা বাণিজ্যের দিকে, প্রভুত্বের দিকে, লাভের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁদের লোভের দরুন অসহ্য দুঃখ এ দেশে উপস্থিত হয়েছে, বন্যা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ জেগে উঠেছে, এটা খুব বড়ো সমস্যা তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বক্তামহাশয় একটা বিষয়ে ভুল করেছেন। আমাদের মাননীয় বন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন এ যদি শুধু মশা মারার কাজ হত তা হলে আমি একে বড়ো ব্যাপার বলে মনে করতুম না। দেশে মশা আছে এটা বড়ো সমস্যা নয়, বড়ো কথা এই— দেশের লোকের মনে জড়তা আছে। সেটা আমাদের দোষ, বড়োরকম দুঃখ-বিপদের মূল কারণ সেখানে। ওঁরা এ কাজ হাতে নিয়েছেন, সেজন্য ওঁদের কাজ সকলের চেয়ে বড়ো বলে মনে করি। গোপালবাবু উপকার করবেন ব'লে কোমর বেঁধে আসেন নি। কোনো-একজন ব্যক্তি বলতে

পারে না, 'আমি কুইনাইন দিয়ে বা ইনজেক্‌শন করে দেশের সকল রোগ ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নিবারণ করব।' এমন কথা বলবার দোষ আছে, কারণ তাঁরা কতদিন পৃথিবীতে থাকবেন। আজ বাদে কাল চলে যেতে কতক্ষণ। কতরকম ব্যাধি-বিপদ আছে! যদি ব্যক্তিগত কয়েকজন লোকের উদ্যমকে একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করি তা হলে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সকলরকম দুর্গতি-নিবারণের জন্য আমরা বাহিরের লোকের সহায়তা বরাবর অপেক্ষা করেছি। এমন দিন ছিল যখন রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষী হয়ে দেশ ছিল না, এমন সময় ছিল যখন দেশের জলাভাব দেশের লোক নিবারণ করেছে— অন্যান্য অভাবও দেশের লোক নিবারণ করেছে। কিন্তু তার ভিতর একটা দুর্বলতা ছিল বলে আমরা আজ পর্যন্ত দুঃখের হাত এড়াতে পারছি না। যারা সেকালে কীর্তি অর্জন করতে উৎসুক ছিল, যাঁরা উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁদের উপর দেশের লোক দাবি করেছে। তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি— তাঁদের উপর জল দেবার, মন্দির দেবার, অতিথিশালা করে দেবার, আরো অন্যান্য অভাব মোচন করবার দাবি করেছি— তাঁদের পুরস্কার ছিল ইহকালে কীর্তি ও পরকালে সদ্‌গতি। এখনকার দিনে তার ফল এই দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা এখন পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে কে এসে তাদের জলদান করবে— জলদান পুণ্যকর্ম, সে পুণ্যকর্ম কে করবে। অর্থাৎ তাদের বলবার কথা এই— 'আমাদের জলদান-দ্বারা তুমি আমার উপকার করছ সেটা বড়ো কথা নয়, তুমি যে পরকালে পুরস্কার পাবে সেজন্য তুমি করবে।' এই-যে তার প্রতি দাবি, এবং তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, সেটা আজ পর্যন্ত গভীরভাবে আমাদের দেশে আছে। এই একটা অসত্যের সৃষ্টি হয়েছে— সর্বসাধারণ সকলে একত্র সম্মিলিত হয়ে নিজের অভাব নিজেরা দূর করবার জন্য কখনো সংকল্প করে না। এমন দিন ছিল যখন দেশে উপকারী সুহৃদ লোকের অভাব ছিল না, সুতরাং সহজেই তখন গ্রামের উন্নতি হয়েছে, অভাব দূর হয়েছে। কিন্তু এখন সে দিনের পরিবর্তন হয়েছে, নূতন অবস্থার উপযোগী চিত্তবৃত্তি এখনো আমরা পেলুম না— এখনো যদি আমরা পুণ্যকর্মী কোনো সুহৃদের উপর ভার দিই, দেশের জলাভাব, দেশের রোগ তাপ সে এসে দূর করুক, তা হলে আমাদের পরিত্রাণ নেই। এখানে বলবার কথা এই, 'তোমরা দুঃখ পাচ্ছ, সে দুঃখ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে দূর করতে না পারবে ততক্ষণ যদি কোনো বন্ধু বাহির থেকে বন্ধুতা করতে আসে তাকে শত্রু বলে জেনো। কারণ তোমার ভিতর যে অভাব আছে সে তাকে চিরন্তন করে দেয়, বাহিরের অভাব দূর করবার চেষ্টা-দ্বারা। গোপালবাবু যে ব্যবস্থা করেছেন, যাকে পল্লীসেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ তোমরা একত্র সমবেত হয়ে তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমাদের দুঃখ দূর করো। এ কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তারা (গ্রামের লোক) বিশ্বাস করতে পারে নাই যে নিজের চেষ্টায় দুঃখ দূর করা যায়। সাধারণ লোকের এমন অভিজ্ঞতা কোনো কালে ছিল না। পূর্বে অসাধারণ লোকেরা তাদের উপকার করেছে— তাদের তারা খুব সম্মান করেছে। এখনো দেখি সে দিকে তারা তাকাচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস তাদের কেউ গোপালবাবুর উপর ক্রুদ্ধও হতে পারে এইজন্য— 'ইনি আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন কেন, নিজে আমাদের ঔষধপত্র দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করলেই তো পারেন।' একটা প্রচলিত গল্প আছে— একজন মা-কালীকে মানত করেছিল মোষ দেবে। অনেকদিন অপেক্ষা করে মা-কালী মোষ না পেয়ে দেখা দিলেন, তখন সে বললে, 'মোষ দিতে পারব না, একটা ছাগল দেব।' আচ্ছা, তাই সই। তার পর ছাগল দেয় না। আবার দেখা দিলেন; লোকটি বলল, 'মা, ছাগল পাই না, একটা ফড়িং দেব।' 'আচ্ছা, তাই দাও।' তখন সে বললে, 'এতই যদি মা তোমার দয়া, তবে একটা ফড়িং নিজে ধরে খাও-না কেন।' এও তাই, আমাদেরও সেরকম অবস্থা। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি, সে ঘটনাটি এই— আমাদের একটা গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিল, গ্রামবাসীদের ফি বৎসর বড়ো জলাভাব হত। আমি বললাম, 'তোমরা কুয়া খোঁড়ো, আমি বাঁধিয়ে দেবার খরচ দেব।' তারা বললে, 'মহাশয়, আপনি কি মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চান? আমরা খরচ দিয়ে কুয়া খুঁড়ব আর স্বর্গে যাবেন আপনি।' আমি বললাম, 'তোমরা যতক্ষণ কুয়া না খোঁড় আমি কিছুই দেব না।' কুয়া হল না। গ্রামে প্রতি বৎসর আগুন লাগছে, তাদের পাড়ার মেয়েরা ৪।৫ মাইল দূরে বালি ভেঙে অসহ্য রৌদ্রে জল নিয়ে আসে, ঘরে অতিথি এলে

একঘটি জল দিতে প্রাণে কষ্ট হয়, কিন্তু কয়জনে মিলে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তে পারবে না। কেহ বলছে, 'কোন্ জায়গায় দেব, ওর বাড়ির দুই হাত দূরে, ওর বাড়ির কাছে পড়ে ; আর-একজন যে জিতল, আমার চেয়ে দুই হাত জিতল— এটা সহ্য হয় না।' নিজেদের পরস্পর চেষ্টা-দ্বারা পরস্পর কল্যাণের প্রবৃত্তি কারও মনে জেগে উঠে না, সকলের যাতে কল্যাণ হয় সে চেষ্টা আমাদের দেশে হল না, তাতে দুর্গতির একশেষ হয়েছে। আমি দেখেছি— একটা গ্রামে মস্ত রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল, ক্রমাগত গোরুর গাড়ি যাওয়ার এক জায়গায় একটা খাদ হয়, বর্ষার সময় হাঁটু পর্যন্ত কাদা হয়, যাওয়া-আসার বড়ো কষ্ট হত। তার দু পাশে দুখানি বড়ো গ্রাম, দু ঘণ্টা কাজ করলে এটা ভরাট করা যেতে পারে। কিন্তু তারা বললে, তারা দু ঘণ্টা কাজ করবে, আর যারা কুষ্টিয়া থেকে কি অন্য জায়গা থেকে আসবে তারা কিছু করবে না— তারা সুবিধা পাবে! নিজে শত অসুবিধা ভোগ করবে তবু পরের সুবিধা সহ্য করতে পারবে না— দূরের লোক তাদের ঠকালো ক্রমাগত এই ভয়। অন্যে পরিশ্রম না ক'রে আমার পরিশ্রমের সুবিধা ভোগ করবে, আমার পরিশ্রমের ফলে সকলের কল্যাণ হবে— এটা তারা সহ্য করতে পারে না। না করতে পারার কারণ এই— কর্মের পুরস্কার মনে মনে কল্পনা। নিজের পুরস্কার কামনা ক'রে কর্মের প্রতি যে ঝোঁক জন্মে সে কর্ম হীনকর্ম। সর্বসাধারণের কল্যাণ হোক, না হয় আমার পরিশ্রম হল, এ কথা তারা বুঝতে পারে না। দুঃখ দিয়ে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে, মরতে হয় তারা মরুক, মৃত্যুদূতের কানমলা খেয়ে যদি তাদের চৈতন্য হয় তাও ভালো। গ্রামে গ্রামে ঔষধপথ্য দিয়ে গোপালবাবু সরে যাবেন এ কথা তিনি বলেন নি বটে— যাকে সেবা বলে তিনি তাই করছেন, বেশি দিন তা করবেন না। যেই তারা বুঝবে এই প্রণালীতে উপকার হয়, অমনি ওঁরা সরে আসবেন তাদের উপর ভার দিয়ে।

গাঁয়ে না গেলে বুঝতে পারবেন না ম্যালেরিয়া কী ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকের যকৃৎ-পিলেতে পেট ভর্তি হয়ে আছে, সুতরাং ম্যালেরিয়া দূর করতে হবে— বেশি করে বুঝাবার দরকার নাই। আমরা অনেকে জানি ম্যালেরিয়া কিরকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। এ দেশে অনেক জিনিস হয় না ; অনেক জিনিস আরম্ভ করি, শেষ হতে চায় না ; অনেক কাজেই দুর্বলতা দেখতে পাই— পরীক্ষা করতে দেখা যায় ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্য থেকে তেজ কেড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করবার ইচ্ছাও হয় না। সকলেই জানেন বাংলাদেশের কাজকর্মে পশ্চিম থেকে লোক আসে। যেখানে বাংলার জেলে ছিল সেখানে হিন্দুস্থানি জেলে এসেছে। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ নিস্তেজ, কাজেই উৎসাহ নেই। প্রভুরা বলেন বটে, চালাকি করছে, ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে, মজুরেরা কাজ করে না, আফিসে কেরানিরা কাজে মন দেয় না। জোয়ান জোয়ান সাহেব, তোমরা বুঝবে কী করে— ওরা চালাকি করে না ; ম্যালেরিয়ায় যারা জীর্ণ, নিয়ত কাজ করবার, কাজে মন দেবার শক্তি তাদের নাই ; মশার কামড় খেয়ে ওদের এরকম অবস্থা হয়েছে। কিছুদিন এ দেশে থাকো, এটা ভালো করে বুঝতে পারবে।

তাই বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকো না, মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে থেকো না। সাহস করো— আমাদের দুঃখ আমরা নিবারণ করতে পারব, শুধু সাহস চাই। কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা কর্মে যদি একবার জয়পতাকা খুলে দিতে পারো— সাহস আসবে। ম্যালেরিয়ায় কত লোক মরছে রিপোর্ট দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি শুনেছি তার খুব পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে বিশ্বাস। বাংলাদেশ থেকে মশা দূর করা সম্পূর্ণ না হোক, এতটা পরিমাণেও যদি হয় অনেক উন্নতি হবে। এতে যে কেবল মশা মরবে তা নয়, জড়তা মরবে। নিজের প্রতি নিজের যে বিশ্বাস সেই চিরন্তন ভিত্তি, চিরকেলে ভিত্তি : কিন্তু মশা চিরকাল থাকবে ওঁর উপর যদি মশা মারবার ভার দিই। শক্তি যদি দেশের মধ্যে জাগে, গ্রামের লোক যদি বলে— 'আমরা কারও দিকে তাকাব না। যে-কোনো পুণ্যলোভী উপকার করবে তাকে অবজ্ঞা করব, ভিক্ষা করব তবু তেমন লোকের উপকার চাইব না। কলিকাতা থেকে যারা আসবে তাদের বলব তোমরা আমাদের ভারি সুহৃদ্ নাম করতে এসেছ, কাগজে বড়ো বড়ো রিপোর্ট লিখবে, তাই দেখে সকলে বাহবা দিবে। কোনোদিন

তো দেখি নি তোমরা আমাদের উপকার করেছ। বরাবর জানি ভদ্রলোক সুদ নেয়, ভদ্রলোক ওকালতি করে, সর্বনাশ করে— জমিদার আছে, তারাও ভদ্রলোক, বরাবর রক্ত শোষণ করছে— গোমস্তা পাইক রয়েছে, তারা উৎপীড়ন করছে— এই তো ভদ্রলোকের পরিচয়। হঠাৎ আজ উপকার করতে এলে কেন।' যদি এ কথা বলে তবে খুশি হই, সে কথা বলতে হবে।

আমাদের বিশ্বভারতীর একটা ব্যবস্থা আছে— তার চারি দিকে যে-সমস্ত পল্লী আছে সেগুলিকে আমরা নীরোগ করবার জন্য কিছু চেষ্টা করেছি। এটুকু তাদের বুঝিয়েছি যে, 'ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছি সে আমাদের অপরাধ নয়, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের মিল আছে।' সে কথা তারা বিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে গিয়ে যা দেখেছি তাতে আমাদের চৈতন্য হয়েছে। আমরা যে সমস্ত বড়ো বিল্ডিং করতে চেষ্টা করছি, পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক জয়স্তম্ভ করবার চেষ্টা করছি, মাল-মসল্লার চেষ্টা করছি— কিসের উপর। বালির উপর— প্রাণ নাই, জীর্ণ জরাজীর্ণ অস্থিমজ্জায় দুর্বলতা প্রবেশ করেছে ; নৈতিক নয়, বাস্তবিক, শারীরিক, কিন্তু সে মানসিক শক্তিকে নষ্ট করে। এক-আধজন এই বহুব্যাপী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতাকে দূর করতে চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু বাংলা এখনো রোগ-তাপ-দুঃখে ক্লিষ্ট, জয়স্তম্ভ থাকবে না, কাত হয়ে পড়ে যাবে, একে রক্ষা করতে পারবে না, ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে নইলে টিকবে না। দুর্বলতা এক রূপে না এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করবে। দুর্বলতার একটা কুশ্রী আকার আছে। সে হচ্ছে, আর-একজন গিয়ে সফলতা লাভ করবে, বড়ো কাজ করবে, এতে দুর্বলের মনে ঈর্ষা হয়— কী করে তাকে ছোটো করা যায় প্রাণপণে সে চেষ্টা করে। আমি কারও দোষ দিই না। পিলে যকৃৎ ভিতরে বড়ো হলে হৃদয় বড়ো হতে পারে না। পিলে বড়ো হয়েছে, যকৃৎ বড়ো হয়েছে, অন্তরে তারা জায়গা করেছে, হৃদয়ের জায়গা ছোটো, এইজন্য বরাবর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে সকলের চেয়ে বড়ো কর্মী নিজে, আর কেহ নয়। মনে শান্তি নাই, তার কারণ ভিতরকার ঈর্ষা। যে নিজে কিছু করতে পারছে না তার ভিতরে মাৎসর্য ফুটে ওঠে। আমি পারছি না, অমুক পারছে, চেষ্টা করছে, তখন 'ওর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি' এ কথা বললে অন্তঃকরণ শান্ত হয়— সুস্থ হয়। আমাদের দেশে এমন কর্মী কেহ নাই যার সম্বন্ধে আমরা এইরকম ভাব কোনো-না-কোনো আকারে মনে পোষণ না করে থাকি, তার কীর্তি কিছু-না-কিছু খর্ব না করতে চাই। এর কারণ সেই ম্যালেরিয়ার ভিতরে— দেহের শক্তি মনের শক্তিকে নষ্ট করেছে। তা হলে আপনারা বলতে পারেন, 'আগে দেহে শক্তি সঞ্চয় করুন।' তা নয়, মানুষকে ভাগ করা যায় না ; দেহ মন আত্মায় সে এক, আগে এইটে পরে ঐটে বলা চলে না। মনে জোর দিলে দেহে জোর পাই, দেহে জোর দিলে মনে জোর পাই, আবার দেহমনে জোর দিলে ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়— দেহ মন আত্মা একসঙ্গে গাঁথা। যে মন্ত্রে দেহের রোগ দূর হবে সে মন্ত্রে মনের যে দীনতা পরনির্ভরতা তাও দূর হবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এই-যে রেলওয়ে হয়েছে, ফলে জল-নিকাশের পথ বন্ধ হয়েছে— মস্ত মস্ত কারবারী লোক, তারা কিভাবে আমাদের দিকে তাকায়, কী দুঃখ আমরা ভোগ করছি তারা কি সেটা বোঝে। বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, তারা লাভের উপর লাভ করে যাচ্ছে, গলা পর্যন্ত যারা লাভ করেছে তাদের পরিত্রাণের আশা নাই। তারা এই-সমস্ত রেলওয়ে লাইন খুলছে। আমরা কে। আমরা 'থামো থামো' বললেই কি রেলওয়ে থামবে। না ক্রমাগত বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে ? মস্ত মস্ত কারবারী তারা এই-সমস্ত করছে, আমরা কেঁদে কী করব। তবে কী হবে। সমস্ত গ্রামের লোক যদি বোঝে আমরা কেউ কিছু নয়, এটা নয় ; যখন তারা বুঝবে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি একটা মস্ত বড়ো জিনিস— ইচ্ছা করলে সকলে মিলে মিশে মরতে পারে, তখন তারা সকলে মিলে এই দুর্গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সকলে কণ্ঠ তুলে বলতে পারে, 'ভাঙব তোমার রেলওয়ে লাইন। আমরা মরব আর তোমরা লাভ করবে ?' এখন বলতে পারবে না। (আপনারা করতালি দেবেন না।) এর জন্যে অনেক ভিত্তি গাড়তে হবে, অনেকদূর গভীর করে— এটা সকলের চেয়ে বড়ো কাজ। আমি অনেকবার বলেছি— কবি বলে আমার কথা শোনে নাই— আমি বলেছি সমাজের ভিতর থেকে সমাজের শক্তিকে জাগাতে হবে, পরস্পর সকলের সমবেত চেষ্টা-দ্বারা শক্তি

লাভ করবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টাও করেছি, পল্লী-সমিতি বলে সমিতি গড়ে তুলেছি, এ বিষয়ে আমার মাথা ততটা খেলাতে পারি নাই। আজ দেখে আনন্দ হয়েছে— এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন জায়গায় আমাদের গলদ। গগনস্পর্শী পার্লিয়ামেন্ট হলে হবে না। আমাদের অভাব এখানে নয়। আমাদের অভাব ভিতরে— যার উপর গড়তে পারব। একবার মুষ্টিমেয় কলেজে-পড়া উপাধিধারী কয়েকজন ভেবেছিল, 'আমাদের চেষ্টার উপর, উদ্যমের উপর দাঁড় করাতে পারব।' মরে গিয়েছে— সমস্ত দেশ ক্রমে ক্রমে জীবন্মৃত হয়েছে তা নয়— যথার্থ মরেছে। সেদিন আমাদের একদল লোক চিত্রকলা অভ্যাস করতে গ্রামের চিত্রকলা দেখতে গিয়েছিল। তারা এসে বললে, 'আমাদের আর অন্নে রুচি হয় না ; দেখলাম একেবারে উজাড় হয়েছে— একটা গ্রামে, বড়ো গ্রামে, বড়ো বড়ো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চার ঘর কায়স্থ রয়েছে এখনো বেঁচে আছে কী করে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমরা বৎসরের মধ্যে দুবার আসানসোল কি বর্ধমান গিয়ে সমবৎসরের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। যে কয়দিন বেঁচে আছি এমনি ভাবে যাবে, যখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসবে যাব। এক জায়গায় দেখলাম— সমস্ত বড়ো বাড়ি। যারা ৫০।১০০ বৎসর পূর্বে বর্ধিষ্ণু লোক ছিল এখন সেখানে তাদের রথ পড়ে আছে, দেবতা অচল।' এইটা শুনাব না মনে করেছিলাম। আপনাদের মধ্যে অনেকে ধর্মপ্রাণ আছেন, তাঁরা বলবেন, 'আমরা গিয়ে দেবতার রথ চালাব।' আমি বলি সে চলবে না, দেবতা তোমাদের হাতের টানে চলবে না, দেবতা তার নিজের শক্তির রথে চলবে, গ্রামের লোকের নিজের শক্তির রথে চলবে, সে রথ বাঁশ কেটে করতে হবে তা নয়, সে পিতলের রথ— আশ্চর্য কারুকার্য— মোটা মোটা বাঁশ দিয়ে তা চালালে চলবে না, ঠাকুর তাতে চলে না, ঠাকুর চান আমাদের হৃদয়ের সেবা দিয়ে তাঁর রথ তৈয়ারি হোক— তাঁর রূপের অন্ত নাই। তাঁকে মেরে ফেলে মুমূর্ষুর গঙ্গাযাত্রার মতো তাঁকে কি টেনে নিয়ে যেতে হবে। তা তো নয়। কোথায় প্রাণ, যে প্রাণপ্রাচুর্যের ভিতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, যে সৃষ্টি সম্পদে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকে বিকশিত হয়, বসন্তের মতো নূতন প্রাণ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যেখানে, দেবতা সেখানে চলেন। নইলে তাঁর ভাঙা রথ যত জোরেই টানো দেবতা চলবেন না। বাংলার সর্বত্র দেবতার ভাঙা রথ পড়ে আছে, দেবতা যদি চলত আমাদের এ দশা হত না, আমরা এমন করে মৃতকল্প হয়ে পড়ে থাকতুম না, এমন করে ঘরের আলো নিভে যেত না। এত দুর্গতি কেন। আমাদের রথ আমরা তৈয়ার করি নাই। যা ছিল তারও চাকা ভেঙে গেছে। এমন কেহ নাই তাকে ব্যবহারে চালাতে পারে। ছোটোখাটো একটা-কিছু তৈয়ারি ক'রে উপস্থিতমত চালিয়ে দেওয়া, বিষয়ী লোকের কথা। ছোটোখাটো লাভের কথায় হানি আছে। সর্বকালের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হবে, বড়োকে ভূমাকে লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তবে তাকে পাব, তবে তিনি তৃপ্ত হবেন, প্রসন্ন হবেন। তিনি প্রসন্ন হলে সকল তাপ দূর হয়ে যাবে। সেইজন্য সকলের চেয়ে বড়ো কাজ— ওঁরা যা করেছেন— উদ্‌বোধন, পল্লীর শক্তির উদ্‌বোধন। এরা একদিন দাঁড়িয়ে বলবে, 'কাউকে মানব না, যেখানে অন্যায় পাপ দুঃখ শোক সেখানে তাকে তাড়া করে যাব।' আজকে মশা থেকে আরম্ভ হয়েছে, এ কাজে আমাদের রায়বাহাদুর লেগেছেন। আমি ইন্‌জেক্‌শন করতে জানি না, কী পরিমাণ কুইনাইন দিতে হয় জানি না, কিন্তু এটা জানি এবং এইজন্য বহুকাল অরণ্যে রোদন করেছি— কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে তা হয় না, তাতে ভগবান প্রসন্ন হন না, সে পথ আপনার ঘরের ভিতরকার হলেও যখনই তাতে নির্ভর করেছি তখনই দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছি, কেননা তিনি অন্তরের ভিতর আছেন, আমার অন্তরের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি তাকে জাগাতে হবে, তিনি জাগলে সব দূর হয়ে যাবে, সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। কেউ কবি হতে পারে, কেউ ডাক্তার হতে পারে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে— যার যেরকম শক্তি, যার যেরকম শিক্ষা, সকলরকম চিত্তবৃত্তির সকলরকম শক্তির দরকার আছে। অনন্ত শক্তির উৎসে যিনি তাঁর বহুধা শক্তি -দ্বারা তিনি বিশ্বকে পালন করেন। কেবল ইকনমিক্‌স্ নয়, কেবল পলিটিক্‌স্ নয়— বহুধা শক্তি, সে বৃহৎ শক্তিকে যদি আমাদের সমাজের ভিতর, নিজের ভিতর স্বীকার করো তা হলে অনন্ত শক্তির উদ্‌বোধন হবে— একটা ছোটো কাজ ক'রে, একটা কথা ব'লে কিছু হবে না। আমাদের সৌন্দর্যবোধ থেকে

আরম্ভ হয়ে, কী করে অন্ন অর্জন করতে হয়, কী করে চাষ করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়, সব বিষয়ে দেশের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জাগাতে হবে। কবিকে যখন সভাপতির আসনে বসিয়েছেন তখন আমি বলব এবং এটা বলবার কথা— বসন্তকালের বাঁশি এই-যে সে শুধু একটা ফুলকে জাগিয়ে দেয় না, একটা গাছের পাতাকে ফোটায় না, দখিন-হাওয়ায় পাখিরা জেগে ওঠে, লতাপাতা ফোটে, গাছের ফল ফুল সমস্ত আনন্দ-উৎসবে শক্তির উৎসবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। সেই বসন্তের বাণীকে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

প্রতিভাষণ

ময়মনসিংহে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে

মহারাজ, ময়মনসিংহের পুরবাসিগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে আপনাদের প্রীতিসুধা সম্ভোগ করছি।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলুম— তুমি কেন আজকের দিনে পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্যে এসেছ, কোন্ সাহসে তুমি বের হয়েছ। কী করতে পারো তুমি তোমার হীনশক্তিতে। এ প্রশ্নের আমার একটা খুবই সহজ উত্তর আছে। তা এই যে, আমি কোনো কাজের দাবি রাখি নে। যদি আমি কোনোদিন আনন্দ দিয়ে থাকি আমার সাহিত্য আমার কাব্যের মধ্য দিয়ে তবে তারই প্রতিদানস্বরূপ আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য সংগ্রহ করে যেতে পারি। বাংলাদেশ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করবার পূর্বে এটুকু পুরস্কার যদি নিয়ে যেতে পারি তো সেই আমার সার্থকতা। আমি কোনো কর্ম করেছি কি না এ কথার দরকার নেই। আপনাদের এ আতিথ্যের বরমাল্যই আমার যথেষ্ট। এ খুব সহজ উত্তর, কিন্তু এ উত্তর সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর-এক দিন এসেছিল যেদিন সমস্ত বাংলাদেশে মানবের চিত্ত উদ্‌বোধিত হয়েছিল। সেদিন আমিও তার মধ্যে ছিলুম— শুধু কবিরূপে নয়— আমি গান রচনা করেছিলুম, কাব্য রচনা করেছিলুম, বাংলাদেশে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সাহিত্যে তারই রূপ প্রকাশ করে দেশকে কিছু দিয়েছিলুম। কিন্তু কেবলমাত্র সেইটুকুই আমার কাজ নয়। একটি কথা সেদিন আমি অনুভব করেছিলুম, দেশের কাছে তা বলেও ছিলাম— সে কথাটি এই যে, যখন সমস্ত দেশের হৃদয় উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে তখন কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগের দ্বারা সেই মহামুহূর্তগুলি সমাপ্ত করে দেওয়ার মতো অপব্যয় আর কিছু নেই। যখন বর্ষা নাবে তখন কেবলমাত্র বর্ষণের স্নিগ্ধ আনন্দসম্ভোগেই যথেষ্ট নয়, সে বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে— বৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে। সেদিন আমি এ কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম— আপনাদের মধ্যে অনেকের তা মনে থাকতে পারে অথবা বিস্মৃতও হয়ে থাকতে পারেন— 'কাজের সময় এসেছে, ভাবাবেগে চিত্ত অনুকূল হয়েছে। এখনই কর্ম করবার উপযুক্ত সময়। কেবলমাত্র ভাবাবেগ স্থায়ী হতে পারে না। ক্ষণকালের যে ভাবাবেগ তা দেশের সকলের চিত্তকে, সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের শক্তি ব্যাপ্ত হলে পরই কর্মের সূত্র দ্বারা যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হয়। কর্মের দিন এসেছে।' এই কথা আমি বলেছিলুম সেদিন। কিরূপ কর্ম। বাংলার পল্লী-সব আজ নিরন্ন, নিরানন্দ, তাদের স্বাস্থ্য দূর হয়ে গেছে— আমাদের তপস্যা করতে হবে সেই পল্লীতে নতুন প্রাণ আনবার জন্যে, সেই কাজে আমাদের ব্রতী হতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করেছিলুম, শুধু কাব্যে ভাব প্রকাশ করি নি। কিন্তু দেশ সে কথা স্বীকার করে নেয় নি সেদিন। আমি যে তখন কেবলমাত্র ভাবুকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়েছিলাম এ কথা সত্য নয়। তারও আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগেই, আমি পল্লীর কর্মের কথা বলেছিলুম— যে পল্লী বাংলাদেশের প্রাণনিকেতন সেইখানেই রয়েছে কর্মের যথার্থ ক্ষেত্র, সেইখানেই

কর্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই কাজের কথা একদিন আমি বলেছিলুম, নিজে তার কিছু সূত্রপাতও করেছিলুম। যখন বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়া বইতে আরম্ভ করে তখন কেবলমাত্র পাখির গানই যথেষ্ট নয়। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ তখন নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করে দেয়। সেই বিচিত্র প্রকাশেই বসন্তের উৎসব পরিপূর্ণ হয়— সেই শক্তি-অভিব্যক্তির দ্বারাই সমস্ত অরণ্য একটি আনন্দের ঐক্য লাভ করে, পূর্ণতায় ঐক্য সাধিত হয়। পাতা যখন ঝরে যায়, বৃক্ষ যখন আধমরা হয়ে পড়ে তখন প্রত্যেক গাছ আপন দীনতায় স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তখন নব পুষ্প নব কিশলয়ের বিকাশে উৎসবের মধ্যে সব এক হয়ে যায়। আমাদের জাতীয় ঐক্যসাধনেরও সেই উপায়, সেই একমাত্র পন্থা। যদি আনন্দের দক্ষিণ-হাওয়া সকলের অন্তরের মধ্যে এক বাণী উদ্‌বোধিত করে তা হলেও যতক্ষণ সেই উদ্‌বোধনের বাণী আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত না করে ততক্ষণ উৎসব পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে এই-যে উৎসবের কথা বললুম তা কর্মের উৎসব। আমগাছ যে আপনার মঞ্জরী বিকশিত করে তা তার সমস্ত মজ্জা থেকে, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে। কর্মের এই চাঞ্চল্য বসন্তকালে পূর্ণ হয়। মাধবীলতায়ও এই কর্মশক্তির পূর্ণরূপ দেখতে পাই। বসন্তকালে সমস্ত অরণ্য এক হয়ে যায় বিচিত্র সৌন্দর্যের তানে, আনন্দের সংগীতে। তেমনি আমরা দেখতে পাই সব বড়ো বড়ো দেশে তাদের যে ঐক্য তা বাইরের ঐক্য নয়, ভাবের ঐক্য নয়— বিচিত্র কর্মের মধ্যে তাদের ঐক্য। জাতির সকলকে বলদান, ধনদান, জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান— এই বিচিত্র কর্মচেষ্টার সমন্বয় হয়েছে যেখানে সেইখানেই যথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কবির গানে নয়, সাহিত্যের রসে নয়— কর্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তখনই সমস্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তৃতার মিথ্যা উত্তেজনায় শুধু বাক্যে শুধু মুখে 'ভাই' বললে ঐক্য স্থাপিত হয় না। ঐক্য কর্মের মধ্যে। এই কথাই আমি বলেছিলুম, যখন মনে হয়েছিল যে, সময় এসেছে। সময় এসেছিল, সে শুভ সময় চলে গিয়েছে। তখন আমার যৌবন ছিল; সব বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়েই আমি এ কথা বলেছিলুম, কেউ গ্রহণ করলে বা না-করলে তা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

আবার দিন এসেছে— দেশের লোকের চিত্তে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অনুকূল অবসর এসেছে— এমন সময়ে বয়সের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে কী করে চুপ করে বসে থাকি। আবার স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে যে, যদি মনের মধ্যে যথার্থই আনন্দ উপলব্ধি করে থাকো তবে কেবলমাত্র বাক্যবিন্যাসের দ্বারা ভাবরসসম্ভোগে তা অপব্যয় কোরো না। যে অনুকূল সময় এসেছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার দ্বার থেকে, সকলে মিলে সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হও। সম্মিলিত দেশের সৃষ্টির মধ্যেই দেশের আত্মা তার গৌরবের স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিধাতা বিশ্বকর্মা আপনার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কোথায়। তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে। তেমনি দেশের আত্মার স্থানও দেশের যত সৃষ্টির কাজের মধ্যে, ভাবসম্ভোগে নয়। সেই বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি কি জেগেছে আজ আমাদের মধ্যে— যে শক্তিতে দেশের অন্নদৈন্য, স্বাস্থ্যের দৈন্য, জ্ঞানের দৈন্য, সব ঘুচে যাবে? বসন্তকালের অরণ্যে যেমন তরুলতা সব ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি কর্মের বিকাশে সমস্ত দেশে একটি বিচিত্র রূপ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সেই লক্ষণ কি দেখতে পাই আমরা। আমি তো সায় পাই নে অন্তরে। ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মের প্রবর্তনা অতি অল্প। কিছু কাজ যে হয় নি তা বলছি নে, কিন্তু সে বড়ো অল্প। আবার সেজন্যে পুরোনো কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আমার সময় গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, আর অধিক দিন বাকি নেই আমার। তথাপি আমি বেরিয়েছি— পুরস্কারের জন্যে নয়, বরমাল্য নেবার জন্যে নয়, করতালিলাভের জন্যে নয়, সম্মানের ট্যাক্স আদায় করবার জন্যে নয়— দেশকে আপনারা জানতে চাচ্ছেন কর্ম-দ্বারা, এইটুকু দেখে যাব আমি। জীবনের অবসানকালে আমি দেখে যেতে চাই যে, সর্বত্র কর্মশক্তি উদ্যত হয়েছে। তা যদি না দেখতে পাই তবে জানব যে, আমাদের যে ভাবাবেগ তা সত্য নয়। যেখানে চিত্তের সত্য-উদ্‌বোধন হয় সেখানে সত্যকর্ম আপনি প্রকাশ পায়। দেশের মধ্যে কর্ম না দেখে আমাদের চিত্ত বিষণ্ণ হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই। খর্বাকৃতি

কাঁটাগাছ, মনসাগাছ দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে ; তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, আছে বিরুদ্ধ রূপ আর চিত্তের দৈন্য। মরুভূমিতে প্রাণশক্তি কর্মচেষ্টাকে বড়ো করে তুলতে পারে নি, সমস্ত উদ্ভিদ সেখানে দৈন্যে কণ্টকিত। এখনো কি তাই দেখব আমাদের মধ্যে। বসন্তের দক্ষিণসমীরণ কি বইল না। মরুভূমির যে প্রাণের দৈন্য বিরোধে বিদ্বেষে ভেদে বিভেদে সব কণ্টকিত, তাই দেখব এখনো ? তা হলে যে সব ব্যর্থ হবে, মরুভূমিতে বারিসেচন যেমন ব্যর্থ হয়। নেব আমরা এই শুভদিনকে, কেবল হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়— কর্মের মধ্যে চার দিকে তাকে বেঁধে নেব, কখনো যেতে দেব না— এই আমাদের পণ হোক। আমার কাজের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, কিন্তু অল্প কাজের মধ্যে সফলতার যে লক্ষণ দেখেছি, তাতে যে আনন্দ পেয়েছি, সেই আনন্দ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে চাই। পূর্বকালে এমন একদিন ছিল যখন আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রাণের প্রাচুর্য পূর্ণরূপে ছিল। গ্রামে গ্রামে জলাশয়-খনন, অতিথিশালা স্থাপন, নানা উৎসবের আনন্দ, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা— এ-সবই ছিল। সেই ছিল প্রাণের লক্ষণ। আজকের দিনে কেন জল দূষিত হয়ে গেছে, শুষ্ক হয়ে গেছে। কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে। কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদীস্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। তেমনি এক সময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায় প্রবাহিত হত আজ তা নির্জীব হয়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফলছে না। দেশবিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে। চার দিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখছি। যদি সেদিন না ফেরাতে পারি, তবে শহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে। যখন কোনো রোগীর গায়ে ব্যথা, ফোড়া প্রভৃতি নানা রকমের লক্ষণ দেখা যায় তখন রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণকে একে একে দূর করা যায় না। দেহের সমস্ত রক্ত দূষিত হলেই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে যদি বিরোধ ভেদ বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগলক্ষণ দেখা দেয় তবে তাদের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে দূর করা যায় না। দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে স্বাস্থ্যসঞ্চার করতে হবে, তবেই সমস্ত সমাজদেহের বিরোধ বিদ্বেষ দৈন্য দুর্গতি সব দূর হয়ে যাবে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে আমি আজকে এসেছি। অনুকূল সময় এসেছে, বসন্তসমীরণ বইতে আরম্ভ হয়েছে— আমি অনুভব করছি যে, মনে করিয়ে দেবার দিন এসেছে। দ্বিতীয় বার যেন এ সময় আমরা নষ্ট না করি, যথার্থ কর্মে যেন আমরা ব্রতী হই। দারিদ্র্যের মাঝখানে, অপমানের মাঝখানে, দেশের তৃষ্ণার মাঝখানে, প্রত্যক্ষভাবে সকলে মিল কাজ করতে হবে। এর বেশি কিছু বলতে চাই নে আজ। কালকে হয়তো আপনারা এ কথা ভুলেও যেতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে আমি খুব ভালো করে বলেছি। এইটুকুই যদি আমার পুরস্কার হয় তবে আমি বঞ্চিত হলাম। আমি আজ যা বলছি তা আমার প্রাণ দিয়ে, আয়ুক্ষয় ক'রে। আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাসে। এর পরিবর্তে আমি চাই সত্যিকার কর্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্যে যারা ব্রতী তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য-রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন। আমার স্বল্পাবশিষ্ট নিশ্বাস ব্যয় করে এ কথা বলছি— আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতিলাভের জন্যে কিছু বলছি না— দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে। এই ব'লে আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ বৈশাখ ১৩৩৩

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

বাংলাদেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের খেত দিয়েছে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরছি— কার কাছে। সেই খেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর-কোনো উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন। এ দেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চির দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা অক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহুবিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জনসংখ্যা মাথা গ'ণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য থাকে না। প্রভুমুখপ্রত্যাশী জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারি নে। বড়োকে ছোটো করতে চাই। একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে-সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায় সেইগুলিই প্রবল হয়। গড়ে তোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালিকে কেবলিই কোণ-ঠ্যাসা করছে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ— যারা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলই তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলই খাটাচ্ছি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালি শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না। ছিল সে যন্ত্রজীবী। মাড়াইকল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরো বড়ো যন্ত্রের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার করে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাষ করে মরছি— মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসল।

তখন থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম-চালনায়। ঐ একটিমাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে আপিসের বড়োবাবু হবার রাস্তায়। সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর-কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে ; তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।'

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিকতে পারব।

এ কথা মানি— যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ শুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই শামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে

দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান ; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারে নি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সবচেয়ে তার বাধা ঘটছে কোন্‌খানে। যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্য-কালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মতো অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মতো আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্মী আনাতে হচ্ছে যন্ত্রদক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত দুটো এবং তার মন না চলে দ্রুতগতিতে, না চলে নিপুণভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলাদেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গ-বিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে-কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে, সক্ষম হতে হবে— মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মতো কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাংলাদেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড়ো ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয় নি ; তাই সেগুলি চলছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থরগমনে। মন তৈরি করে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথমে যে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ করেছে সে হল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যাবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব-শেষে বাংলাদেশে এসে পৌঁছল। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে-খড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য জানেন কী করে মার বাঁচানো যায়— সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি— সে হল হাতিয়ার-বিদ্যার পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল।

বোম্বাই প্রদেশে এ কথা বললে ক্ষতি হয় না যে, 'চরখা ধরো'। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটিমাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলাদেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছি— তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানব যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয় তবে আর-কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত করে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

যাই হোক, বাংলাদেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল 'মোহিনী' মিল ; একে একে আরো কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেছে।

এদের যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে— বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাব তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে ব'লে যেন প'ণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেইজন্য বাঙালির দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহরক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে তাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কিরকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আমাদের সামনে আনতে হবে। কলকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্নদ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালি যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

অবশেষে উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত কারখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করছে, তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলাদেশের তাঁতিদের কেন নির্মম হয়ে মারি। বাঙালি দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতি সুতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব করে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তা হলে কী প্রমাণ হবে। তা ছাড়া কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ যে যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র। সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলাদেশের বহু যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরিবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি জোর করেই বলব, পুজোর বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতি যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।

অবশ্য, সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তা হলে মিলের কাপড় কিনতে হবে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলাদেশের বাইরে না যাই। যাঁরা শৌখিন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তাঁরা কেন যে তার চেয়ে অল্পদামে তেমনি শৌখিন শান্তিপুরি কাপড় না কেনেন তার যুক্তি খুঁজে পাই নে। একদিন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড়ো বজ্র হানলে। যে হাত তৈরি হতে কতকাল লেগেছে সেই হাতকে অপটু করতে বেশি দিন লাগে না। কিন্তু স্বদেশের এই বহুকালের অর্চিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে কি কারো ব্যথা লাগবে না। আমি পুনর্বার বলছি, কাপড়ের বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল যতটা, বিলিতি সুতো সত্ত্বেও তাঁতের কাপড়ে তার চেয়ে স্বল্পতর। আরো গুরুতর কথা এই যে, আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলা শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদনশক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাঁতিকে অনুনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিন্তু যদি না পৌঁছয়, তবে বাঙালি তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লৌহযন্ত্র ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

আশ্বিন ১৩৩৮

জলোৎসর্গ

ভুবনডাঙায় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কথিত

আজকের অনুষ্ঠানসূচীর শেষভাগে আছে আমার অভিভাষণ। কিন্তু যে বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হল তার পরে আমি আর কিছু বলা ভালো মনে করি না। সেগুলি এত সহজ, এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর যে, তার কাছে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল উৎসের মতো উৎসারিত।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন— যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত, মলিন, রুগ্‌ণ, উপবাসী। ঋষি বলেছেন— হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য করো। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য -দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।— জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃশ্য-লাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে। নিজের চারি দিককে অমলিন অন্নবান্ অনাময় করে রাখতে পারে না যে বর্বরতা, তা রাজারই হোক আর প্রজারই হোক, তার গ্লানিতে সমস্ত দেশ লাঞ্ছিত। অথচ একদিন দেশে জল ছিল প্রচুর, আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলায় কবরস্থ মৃত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে, আর তাদেরই প্রেত মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ দেশের সঙ্গে আপন প্রাণাত্মবোধের পরিচয় আজও ভালো করে দিল না। অন্য সকল লজ্জার চেয়ে এই লজ্জার কারণকেই এখানে আমরা সব চেয়ে দুঃখকর বলে এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণান্তিক বেদনা সম্বন্ধে দেশের চেতনার উদ্রেক হয়েছে। ধরণীর যে অন্তঃপুরগত সম্পদ্, যাতে জীবজন্তুর আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনার গোড়ায়, এই সহজ কথাটি স্বীকার করবার শুভদিন বোধ হচ্ছে আজ অনেক কাল পরে এসেছে।

যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে— তাই মন্ত্রে আছে : আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরের পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত থেকে মধ্যাহ্নরৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ দান!

অথচ বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার-অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য-অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদের জল দান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।

সেই ভুবনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পূর্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্তি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্যে নিঃসন্দেহ তাঁর কাছে যেতুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তিসমবায়ের দ্বারা এই-যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরো বেশি। এইরকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এখানে ক্রমে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চার দিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমূর্তি ধারণ করেছিল। আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। বন্ধুরা অনেকে অক্লান্ত যত্নে নানাভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শক্তির অনুপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক খর্ব করতে হয়েছে। আয়তন এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোখ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরূপ গ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হল।

এই জলপ্রসার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আভায় রঞ্জিত হয়ে নূতন যুগের হৃদয়কে আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিহৃদয় থেকে একে অভ্যর্থনা করছি। এই জল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত করে শস্যদান করুক। এর অজস্র দানে চার দিক স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

৭ ভাদ্র ১৩৪৩ কার্তিক ১৩৪৩

সম্ভাষণ

শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য যে, আমি কী ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।

আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কী ভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর— যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে! পল্লীজীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি। সেবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে যখন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি হল তখন আমাকে তাঁরা তাঁদের গোলযোগের মীমাংসার জন্য সভাপতির পদে বরণ করেছিলেন। আমার অভিভাষণ শুনে দুই পক্ষই আমার খুবই প্রশংসা করে বললেন, আপনি ঠিক আমাদেরই পক্ষের কথা বলেছেন; আমি কিন্তু জানতাম, আমি কারুর কথাই বলি নি। আমার জীবনের মধ্যে পল্লীগ্রামের দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, বিচলিত করেছিল, আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।

আমার অন্তর্নিহিত গ্রামসংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত তখন দু ধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে। ভেবেছি এই-যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে। পারব না একে কখনো উত্তীর্ণ হতে? সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল; যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব। এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, করুণা করেন নি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্যের ভিতর। আবার মনে হল মহর্ষির সাধনস্থল শান্তিনিকেতনে যদি ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়তো হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন— মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও— এদের যদি খুশি করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিচিত্ত এই নূতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ-সাতটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না, কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেছি, নানা গল্প ও কাহিনী রচনা করে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি, তাদের চিত্তকে সরস করবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার যা-কিছু সামান্য সম্বল ছিল তাই নিয়ে এ কাজে নেমে পড়েছিলাম। তখন এমন কথা মনেও আসে নি যে, কত বড়ো দুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বর যখন কাকেও কোনো কাজের ভার দেন তখন তাকে ছলনাই করেন, বুঝতে দেন না যে পরে কোথায় কোন্ পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবতাও আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে ক্রমশ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন দুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন যে, আর সেখান থেকে ভীরুর মতো ফেরবার সম্ভাবনা

রইল না। এখন আমাকে এই বিরাট এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোনো উপায় নেই আর তাকে অস্বীকার করবার।...

আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন ; আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে— আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাড়ানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই— আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনো আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না— এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি গদ্যে পদ্যে ছন্দে অনেক-কিছু লিখেছি, তার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্‌ বা না থাক্‌, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি নে, বুঝি নে, পল্লী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানি নে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। তার পর এ কাজ একার নয়। এই কর্ম বহু লোককে নিয়ে। বহু লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্য-রচনা একলার জিনিস, সমালোচনা তার দূর হতেও চলে। কিন্তু এই-যে ব্রত, এই-যে কর্মের অনুষ্ঠান, যা আমি গড়ে তুলছি, যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি— তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লীপ্রকৃতি সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য ; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে ; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।

এই-যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি, এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়।... আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাব্য-আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়। তাই এখানে আজ বার বার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন— তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ চৈত্র ১৩৪৩

অভিভাষণ

বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত

পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না, তেমনি বাধাও দেয় না। বকশিশ যখন জোটে নি বকশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন মনে। সে যুগে যশের হাটে দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্বল্প। আজকের দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা আমার পক্ষে ছিল ভালো, কলমের উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ। পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর পথ দেখাতে পারে না— অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে— সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পৌঁছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অন্তত আমাদের ঘরে পৌঁছয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে। আমার মরাইয়ে আজ যা-কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অঙ্কুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলার চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন-মনে। অঙ্কুরিত না হলে সে বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের খেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাই নি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

একসময়ে অঙ্কুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে-ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে, স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে। পুব দিকে বটগাছ, ছায়া পড়েছে তার পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যাস্তের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সেই সময় অকস্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিলুম ডেঙ্গুজ্বরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের স্নিগ্ধ শ্যামল আতিথ্য আমায় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া ; ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নৌকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যে-সব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়।

পুকুরে আসত-যেত যারা সেই-সব পল্লীবাসী-পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে একরকমের চেনাশোনা হল— নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে— ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যারা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারি দিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস; সেখানকার মানুষ যারা— সাঁওতাল— সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন— অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না— 'ঐ কবি আসছেন' 'ঐ রবিঠাকুর আসছেন' ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা, তাদের সঙ্গে একান্ত হৃদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে— সম্ভব ছিল তখন। ভয় করে নি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের চেহারা এর। পল্লীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম। এ দেশের এক নূতন দৃশ্য— শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে, অন্যসময় থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এড়িয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা, কী করে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ থেকে। যেন উপলক্ষটা কিছুই নয়, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উপায়। কিন্তু এই উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন; তীর্থ সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম্-টেবল্ নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। শীর্ষদেশে হিমালয়, পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর— এ-সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্ল্যাক্‌বোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম, কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬ বৈশাখ ১৩৪৭

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অচলিত সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার রচনার আবর্জিত অংশ অনেক দিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলুম। তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ব। এক সময়ে বালক ছিলুম, তখনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, কিন্তু সাহিত্যসভায় তাকে প্রকাশ্যতা দিলে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্কের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্যকর, কেননা সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়— অন্তত আমি তাই অনুভব করি। যে বয়স থেকে নিজের পরিচয় আমি নিজের স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত উপলব্ধি করেছি সেই বয়স থেকেই আমি সাহিত্যিক দায়িত্ব নিজের ব'লে স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বিচারসভায় আত্মসমর্পণ করতে আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম।

প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার জন্যেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে। প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছোয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে ; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে কবির কৈশোর ও যৌবনের রচনা কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশকালানুক্রমে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে "অচলিত-সংগ্রহ"। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই পুনরমুদ্রিত হয় নাই। বর্তমানেও এগুলি আর চলিত ছিল না ; অপরিণত রচনা মনে করিয়া কবি এগুলি বর্জন করিয়াছিলেন, এবং এই "অচলিত" রচনাগুলি আর প্রচলিত না হয় ইহাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে সুতীব্র বিরাগ তিনি নানা উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলী-প্রকাশের উদ্যোগকালেও তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

'বিশ্বভারতী-গ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলী আমার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ, যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে, কিন্তু তার চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতের ঘ'ষে-যাওয়া তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্তযুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করবে বসে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না। কেননা, যে বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ করবার মতো আব্রু নেই।'...

কবির সকল রচনা প্রকাশ করিতে উৎসুক বন্ধুদের পরিহাস করিয়া কিছুকাল পূর্বে একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
    আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে,
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে ?
    যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি!'
ইতিহাস বুড়ো বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা—
    ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয় খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালো-মন্দর দরদ কিছুই নেই,
    মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপা-যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
    এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণ-পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
    সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা!

এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কবির বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য কিরূপ সুগভীর তাহাই জানাইবার জন্য এই পত্র ও কবিতা উদ্‌ধৃত করিলাম ; এগুলি পুনঃপ্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই। এখন আমাদের তরফ হইতে কৈফিয়ৎস্বরূপ দু-একটা কথা বলি।

ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়— যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না ; এই রচনাগুলি যে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়, যে বয়সে এগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন সে বয়সের পক্ষে আদৌ বিস্ময়কর নয়, এমন নহে ; এগুলির রচনাকালে বাংলা-সাহিত্য উৎকর্ষের যে পর্যায়ে ছিল তাহার পক্ষে এগুলির অধিকাংশই পরম বিস্ময়, এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথকে জয়মাল্য পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাব-ঐশ্বর্যের দিক দিয়াও এগুলি যে রচয়িতার দীনতাই ঘোষণা করিতেছে, এমন কথা অনেক পাঠকই মনে করেন না। এ-রচনাগুলির 'শিল্প-আবরণ' আজ 'জীর্ণ' মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার বাণী যে সম্পূর্ণ 'অর্থভ্রষ্ট', রসহীন, 'মরুপ্রদেশ', কবির এ কথা মানিয়া না লইবার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয়, কোন্ দান শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহার বিচার-ভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না, আমরা নিজেরাও সে ভার গ্রহণ করি নাই— ভাবী কালের উপরে রাখিয়াই এই গ্রন্থগুলি সংকলন করা হইল।

এই খণ্ড সম্পাদনায় সহযোগিতা করিয়া শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই খণ্ডের ভূমিকা ও গ্রন্থপরিচয় তাঁহাদের রচনা।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

এই খণ্ডগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বর্জিত রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অচলিত সংগ্রহ'। ইহার দুই ভাগ ; পুস্তক বা পুস্তিকা আকারে যেগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং লেখকের ইচ্ছায় পরবর্তীকালে আর মুদ্রিত হয় নাই। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা অনবধানবশতই কোনো পুস্তকসংগ্রহে স্থান পায় নাই, এই অংশে তেমন রচনাও থাকিবে। দুই-একটি পুস্তক পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত বা পরিবর্জিত-পরিবর্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিরও মূল সংস্করণ এই অংশে স্থান পাইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগে সেই সকল রচনা থাকিবে যাহা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করে নাই। ইহার অধিকাংশই লেখক স্বয়ং বর্জন করিয়াছেন, তবে কয়েকটি এমন রচনাও আছে যাহা নিতান্ত ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছে।

রচনাবলীতে এই উভয় শ্রেণীর বর্জিত রচনা সংকলন করার বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক যুক্তি দিয়াছেন, সকল যুক্তি মানিয়া লইয়াও যে আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিতেছি তাহার একমাত্র কারণ— এই রচনাবলীকে সমগ্র রচনাবলী করার ঐকান্তিক ইচ্ছা। অপরিপুষ্ট ও অবাঞ্ছিত রচনার প্রকাশে আর যাহারই ক্ষতি হউক, রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। তা ছাড়া, বহু পাঠককে আমরা আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ; এগুলি এখন অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। তাঁহাদের আক্ষেপ-মোচনও এই পরিশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশের অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারি দিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে ; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না। মনের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যখন ফুল ফোটায় ফল ফলায় তখন সেইটের আবেগ ও বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ। তার মাঝে মাঝে সময় আসে যখন ফলন যায় কমে, যখন হাওয়ার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রেরণা হয় ক্ষীণ। তখন ইতস্তত যে ফসলের চিহ্ন দেখা দেয় সে আগেকার কাটা শস্যের পোড়ো বীজের অঙ্কুর। এই অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উঞ্ছবৃত্তির ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যাঁরা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা। কিন্তু ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।

'ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ

ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

'আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা, রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে-একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।

'একেবারে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে নিয়েই আঁট করে তোড়া বাঁধতে হবে এ কথা আমি বলি নে। একটা আদর্শ আছে সেটা নিছক পয়লা শ্রেণীর আদর্শ নয়, সেটা সাধারণ চলতি শ্রেণীর আদর্শ। তার মধ্যে পরস্পরের মূল্যের কমিবেশি আছে। রেলগাড়িতে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয়, কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা সকলেই রক্ষা করেছে। যারা অসম্পূর্ণ, কারখানা-ঘরের বাইরে তাদের আনা উচিত হয় না। কিন্তু তারা যে অনেক এসে পড়েছে তা এই বইয়ের গোড়ার দিকের কবিতাগুলি দেখলে ধরা পড়বে। কুয়াশা যেমন বৃষ্টি নয়, এরাও তেমনি কবিতা নয়। যাঁরা পড়বেন তাঁরা এই-সব কাঁচা বয়সের অকালজাত অঙ্গ-হীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় তো হাসবেন তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভই শেষ নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই বইয়ে যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।

'সাহিত্যরচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। তাদের সবাইকে একত্রে এলোমেলো বাড়তে দিলে সবারই ক্ষতি হয়। মনে আছে এক সময়ে বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয় নি। তিনি আমার যে-সব গানকে তলব দিয়ে বিচারকক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার 'পরে। তারা সেই পরিণতি পায় নি যার জোরে গীতসাহিত্য-সভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের সরিয়ে আনতে গেলে ইতিহাস আপন পুরাতন দাবির দোহাই পেড়ে আপত্তি পেশ করে।

'আজ যদি আমার সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি আপন আপন স্থান পাবে এ কথা মানা যেতে পারে। তারা সবাই মিলেই সমষ্টির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কেবল যাদের মধ্যে পরিণতি ঘটে নি তারা কোনো-এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়; সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।'

উপরের উদ্‌ধৃতির মধ্যেই এই-সকল অপরিণত, অপরিপক্ক রচনার জন্য পাঠকসমাজের কাছে কবির কৈফিয়ৎ আছে। অচলিত ভাগের বিবিধ খণ্ডগুলির জন্য এই কৈফিয়ৎ বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য।

বর্তমান খণ্ডে 'কবি-কাহিনী', 'বন ফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কাল-মৃগয়া', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'নলিনী' ও শৈশবসঙ্গীত' মুদ্রিত হইল। প্রত্যেকটিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খণ্ডের পরিশিষ্টে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল; এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণ মূল রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত পাঠভেদ সম্বন্ধে এখানে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রিকার সহিত মিলাইয়া এই পুস্তকের স্থানে স্থানে স্পষ্ট মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য।

পৃ· ৫০১, পঙ্‌ক্তি ২৯—

পুস্তকে 'উল্লাসে হৃদয় আর উঠে না নাচিয়া !' আছে। আমরা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে মুদ্রিত পাঠ 'উল্লাসে শোণিতরাশি উঠে না নাচিয়া !' গ্রহণ করিয়াছি।

কবি-কাহিনী

কবি-কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার-রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে
সরস্বতী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৫।

রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক চৌদ্দ বৎসর বয়সে

কবি-কাহিনী

প্রথম সর্গ

শুন কলপনা বালা, ছিল কোনো কবি
বিজন কুটির-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।
একাকী আপন মনে সরল শিশুটি
তোমারি কমল-বনে করিত গো খেলা,
মনের কত কি গান গাহিত হরষে,
বনের কত কি ফুলে গাঁথিত মালিকা।
একাকী আপন মনে কাননে কাননে
যেখানে সেখানে শিশু করিত ভ্রমণ ;
একাকী আপন মনে হাসিত কাঁদিত।
জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা—
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
বিজন কুলায়ে বসি গাহিত বিহঙ্গ,
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক
কোথায় গাইছে পাখি। ফুলদলগুলি,
কামিনীর গাছ হতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা!
প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণকিরণে
বিমল সরসী যবে হত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু-জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া
ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।

দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
নিশা তারে ঝিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,
স্নেহময়ী মাতা যথা সুপ্ত শিশুটির
মুখপানে চেয়ে চেয়ে করেন চুম্বন।
প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
উষা তার সুখনিদ্রা দিতেন ভাঙায়ে।
এইরূপে কি একটি সংগীতের মতো,
তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা-বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মতো
কবির বালক-কাল হইল বিগত।

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল
কহিত প্রকৃতিদেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরমবারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।
তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।
যখনি রজনীমুখ উজলিত শশী,
সুপ্ত বালিকার মতো যখন বসুধা
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে,
বসিয়া তটিনীতীরে দেখিত সে কবি—
স্নান করি জোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশ, হাসে নিম্নে স্রোতস্বিনী ;
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে।

ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে—
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি-পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের 'পরে হবে প্রকাশিত ;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি'।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের 'পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত ;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন ;
ওই স্তব্ধ নদীজলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশসলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ ;
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,
জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সেই কবি ভাবিত কত কি।
হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মতো,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা-পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবীদেবী, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু-হৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মতো মুক্ত সমীরণ
হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্বতগহ্বর,
সকলি কবির ছিল সাধের বসতি।
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল
কল্পনা ! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কনককিরণময় উষার জলদে

একাকী পাখির সাথে গাইতে কি গীত
তাই শুনি যেন তার ভাঙিত গো ঘুম !
অনন্ত-তারা-খচিত নিশীথগগনে
বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর গান,
তাহাই শুনিয়া যেন বিহ্বলহৃদয়ে
নীরবে আকাশ পানে রহিত চাহিয়া ।
নীরব নিশীথ যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীরতলে বাজাইত বাঁশী
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর ।
নিশার আঁধার-কোলে জগৎ যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে
তখন সে কবি উঠি তুষারমণ্ডিত
সমুচ্চ পর্বতশিরে গাইত একাকী
প্রকৃতিবন্দনাগান মেঘের মাঝারে ।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না,
কেবল আকাশব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
এক দৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া ।
কেবল, পর্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার,
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান ;
কেবল সুদূর বনে দিগন্তবালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া ।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর গীতি-সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সমুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথবায়ু কাঁপাত পল্লব ।
গম্ভীরে গাইত কবি— "হে মহাপ্রকৃতি,
কি সুন্দর, কি মহান্ মুখশ্রী তোমার,
শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতিদেবী
কি কবিতা লিখেছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে,
যত দিন রবে প্রাণ পড়িয়া পড়িয়া
তবু ফুরাবে না পড়া ; মিটিবে না আশ !
শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্বচরাচরে ।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মতো এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন !

সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,
দুরন্ত শিশুর মতো অনন্ত আকাশে
করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন,
স্তনদানে পুষ্ট করি তুমি তাহাদের
অলঙ্ঘ্য সখ্যের ডোরে দিলে গো বাঁধিয়া।
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায়;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হোয়ে রহে অনন্ত আকাশে!
অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সময়,
যা ভাবিতে পৃথিবীর কীট মানুষের
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হোয়ে পড়ে ভয়ে সঙ্কুচিত,
তাহাই তোমার দেবি সাধের আবাস।
তোমার মুখের পানে চাহিতে হে দেবি
ক্ষুদ্র মানবের এই স্পর্দ্ধিত জ্ঞানের
দুর্বল নয়ন যায় নিমীলিত হয়ে।
হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা!
প্রকৃতি জননি ওগো, তোমার স্বরূপ
যত দূর জানিবারে ক্ষুদ্র মানবেরে
দিয়াছ গো অধিকার সদয় হইয়া,
তত দূর জানিবারে জীবন আমার
করেছি ক্ষেপণ আর করিব ক্ষেপণ।
ভ্রমিতেছি পৃথিবীর কাননে কাননে—
বিহঙ্গও যত দূর পারে না উড়িতে
সে পর্বতশিখরেও গিয়াছি একাকী;
দিবাও পশে নি দেবি যে গিরিগহ্বরে,
সেখানে নির্ভয়ে আমি করেছি প্রবেশ।
যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মতো

করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা-দেশে,
তুষারসংঘাতরাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।
অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর 'পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকসিত।
এমন নীরবে বায়ু যেতেছে বহিয়া,
নীরবতা ঝাঁ ঝাঁ করি গাইছে কি গান—
মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।
কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষায়,
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মতো
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি!
কী মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ-বালারে—
যে দিকে দক্ষিণবধূ ফেলেন নিশ্বাস,
সে দিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সে দিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সে দিকে বসন্ত-লক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।
কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমাশর্বরী—
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথলে জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটীর।
হে প্রকৃতিদেবি তুমি মানুষের মন
কেমন বিচিত্র ভাবে রেখেছ পূরিয়া,
করুণা, প্রণয়, স্নেহ, সুন্দর শোভন—
ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য আদি সমুচ্চ মহান্—
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি ভয়ানক ভাব,
নিরাশা মরুর মতো দারুণ বিষণ্ণ—
তেমনি আবার এই বাহির জগৎ
বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত।
তোমার বিচিত্র কাব্য-উপবন হতে

তুলিয়া সুরভি ফুল গাঁথিয়া মালিকা,
তোমারি চরণতলে দিব উপহার !"
এইরূপে সুনিস্তব্ধ নিশীথ-গগনে
প্রকৃতি-বন্দনা-গান গাইত সে কবি ।

দ্বিতীয় সর্গ

"এত কাল হে প্রকৃতি করিনু তোমার সেবা,
তবু কেন এ হৃদয় পূরিল না দেবি ?
এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর ?
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া—
কত দিন বল দেবি রহিবে এমন শূন্য,
তা হলে ভাঙিয়ে যাবে এ মনোমন্দির !
কিছু দিন পরে আর দেখিব সেখানে চেয়ে
পূর্ব হৃদয়ের আছে ভগ্ন-অবশেষ,
সেই ভগ্ন-অবশেষে— সুখের সমাধি'পরে
বসিয়া দারুণ দুখে কাঁদিতে কি হবে ?
মনের অন্তর-তলে কী যে কী করিছে হুহু,
কী যেন আপন ধন নাইক সেখানে,
সে শূন্য পূরাতে দেবি ঘুরেছি পৃথিবীময়
মরুভূমে তৃষাতুর মৃগের মতন ।
কত মরীচিকা দেবী করেছে ছলনা মোরে,
কত ঘুরিয়াছি তার পশ্চাতে পশ্চাতে,
অবশেষে শ্রান্ত হয়ে তোমারে শুধাই দেবি
এ শূন্য পূরিবে না কি কিছুতে আমার ?
উঠিছে তপন শশী, অস্ত যাইতেছে পুনঃ,
বসন্ত শরত শীত চক্রে ফিরিতেছে ;
প্রতি পদক্ষেপে আমি বাল্যকাল হতে দেবি
ক্রমে ক্রমে কত দূর যেতেছি চলিয়া—
বাল্যকাল গেছে চলে, এসেছে যৌবন এবে,
যৌবন যাইবে চলি আসিবে বার্ধক্য—
তবু এ মনের শূন্য কিছুতে কি পূরিবে না ?
মন কি করিবে হুহু চিরকাল তরে ?
শুনিয়াছিলাম কোন্ উদাসী যোগীর কাছে—
'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন ;
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,

বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল,
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর,
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সংগীত,
পারে না পূরিতে তারা বিশাল মনুষ্য-হৃদি—
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।'
শুনিয়া, প্রকৃতিদেবি, ভ্রমিনু পৃথিবীময় ;
কত লোক দিয়েছিল হৃদি উপহার—
আমার মর্মের গান যবে গাহিতাম দেবি
কত লোক কেঁদেছিল শুনিয়া সে গীত।
তেমন মনের মতো মন পেলাম না দেবি,
আমার প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ,
তাইতে নিরাশ হয়ে আবার এসেছি ফিরে,
বুঝি গো এ শূন্য মন পূরিল না আর।"
এইরূপ কেঁদে কেঁদে কাননে কাননে কবি
একাকী আপন-মনে করিত ভ্রমণ।
সে শোক-সংগীত শুনি কাঁদিত কাননবালা,
নিশীথিনী হাহা করি ফেলিত নিশ্বাস,
বনের হরিণগুলি আকুল নয়নে আহা
কবির মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
"হাহা দেবি একি হল, কেন পূরিল না প্রাণ"
প্রতিধ্বনি হত তার কাননে কাননে।
শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা ঝরিতেছে মৃদু মৃদু,
উঠিতেছে কুলু কুলু জলের কল্লোল,
সেখানে গাছের তলে একাকী বিষণ্ণ কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া—
তৃষিত হরিণশিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখপানে চলিয়া যাইত।
শীতরাত্রে পর্বতের তুষারশয্যার 'পরে
বসিয়া রহিত স্তব্ধ প্রতিমার মতো,
মাথার উপরে তার পড়িত তুষারকণা,
তীব্রতম শীতবায়ু যাইত বহিয়া।
দিনে দিনে ভাবনায় শীর্ণ হয়ে গেল দেহ,
প্রফুল্ল হৃদয় হল বিষাদে মলিন,
রাক্ষসী স্বপ্নের তরে ঘুমালেও শান্তি নাই,
পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মতো
এক দিন অপরাহ্নে বিজন পথের প্রান্তে
কবি বৃক্ষতলে এক রয়েছে শুইয়া,
পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ, চিন্তায় আকুল হৃদি,
বহিতেছে বিষাদের আকুল নিশ্বাস।
হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি

দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে,
"কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক ?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময় ?
কি দুখে উদাস হয়ে করিছ ভ্রমণ ?"
গভীর নিশ্বাস ফেলি গম্ভীরে কহিল কবি,
"প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা ?"
একে একে কত কথা কহিল বালিকা কাছে,
যত কথা রুদ্ধ ছিল হৃদয়ে কবির—
আগ্নেয় গিরির বুকে জ্বলন্ত অগ্নির মতো
যত কথা ছিল কবি কহিলা গম্ভীরে।
"নদ নদী গিরি গুহা কত দেখিলাম, তবু
প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না দেবি।"
বালার কপোল বাহি নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির-সম পড়িল ঝরিয়া,
সেই এক অশ্রুবিন্দু অমৃতধারার মতো
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন ;
দেখি সে করুণাবারি নিরশ্রু কবির চোখে
কত দিন পরে হল অশ্রুর উদয়।
শ্রান্ত হৃদয়ের তরে যে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে
পাগল ভ্রমিতেছিল হেথায় হোথায়—
আজ যেন একটুকু আশ্রয় পাইল হৃদি,
আজ যেন একটুকু জুড়ালো যন্ত্রণা।
যে হৃদয় নিরাশায় মরুভূমি হয়েছিল
সেথা হতে হল আজ অশ্রু উৎসারিত।
শান্ত সে কবির মাথা রাখিয়া কোলের 'পরে,
সরলা মুছায়ে দিল অশ্রুবারিধারা।
কবি সে ভাবিল মনে, তুমি কোথাকার দেবী
কি অমৃত ঢালিলে গো প্রাণের ভিতর !
ললনা তখন ধীরে চাহিয়া কবির মুখে
কহিল মমতাময় করুণ কথায়,—
"হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটীর ওই,
চল পান্থ ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হতে ফল মূল আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।

হরিণশাবক এক আছে ও গাছের তলে,
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক।
দূরে সরসীর ধারে আছে এক চারু কুঞ্জ,
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন।
কত পাখি ডালে ডালে সারাদিন গাইতেছে,
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখি এক আছে মোর সে যে কত গায় গান—
নাম ধোরে ডাকে মোরে 'নলিনী' 'নলিনী'।
যা আছে আমার কিছু সব আমি দেখাইব,
সব আমি শুনাইব যত জানি গান—
আসিবে কি পান্থ ওই বনের কুটীরমাঝে?"
এতেক শুনিয়া কবি চলিল কুটীরে।
কি সুখে থাকিত কবি, বিজন কুটীরে সেই
দিনগুলি কেটে যেত মুহূর্তের মতো—
কি শান্ত সে বনভূমি, নাই লোক নাই জন,
শুধু সে কুটীরখানি আছে এক ধারে।
আঁধার তরুর ছায়ে— নীরব শান্তির কোলে
দিবস যেন রে সেথা রহিত ঘুমায়ে।
পাখির অস্ফুট গান, নির্ঝরের ঝরঝর
স্তব্ধতারে আরো যেন দিত মিষ্ট করি।
আগে এক দিন কবি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে
অরণ্যে অরণ্যে একা করিত ভ্রমণ,
এখন দুজনে মিলি ভ্রমিয়া বেড়ায় সেথা,
দুই জন প্রকৃতির বালক বালিকা।
সুদূর কাননতলে কবিরে লইয়া যেত
নলিনী, সে যেন এক বনেরি দেবতা।
শ্রান্ত হলে পথশ্রমে ঘুমাত কবির কোলে,
খেলিত বনের বায়ু কুন্তল লইয়া,
ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিত কবি—
মুখে যেন লিখা আছে আরণ্য কবিতা।
"একি দেবি কলপনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না তো!
কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের 'পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি দুইটি হৃদয়ে মিলি,
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা এক ইচ্ছা দুজনার,

এক ভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয় সে কি গো সুখের মিল—
এ জনমে ভাঙিবে না তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
এক সাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুই জনে
তা হলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হোয়ে—
কিছু ভয় করি নাকো— বিহ্বল প্রণয়ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া।
তাই হোক্— হোক্ দেবি আমাদের দুই জনে
সেই প্রেম এক করে দিক্।
মজি স্বপনের ঘোরে হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"
নিশীথে একেলা হলে এইরূপ কত গান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত-প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস-কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয় প্রকাশ করিতে গিয়া
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া।
বিষাদ যতই হয় দারুণ অন্তরভেদী,
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!
মরমের ভার-সম হৃদয়ের কথাগুলি
কত দিন পারে বলো চাপিয়া রাখিতে?
এক দিন ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া
অশান্ত বালক-মত কহিল কত কি!
অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি।
কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা!
এই কথাগুলি যেন পড়িল বালিকা ধীরে—
"কত ভালোবাসি বালা কহিব কেমন!
তুমিও সদয় হয়ে আমার সে প্রণয়ের
প্রতিদান দিয়ো বালা এই ভিক্ষা চাই।"

গড়ায়ে পড়িল ধীরে বালিকার অশ্রুজল,
কবির অশ্রুর সাথে মিশিল কেমন—
স্কন্ধে তার রাখি মাথা কহিল কম্পিত স্বরে,
"আমিও তোমারে কবি বাসি না কি ভালো ?"
কথা না স্ফুরিল আর, শুধু অশ্রুজলরাশি
আরক্ত কপোল তার করিল প্লাবিত।
এইরূপ মাঝে মাঝে অশ্রুজলে অশ্রুজলে
নীরবে গাইত তারা প্রণয়ের গীত।
অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন সুখে
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন—
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু,
যেন তারা অপ্সরার সুখের সংগীত।
আলুলিত চুলগুলি সাজাইয়া বনফুলে
ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
একথা ওকথা লয়ে কি যে কি কহিত বালা
কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত।
কভু বা মুখের পানে সে যে কি রহিত চেয়ে,
ঘুমায়ে পড়িত যেন হৃদয় কবির।
কভু বা কি কথা লয়ে সে যে কি হাসিত হাসি,
তেমন সরল হাসি দেখে নি কেহই।
আঁধার অমার রাত্রে একাকী পর্বতশিরে
সেও গো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর
পর্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া,
তাহারো হৃদয় যেন নদীর তরঙ্গ-সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব—
করিত সে ছুটাছুটি, কিছুতে সে ডরিত না,
এমন দুরন্ত মেয়ে দেখি নি তো আর !
কবি যা কহিত কথা শুনিত কেমন ধীরে,
কেমন মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
বনদেবতার মতো এমন সে এলোথেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত প্রভাতের বায়ু যথা
নীরবে শুনে গো যবে পাখির সংগীত।
কিন্তু, কলপনা, যদি কবির হৃদয় দেখ
দেখিবে এখনো তাহা পূর্ণ হয় নাই।
এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভালোবাসা,
আরো ঢালো' ভালোবাসা হৃদয়ে আমার।"
প্রেমের অমৃতধারা এত যে করেছে পান,
তবু মিটিল না কেন প্রণয়পিপাসা ?
প্রেমের জোছনাধারা যত ছিল ঢালি বালা

কবির সমুদ্র-হৃদি পারে নি পূরিতে ।
স্বাধীন বিহঙ্গ-সম, কবিদের তরে দেবি
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু ।
অমন সমুদ্র-সম আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবি নহে এ পৃথিবী ।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তার আকুল বিলাপে ।
কবির সমুদ্র-বুক পূরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা ।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা ।"
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি,
"আরো দাও ভালোবাসা হৃদয়ে ঢালিয়া ।
আমি যত ভালোবাসি তত দাও ভালোবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা ।"
শুনিয়া কবির কথা কাতরে কহিল বালা,
"যা ছিল আমার কবি দিয়েছি সকলি—
এ হৃদয়, এ পরান, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমার প্রেমে দেছি বিসর্জন ।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর,
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ ।"
সে কথা শুনিয়া কবি কহিল কাতর স্বরে,
"প্রাণের শূন্যতা তবু ঘুচিল না কেন ?
ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি,
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন ?
সারাদিন সাধ যায় শুনাই মনের কথা,
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া ?
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা ?
সাধ যায় এ জীবন প্রাণ ভোরে ভালোবাসি,
বেসেও প্রাণের শূন্য ঘুচিল না কেন ?
আমি যত ভালোবাসি তত দাও ভালোবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা ।
একি দেবি ! একি তৃষ্ণা জ্বলিছে হৃদয়ে মোর,
ধরায় অমৃত যত করিয়াছি পান,
প্রকৃতির আছে যত অতুল সৌন্দর্যরাশি,
প্রণয়ের আছে যত সুধা হতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি,
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া—

শুধু দেবি পৃথিবীর হলাহল আছে যত
তাহাই করি নি পান মিটাতে পিপাসা !
শুধু দেবি ঐশ্বর্যের কনকশৃঙ্খল দিয়া
বাঁধি নাই আমার এ স্বাধীন হৃদয় !
শুধু দেবি মিটাইতে মনের বীরত্ব-গর্ব
লক্ষ মানবের রক্তে ধুই নি চরণ !
শুধু দেবি এ জীবনে নিশাচর বিলাসেরে
সুখ-স্বাস্থ্য অর্ঘ্য দিয়া করি নাই সেবা !
তবু কেন হৃদয়ের তৃষা মিটিল না মোর,
তবু কেন ঘুচিল না প্রাণের শূন্যতা ?
শুনেছি বিলাসসুরা বিহ্বল করিয়া হৃদি
ডুবাইয়া রাখে সদা বিস্মৃতির ঘুমে !
কিন্তু দেবি— কিন্তু দেবি— এত যে পেয়েছি কষ্ট,
বিস্মৃতি চাই নে তবু বিস্মৃতি চাই নে !—
সে কি ভয়ানক দশা, কল্পনাও শিহরে গো—
স্বর্গীয় এ হৃদয়ের জীবনে মরণ !
আমার এ মন দেবি হোক্ মরুভূমি-সম
তৃণলতা-জল-শূন্য জ্বলন্ত প্রান্তর,
তবুও তবুও আমি সহিব তা প্রাণপণে,
বহিব তা যত দিন রহিব বাঁচিয়া,
মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন, পর্যটিব,
হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার ।
প্রেম ভক্তি স্নেহ আদি মনের দেবতা যত
যতনে রেখেছি আমি মনের মন্দিরে,
তাঁদের করিতে পূজা ক্ষমতা নাইক ব'লে
বিসর্জন করিবারে পারিব না আমি ।
কিন্তু ওগো কলপনা আমার মনের কথা
বুঝিতে কে পারিবেক বলো দেখি দেবি ?
আমার ব্যথার মর্ম কারে বুঝাইবে বলো—
বুঝাইতে না পারিলে বুক যায় ফেটে ।
যদি কেহ বলে দেবি 'তোমার কিসের দুখ,
হৃদয়ের বিনিময়ে পেয়েছ হৃদয়,
তবে কাল্পনিক দুখে এত কেন ম্রিয়মাণ ?'
তবে কি বলিয়া আমি দিব গো উত্তর ?
উপায় থাকিতে তবু যে সহে বিষাদজ্বালা
পৃথিবী তাহারি কষ্টে হয় গো ব্যথিত—
আমার এ বিষাদের উপায় নাইক কিছু,
কারণ কি তাও দেবি পাই না খুঁজিয়া ।
পৃথিবী আমার কষ্ট বুঝুক্ বা না বুঝুক্,
নলিনীরে কি বলিয়া বুঝাইব দেবি ?
তাহারে সামান্য কথা গোপন করিলে পরে

হৃদয়ে কি কষ্ট হয় হৃদয় তা জানে।
এত তারে ভালোবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালোবাসা হইল না আশ মিটাইয়া ?
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কী যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।
বুকের যেখানে তারে রাখিতে চাই গো আমি
সেখানে পাই নে যেন রাখিতে তাহারে—
তাইতে অন্তর বুক এখনো পূরিতেছে না,
তাইতে এখনো শূন্য রয়েছে হৃদয়।"
কবির প্রণয়সিন্ধু ক্ষুদ্র বালিকার মন
রেখেছিল মগ্ন করি অগাধ সলিলে—
উপরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা কত কি বহিয়া যেত
নিম্নে তার কোলাহল পেত না শুনিতে,
প্রণয়ের অবিচিত্র নিয়তনূতন তবু
তরঙ্গের কলধ্বনি শুনিত কেবল,
সেই একতান ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া তার
হৃদয় পড়িয়াছিল ঘুমায়ে কেমন !
বনের বালিকা আহা সে ঘুমে বিহ্বল হয়ে
কবির হৃদয়ে রাখি অবশ মস্তক
স্বর্গের স্বপন শুধু দেখিত দিবস রাতি,
হৃদয়ের হৃদয়ের অনন্ত মিলন।
বালিকার সে হৃদয়ে সে প্রণয়মগ্ন হৃদে,
অবশিষ্ট আছিল না এক তিল স্থান—
আর কিছু জানিত না, আর কিছু ভাবিত না,
শুধু সে বালিকা ভালোবাসিত কবিরে
শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভালো,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।
শুধু সে কবির নেত্র কী এক স্বর্গীয় জ্যোতি
বিকীরিত, তাই হেরি হইত বিহ্বল !
শুধু সে কবির কোলে ঘুমাতে বাসিত ভালো,
কবি তার চুল লয়ে করিত কি খেলা।
শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভালো
কত কী— কত কী কথা অর্থ নাই যার,
কিন্তু সে কথায় কবি কত যে পাইত অর্থ
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়—
সেই অর্থহীন কথা, হৃদয়ের ভাব যত
প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।
একদিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া—
"নলিনি ! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী !
আর একবার বালা কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখির কবিতা !

রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ !
এইখানে থাকো তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন ।"
এতেক কহিয়া কবি নীরবে চলিয়া গেল
গোপনে মুছিয়া ফেলি নয়নের জল ।
বালিকা নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি,
কী দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চোখে ।
সন্ধ্যা হয়ে এল ক্রমে তবুও রহিল চাহি,
তবুও তো পড়িল না নয়নে নিমেষ ।
অনিমিষ নেত্র ক্রমে করিয়া প্লাবিত
এক বিন্দু দুই বিন্দু ঝরিল সলিল ।
বাহুতে লুকায়ে মুখ কাতর বালিকা
মর্মভেদী অশ্রুজলে করিল রোদন ।
হা-হা কবি কী করিলে, ফিরে দেখো, ফিরে এসো,
দিয়ো না বালার হৃদে অমন আঘাত—
নীরবে বালার আহা কী বজ্র বেজেছে বুকে,
গিয়াছে কোমল মন ভাঙিয়া চুরিয়া !
হা কবি অমন করে অনর্থক তার মনে
কী আঘাত করিলে যে বুঝিলে না তাহা ?
এত কাল সুখস্বপ্ন ডুবায়ে রাখিয়া মন,
এত দিন পরে তাহা দিবে কি ভাঙিয়া ?
কবি তো চলিয়া যায়— সন্ধ্যা হয়ে এল ক্রমে,
আঁধারে কাননভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কী যেন কী ভাবিছে নীরবে !
তখন বনান্ত হতে সুধীরে শুনিল কবি
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ণ সংগীত—
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে ।
একবার কবি শুধু চাহিল কুটীরপানে,
কাতরে বিদায় মাগি বনদেবী-কাছে
নয়নের জল মুছি— যে দিকে নয়ন চলে
সে দিকে পথিক কবি যাইল চলিয়া ।

সংগীত

কেন ভালোবাসিলে আমায় ?
কিছুই নাইক গুণ, কিছুই জানি না আমি,
কী আছে ? কী দিয়ে তব তুষিব হৃদয় !

যা আমার ছিল সাধ্য   সকলি করেছি আমি
কিছুই করি নি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভালো বাসিয়াছি,   শুধু এ পরান মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন   তুষিতে নারিনু যদি
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার ?
গেলে যদি, গেলে চলি,   যাও যেথা ভালো লাগে—
একবার মনে কোরো দীন অধীনীরে।
ভ্রমিতে ধরার মাঝে   কত ভালোবাসা পাবে,
তাতে যদি ভালো থাক তাই হোক তবে—
তবু একবার যদি   মনে কর নলিনীরে
যে দুখিনী, যে তোমারে এত ভালোবাসে !
কী করিলে মন তব   পারিতাম জুড়াইতে
যদি জানিতাম কবি করিতাম তাহা !
আমি অতি অভাগিনী   জানি না বলিয়া যেন
বিরক্ত হোয়ো না কবি এই ভিক্ষা দাও !
না জানিয়া না শুনিয়া   যদি দোষ করে থাকি,
ক্ষুদ্র আমি, ক্ষমা তবে করিয়ো আমারে—
তুমি ভালো থেকো কবি,   ক্ষুদ্র এক কাঁটা যেন
ফুটে না তোমার পায়ে ভ্রমিতে পৃথিবী।
জননি, কোথায় তুমি   রেখে গেলে দুহিতারে ?
কত দিন একা একা কাটালাম হেথা,
একেলা তুলিয়া ফুল   কত মালা গাঁথিতাম,
একেলা কাননময় করিতাম খেলা !
তোমার বীণাটি ল'য়ে,   উঠিয়া পর্বতশিরে
একেলা আপন মনে গাইতাম গান—
হরিণশিশুটি মোর   বসিত পায়ের তলে,
পাখিটি কাঁধের 'পরে শুনিত নীরবে।
এইরূপ কত দিন   কাটালেম বনে বনে,
কত দিন পরে তবে এলে তুমি কবি !
তখন তোমারে কবি   কী যে ভালোবাসিলাম
এত ভালো কাহারেও বাসি নাই কভু।
দূর স্বরগের এক   জ্যোতির্ময় দেব-সম
কত বার মনে মনে করেছি প্রণাম।
দূর থেকে আঁখি ভরি   দেখিতাম মুখখানি,
দূর থেকে শুনিতাম মধুময় গান।
যে দিন আপনি আসি   কহিলে আমার কাছে
ক্ষুদ্র এই বালিকারে ভালোবাস তুমি,
সে দিন কী হর্ষে কবি   কী আনন্দে কি উচ্ছ্বাসে
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মোর ফেটে গেল যেন।
আমি কোথাকার কেবা !   আমি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র,

স্বর্গের দেবতা তুমি ভালোবাস মোরে ?
এত সৌভাগ্য, কবি, কখনো করি নি আশা—
কখনো মুহূর্ত-তরে জানি নি স্বপনে ।
যেথায় যাও-না কবি, যেথায় থাক-না তুমি,
আমরণ তোমারেই করিব অর্চনা ।
মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক
দেবতা ! এ দুখিনীর শুন গো প্রার্থনা ।

তৃতীয় সর্গ

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি !
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ণকণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে ।
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয় ।
বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি প্রকৃতির গীত—
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়
সে মনের তন্ত্রী যেন হয়েছে বিকল ।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হল দশা—
যে প্রকৃতি-শোভা-মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মতো কবির নয়নে,
নাইক দেবতা যেন মন্দিরমাঝারে ।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্ধন
প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া ;
সে না হলে অমাবস্যানিশির মতন
সমস্ত জগৎ হত বিষণ্ণ আঁধার ।

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা, নীরব রজনী ।
অরণ্যের অন্ধকারময় গাছগুলি
মাথার উপরে মাখি রজত জোছনা,
শাখায় শাখায় ঘন করি জড়াজড়ি,
কেমন গম্ভীর ভাবে রয়েছে দাঁড়ায়ে ।

হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসীবক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভপ্রতিবিম্বশোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন!
লীলাময়ী প্রবাহিণী চলেছে ছুটিয়া,
লীলাভঙ্গ বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙে চুরে কত শত ধরিছে মুরতি।
গাইছে রজনী কিবা নীরব সংগীত!
কেমন নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর—
শুধু দূর-শৃঙ্গ হতে ঝরিছে নির্ঝর,
শুধু এক পাশ দিয়া সংকুচিত অতি
তটিনীটি সর সর যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্তবায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কত বার আমি
গম্ভীর অরণ্যে একা করেছি ভ্রমণ।
স্নিগ্ধ রাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার পড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানি না কী এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া উঠে গো কেমন!
কী যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কী কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কী কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি!
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে,
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠে নি উথলি!
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায় নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবা নিশি তার
হৃদয়ের এক দিক শূন্য হয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্মভেদী একটি নিশ্বাস?
কতস্থানে আজ রাত্রে নিশীথপ্রদীপে
উঠিছে প্রমোদধ্বনি বিলাসীর গৃহে।
মুহূর্ত ভাবে নি তারা আজ নিশীথেই
কত চিত্ত পুড়িতেছে প্রচ্ছন্ন অনলে।

কত শত হতভাগা আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মতো জীবনের সুখ
মর্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলাই হা হা করি বেড়ায় ভ্রমিয়া !

ঝোপে-ঝাপে ঢাকা ওই অরণ্যকুটীর ।
বিষণ্ণ নলিনীবালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া !
জানি না কেমন করে বালার বুকের মাঝে
সহসা কেমন ধারা লেগেছে আঘাত—
আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হয়েছে নীরব ।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে ।
বিজন কুটীরে শুধু পরণশয্যার 'পরে
একেলা আপন মনে রয়েছে শুইয়া ।
যে বালা মুহূর্তকাল স্থির না থাকিত কভু,
শিখরে নির্ঝরে বনে করিত ভ্রমণ—
কখনো তুলিত ফুল, কখনো গাঁথিত মালা,
কখনো গাইত গান, বাজাইত বীণা—
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির !
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ !
এক দিন, দুই দিন, যেতেছে কাটিয়া ক্রমে—
মরণের পদশব্দ গনিছে সে যেন !
আর কোনো সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয় গো মরণ ।
এ দিকে পৃথিবী ভ্রমি সহিয়া ঝটিকা কত
ফিরিয়া আসিছে কবি কুটীরের পানে,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যথা জ্বলিয়া পুড়িয়া পাখি
সন্ধ্যায় কুলায়ে তার আইসে ফিরিয়া ।
বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা !
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাইছে পাখি,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি ।
অধীরে চলিল কবি কুটীরের পানে—
দুয়ারের কাছে গিয়া দুয়ারে আঘাত দিয়া
ডাকিল অধীর স্বরে, নলিনী ! নলিনী !
কিছু নাই সাড়া শব্দ, দিল না উত্তর কেহ,
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ ।

কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা রয়েছে পড়ি—
বেষ্টিত বিতন্ত্রী বীণা লূতাতন্তুজালে।
ভ্রমিল আকুল কবি কাননে কাননে,
ডাকিয়া সমুচ্চ স্বরে, নলিনী! নলিনী!
মিলিয়া কবির সাথে বনদেবী উচ্চস্বরে
ডাকিল কাতরে আহা, নলিনী! নলিনী!
কেহই দিল না সাড়া, শুধু সে শবদ শুনি
সুপ্ত হরিণেরা ত্রস্ত উঠিল জাগিয়া।
অবশেষে গিরিশৃঙ্গে উঠিল কাতর কবি,
নলিনীর সাথে যেথা থাকিত বসিয়া।
দেখিল সে গিরি-শৃঙ্গে, শীতল তুষার-'পরে,
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লানমুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্ধনিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।
একটি হরিণশিশু খেলা করিবার তরে
কভু বা অঞ্চল ধরি টানিতেছে তার,
কভু শৃঙ্গ দুটি দিয়া সুধীরে দিতেছে ঠেলি,
কভু বা অবাক্ নেত্রে রয়েছে চাহিয়া!
তবু নলিনীর ঘুম কিছুতেই ভাঙিছে না,
নীরবে নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে ভূতলে।
দূর হতে কবি তারে দেখিয়া কহিল উচ্চে,
"নলিনি, এয়েছি আমি দেখ্‌সে বালিকা।"
তবুও নলিনী বালা না দিয়া উত্তর
শীতল তুষার-'পরে রহিল ঘুমায়ে।
কবি সে শিখর-'পরে করি আরোহণ
শীতল অধর তার করিল চুম্বন—
শিহরিয়া চমকিয়া দেখিল সে কবি
না নড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস।
দেখিল না, ভাবিল না, কহিল না কিছু,
যেমন চাহিয়া ছিল রহিল চাহিয়া।
নিদারুণ কী যেন কী দেখিয়া তরাসে
নয়ন হইয়া গেল অচল পাষাণ।
কতক্ষণে কবি তবে পাইল চেতন,
দেখিল তুষারশুভ্র নলিনীর দেহ
হৃদয়জীবনহীন জড় দেহ তার
অনুপম সৌন্দর্যের কুসুম-আলয়,
হৃদয়ের মরমের আদরের ধন—
তৃণ কাষ্ঠ সম ভূমে যায় গড়াগড়ি!
বুকে তারে তুলে লয়ে ডাকিল "নলিনী",

হৃদয়ে রাখিয়া তারে পাগলের মতো কবি
কহিল, কাতর স্বরে "নলিনী" "নলিনী" !
স্পন্দহীন, রক্তহীন অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন ।

...

তার পর দিন হতে সে বনে কবিরে আর
পেলে না দেখিতে কেহ, গেছে সে কোথায় !
ঢাকিল নলিনীদেহ তুষারসমাধি—
ক্রমে সে কুটীরখানি কোথা ভেঙে চুরে গেল,
ক্রমে সে কানন হল গ্রাম লোকালয়,
সে কাননে— কবির সে সাধের কাননে
অতীতের পদচিহ্ন রহিল না আর ।

চতুর্থ সর্গ

"এ তবে স্বপন শুধু, বিম্বের মতন
আবার মিলায়ে গেল নিদ্রার সমুদ্রে !
সারারাত নিদ্রার করিনু আরাধনা—
যদি বা আইল নিদ্রা এ শ্রান্ত নয়নে,
মরীচিকা দেখাইয়া গেল গো মিলায়ে !
হা স্বপ্ন, কী শক্তি তোর, এ হেন মুরতি
মুহূর্তের মধ্যে তুই ভাঙিলি, গড়িলি ?
হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা—
সত্যের মতন গড়িলি প্রতিমা,
স্বপ্নের মতন তাহা ফেলিলি ভাঙিয়া ?
কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে ?
না না, তাহা নয় কভু, নলিনী, সে কি গো
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মতো !
যাহার মোহিনী মূর্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যত কাল রব বেঁচে যার ভালোবাসা
চিরকাল এ হৃদয়ে রহিবে অক্ষয়,
সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গপ্রতিমা,
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মতো
তরঙ্গের অভিঘাতে জন্মিল মিশিল ?
না না, তাহা নয় কভু, তা যেন না হয় !

দেহকারাগারমুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।
দেহকারাগারমুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয়সাথে মিশাব হৃদয়।
নলিনী, আছ কি তুমি, আছ কি হেথায়?
একবার দেখা দেও, মিটাও সন্দেহ!
চিরকাল তরে তোরে ভুলিতে কি হবে?
তাই বল্ নলিনী লো, বল্ একবার!
চিরকাল আর তোরে পাব না দেখিতে,
চিরকাল আর তোর হৃদয়ে হৃদয়
পাব না কি মিশাইতে, বল্ একবার।
মরিলে কি পৃথিবীর সব যায় দূরে?
তুই কি আমারে ভুলে গেছিস্ নলিনি?
তা হলে নলিনি, আমি চাই না মরিতে।
তোর ভালোবাসা যেন চিরকাল মোর
হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে থাকে গো মুদ্রিত—
কষ্ট পাই পাব, তবু চাই না ভুলিতে!
তুমি নাহি থাক যদি তোমার স্মৃতিও
থাকে যেন এ হৃদয় করিয়া উজ্জ্বল!
এই ভালোবাসা যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?
যত কাল বেঁচে রব, রবে যা হৃদয়ে
মুহূর্তে না পালটিতে আঁখির পলক
ক্ষণস্থায়ী কুসুমের সুরভের মতো
শূন্য এই বায়ুস্রোতে যাইবে মিশায়ে?
হিমাদ্রির এই স্তব্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ে পদক্ষেপ গনিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্তমান,
বর্তমান মিশিতেছে অতীতসমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে মানুষেরে অলক্ষিতভাবে
পরিবর্তনের পথে যেতেছে লইয়া,

কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে
তাহার চরণ-চিহ্ন পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দান্ত সময়স্রোত অবিরামগতি,
নূতন গড়ে নি কিছু, ভাঙে নি পুরানো।
বাহিরের কত কী যে ভাঙিল চুরিল,
বাহিরের কত কী যে হইল নূতন,
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি—
আগেও আছিল যাহা এখনো তা আছে,
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই!
বরষে বরষে দেহ যেতেছে ভাঙিয়া,
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর,
নলিনীরে ভালোবাসি তবুও তেমনি।
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন
তার হৃদয়ের মূর্তি ছিল এ হৃদয়ে,
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে,
মরমের মর্ম্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙিবারে এ জনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকানো সে ধন!
ভেবেছিনু এক বার এই-যে বিষাদ
নিদারুণ তীব্র স্রোতে বহিছে হৃদয়ে
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙিবে চুরিবে—
পারে নি ভাঙিতে কিন্তু এক তিল তাহা,
যেমন আছিল মন তেমনি রয়েছে!
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে,
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কী যে আছে বল,
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী।
গাও গো বিহগ তব প্রমোদের গান,
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি!
প্রকৃতি! মাতার মতো সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতিদেবি
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য, দেবি, তোমার এ রাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।

যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতিদেবি,
সংশয় কখন আমি করি না স্বপনে!
বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান!
পাখিরা মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত,
কানন ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু,
উপত্যকাময় যবে ফুটিয়াছে ফুল,
তখন তোদের আর কিসের ভাবনা?
দেখি চিরহাস্যময় প্রকৃতির মুখ,
দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা!
সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে,
সমস্ত জগৎ যবে গাহে গো সংগীত,
তখন তো তোরা নিজ বিজন কুটীরে
ক্ষুদ্রতম আপনার মনের বিষাদে
সমস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস না বসি!
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কি গো আর?
ধীরে ধীরে দূর হতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।
একেক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ
মনে হয় আমারি তা প্রাণের রাগিণী—
সেই রাগিণীর মতো আমার এ প্রাণ,
আমার প্রাণের মতো যেন সে রাগিণী!
কখন বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মতো আছিল মধুর,
এমনি স্বপনময় এমনি অস্ফুট—
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে!"

ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্ধক্যে আসি হল উপনীত!
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে!
মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্!
নেত্র তাঁর বিকীরিত কী স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।

বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তেও যেন
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।
যেন কোন্ দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্রলোকে করেছে স্থাপিত—
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন
কহিত কাতর স্বরে ঢাকিয়া নয়ন,
"এ কি রে অনন্ত কাণ্ড, পারি না সহিতে!"
সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া,
কী গান গাইছে কবি, শুন কলপনা।
কী "সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষারশুভ্র মস্তক তোমার!
সরল পাদপরাজি-আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীতবায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ন নিশ্বাস!
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্বতের বনে বনে গাঢ়তর হল
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব!
সাড়াশব্দ নাই মুখে, অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্বতের পদতল দিয়া!
কী মহান্! কী প্রশান্ত! কী গম্ভীর ভাব!
ধরার সকল হতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব ওগো হিমালয়
নীরব ভাষায় তুমি কী যেন একটি
গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার!
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্যমনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ!
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মতো

হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে, হয়ে হতজ্ঞানপ্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া।
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কী গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কত বার আইল ফিরিয়া!
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া
কত কাল আইল রে, গেল কত কাল
হিমাদ্রি তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে।
কিন্তু বলো দেখি ওগো হিমালয়গিরি
মানুষসৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কী দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে?
যা দেখিছ যা দেখেছ তাতে কি এখনো
সর্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠে নি শিহরি?
কী দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে, মানবমনে বিষ মিশাইয়া!
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতাশৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্কশৃঙ্খল তার অলংকাররূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায়!
দাসত্বের পদধূলি অহংকার করে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা!
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!

সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল—
দুর্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জিতে !
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্বলে কোথা সাহায্য করিবে—
দুর্বলে অধিকতর করিতে দুর্বল
বলো তার— হিমগিরি, দেখিছ কি তাহা ?
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময়পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার !
কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে,
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে !
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে,
উপেক্ষা ঘৃণায় মাখা কুঞ্চিত অধর
পরঅশ্রুজলে ঢালে হাসিমাখা বিষ !
পৃথিবী জানে না গিরি হেরিয়া পরের জ্বালা,
হেরিয়া পরের মর্মদুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়নজলে মিশাতে নয়নজল—
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !
প্রেম ? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তিধামে ?
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে ?
প্রেমে পাপ বলে যারা, প্রেম তারা চিনে ?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম-অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভালোবাসে যারা
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা,
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই—
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে !
কেহ বা রতনময় কনকভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্নসন্ধান !

সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু
সমস্ত পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস !
সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব !
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি—
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ ।
এ অশান্তি কবে দেব হবে দূরীভূত !
অত্যাচার-গুরুভারে হয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন !
সুখ শান্তি সেথা হতে লয়েছে বিদায় !
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !
নাইক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা—
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার !
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল-অন্তরে ।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস !
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত !
হিমাদ্রি, মানুষসৃষ্টি-আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
তবে বলো কবে, গিরি, হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ !
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয় ।

প্রকৃতির সব কার্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে—
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয় ।
আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতিদেবি
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয় ।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সংগীত, দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষচিতে ত্যজিতে জীবন !"

সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত !
যথা সে হিমাদ্রি হতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্বরা ।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময় । মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হয়ে পৃথিবীর দুখে,
ব্যাধশরে নিপতিত পাখির মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন !
কবির প্রাচীননেত্রে পৃথিবীর শোভা
এখনো কিছুমাত্র হয় নি পুরানো ?
এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে
একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ ।
বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি, গম্ভীর মুরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃদেব !
জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির !
সংগীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন ।
প্রতিরাত্রে গিরিশিরে জোছনায় বসি
আনন্দে গাইত কবি সুখের সংগীত ।
দেখিতে পেয়েছে যেন স্বর্গের কিরণ,
শুনিতে পেয়েছে যেন দূর স্বর্গ হতে,

নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান ।
প্রবাসী যেমন আহা দূর হতে যদি
সহসা শুনিতে পায় স্বদেশ-সংগীত,
ধায় হরষিত চিতে সেই দিক্ পানে,
একদিন দুইদিন যেতেছে যেমন
চলেছে হরষে কবি, যেই দেশ হতে
স্বদেশসংগীতধ্বনি পেতেছে শুনিতে ।
এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া !
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস !
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রুজলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত !
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হুহু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস !
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল !
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান ।

বন-ফুল

বন-ফুল।

কাব্যোপন্যাস।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রী মতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ;

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট;—কলিকাতা।

১২৮৬ সাল।
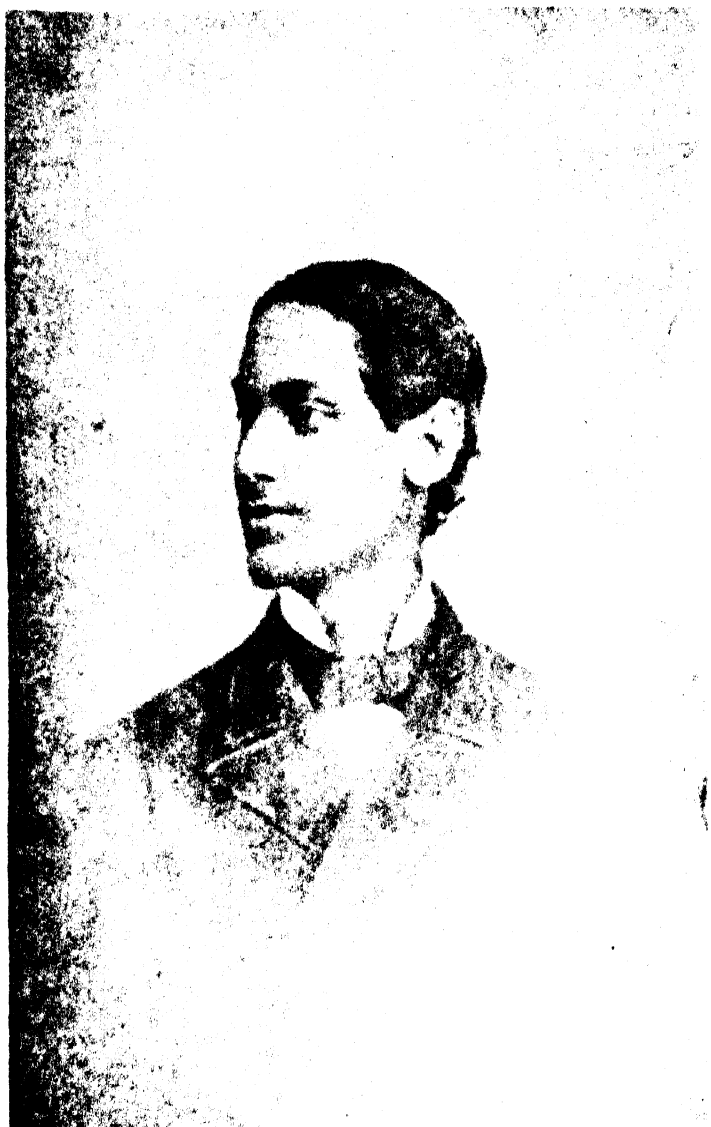
রবীন্দ্রনাথ

সতেরো বছর বয়সে

বন-ফুল

প্রথম সর্গ

চাই না জ্ঞেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে ।
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে !

—

দীপনির্বাণ

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজতসুষমাময় প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য.শিখরমালা বিশাল মহান্ ;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান !
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন ;
তুষারে আবরি শির ছেলেখেলা পৃথিবীর
ভ্রূক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন ।
কত নদী কত নদ কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন !
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে,
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন !

...

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীতসমীরণে দুলায়ে পাদপগনে
বহিছে নির্ঝরবারি করিয়া চুম্বন,
হিমাদ্রিশিখরশৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি তুষার বিভায় নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা রহেছে নিদ্রিত ।
পর্বতের পদতলে ধীরে ধীরে নদী চলে
উপলরাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গকুল সিক্ত করি বৃক্ষমূল
নাচিছে পাষাণতট করিয়া প্রহত !

চারি দিকে কত শত কলকলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা-মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

...

কল্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র-ছায়ে-ছায়ে পাদপের গায়ে-গায়ে
ডুবায়ে চরণদেশ স্রোতস্বিনীনীরে?
চৌদিকে মানববাস নাহিক কোথায়,
নাহি জনকোলাহল গভীর বিজনস্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুমভূষিত বেশে কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকামালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবকরাশি দুয়ার-উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীরভিতর!
কুটীরের এক পাশে শাখাদীপ[১] ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোক, তায় আঁধার মিশিয়া যায়—
ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর-দ্বার!
গভীর নীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর!
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়—
বিষাদের অন্ধকারে গভীর শোকের ভারে
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকারময়!
কে ওগো নবীনা বালা উজলি পরণশালা
বসিয়া মলিনভাবে তৃণের আসনে?
কোলে তার সঁপি শির কে শুয়ে হইয়া স্থির
থেক্যে থেক্যে দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সঘনে—
সুদীর্ঘ ধবল কেশ ব্যাপিয়া কপোলদেশ,
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে বক্ষের বসন—
অবশ জ্ঞেয়ানহারা, স্তিমিত লোচনতারা,
পলক নাহিক পড়ে নিস্পন্দ নয়ন!
বালিকা মলিনমুখে বিশীর্ণা বিষাদদুখে,
শোকে ভয়ে অবশ সে সুকোমল-হিয়া।
আনত করিয়া শির বালিকা হইয়া স্থির
পিতার-বদন-পানে রয়েছে চাহিয়া।
এলোথেলো বেশবাস, এলোথেলো কেশপাশ
অবিচল আঁখিপার্শ্ব করেছে আবৃত!

১ হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে, তথাকার লোকেরা উহা প্রদীপের পরিবর্তে ব্যবহার করে।

নয়নপলক স্থির, হৃদয় পরান ধীর,
শিরায় শিরায় রহে স্তব্ধ শোণিত।
হৃদয়ে নাহিক জ্ঞান, পরানে নাহিক প্রাণ,
চিন্তার নাহিক রেখা হৃদয়ের পটে!
নয়নে কিছু না দেখে, শ্রবণে স্বর না ঠেকে,
শোকের উচ্ছ্বাস নাহি লাগে চিত্ততটে!
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, সুধীরে নয়ন মেলি
ক্রমে ক্রমে পিতা তাঁর পাইলেন জ্ঞান!
সহসা সভয়প্রাণে দেখি চারিদিক পানে
আবার ফেলিল শ্বাস ব্যাকুলপরান—
কী যেন হারায়ে গেছে, কী যেন আছে না আছে,
শোকে ভয়ে ধীরে ধীরে মুদিল নয়ন—
সভয়ে অস্ফুট স্বরে সরিল বচন,
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী!"
চমকি উঠিল যেন নীরব রজনী!
চমকি উঠিল যেন নীরব অবনী!
ঊর্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে—
সহসা করণক্ষেপে সহসা উঠে রে কেঁপে,
সহসা জাগিয়া উঠে চলঊর্মি সবে!
কমলার চিত্তবাপী সহসা উঠিল কাঁপি
পরানে পরান এলো হৃদয়ে হৃদয়!
স্তবধ শোণিতরাশি আস্ফালিল হৃদে আসি,
আবার হইল চিন্তা হৃদয়ে উদয়!
শোকের আঘাত লাগি পরান উঠিল জাগি,
আবার সকল কথা হইল স্মরণ!
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে নয়নযুগল মুদে
আছেন জনক তাঁর, হেরিল নয়ন।
স্থির নয়নের পাতে পড়িল পলক,
শুনিল কাতর স্বরে ডাকিছে জনক,
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী!"
বিষাদে ষোড়শী বালা চমকি অমনি
(নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে) কহিল কাতর স্বরে
পিতার নয়ন-'পরে রাখিয়া নয়ন,
"কেন পিতা! কেন পিতা! এই-যে রয়েছি হেতা"—
বিষাদে নাহিক আর সরিল বচন!
বিষাদে মেলিয়া আঁখি বালার বদনে রাখি
এক দৃষ্টে স্থিরনেত্রে রহিল চাহিয়া!
নেত্রপ্রান্তে দরদরে, শোক-অশ্রুবারি ঝরে,
বিষাদে সন্তাপে শোকে আলোড়িত হিয়া!
গভীরনিশ্বাসক্ষেপে হৃদয় উঠিল কেঁপে,
ফাটিয়া বা যায় যেন শোণিত-আধার!

ওষ্ঠপ্রান্ত থরথরে কাঁপিছে বিষাদভরে
নয়নপলক-পত্র কাঁপে বার বার—
শোকের স্নেহের অশ্রু করিয়া মোচন
কমলার পানে চাহি কহিল তখন,
"আজি রজনীতে মা গো ! পৃথিবীর কাছে
বিদায় মাগিতে হবে, এই শেষ দেখা ভবে !
জানি না তোমার শেষে অদৃষ্টে কি আছে—
পৃথিবীর ভালোবাসা পৃথিবীর সুখ আশা,
পৃথিবীর স্নেহ প্রেম ভক্তি সমুদায়,
দিনকর নিশাকর গ্রহ তারা চরাচর,
সকলের কাছে আজি লইব বিদায় !
গিরিরাজ হিমালয় ! ধবল তুষারচয় !
অয়ি গো কাঞ্চনশৃঙ্গ মেঘ-আবরণ !
অয়ি নির্ঝরিণীমালা ! স্রোতস্বিনী শৈলবালা !
অয়ি উপত্যকে ! অয়ি হিমশৈলবন !
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায় ।
কুটীর পরণশালা সহিয়া বিষাদজ্বালা
আশ্রয় লইয়াছিনু যাহার ছায়ায়—
স্তিমিত দীপের প্রায় এত দিন যেথা হায়
অন্তিমজীবনরশ্মি করেছি ক্ষেপণ,
আজিকে তোমার কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
তোমারি কোলের পরে সঁপিব জীবন !
নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে, নহে তোমাদের তরে,
তোমাদের তরে চিত্ত ফেলিছে না শ্বাস—
আজি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিব তো,
বাতাসে মিশাবে আজি অন্তিম নিশ্বাস !
কাঁদি না তাহার তরে, হৃদয় শোকের ভরে
হতেছে না উৎপীড়িত তাহারো কারণ ।
আহা হা ! দুখিনী বালা সহিবে বিষাদজ্বালা
আজিকার নিশিভোর হইবে যখন ?
কালি প্রাতে একাকিনী অসহায়া অনাথিনী
সংসারসমুদ্র-মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে !
সংসারযাতনাজ্বালা কিছু না জানিস্, বালা,
আজিও !— আজিও তুই চিনিস নে ভবে !
ভাবিতে হৃদয় জ্বলে,— মানুষ কারে যে বলে
জানিস্ নে কারে বলে মানুষের মন ।
কার দ্বারে কাল প্রাতে দাঁড়াইবি শূন্যহাতে,
কালিকে কাহার দ্বারে করিবি রোদন !
অভাগা পিতার তোর জীবনের নিশা ভোর—
বিষাদ নিশার শেষে উঠিবেক রবি

আজ রাত্রি ভোর হলে ! কারে আর পিতা বলে
ডাকিবি, কাহার কোলে হাসিবি খেলিবি ?
জীবধাত্রী বসুন্ধরে ! তোমার কোলের 'পরে
অনাথা বালিকা মোর করিনু অর্পণ !
দিনকর ! নিশাকর ! আহা এ বালার 'পর
তোমাদের স্নেহদৃষ্টি করিও বর্ষণ !
শুন সব দিকবালা ! বালিকা না পায় জ্বালা
তোমরা জননীস্নেহে করিও পালন !
শৈলবালা ! বিশ্বমাতা ! জগতের স্রষ্টা পাতা !
শত শত নেত্রবারি সঁপি পদতলে—
বালিকা অনাথা বলে স্থান দিও তব কোলে,
আবৃত করিও এরে স্নেহের আঁচলে !
মুছ মা গো অশ্রুজল ! আর কি কহিব বলো !
অভাগা পিতারে ভোলো জন্মের মতন !
আটকি আসিছে স্বর !— অবসন্ন কলেবর ।
ক্রমশ মুদিয়া, মা গো, আসিছে নয়ন !
মুষ্টিবদ্ধ করতল, শোণিত হইছে জল,
শরীর হইয়া আসে শীতল পাষাণ !
এই— এই শেষবার— কুটীরের চারি ধার
দেখে লই ! দেখে লই মেলিয়া নয়ান !
শেষবার নেত্র ভোরে এই দেখে লই তোরে
চিরকাল তরে আঁখি হইবে মুদ্রিত !
সুখে থেকো চিরকাল !— সুখে থেকো চিরকাল !
শান্তির কোলেতে বালা থাকিও নিদ্রিত !"
স্তবধ হৃদয়োচ্ছ্বাস ! স্তবধ হইল শ্বাস !
স্তবধ লোচনতারা ! স্তবধ শরীর !
বিষম শোকের জ্বালা— মূর্ছিয়া পড়িল বালা,
কোলের উপরে আছে জনকের শির !
গাইল নির্ঝরবারি বিষাদের গান,
শাখার প্রদীপ ধীরে হইল নির্বাণ !

দ্বিতীয় সর্গ

যেয়ো না ! যেয়ো না !

দুয়ারে আঘাত করে কে ও পান্থবর ?
"কে ওগো কুটীরবাসি ! দ্বার খুলে দাও আসি !'
তবুও কেন রে কেউ দেয় না উত্তর ?
আবার পথিকবর আঘাতিল ধীরে !

"বিপন্ন পথিক আমি, কে আছে কুটীরে ?"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই—
তটিনী বহিয়া যায় আপনার মনে !
পাদপ আপন মনে প্রভাতের সমীরণে
দুলিছে, গাইছে গান সরসর স্বনে !
সমীরে কুটীরশিরে লতা দুলে ধীরে ধীরে
বিতরিয়া চারি দিকে পুষ্পপরিমল !
আবার পথিকবর আঘাতে দুয়ার-'পর—
ধীরে ধীরে খুলে গেল শিথিল অর্গল ।
বিস্ফারিয়া নেত্রদ্বয় পথিক অবাক্ রয়,
বিস্ময়ে দাঁড়ায়ে আছে ছবির মতন ।
কেন পান্থ, কেন পান্থ, মৃগ যেন দিক্‌ভ্রান্ত
অথবা দরিদ্র যেন হেরিয়া রতন !
কেন গো কাহার পানে দেখিছ বিস্মিত প্রাণে—
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিশ্বাস ?
দারুণ শীতের কালে ঘর্মবিন্দু ঝরে ভালে,
তুষারে করিয়া দৃঢ় বহিছে বাতাস !
ক্রমে ক্রমে হয়ে শান্ত সুধীরে এগোয় পান্থ,
থর থর করি কাঁপে যুগল চরণ—
ধীরে ধীরে তার পরে সভয়ে সংকোচভরে
পথিক অনুচ্চ স্বরে করে সম্বোধন—
"সুন্দরি ! সুন্দরি !" হায় । উত্তর নাহিক পায় !
আবার ডাকিল ধীরে "সুন্দরি ! সুন্দরি !"
শব্দ চারি দিকে ছুটে, প্রতিধ্বনি জাগি উঠে,
কুটীর গম্ভীরে কহে "সুন্দরি ! সুন্দরি !"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই,
এখনো পৃথিবী ধরা নীরবে ঘুমায় !
নীরব পর্ণশালা, নীরব ষোড়শী বালা,
নীরবে সুধীর বায়ু লতারে দুলায় !
পথিক চমকি প্রাণে দেখিল চৌদিক-পানে—
কুটীরে ডাকিছে কেও "কমলা ! কমলা !"
অবাক্ হইয়া রহে, অস্ফুটে কে ওগো কহে ?
সুমধুর স্বরে যেন বালকের গলা !
পথিক পাইয়া ভয়, চমকি দাঁড়ায়ে রয়,
কুটীরের চারি ভাগে নাই কোনোজন !
এখনো অস্ফুটস্বরে 'কমলা ! কমলা !' ক'রে
কুটীর আপনি যেন করে সম্ভাষণ !
কে জানে কাহাকে ডাকে, কে জানে কেন বা ডাকে,
কেমনে বলিব কেবা ডাকিছে কোথায় ?
সহসা পথিকবর দেখে দণ্ডে করি ভর
'কমলা ! কমলা !' বলি শুক গান গায় !

আবার পথিকবর হন ধীরে অগ্রসর,
'সুন্দরি ! সুন্দরি !' বলি ডাকিয়া আবার !
আবার পথিক হায় উত্তর নাহিক পায়,
বসিল উরুর 'পরে সঁপি দেহভার !
সঙ্কোচ করিয়া কিছু পান্থবর আগুপিছু
একটু একটু ক'রে হন অগ্রসর !
আনমিত করি শিরে পথিকটি ধীরে ধীরে
বালার নাসার কাছে সঁপিলেন কর !
হস্ত কাঁপে থরথরে, বুক ধুক্ ধুক্ করে,
পড়িল অবশ বাহু কপোলের 'পর—
লোমাঞ্চিত কলেবরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ঝরে,
কে জানে পথিক কেন টানি লয় কর !
আবার কেন কী জানি বালিকার হস্তখানি
লইলেন আপনার করতল-'পরি—
তবুও বালিকা হায় চেতনা নাহিক পায়—
অচেতনে শোক জ্বালা রয়েছে পাশরি !
রুক্ষ রুক্ষ কেশরাশি বুকের উপরে আসি
থেকে থেকে কাঁপি উঠে নিশ্বাসের ভরে !
বাঁহাত আঁচল-'পরে অবশ রয়েছে পড়ে
এলো কেশরাশি মাঝে সঁপি ডান করে।
ছাড়ি বালিকার কর ত্রস্ত উঠে পান্থবর
দ্রুতগতি চলিলেন তটিনীর ধারে,
নদীর শীতল নীরে ভিজায়ে বসন ধীরে
ফিরি আইলেন পুন কুটীরের দ্বারে।
বালিকার মুখে চোখে শীতল সলিল-সেকে
সুধীরে বালিকা পুন মেলিল নয়ন।
মুদিতা নলিনীকলি মরমহুতাশে জ্বলি
মুরছি সলিলকোলে পড়িলে যেমন—
সদয়া নিশির মন হিম সেঁচি সারাক্ষণ
প্রভাতে ফিরায়ে তারে দেয় গো চেতন।
মেলিয়া নয়নপুটে বালিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ।
পিতা মাতা ছাড়া কারে মানুষে দেখে নি হা রে,
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন !
আঁচল গিয়াছে খ'সে, অবাক্ রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক-পানে যুগল নয়ন !
দেখেছে কভু কেহ কি এহেন মধুর আঁখি ?
স্বর্গের কোমল জ্যোতি খেলিছে নয়নে—
মধুর-স্বপনে-মাখা সারল্য-প্রতিমা-আঁকা
'কে তুমি গো ?' জিজ্ঞাসিছে যেন প্রতিক্ষণে।
পৃথিবী-ছাড়া এ আঁখি স্বর্গের আড়ালে থাকি

পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে 'কে তুমি ? কে তুমি' ?
মধুর মোহের ভুল, এ মুখের নাই তুল—
স্বর্গের বাতাস বহে এ মুখটি চুমি !
পথিকের হৃদে আসি নাচিছে শোণিত রাশি,
অবাক্ হইয়া বসি রয়েছে সেথায় !
চমকি ক্ষণেক-পরে কহিল সুধীর স্বরে
বিমোহিত পান্থবর কমলাবালায়,
"সুন্দরি, আমি গো পান্থ দিক্‌ভ্রান্ত পথশ্রান্ত
উপস্থিত হইয়াছি বিজন কাননে !
কাল হতে ঘুরি ঘুরি শেষে এ কুটীরপুরী
আজিকার নিশিশেষে পড়িল নয়নে !
বালিকা ! কী কব আর, আশ্রয় তোমার দ্বার
পান্থ পথহারা আমি করি গো প্রার্থনা ।
জিজ্ঞাসা করি গো শেষে মৃতে লয়ে ক্রোড়দেশে
কে তুমি কুটীরমাঝে বসি সুধাননা ?"
পাগলিনীপ্রায় বালা হৃদয়ে পাইয়া জ্বালা
চমকিয়া বসে যেন জাগিয়া স্বপনে ।
পিতার বদন-'পরে নয়ন নিবিষ্ট ক'রে
স্থির হ'য়ে বসি রয় ব্যাকুলিত মনে ।
নয়নে সলিল ঝরে, বালিকা সমুচ্চ স্বরে
বিষাদে ব্যাকুলহৃদে কহে "পিতা— পিতা" ।
কে দিবে উত্তর তোর, প্রতিধ্বনি শোকে ভোর
রোদন করিছে সেও বিষাদে তাপিতা ।
ধরিয়া পিতার গলে আবার বালিকা বলে
উচ্চৈস্বরে "পিতা— পিতা", উত্তর না পায় !
তরুণী পিতার বুকে বাহুতে ঢাকিয়া মুখে,
অবিরল নেত্রজলে বক্ষ ভাসি যায় ।
শোকানলে জল ঢালা সাঙ্গ হ'লে উঠে বালা,
শূন্য মনে উঠি বসে আঁখি অশ্রুময় !
বসিয়া বালিকা পরে নিরখি পথিকবরে
সজল নয়ন মুছি ধীরে ধীরে কয়,
"কে তুমি জিজ্ঞাসা করি, কুটীরে এলে কি করি—
আমি যে পিতারে ছাড়া জানি না কাহারে !
পিতার পৃথিবী এই, কোনোদিন কাহাকেই
দেখি নি তো এখানে এ কুটীরের দ্বারে !
কোথা হ'তে তুমি আজ আইলে পৃথিবীমাঝ ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন ?
তুমি কি তাহাই হবে পিতা যাহাদের সবে
'মানুষ' বলিয়া আহা করিত রোদন ?
কিংবা জাগি প্রাতঃকালে যাদের দেবতা ব'লে
নমস্কার করিতেন জনক আমার ?

বলিতেন যার দেশে   মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথাই কি নিবাস তোমার ?—
নাম তার স্বর্গভূমি,   আমারে সেথায় তুমি
ল'য়ে চল, দেখি গিয়া পিতায় মাতায় !
ল'য়ে চল দেব তুমি আমারে সেথায়।
যাইব মায়ের কোলে,   জননীরে মাতা ব'লে
আবার সেখানে গিয়া ডাকিব তাঁহারে।
দাঁড়ায়ে পিতার কাছে   জল দিব গাছে গাছে,
সঁপিব তাঁহার হাতে গাঁথি ফুলহারে !
হাতে ল'য়ে শুকপাখি   বাবা মোর নাম ডাকি
'কমলা' বলিতে আহা শিখাবেন তারে !
লয়ে চল, দেব, তুমি সেথায় আমারে !
জননীর মৃত্যু হ'লে,   ওই হোথা গাছতলে
রাখিয়াছিলেন তাঁরে জনক তখন !
ধবলতুষার ভার   ঢাকিয়াছে দেহ তাঁর,
স্বরগের কুটীরেতে আছেন এখন !
আমিও তাঁহার কাছে করিব গমন !"
বালিকা থামিল সিক্ত হয়ে আঁখিজলে
পথিকেরও আঁখিদ্বয়   হ'ল আহা অশ্রুময়,
মুছিয়া পথিক তবে ধীরে ধীরে বলে,
"আইস আমার সাথে,   স্বর্গরাজ্য পাবে হাতে
দেখিতে পাইবে তথা পিতায় মাতায়।
নিশা হ'ল অবসান,   পাখিরা করিছে গান,
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাতের বায় !
আঁধার ঘোমটা তুলি   প্রকৃতি নয়ন খুলি
চারি দিক ধীরে যেন করিছে বীক্ষণ—
আলোকে মিশিল তারা,   শিশিরের মুক্তাধারা
গাছ পালা পুষ্প লতা করিছে বর্ষণ !
হোথা বরফের রাশি,   মৃত দেহ রেখে আসি
হিমানীক্ষেত্রের মাঝে করায়ে শয়ান,
এই লয়ে যাই চ'লে,   মুছে ফেল অশ্রুজলে—
অশ্রুবারিধারে আহা পূরেছে নয়ান !"
পথিক এতেক কয়ে   মৃত দেহ তুলে লয়ে
হিমানীক্ষেত্রের মাঝে করিল প্রোথিত।
কুটীরেতে ধীরি ধীরি   আবার আইল ফিরি,
কত ভাবে পথিকের চিত্ত আলোড়িত।
ভবিষ্যৎ-কলপনে   কত কী আপন মনে
দেখিছে, হৃদয়পটে আঁকিতেছে কত—
দেখে পূর্ণচন্দ্র হাসে   নিশিরে রজতবাসে
ঢাকিয়া, হৃদয় প্রাণ করি অবারিত—
জাহ্নবী বহিছে ধীরে,   বিমল শীতল নীরে

মাখিয়া রজতরশ্মি গাহি কলকলে—
হরষে কম্পিত কায়, মলয় বহিয়া যায়
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কুসুমের দলে—
ঘাসের শয্যার 'পরে ঈষৎ হেলিয়া পড়ে
শীতল করিছে প্রাণ শীত সমীরণ—
কবরীতে পুষ্পভার কে ও বাম পাশে তার,
বিধাতা এমন দিন হবে কি কখন ?
অদৃষ্টে কি আছে আহা ! বিধাতাই জানে তাহা
যুবক আবার ধীরে কহিল বালায়,
"কিসের বিলম্ব আর ? ত্যজিয়া কুটীরদ্বার
আইস আমার সাথে, কাল বহে যায় !"
তুলিয়া নয়নদ্বয় বালিকা সুধীরে কয়,
বিষাদে ব্যাকুল আহা কোমল হৃদয়—
"কুটীর ! তোদের সবে ছাড়িয়া যাইতে হবে,
পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয় ।
হরিণ ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি,
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়—
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায় !
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায় ?
যাইব স্বরগভূমে, আহা হা ! ত্যজিয়া ঘুমে
এতক্ষণে উঠেছেন জননী আমার—
এতক্ষণে ফুল তুলি গাঁথিছেন মালাগুলি,
শিশিরে ভিজিয়া গেছে আঁচল তাঁহার—
সেথাও হরিণ আছে, ফুল ফুটে গাছে গাছে,
সেখানেও শুক পাখি ডাকে ধীরে ধীরে !
সেথাও কুটীর আছে, নদী বহে কাছে কাছে,
পূর্ণ হয় সরোবর নির্ঝরের নীরে ।
আইস ! আইস দেব ! যাই ধীরে ধীরে !
আয় পাখি ! আয় আয় ! কার তরে রবি হায়,
উড়ে যা উড়ে যা পাখি ! তরুর শাখায় !
প্রভাতে কাহারে পাখি ! জাগাবি রে ডাকি ডাকি
'কমলা !' 'কমলা !' বলি মধুর ভাষায় ?
ভুলে যা কমলা নামে, চলে যা সুখের ধামে,
'কমলা !' 'কমলা !' ব'লে ডাকিস নে আর ।
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে—
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার ।
তবু উড়ে যাবি নে রে, বসিবি হাতের 'পরে ?
আয় তবে, আয় পাখি, সাথে সাথে আয়,
পিতার হাতের 'পরে আমার নামটি ধ'রে—
আবার আবার তুই ডাকিস সেথায় ।

আইস পথিক তবে কাল ব'হে যায়।"
সমীরণ ধীরে ধীরে চুম্বিয়া তটিনীনীরে
দুলাইতে ছিল আহা লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায়?
সহসা রে জলধর নব অরুণের কর
কেন রে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে?
পাপিয়া শাখার 'পরে ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি কর-না গান, থামিলি কেন রে?
ভুলিয়া শোকের জ্বালা ওই রে চলিছে বালা।
কুটীর ডাকিছে যেন 'যেয়ো না—যেয়ো না!'
তটিনীতরঙ্গকুল ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেয়ো না! যেয়ো না'—
বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙুল তুলি
যেন বলিছেন আহা 'যেয়ো না!—যেয়ো না!'—
নেত্র তুলি স্বর্গ-পানে দেখে পিতা মেঘযানে
হাত নাড়ি বলিছেন 'যেয়ো না!—যেয়ো না!'—
বালিকা পাইয়া ভয় মুদিল নয়নদ্বয়,
এক পা এগোতে আর হয় না বাসনা—
আবার আবার শুন কানের কাছেতে পুন
কে কহে অস্ফুট স্বরে 'যেয়ো না!—যেয়ো না!'

তৃতীয় সর্গ

"যমুনার জল করে থল্ থল্
কলকলে গাহি প্রেমের গান।
নিশার আঁচোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে
সুধাকর খুলি হৃদয় প্রাণ!
বহিছে মলয় ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
নুয়ে নুয়ে পড়ে কুসুমরাশি!
ধীরি ধীরি ধীরি ফুলে ফুলে ফিরি
মধুকরী প্রেম আলাপে আসি!
আয় আয় সখি! আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা।
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা,
হেথায় আয় লো বিপিনবালা।
নতুন ফুটেছে মালতীর কলি,
ঢলি ঢলি পড়ে এ ওর পানে!

মধুবাসে ভুলি প্রেমালাপ তুলি
অলি কত কী-যে কহিছে কানে!
আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে
কুড়া-না হোথায় বকুলগুলি!
মাধবীর ভরে লতা নুয়ে পড়ে,
আমি ধীরি ধীরি আনি লো তুলি।
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা,
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্‌সে হেথায় কামিনী পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
আয় আয় হেথা, ওই দেখ্ ভাই,
ভ্রমরা একটি ফুলের কোলে—
কমলা, ফুঁ দিয়ে দে-না লো উড়িয়ে,
ফুলটা আমি লো নেব যে তুলে।
পারি না লো আর, আয় হেথা বসি
ফুলগুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি!
হেথায় পবন খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি!
আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
শুই একটুকু ঘাসের 'পরে—
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুর,
আঁখি মুদে আসে ঘুমের তরে!
বল্ বনবালা এত কী লো জ্বালা!
রাত দিন তুই কাঁদিবি বসে!
আজো ঘুমঘোর ভাঙিল না তোর,
আজো মজিলি না সুখের রসে!
তবে যা লো ভাই! আমি একেলাই
রাশ্ রাশ্ করি গাঁথিয়া মালা।
তুই নদীতীরে কাঁদ্‌গে লো ধীরে
যমুনারে কহি মরমজ্বালা!
আজো তুই বোন! ভুলিবি নে বন?
পরণকুটীর যাবি নে ভুলে?
তোর ভাই মন কে জানে কেমন।
আজো বলিলি নে সকল খুলে?"
"কি বলিব বোন! তবে সব শোন্!"
কহিল কমলা মধুর স্বরে,
"লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে!
ভুলিব সে বন?— ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগে যাব ভুলে— কোলে লয়ে তুলে

কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিশু ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে!
ভুলিব তাদের থাকিতে পরান?
হৃদয়ে সে সব থাকিতে লেখা?
পারিব ভুলিতে যত দিন চিতে
ভাবনার আহা থাকিবে রেখা?
আজ কত বড়ো হয়েছে তাহারা,
হয়ত আমার না দেখা পেয়ে
কুটীরের মাঝে খুঁজে খুঁজে খুঁজে
বেড়াতেছে আহা ব্যাকুল হয়ে!
শুয়ে থাকিতাম দুপরবেলায়
তাহাদের কোলে রাখিয়ে মাথা,
কাছে বসি নিজে গলপ কত যে
করিতেন আহা তখন মাতা!
গিরিশিরে উঠি করি ছুটাছুটি
হরিণের ছানাগুলির সাথে
তটিনীর পাশে দেখিতাম বসে
মুখছায়া যবে পড়িত তাতে!
সরসীভিতরে ফুটিলে কমল
তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে,
দেখি মুখ তুলে— কমলিনী দুলে
এপাশে ওপাশে পড়িতে ঢলে!
গাছের উপরে ধীরে ধীরে ধীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে দিতেম লতা,
বসি একাকিনী আপনা-আপনি
কহিতাম ধীরে কত কি কথা!
ফুটিলে গো ফুল হরষে আকুল
হতেম, পিতারে কতেম গিয়ে!
ধরি হাতখানি আনিতাম টানি,
দেখাতেম তাঁরে ফুলটি নিয়ে!
তুষার কুড়িয়ে আঁচল ভরিয়ে
ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে—
পড়িলে কিরণ, কত যে বরন
ধরিত, আমোদে যেতাম গলে!
দেখিতাম রবি বিকালে যখন
শিখরের শিরে পড়িত ঢলে
করি ছুটাছুটি শিখরেতে উঠি
দেখিতাম দূরে গিয়াছে চলে!

আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
দেখিতাম আরও গিয়াছে সরে!
শ্রান্ত হয়ে শেষে কুটীরেতে এসে
বসিতাম মুখ মলিন করে!
শশধরছায়া পড়িলে সলিলে
ফেলিতাম জলে পাথরকুচি—
সরসীর জল উঠিত উথুলে,
শশধরছায়া উঠিত নাচি।
ছিল সরসীতে এক-হাঁটু জল,
ছুটিয়া ছুটিয়া যেতেম মাঝে,
চাঁদের ছায়ারে গিয়া ধরিবারে
আসিতাম পুন ফিরিয়া লাজে।
তটদেশে পুন ফিরি আসি পর
অভিমানভরে ঈষৎ রাগি
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম— জল উঠিত জাগি।
যবে জলধর শিখরের 'পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে,
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি—
কাপড়-চোপড় ভিজিত জলে!
কিছুই— কিছুই— জানিতাম না রে,
কিছুই হায় রে বুঝিতাম না।
জানিতাম হা রে জগৎমাঝারে
আমরাই বুঝি আছি কজনা!
পিতার পৃথিবী পিতার সংসার
একটি কুটীর পৃথিবীতলে
জানি না কিছুই ইহা ছাড়া আর—
পিতার নিয়মে পৃথিবী চলে!
আমাদেরি তরে উঠে রে তপন,
আমাদেরি তরে চাঁদিমা উঠে,
আমাদেরি তরে বহে গো পবন,
আমাদেরি তরে কুসুম ফুটে!
চাই না জ্রেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে,
শুকায়ে যেতেম বনের কোলে।
জানিব আমারি পৃথিবী ধরা,
খেলিব হরিণশাবক-সনে—
পুলকে হরষে হৃদয় ভরা,
বিষাদভাবনা নাহিক মনে।
তটিনী হইতে তুলিব জল,

ঢালি ঢালি দিব গাছের তলে।
পাখিরে বলিব 'কমলা বল',
শরীরের ছায়া দেখিব জলে!
জেনেছি মানুষ কাহারে বলে।
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি রে হায় ভালোবাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে!
এখন আবার বেঁধেছি চুলে,
বাহুতে পরেছি সোনার বালা।
উরসেতে হার দিয়েছি তুলে,
কবরীর মাঝে মণির মালা!
বাকলের বাস ফেলিয়াছে দূরে—
শত শ্বাস ফেলি তাহার তরে,
মুছেছি কুসুম রেণুর সিঁদুরে
আজো কাঁদে হৃদি বিষাদভরে!
ফুলের বলয় নাইক হাতে,
কুসুমের হার ফুলের সিঁথি—
কুসুমের মালা জড়ায়ে মাথে
স্মরণে কেবল রাখিনু গাঁথি!
এলো এলো চুলে ফিরিব বনে
রুখো রুখো চুল উড়িবে বায়ে।
ফুল তুলি তুলি গহনে বনে
মালা গাঁথি গাঁথি পরিব গায়ে!
হায় রে সে দিন ভুলাই ভালো!
সাধের স্বপন ভাঙিয়া গেছে!
এখন মানুষে বেসেছি ভালো,
হৃদয় খুলিব মানুষ-কাছে!
হাসিব কাঁদিব মানুষের তরে,
মানুষের তরে বাঁধিব চুলে—
মাখিব কাজল আঁখিপাত ভ'রে,
কবরীতে মণি দিব রে তুলে।
মুছিনু নীরজা! নয়নের ধার,
নিভালাম সখি হৃদয়জ্বালা!
তবে সখি আয় আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা!
এই যে মালতী তুলিয়াছ সতি!
এই যে বকুল ফুলের রাশি;
জুঁই আর বেলে ভরেছ আঁচলে,
মধুপ ঝাঁকিয়া পড়িছে আসি!
এই হল মালা, আর না লো বালা—
শুই লো নীরজা! ঘাসের 'পরে।

শুন্‌ছিস্‌ বোন! শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌!
কে গায় কোথায় সুধার স্বরে!
জাগিয়া উঠিল হৃদয় প্রাণ!
স্মরণের জ্যোতি উঠিল জ্বলে!
ঘা দিয়েছে আহা মধুর গান
হৃদয়ের অতি গভীর তলে!
সেই-যে কানন পড়িতেছে মনে
সেই-ই কুটীর নদীর ধারে!
থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌ হৃদয়বেদন
নিভাইয়া ফেলি নয়নধারে!
সাগরের মাঝে তরণী হতে
দূর হতে যথা নাবিক যত—
পায় দেখিবারে সাগরের ধারে
মেঘলা মেঘলা ছায়ার মতো!
তেমনি তেমনি উঠিয়াছে জাগি—
অফুট অফুট হৃদয়-'পরে
কী দেশ কী জানি, কুটীর দুখানি,
মাঠের মাঝেতে মহিষ চরে!
বুঝি সে আমার জনমভূমি
সেখান হইতে গেছিনু চলে!
আজিকে তা মনে জাগিল কেমনে
এত দিন সব ছিলুম ভুলে।
হেথায় নীরজা, গাছের আড়ালে
লুকিয়ে লুকিয়ে শুনিব গান,
যমুনাতীরেতে জোছনার রেতে
গাইছে যুবক খুলিয়া প্রাণ!
কে ও কে ও ভাই? নীরদ বুঝি?
বিজয়ের[১] আহা প্রাণের সখা!
গাইছে আপন ভাবেতে মজি
যমুনা পুলিনে বসিয়ে একা!
যেমন দেখিতে গুণও তেমন,
দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো—
রূপে গুণে মাখা দেখি নি এমন,
নদীর ধারটি করেছে আলো!
আপনার ভাবে আপনি কবি
রাত দিন আহা রয়েছে ভোর!
সরল প্রকৃতি মোহনছবি
অবারিত সদা মনের দোর

১ কমলাকে যিনি সংসারে আনেন।

মাথার উপরে জড়ানো মালা—
নদীর উপরে রাখিয়া আঁখি
জাগিয়া উঠেছে নিশীথবালা
জাগিয়া উঠেছে পাপিয়া পাখি!
আয় না লো ভাই গাছের আড়ালে
আয় আর একটু কাছেতে সরে
এইখানে আয় শুনি দুজনায়
কি গায় নীরদ সুধার স্বরে!"

গান

"মোহিনী কল্পনে! আবার আবার—
মোহিনী বীণাটি বাজাও না লো!
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার
হৃদয়ে শ্রবণে জীবনে ঢালো!
ভুলিব সকল— ভুলেছি সকল—
কমলচরণে ঢেলেছি প্রাণ!
ভুলেছি— ভুলিব— শোক-অশ্রুজল,
ভুলিছি বিষয়, গরব, মান!

শ্রবণ জীবন হৃদয় ভরি
বাজাও সে বীণা বাজাও বালা!
নয়নে রাখিব নয়নবারি
মরমে নিবারি মরমজ্বালা!

অবোধ হৃদয় মানিবে শাসন
শোকবারিধারা মানিবে বারণ,
কী যে ও বীণার মধুর মোহন
হৃদয় পরান সবাই জানে—
যখনি শুনি ও বীণার স্বরে
মধুর সুধায় হৃদয় ভরে,
কী জানি কিসের ঘুমের ঘোরে
আকুল করে যে ব্যাকুল প্রাণে!
কী জানি লো বালা! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে।
কী জানি কী ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে!

অস্ফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কী জানি কেমন
কী ভাব কে জানে কিসের লাগি!
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কী জানি কেমন
কী ভাব কে জানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে,
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে,
ঘুমন্ত পরান উঠেছে জাগি!

ভেবেছিনু হায় ভুলিব সকল
সুখ দুখ শোক হাসি অশ্রুজল
আশা প্রেম যত ভুলিব— ভুলিব—
আপনা ভুলিয়া রহিব সুখে!
ভেবেছিনু হায় কল্পনাকুমারী
বীণাস্বরসুধা পিইয়া তোমারি
হৃদয়ের ক্ষুধা রাখিব নিবারি
পাশরি সকল বিষাদ দুখে!

প্রকৃতিশোভায় ভরিব নয়নে,
নদীকলস্বরে ভরিব শ্রবণে
বীণার সুধায় হৃদয় ভরি!
ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়,
ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায়
ফেলে কি না ধরা নয়নবারি!
কই তা পারিনু শোভনা কল্পনে!
বিস্মৃতির জলে ডুবাইতে মনে!
আঁকা যে মূরতি হৃদয়ের তলে
মুছিতে লো তাহা যতন করি!
দেখ লো এখন অবারি হৃদয়
মরম-আধার হুতাশনময়,
শিরায় শিরায় বহিছে অনল
জ্বলন্ত জ্বালায় হৃদয় ভরি!

প্রেমের মূরতি হৃদয়গুহায়
এখনো স্থাপিত রয়েছে রে হায়!
বিষাদ-অনলে আহুতি দিয়া
বলো তুমি তবে বলো কলপনে
যে মূরতি আঁকা হৃদয়ের সনে
কেমনে ভুলিব থাকিতে হিয়া।

কেমনে ভুলিব থাকিতে পরান
কেমনে ভুলিব থাকিতে জ্ঞেয়ান
পাষাণ না হলে হৃদয় দেহ!
তাই বলি বালা! আবার— আবার
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার—
ঢাল গো হৃদয়ে সুধার স্নেহ।

শুকায়ে যাউক সজল নয়ান,
হৃদয়ের জ্বালা নিবুক হৃদে,
রেখো না হৃদয়ে একটুকু খান
বিষাদ বেদনা যেখানে বিঁধে।

কেন লো— কেন লো— ভুলিব কেন লো—
এত দিন যারে বেসেছিনু ভালো
হৃদয় পরান দেছিনু যারে—
স্থাপিয়া যাহারে হৃদয়াসনে
পূজা করেছিনু দেবতা-সনে
কোন্ প্রাণে আজি ভুলিব তারে!—

দ্বিগুণ জ্বলুক হৃদয়-আগুন।
দ্বিগুণ বহুক বিষাদধারা।
স্মরণের আভা ফুটুক দ্বিগুণ।
হোক হৃদিপ্রাণ পাগল পারা।

প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে
মরমশোণিতে আছে যা গাঁথা—
শত শত শত অশ্রু বারিচয়ে
দিব উপহার দিব রে তথা।

এত দিন যার তরে অবিরল
কেঁদেছিনু হায় বিষাদভরে,
আজিও— আজিও— নয়নের জল
বরষিবে আঁখি তাহারি তরে।

এত দিন ভালো বেসেছিনু যারে
হৃদয় পরান দেছিনু খুলে—
আজিও রে ভালোবাসিব তাহারে,
পরান থাকিতে যাব না ভুলে।

হৃদয়ের এই ভগনকুটীরে
প্রেমের প্রদীপ করেছে আলা—

যেন রে নিবিয়া না যায় কখনো
সহস্র কেন রে পাই-না জ্বালা।

কেবল দেখিব সেই মুখখানি,
দেখিব সেই সে গরব হাসি।
উপেক্ষার সেই কটাক্ষ দেখিব,
অধরের কোণে ঘৃণার রাশি।

তবু কল্পনা কিছু ভুলিব না!
সকলি হৃদয়ে থাকুক গাঁথা—
হৃদয়ে, মরমে, বিষাদবেদনা
যত পারে তারে দিক না ব্যথা।

ভুলিব না আমি সেই সন্ধ্যাবায়,
ভুলিব না ধীরে নদী ব'হে যায়,
ভুলিব না হায় সে মুখশশী।
হব না— হব না— হব না বিস্মৃত,
যত দিন দেহে রহিবে শোণিত,
জীবন-তারকা না যাবে খসি।
প্রেমগান কর তুমি কল্পনা!
প্রেমগীতে মাতি বাজুক বীণা!
শুনিব, কাঁদিব হৃদয় ঢালি!
নিরাশ প্রণয়ী কাঁদিবে নীরবে।—
বাজাও বাজাও বীণাসুধারবে
নব অনুরাগ হৃদয়ে জ্বালি!

প্রকৃতিশোভায় ভরিব নয়নে,
নদীকলস্বরে ভরিব শ্রবণে,
প্রেমের প্রতিমা হৃদয়ে রাখি।
গাও গো তটিনী প্রেমের গান,
ধরিয়া অস্ফুট মধুর তান
প্রেমগান কর বনের পাখি।"

কহিল কমলা "শুনেছিস্ ভাই
বিষাদে দুঃখে যে ফাটিছে প্রাণ!
কিসের লাগিয়া, মরমে মরিয়া
করিছে অমন খেদের গান?
কারে ভালোবাসে? কাঁদে কার তরে?
কার তরে গায় খেদের গান?
কার ভালোবাসা পায় নাই ফিরে
সঁপিয়া তাহারে হৃদয় প্রাণ?

ভালোবাসা আহা পায় নাই ফিরে!
অমর দেখিতে অমন আহা!
নবীন যুবক ভালোবাসে কি রে?
কারে ভালোবাসে জানিস্ তাহা?

বসেছিনু কাল ওই গাছতলে
কাঁদিতে ছিলেম কত কী ভাবি—
যুবক তখনি সুধীরে আপনি
প্রাসাদ হইতে আইল নাবি।

কহিল 'শোভনে! ডাকিছে বিজয়,
আমার সহিত আইস তথা।'
কেমন আলাপ! কেমন বিনয়!
কেমন সুধীর মধুর কথা!

চাইতে নারিনু মুখপানে তাঁর,
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
শরমে পাশরি বলি বলি করি
তবুও বাহির হল না কথা!

কাল হতে ভাই! ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হয়েছে কেমন ধারা!
থাকি থাকি থাকি উঠি লো চমকি,
মনে হয় কার পাইনু সাড়া!

কাল হতে তাই মনের মতন
বাঁধিয়াছি চুল করিয়া যতন,
কবরীতে তুলে দিয়াছি রতন,
চুলে সঁপিয়াছি ফুলের মালা,
কাজল মেখেছি নয়নের পাতে,
সোনার বলয় পরিয়াছি হাতে,
রজতকুসুম সঁপিয়াছি মাথে,
কী কহিব সখি! এমন জ্বালা!"

চতুর্থ সর্গ

নিভৃত যমুনাতীরে বসিয়া রয়েছে কি রে
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞানহত— নীরব চিত্রের মতো
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে।

দেখিতে দেখিতে কেন অবশ পাষাণ হেন,
চখের পলক নাহি পড়ে।
শোণিত না চলে বুকে, কথাটি না ফুটে মুখে,
চুলটিও না নড়ে না চড়ে!

মুখ ফিরাইল বালা, দেখিল জোছনামালা
খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোলস্বর উঠিছে আকাশ-'পর
অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী-গভীরে!

দেখিছে লুটায় ঢেউ আবার লুটায়,
দিগন্তে খেলায়ে পুন দিগন্তে মিলায়!
দেখে শূন্য নেত্র তুলি— খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি
জোছনা মাখিয়া গায়ে উড়ে উড়ে যায়।

একখণ্ড উড়ে যায় আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি মলিন করিয়া রাতি
মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।

পাখি এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
ফেনখণ্ড গেল ভেসে নীল নদীজলে,
দিবা ভাবি অতিদূরে আকাশ সুধায় পূরে
ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপিয়া।
পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে উচ্চ হতে উচ্চে উঠে—
আকাশ সে সূক্ষ্ম স্বরে উঠিল কাঁপিয়া।

বসিয়া গনিল বালা কত ঢেউ করে খেলা,
কত ঢেউ দিগন্তের আকাশে মিলায়,
কত ফেন করি খেলা লুটায়ে চুম্বিছে বেলা,
আবার তরঙ্গে চড়ি সুদূরে পলায়।

দেখি দেখি থাকি থাকি আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেকমুদিত নেত্র অবশ পল্লকপত্র—
অপূর্ব মধুর ভাবে বালিকা বিবশা!

নীরদ ক্ষণেক পরে উঠে চমকিয়া,
অপূর্ব স্বপন হতে জাগিল যেন রে।
দূরেতে সরিয়া গিয়া থাকিয়া থাকিয়া
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে—
"সে কী কথা শুধাইছ বিপিনরমণী!
ভালোবাসি কিনা আমি তোমারে কমলে?

পৃথিবী হাসিয়া যে লো উঠিবে এখনি!
      কলঙ্ক রমণী নামে রটিবে তা হলে?

ও কথা শুধাতে আছে?   ও কথা ভাবিতে আছে!
      ও-সব কি স্থান দিতে আছে মনে মনে?
বিজয় তোমার স্বামী   বিজয়ের পত্নী তুমি
      সরলে! ও কথা তবে শুধাও কেমনে?

      তবুও শুধাও যদি দিব না উত্তর!—
হৃদয়ে যা লিখা আছে   দেখাবো না কারো কাছে,
      হৃদয়ে লুকান রবে আমরণ কাল!
রুদ্ধ অগ্নিরাশিসম   দহিবে হৃদয় মম
      ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যাবে হৃদিগ্রন্থিজাল।

যদি ইচ্ছা হয় তবে   লীলা সমাপিয়া ভবে
      শোণিতধারায় তাহা করিব নির্বাণ।
নহে অগ্নিশৈলসম   জ্বলিবে হৃদয় মম
      যত দিন দেহমাঝে রহিবেক প্রাণ!

যে তোমারে বন হতে এনেছে উদ্ধারি
      যাহারে করেছ তুমি পাণি সমর্পণ
প্রণয় প্রার্থনা তুমি করিয়ো তাহারি—
      তারে দিয়ো যাহা তুমি বলিবে আপন!

চাই না বাসিতে ভালো, ভালোবাসিব না।
      দেবতার কাছে এই করিব প্রার্থনা—
বিবাহ করেছ যারে   সুখে থাক লয়ে তারে
      বিধাতা মিটান তব সুখের কামনা!”

“বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি”
      কহিল কমলা তবে বিপিনকামিনী,
“কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
      কারে বলে ভালোবাসা আজিও শিখি নি।

এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি,
      দেখিবারে আঁখি মোর ভালোবাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভালো যার সুধাবাণী—
      শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে!

ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
      ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বলো গো নীরদ আমি কী করিব তায়?
      রটায়ে কলঙ্ক তবে হাসুক না তারা।

বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভালো, ভালোবাসি যারে!
তাহারই ভালোবাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসে না ভালো, ভালোবাসি যারে।"

নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে,
"সে কী কথা বলো বালা, যে জন তোমারে
বিজন কানন হতে করিয়া উদ্ধার
আনিল, রাখিল যত্নে সুখের আগারে—
সে কেন গো ভালোবাসা পাবে না তোমার?

হৃদয় সঁপেছে যে লো তোমারে নবীনা
সে কেন গো ভালোবাসা পাবে না তোমার?"
কমলা কহিল ধীরে, "আমি তা জানি না।"
নীরদ সমুচ্চ স্বরে কহিল আবার—

"তবে যা লো দুশ্চারিণী! যেথা ইচ্ছা তোর
কর্ তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়—
কিন্তু যত দিন দেহে প্রাণ রবে মোর—
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয়!

আর তুই পাইবি না দেখিতে আমারে
জ্বলিব যদিন আমি জীবন-অনলে—
স্বরগে বাসিব ভালো যা খুশী যাহারে
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে!

কেন বল্ পাগলিনী! ভালোবাসি মোরে
অনলে জ্বালিতে চাস্ এ জীবন ভোরে!
বিধাতা যে কি আমার লিখেছে কপালে!
যে গাছে রোপিতে যাই শুকায় সমূলে।"

ভর্ৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে—
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত!
কমলা নয়নজল ভরিয়া নয়নে
মুখপানে চাহি রয় পাগলের মতো!

নীরদ উদ্গামী অশ্রু করি নিবারিত
সবেগে সেখান হতে করিল প্রয়াণ।
উচ্ছ্বাসে কমলা বালা উন্মত্ত চিত
অঞ্চল করিয়া সিক্ত মুছিল নয়ান।

পঞ্চম সর্গ

বিজয় নিভৃতে কী কহে নিশীথে?
কী কথা শুধায় নীরজা বালায়—
দেখেছ, দেখেছ হোথা?
ফুলপাত্র হতে ফুল তুলি হাতে
নীরজা শুনিছে, কুসুম গুণিছে,
মুখে নাই কিছু কথা।
বিজয় শুধায়— কমলা তাহারে
গোপনে, গোপনে ভালোবাসে কি রে?
তার কথা কিছু বলে কি সখীরে?
যতন করে কি তাহার তরে।
আবার কহিল, "বলো কমলায়
বিজন কানন হইতে যে তায়
করিয়া উদ্ধার সুখের ছায়ায়
আনিল, হেলা কি করিবে তারে?
যদি সে ভালো না বাসে আমায়
আমি কিন্তু ভালোবাসিব তাহায়
যত দিন দেহে শোণিত চলে।"
বিজয় যাইল আবাস ভবনে
নিদ্রায় সাধিতে কুসুমশয়নে।
বালিকা পড়িল ভূমির তলে।
বিবর্ণ হইল কপোল বালার,
অবশ হইয়ে এল দেহভার—
শোণিতের গতি থামিল যেন!
ও কথা শুনিয়া নীরজা সহসা
কেন ভূমিতলে পড়িল বিবশা?
দেহ থর থর কাঁপিছে কেন?
ক্ষণেকের পরে লভিয়া চেতন,
বিজয়-প্রাসাদে করিল গমন,
দ্বারে ভর দিয়া চিন্তায় মগন
দাঁড়ায়ে রহিল কেন কে জানে?
বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়,
নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে!
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি!

ভয়ে, ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র-প্রাণমন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন
অবশ্য দুয়ার ধরিত চাপি!
ধীরে, ধীরে, ধীরে খুলিল দুয়ার,
পদাঙ্গুলি-'পরে সঁপি দেহভার
কেও বামা ডরে প্রবেশিছে ঘরে
ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিয়া ভয়ে!
একদৃষ্টে চাহি বিজয়ের মুখে
রহিল দাঁড়ায়ে শয্যার সমুখে,
নেত্রে বহে ধারা মরমের দুখে,
ছবিটির মতো অবাক্ হয়ে!
ভিন্ন ওষ্ঠ হতে বহিছে নিশ্বাস—
দেখিছে নীরজা, ফেলিতেছে শ্বাস,
সুখের স্বপন দেখিয়ে তখন
ঘুমায় যুবক প্রফুল্লমুখে!
'ঘুমাও বিজয়! ঘুমাও গভীরে—
দেখো-না দুখিনী নয়নের নীরে
করিছে রোদন তোমারি কারণ—
ঘুমাও বিজয় ঘুমাও সুখে!
দেখো-না তোমারি তরে একজন
সারা নিশি দুখে করি জাগরণ
বিছানার পাশে করিছে রোদন—
তুমি ঘুমাইছ ঘুমাও ধীরে!
দেখো-না বিজয়! জাগি সারা নিশি
প্রাতে অন্ধকার যাইলে গো মিশি
আবাসেতে ধীরে যাইব গো ফিরে—
তিতিয়া বিষাদে নয়ননীরে
ঘুমাও বিজয়। ঘুমাও ধীরে!'

ষষ্ঠ সর্গ

"কমলা ভুলিবে সেই শিখর কানন,
কমলা ভুলিবে সেই বিজন কুটীর—
আজ হতে নেত্র! বারি কোরো না বর্ষণ,
আজ হতে মন প্রাণ হও গো সুস্থির।

অতীত ও ভবিষ্যত হইব বিস্মৃত।
জুড়িয়াছে কমলার ভগন হৃদয়!

সুখের তরঙ্গ হৃদে হয়েছে উত্থিত,
সংসার আজিকে হতে দেখি সুখময়।

বিজয়েরে আর করিব না তিরস্কার
সংসারকাননে মোরে আনিয়াছে বলি।
খুলিয়া দিয়াছে সে যে হৃদয়ের দ্বার,
ফুটায়েছে হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি!

জমি জমি জলরাশি পর্বতগুহায়
একদিন উথলিয়া উঠে রে উচ্ছ্বাসে,
একদিন পূর্ণ বেগে প্রবাহিয়া যায়,
গাহিয়া সুখের গান যায় সিন্ধুপাশে।—

আজি হতে কমলার নূতন উচ্ছ্বাস,
বহিতেছে কমলার নূতন জীবন।
কমলা ফেলিবে আহা নূতন নিশ্বাস,
কমলা নূতন বায়ু করিবে সেবন।

কাঁদিতে ছিলাম কাল বকুলতলায়,
নিশার আঁধারে অশ্রু করিয়া গোপন!
ভাবিতে ছিলাম বসি পিতায় মাতায়—
জানি না নীরদ আহা এয়েছে কখন।

সেও কি কাঁদিতে ছিল পিছনে আমার?
সেও কি কাঁদিতে ছিল আমারি কারণ?
পিছনে ফিরিয়া দেখি মুখপানে তার,
মন যে কেমন হল জানে তাহা মন।

নীরদ কহিল হৃদি ভরিয়া সুধায়—
'শোভনে! কিসের তরে করিছ রোদন?'
আহা হা! নীরদ যদি আবার শুধায়,
'কমলে! কিসের তরে করিছ রোদন?'

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল—
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালোবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান।

ওই যে নীরজা আসে পরান-সজনী,
একমাত্র বন্ধু মোর পৃথিবীমাঝার!

হেন বন্ধু আছে কি রে নির্দয় ধরণী!
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?

ওকি সখি কোথা যাও? তুলিবে না ফুল?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবে না মালা?
ওকি সখি আজ কেন বাঁধ নাই চুল?
শুকনো শুকনো মুখ কেন আজি বালা?

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখিজল?
কোথা যাও, কোথা সই, যেয়ো না, যেয়ো না!
কী হয়েছে? বল্‌বি নে— বল্ সখি বল্!
কী হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা?"

"কী হয়েছে, কে দিয়েছে, বলি গো সকল।
কী হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা—
ফেলিব যে চিরকাল নয়নের জল
নিভায়ে ফেলিতে বালা মরমবেদনা!

কে দিয়েছে মনমাঝে জ্বালায়ে অনল?
বলি তবে তুই সখি তুই! আর নয়—
কে আমার হৃদয়েতে ঢেলেছে গরল?
কমলারে ভালোবাসে আমার বিজয়!

কেন হলুম না বালা আমি তোর মতো,
বন হতে আসিতাম বিজয়ের সাথে—
তোর মতো কমলা লো মুখ আঁখি যত
তা হলে বিজয়-মন পাইতাম হাতে!

পরান হইতে অগ্নি নিভিবে না আর
বনে ছিলি বনবালা সে তো বেশ ছিলি—
জ্বালালি!— জ্বলিলি বোন! খুলি মর্মদ্বার—
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি।"

কমলা চাহিয়া রয়, নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ় দেশে অশ্রুরাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস—
কমলা কহিল ধীরে, "জ্বালালি জ্বলিলি!"

আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে
যমুনাতরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর—
তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজতময় কর!

হেরিল আকাশ-পানে সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে।
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কী মনে লাগিল ভাবিতে!

"ওইখানে আছে পিতা, ওইখানে আছে মাতা,
ওই জোৎসাময় চাঁদে করি বিচরণ
দেখিছেন হোথা হতে দাঁড়ায়ে সংসারপথে
কমলা নয়নবারি করিছে মোচন।

একি রে পাপের অশ্রু? নীরদ আমার—
নীরদ আমার যথা আছে লুক্কায়িত,
সেইখান হতে এই অশ্রুবারিধার
পূর্ণ উৎস-সম আজ হ'ল উৎসারিত।

এ তো পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?
বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার
ভালোবাসিব না? হায় এ হৃদয় তবে
বজ্র দিয়া দিক বিধি ক'রে চুরমার!

এ বক্ষে হৃদয় নাই, নাইক পরান,
একখানি প্রতিমূর্তি রেখেছি শরীরে—
রহিবে, যদিন প্রাণ হবে বহমান
রহিবে, যদিন রক্ত রবে শিরে শিরে!

সেই মূর্তি নীরদের! সে মূর্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে?
তবুও সে পাপ— আহা নীরদ যখন
বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে!

তবু মুছিব না অশ্রু এ নয়ান হতে,
কেন বা জানিতে চাব পাপ কারে বলি?
দেখুক জনক মোর ঐ চন্দ্র হতে
দেখুন জননী মোর আঁখি দুই মেলি!

নীরজা গাইত 'চল্ চন্দ্রলোকে র'বি।
সুধাময় চন্দ্রলোক, নাই সেথা দুখ শোক,
সকলি সেথায় নব ছবি!

ফুলবক্ষে কীট নাই, বিদ্যুতে অশনি নাই,
কাঁটা নাই গোলাপের পাশে!
হাসিতে উপেক্ষা নাই, অশ্রুতে বিষাদ নাই,
নিরাশার বিষ নাই শ্বাসে।

নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই,
কোলাহল নাইক দিবায় !
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত,
তৃপ্তি নাই মাধুর্যশোভায় ।

লতিকা কুসুমময়, কুসুম সুরভিময়,
সুরভি মৃদুতাময় যেথা !
জীবন স্বপনময়, স্বপন প্রমোদময়,
প্রমোদ নূতনময় সেথা !

সংগীত উচ্ছ্বাসময়, উচ্ছ্বাস মাধুর্যময়,
মাধুর্য মত্ততাময় অতি ।
প্রেম অস্ফুটতামাখা, অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা,
স্বপ্নে-মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি !

গভীর নিশীথে যেন, দূর হতে স্বপ্ন-হেন
অস্ফুট বাঁশীর মৃদু রব—
সুধীরে পশিয়া কানে শ্রবণ হৃদয় প্রাণে
আকুল করিয়া দেয় সব ।

এখানে সকলি যেন অস্ফুট মধুর-হেন,
উষার সুবর্ণ জ্যোতি-প্রায় ।
আলোকে আঁধার মিশে মধু জ্যোছনায় দিশে
রাখিয়াছে ভরিয়া সুধায় !

দূর হোতে অপ্সরার মধুর গানের ধার,
নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ।
নদীর অস্ফুট তান মলয়ের মৃদুগান
একত্তরে মিশেছে এমনি !

সকলি অস্ফুট হেথা মধুর স্বপনে-গাঁথা
চেতনা মিশান' যেন ঘুমে ।
অশ্রু শোক দুঃখ ব্যথা কিছুই নাহিক হেথা
জ্যোতির্ময় নন্দনের ভূমে !'

আমি যাব সেই খানে পুলকপ্রমত্ত প্রাণে
সেই দিনকার মতো বেড়াব খেলিয়া—
বেড়াব তটিনীতীরে, খেলাব তটিনীনীরে,
বেড়াইব জোছনায় কুসুম তুলিয়া !

শুনিছি মৃত্যুর পিছু পৃথিবীর সব-কিছু
ভুলিতে হয় নাকি গো যা আছে এখানে !
ওমা ! সে কি করে হবে ? মরিতে চাই না তবে
নীরদে ভুলিতে আমি চাব কোন্ প্রাণে ?"

কমলা এতেক পরে হেরিল সহসা
নীরদ কাননপথে যাইছে চলিয়া—
মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা,
হৃদয়ে শোণিতরাশি উঠে উথলিয়া ।

নীরদের স্কন্ধে খেলে নিবিড় কুন্তল,
দেহ আবরিয়া রহে গৈরিক বসন,
গভীর ঔদাস্যে যেন পূর্ণ হৃদিতল—
চলিছে যে দিকে যেন চলিছে চরণ ।

যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি,
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি ।
যুবক চলিয়া যায় বালিকা তবুও হায় !
চাহি রয় একদৃষ্টে আঁখিদ্বয় মেলি ।

ঘুম হতে যেন জাগি সহসা কিসের লাগি
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায় ।
যুবক চমকি প্রাণে হেরি চারি দিক-পানে
পুন না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায় ।

"কোথা যাও— কোথা যাও— নীরদ ! যেও না !
একটি কহিব কথা শুন একবার !
মুহূর্ত— মুহূর্ত রও— পুরাও কামনা !
কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার !

জিজ্ঞাসা করিবে নাকি আজি যুবাবর
'কমলা কিসের তরে করিছ রোদন ?'
তা হলে কমলা আজি দিবেক উত্তর,
কমলা খুলিবে আজি হৃদয়বেদন ।

দাঁড়াও— দাঁড়াও যুবা ! দেখি একবার,
যেথা ইচ্ছা হয় তুমি যেও তার পর !
কেন গো রোদন করি শুধাও আবার,
কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর !

কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর,
কমলা হৃদয় খুলি দেখাবে তোমায়—
সেথায় রয়েছে লেখা দেখো তার পর
কমলা রোদন করে কিসের জ্বালায় !"

"কি কব কমলা আর কি কব তোমায়,
জনমের মতো আজ লইব বিদায় !
ভেঙেছে পাষাণ প্রাণ, ভেঙেছে সুখের গান—
এ জন্মে সুখের আশা রাখি নাকো আর !

এ জন্মে মুছিব নাকো নয়নের ধার !
কত দিন ভেবেছিনু যোগীবেশ ধরে
ভ্রমিব যেথায় ইচ্ছা কানন-প্রান্তরে।

তবু বিজয়ের তরে এত দিন ছিনু ঘরে
হৃদয়ের জ্বালা সব করিয়া গোপন—
হাসি টানি আনি মুখে এত দিন দুখে দুখে
ছিলাম, হৃদয় করি অনলে অর্পণ !

কি আর কহিব তোরে— কালিকে বিজয় মোরে
কহিল জন্মের মতো ছাড়িতে আলয় !
জানেন জগৎস্বামী— বিজয়ের তরে আমি
প্রেম বিসর্জিয়াছিনু তুষিতে প্রণয়।"

এত বলি নীরবিল ক্ষুব্ধ যুবাবর !
কাঁপিতে লাগিল কমলার কলেবর,
নিবিড় কুন্তল যেন উঠিল ফুলিয়া—
যুবারে সম্ভাষে বালা, এতেক বলিয়া—

"কমলা তোমারে আহা ভালোবাসে বলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয় !
প্রেমেরে ডুবাব আজি বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয় !

তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন ?
নিষ্ঠুর ! আমারে আর পাবি কি কখন ?
পদতলে পড়ি মোর দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয় ?

তুমিও চলিলে যদি হইয়া উদাস—
কেন গো বহিব তবে এ হৃদি হতাশ ?

আমিও গো আভরণ ভূষণ ফেলিয়া
যোগিনী তোমার সাথে যাইব চলিয়া ।

যোগিনী হইয়া আমি জন্মেছি যখন
যোগিনী হইয়া প্রাণ করিব বহন ।
কাজ কি এ মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন—
পরিব বাকলবাস ফুলের ভূষণ ।

নীরদ ! তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন !
নতুবা যমুনাজলে এখনই অবহেলে
ত্যজিব বিষাদদগ্ধ নারীর জীবন !”

পড়িল ভূতলে কেন নীরদ সহসা ?
শোণিতে মৃত্তিকাতল হইল রঞ্জিত ?
কমলা চমকি দেখে সভয়ে বিবশা
দারুণ ছুরিকা পৃষ্ঠে হয়েছে নিহিত !

কমলা সভয়ে শোকে করিল চিৎকার ।
রক্তমাখা হাতে ওই চলিছে বিজয় ?
নয়নে আঁচল চাপি কমলা আবার—
সভয়ে মুদিয়া আঁখি স্থির হ’য়ে রয় ।

আবার মেলিয়া আঁখি মুদিল নয়নে,
ছুটিয়া চলিল বালা যমুনার জলে—
আবার আইল ফিরি যুবার সদনে,
যমুনা-শীতল জলে ভিজায়ে আঁচলে ।

যুবকের ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি রহিল তথায়—
এক বিন্দু পড়িল না নয়নের জল,
এক বারো বহিল না দীর্ঘশ্বাস-বায় ।

তুলি নিল যুবকের মাথা কোল-’পরে—
একদৃষ্টে মুখপানে রহিল চাহিয়া ।
নির্জীব প্রতিমা-প্রায় না নড়ে না চড়ে,
কেবল নিশ্বাস মাত্র যেতেছে বহিয়া ।

চেতন পাইয়া যুবা কহে কমলায়,
“যে ছুরিতে ছিঁড়িয়াছে জীবনবন্ধন
অধিক সুতীক্ষ্ণ ছুরি তাহা অপেক্ষায়
আগে হতে প্রেমরজ্জু করেছে ছেদন ।

বন্ধুর ছুরিকা-মাখা দ্বেষহলাহলে
করেছে হৃদয়ে দেহে আঘাত ভীষণ,
নিবেছে দেহের জ্বালা হৃদয়-অনলে—
ইহার অধিক আর নাইক মরণ !

বকুলের তলা হোক্ রক্তে রক্তময় !
মৃত্তিকা রঞ্জিত হোক্ লোহিত বরণে !
বসিবে যখন কাল হেথায় বিজয়
আচ্ছন্ন বন্ধুতা পুন উদিবে না মনে ?

মৃত্তিকার রক্তরাগ হয়ে যাবে ক্ষয়—
বিজয়ের হৃদয়ের শোণিতের দাগ
আর কি কখনো তার হবে অপচয় ?
অনুতাপ-অশ্রুজলে মুছিবে সে রাগ ?

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি প্রেমের কিরণে
(রবিকরে হীনভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কি রে বিজয়ের মনে ?
উদিত হইবে না কি আবার কখন ?

একদিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয় !
একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকারে !
একদিন মুছিবারে হইতে হৃদয়
চাহিবে সে রক্তধারা অশ্রুবারিধারে !

কমলে ! খুলিয়া ফেল আঁচল তোমার !
রক্তধারা যেথা ইচ্ছা হোক প্রবাহিত !
বিজয় শুধেছে আজি বন্ধুতার ধার
প্রেমেরে করায়ে পান বন্ধুর শোণিত !

চলিনু কমলা আজ ছাড়িয়া ধরায়—
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িয়া বন্ধন,
জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মিত্রতায়,
প্রেমের দাসত্ব রজ্জু করিয়া ছেদন !"

অবসন্ন হয়ে প'ল যুবক তখনি,
কমলার কোল হোতে পড়িল ধরায় !
উঠিয়া বিপিনবালা সবেগে অমনি
ঊর্ধ্বহস্তে কহে উচ্চ সুদৃঢ় ভাষায়—

"জ্বলন্ত জগৎ ! ওগো চন্দ্র সূর্য তারা !
দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে !
পৃথিবীর পাপ পুণ্য, হিংসা, রক্তধারা
তোমরাই লিখে রাখ জ্বলদ্ অক্ষরে !

সাক্ষী হও তোমরা গো করিও বিচার !—
তোমরা হও গো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর !
ব'হে যাও !— ব'হে যাও যমুনার ধার,
নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর !

এখনই অস্তাচলে যেও না তপন !
ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি দিনকর !
এই, এই রক্তধারা করিয়া শোষণ
লয়ে যাও, লয়ে যাও স্বর্গের গোচর !

ধুস্ নে যমুনাজল ! শোণিতের ধারে !
বকুল তোমার ছায়া লও গো সরিয়ে !
গোপন ক'রো না উহা নিশীথ ! আঁধারে !
জগৎ ! দেখিয়া লও নয়ন ভরিয়ে !

অবাক হউক্ পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে !
অবাক হইয়া যাক্ আঁধার নরক !
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে !
প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়নপলক !

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন !
বিস্মৃতি ! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে ;
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে !

বিষাদ ! বিলাসে তার মাখি হলাহল
ধরিও সমুখে তার নরকের বিষ !
শান্তির কুটীরে তার জ্বালায়ো অনল !
বিষবৃক্ষবীজ তার হৃদয়ে রোপিস্ !

দূর হ—দূর হ তোরা ভূষণ রতন !
আজিকে কমলা যে রে হয়েছে বিধবা !
আবার কবরি ! তোরে করিনু মোচন !
আজিকে কমলা যে রে হয়েছে বিধবা !

কি বলিস্ যমুনা লো ! কমলা বিধবা !
জাহ্নবীরে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা' !
পাখি ! কি করিস্ গান 'কমলা বিধবা' !
দেশে দেশে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা' !

আয় ! শুক ফিরে যা লো বিজন শিখরে,
মৃগদের বল্ গিয়া উঁচু করি গলা—
কুটীরকে বল্ গিয়ে, তটিনী, নির্ঝরে—
'বিধবা হয়েছে সেই বালিকা কমলা !'

উহুহু ! উহুহু— আর সহিব কেমনে ?
হৃদয়ে জ্বলিছে কত অগ্নিরাশি মিলি ।
বেশ ছিনু বনবালা, বেশ ছিনু বনে !—
নীরজা বলিয়া গেছে 'জ্বালালি ! জ্বলিলি' !"

সপ্তম সর্গ

শ্মশান

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ !
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন !
সর সর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায় ।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায় !

গাছপালা নাই কোথা প্রান্তর গম্ভীর !
শাখাপত্রহীন বৃক্ষ, শুষ্ক, দগ্ধ, উঁচু করি শির
দাঁড়াইয়া দূরে— দূরে নিরখিয়া চারি দিক-পান
পৃথিবীর ধ্বংসরাশি, রহিয়াছে হয়ে ম্রিয়মাণ ?

শ্মশানের নাই প্রাণ যেন আপনার,
শুষ্ক তৃণরাজি তার ঢাকিয়াছে বিশাল বিস্তার !
তৃণের শিশির চুমি বহে নাকো প্রভাতের বায়
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া হেথায় হোথায় ।

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক !
হেথা হোথা অস্থিরাশি ভস্মমাঝে লুকাইয়া মুখ !
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গারশিখায় !

বিকট দশন মেলি মানবকপাল—
ধ্বংসের স্মরণস্তূপ, ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল !
গভীর আঁখিকোটর আঁধারেরে দিয়েছে আবাস,
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস !

মানবকঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়—
কানের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায় !
তটিনী কহিছে কানে 'উঠ ! উঠ ! উঠ নিদ্রা হতে
ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ-আঘাতে !

উঠ গো কঙ্কাল ! কত ঘুমাইবে আর !
পৃথিবীর বায়ু এই বহিতেছে উঠ আরবার !
উঠ গো কঙ্কাল ! দেখ স্রোতস্বিনী ডাকিছে তোমায়
ঘুমাইবে কত আর বিসর্জন দিয়া চেতনায় !

বলো না, বলো না তুমি ঘুমাও কি বোলে ?
কাল যে প্রেমের মালা পরাইয়াছিল এই গলে
তরুণী ষোড়শী বালা ! আজ তুমি ঘুমাও কি বলে !
অনাথারে একাকিনী সঁপিয়া এ পৃথিবীর কোলে !

উঠ গো— উঠ গো— পুন করিনু আহ্বান !
শুন, রজনীর কানে ওই সে করিছে খেদ গান !
সময় তোমার আজো ঘুমাবার হয় নাই তো রে !
কোল বাড়াইয়া আছে পৃথিবীর সুখ তোমা-তরে !

তুমি গো ঘুমাও, আমি বলি না তোমারে !
জীবনের রাত্রি তব ফুরায়েছে নেত্রধারে-ধারে !
এক বিন্দু অশ্রুজল বরষিতে কেহ নাই তোর,
জীবনের নিশা আহা এত দিনে হইয়াছে ভোর !

ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধূমরাশি শ্বসে !
একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা নিক্ষেপিয়া আকাশের 'পরে।

কার চিতা জ্বলিতেছে কাহার কে জানে ?
কমলা ! কেন গো তুমি তাকাইয়া চিতাগ্নির পানে ?
একাকিনী অন্ধকারে ভীষণ ও শ্মশানপ্রদেশে
ভূষণবিহীনদেহে, শুষ্কমুখে, এলোথেলো কেশে ?

কার চিতা জান কি গো কমলে জিজ্ঞাসি !
দেখিতেছ কার চিতা শ্মশানেতে একাকিনী আসি ?
নীরদের চিতা ? নীরদের দেহ অগ্নিমাঝে জ্বলে ?
নিবায়ে ফেলিবে অগ্নি, কমলে, কি নয়নের জলে ?

নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কমলা দাঁড়ায়ে !
গভীর নিশ্বাসবায়ু উচ্ছ্বাসিয়া উঠে !
ধূমময় নিশীথের শ্মশানের বায়ে
এলোথেলো কেশরাশি চারি দিকে ছুটে !

ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় অন্ধকার
চিতার অনলোত্থিত অস্ফুট আলোক
পড়িয়াছে ঘোর ম্লান মুখে কমলার,
পরিস্ফুট করিতেছে সুগভীর শোক !

নিশীথে শ্মশানে আর নাই জন প্রাণী,
মেঘান্ধ অমান্ধকারে মগ্ন চরাচর !
বিশাল শ্মশানক্ষেত্রে শুধু একাকিনী
বিষাদপ্রতিমা বামা বিলীন-অন্তর !

তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
নিশীথশ্মশানবায়ু স্বনিছে উচ্ছ্বাসে !
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া !
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে !

শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া
নীরব শ্মশানময় তুলি প্রতিধ্বনি !
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি !

এ-হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা !
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ !
শূন্যনেত্রে শূন্যহৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ননিবেশ !

কমলা চিতায় নাকি করিবে প্রবেশ ?
বালিকা কমলা নাকি পশিবে চিতায় ?
অনলে সংসারলীলা করিবি কি শেষ ?
অনলে পুড়াবি নাকি সুকুমার কায় ?

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম হায়—
ছুটিতিস্ ফুল তুলে কাননে কাননে
ফুলে ফুল সাজাইয়া ফুলসম কায়—
দেখাতিস সাজসজ্জা পিতার সদনে !

দিতিস হরিণশৃঙ্গে মালা জড়াইয়া !
হরিণশিশুরে আহা বুকে লয়ে তুলি
সুদূর কাননভাগে যেতিস্ ছুটিয়া,
ভ্রমিতিস্ হেথা হোথা পথ গিয়া ভুলি !

সুধাময়ী বীণাখানি লয়ে কোল-'পরে
সমুচ্চ হিমাদ্রিশিরে বসি শিলাসনে
বীণার ঝংকার দিয়া মধুময় স্বরে
গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে !

হরিণেরা বন হতে শুনিয়া সে স্বর
শিখরে আসিত ছুটি তৃণাহার ভুলি !
শুনিত, ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর
বড়ো বড়ো আঁখিদুটি মুখ-পানে তুলি !

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতার অনলে আজ হবে তোর শেষ ?
সুখের যৌবন হায় পোড়াবি আগুনে ?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম-অবশেষ !

না, না, না, সরলা বালা, ফিরে যাই চল্
এসেছিলি যেথা হতে সেই সে কুটীরে !
আবার ফুলের গাছে ঢালিবি লো জল !
আবার ছুটিবি গিয়ে পর্বতের শিরে ?

পৃথিবীর যাহা কিছু ভুলে যা লো সব,
নিরাশযন্ত্রণাময় পৃথ্বীর প্রণয় !
নিদারুণ সংসারের ঘোর কলরব,
নিদারুণ সংসারের জ্বালা বিষময় ।

তুই স্বরগের পাখি পৃথিবীতে কেন !
সংসারকণ্টকবনে পারিজাত ফুল !
নন্দনের বনে গিয়া গাইবি খুলিয়া হিয়া,
নন্দনমলয়বায়ু করিবি আকুল ।

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে—
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যথা কলকলস্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বনফুলদল !

বন-ফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে !
দয়াময়ী বনদেবী শিশিরসেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে ।

এখনো কমলা ওই রয়েছে দাঁড়িয়ে
জ্বলন্ত চিতার 'পরে মেলিয়ে নয়ন !
ওই রে সহসা ওই মূর্ছিয়ে পড়িয়ে
ভস্মের শয্যার পরে করিল শয়ন !

এলায়ে পড়িল ভস্মে সুনিবিড় কেশ !
অঞ্চলবসন ভস্মে পড়িল এলায়ে !
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলুথালু বেশ
কমলার বক্ষ হতে, শ্মশানের বায়ে !

নিবে গেল ধীরে ধীরে চিতার অনল !
এখনো কমলা বালা মূর্ছায় মগন !
শুকতারা উজলিল গগনের তল,
এখনো কমলা বালা স্তব্ধ অচেতন !

ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্বাশার সুবর্ণ তোরণে
রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতিভালে দিল পরাইয়া ।

এখনো কমলা বালা ঘোর অচেতন,
কমলা-কপোল চুমে অরুণকিরণ !
গনিছে কুন্তলগুলি প্রভাতের বায়,
চরণে তটিনী বালা তরঙ্গ দুলায় !

কপোলে, আঁখির পাতে পড়েছে শিশির !
নিস্তেজ সুবর্ণকরে পিতেছে মিহির !
শিথিল অঞ্চলখানি লয়ে ঊর্মিমালা
কত কি— কত কি করে করিতেছে খেলা !

ক্রমশ বালিকা ওই পাইছে চেতন !
ক্রমশ বালিকা ওই মেলিছে নয়ন !
বক্ষোদেশ আবরিয়া অঞ্চলবসনে
নেহারিল চারি দিক বিস্মিত নয়নে ।

ভস্মরাশিসমাকুল শ্মশানপ্রদেশ !
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি
বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্যের লেশ,
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি !

সূর্যকর পড়িয়াছে শুষ্কম্লানপ্রায়,
ভস্মমাখা ছুটিতেছে প্রভাতের বায় !
কোথাও নাই রে যেন আঁখির বিশ্রাম,
তটিনী ঢালিছে কানে বিষাদের গান !

বালিকা কমলা ক্রমে করিল উত্থান
ফিরাইল চারি দিকে নিস্তেজ নয়ান ।
শ্মশানের-ভস্ম-মাখা অঞ্চল তুলিয়া
যেদিকে চরণ চলে যাইল চলিয়া !

অষ্টম সর্গ

বিসর্জন

আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর !
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর ।

আজিও সে শৈলবালা বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা,
চলিছে কত কি কহি আপনার মনে !
তুষারশীতল বায় পুষ্প চুমি চুমি যায়,
খেলা করে মনোসুখে তটিনীর সনে ।

কুটীরে তটিনীতীরে লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিলদর্পণে !
হরিণেরা তরুছায়ে খেলিতেছে গায়ে গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপকম্পনে ।

বনের পাদপপত্র আজিও মানবনেত্র
হিংসার অনলময় করে নি লোকন !
কুসুম লইয়া লতা প্রণত করিয়া মাথা
মানবেরে উপহার দেয় নি কখন !

বনের হরিণগণে মানবের শরাসনে
ছুটে ছুটে ভ্রমে নাই তরাসে তরাসে !
কানন ঘুমায় সুখে নীরব শান্তির বুকে,
কলঙ্কিত নাহি হয়ে মানবনিশ্বাসে ।

কমলা বসিয়া আছে উদাসিনী বেশে
শৈলতটিনীর তীরে এলোথেলো কেশে
অধরে সঁপিয়া কর, অশ্রু বিন্দু ঝর ঝর
ঝরিছে কপোলদেশে— মুছিছে আঁচলে ।
সম্বোধিয়া তটিনীরে ধীরে ধীরে বলে,
"তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে !
কিন্তু সেই ছেলেবেলা যেমন করিতে খেলা
তেমনি করিয়ে খেলো নির্ঝরের সনে !

তখন যেমন স্বরে কল কল গান করে
মৃদু বেগে তীরে আসি পড়িতে লো ঝাঁপি
বালিকা ক্রীড়ার ছলে পাথর ফেলিয়া জলে
মারিতাম— জলরাশি উঠিত লো কাঁপি

তেমনি খেলিয়ে চল্ তুই লো তটিনীজল !
তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার ।
নির্ঝর তেমনি করে ঝাঁপিয়া সরসী-'পরে
পড়্ লো উগরি শুভ্র ফেনরাশিভার !

মুছিতে লো অশ্রুবারি এয়েছি হেথায় ।
তাই বলি পাপিয়ারে ! গান কর্ সুধাধারে
নিবাইয়া হৃদয়ের অনলশিখায় !

ছেলেবেলাকার মতো বায়ু তুই অবিরত
লতার কুসুমরাশি কর্ লো কম্পিত !
নদী চল্ দুলে দুলে ! পুষ্প দে হৃদয় খুলে !
নির্ঝর সরসীবক্ষ কর্ বিচলিত !

সেদিন আসিবে আর হৃদিমাঝে যাতনার
রেখা নাই, প্রমোদেই পূরিত অন্তর !
ছুটাছুটি করি বনে বেড়াইব ফুল্লমনে,
প্রভাতে অরুণোদয়ে উঠিব শিখর !

মালা গাঁথি ফুলে ফুলে   জড়াইবে এলোচুলে,
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গল !
বড়ো বড়ো দুটি আঁখি   মোর মুখপানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল !

সেদিন গিয়েছে হা রে— বেড়াই নদীর ধারে
ছায়াকুঞ্জে শুনি গিয়ে শুকদের গান !
না থাক্, হেথায় বসি,   কি হবে কাননে পশি—
শুক আর গাবে নাকো খুলিয়ে পরান !
সেও যে গো ধরিয়াছে বিষাদের তান !

জুড়ায়ে হৃদয়ব্যথা   দুলিবে না পুষ্পলতা,
তেমন জীবন্ত ভাবে বহিবে না বায় !
প্রাণহীন যেন সবি— যেন রে নীরব ছবি—
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায় !

তবুও যাহাতে হোক্   নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল !
তবুও তো আপনারে   ভুলিতে হইবে হা রে !
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল !

যাই তবে বনে বনে   ভ্রমিগে আপনমনে,
যাই তবে গাছে গাছে   ঢালি দিই জল !
শুকপাখিদের গান   শুনিয়া জুড়াই প্রাণ,
সরসী হইতে তবে তুলিগে কমল !

হৃদয় নাচে না তো গো তেমন উল্লাসে !
ভ্রমি তো ভ্রমিই বনে   ম্রিয়মাণ শূন্যমনে,
দেখি তো দেখিই বোসে সলিল-উচ্ছ্বাসে !
তেমন জীবন্ত ভাব নাই তো অন্তরে—
দেখিয়া লতার কোলে   ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—

নির্ঝরের ঝরঝরে   হৃদয়ে তেমন করে
উল্লাসে শোণিতরাশি উঠে না নাচিয়া !
কি জানি কি করিতেছি,   কি জানি কি ভাবিতেছি,
কি জানি কেমনধারা শূন্যপ্রায় হিয়া !

তবুও যাহাতে হোক্   নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল।
তবুও তো আপনারে   ভুলিতে হইবে হা রে,
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল !

কাননে পশিগে তবে শুক যেথা সুধারবে
গান করে জাগাইয়া নীরব কানন।
উচু করি করি মাথা হরিণেরা বৃক্ষপাতা
সুধীরে নিঃশঙ্কমনে করিছে চর্বণ !"

সুন্দরী এতেক বলি পশিল কাননস্থলী,
পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারণ।
বৃক্ষছায়ে তলে তলে ধীরে ধীরে নদী চলে
সলিলে বৃক্ষের মূল করি প্রক্ষালন।

হরিণ নিঃশঙ্কমনে শুয়ে ছিল ছায়াবনে,
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি নয়নদ্বয় মুখপানে চাহি রয়,
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।

ছুটিছে হরিণচয়, কমলা অবাক্ রয়—
নেত্রহতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রুজল।
ওই যায়— ওই যায় হরিণ হরিণী হায়—
যায় যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।

কমলা বিষাদভরে কহিল সমুচ্চস্বরে—
প্রতিধ্বনি বন হতে ছুটে বনান্তরে—
"যাস্ নে— যাস্ নে তোরা, আয় ফিরে আয়!
কমলা— কমলা সেই ডাকিতেছে তোরে!

সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে,
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে!
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে!

কোথা যাস্— কোথা যাস্— আয় ফিরে আয়!
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা!
কারে ভয় করি তোরা যাস্ রে কোথায়?
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ! আয় লো চপলা!

এলি নে— এলি নে তোরা এখনো এলি নে—
কমলা ডাকিছে যে রে, তবুও এলি নে!
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে?
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে?

খুলিয়া ফেলিনু এই কবরীবন্ধন,
এখনো ফিরিবি না হরিণের দল ?
এই দেখ্— এই দেখ্ ফেলিয়া বসন
পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল !
যাক্ তবে, যাক্ চ'লে— যে যায় যেখানে—
শুক পাখি উড়ে যাক্ সুদূর বিমানে !
আয়— আয়— আয় তুই আয় রে মরণ !
বিনাশশক্তিতে তোর নিভা এ যন্ত্রণা !
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন !
বহিতে অনল হৃদে আর তো পারি না !

নীরদ স্বরগে আছে, আছেন জনক
স্নেহময়ী মাতা মোর কোল রাখি পাতি—
সেথায় মিলিব গিয়া, সেথায় যাইব—
ভোর করি জীবনের বিষাদের রাতি !
নীরদে আমাতে চড়ি প্রদোষতারায়
অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ,
মন্দাকিনী তীরে বসি দেখিব ধরায়
এত কাল যার কোলে কাটিল জীবন ।

শুকতারা প্রকাশিবে উষার কপোলে
তখন রাখিয়া মাথা নীরদের কোলে—
অশ্রুজলসিক্ত হয়ে কব সেই কথা
পৃথিবী ছাড়িয়া এনু পেয়ে কোন্ ব্যথা !
নীরদের আঁখি হতে ব'বে অশ্রুজল !
মুছিব হরষে আমি তুলিয়া আঁচল !
আয়— আয়— আয় তুই, আয় রে মরণ !
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন !"

এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর !
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারি দিক গেছে খুলে
উপত্যকা, বনভূমি, বিপিন, ভূধর !

তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্রপথে দিল দেখা—
বৃক্ষচ্ছায়া দুলাইয়া ব'হে ব'হে যায় !
ছোটো ছোটো গাছপালা—
সংকীর্ণ নির্ঝরমালা—
সবি যেন দেখা যায় রেখা-রেখা-প্রায় ।

গেছে খুলে দিগ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক
কোথা কুঞ্জ— কোথা বন— কোথায় কুটীর !
শ্যামল মেঘের মতো—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর !

তুষাররাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
মাথায় জলদ ঠেকে,
চরণে চাহিয়া দেখে
গাছপালা ঝোপে-ঝাপে ভূধর আবরি !

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা-রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা
কে কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথায় !
বন, গিরি, লতা, পাতা আঁধারে মিশায় !

অসংখ্য শিখরমালা ব্যাপি চারি ধার—
মধ্যের শিখর-'পরে
(মাথায় আকাশ ধরে)
কমলা দাঁড়ায়ে আছে, চৌদিকে তুষার !

চৌদিকে শিখরমালা—
মাঝেতে কমলা বালা
একেলা দাঁড়ায়ে মেলি নয়নযুগল !
এলোথেলো কেশপাশ,
এলোথেলো বেশবাস,
তুষারে লুটায়ে পড়ে বসন-আঁচল !

যেন কোন্ সুরবালা
দেখিতে মর্তের লীলা
স্বর্গ হতে নামি আসি হিমাদ্রিশিখরে !
চড়িয়া নীরদ-রথে—
সমুচ্চ শিখর হতে
দেখিলেন পৃথ্বীতল বিস্মিত অন্তরে !

তুষাররাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
হিমময় বায়ু ছুটে,
অন্তরে অন্তরে ফুটে
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধপ্রায় করি !

শীতল তুষারদল
কোমল চরণতল
দিয়াছে অসাড় ক'রে পাষাণের মতো !
কমলা দাঁড়ায়ে আছে যেন জ্ঞানহত !
কোথা স্বর্গ— কোথা মর্ত— আকাশ পাতাল !
কমলা কি দেখিতেছে !
কমলা কি ভাবিতেছে !
কমলার হৃদয়েতে ঘোর গোলমাল !

চন্দ্র সূর্য নাই কিছু—
শূন্যময় আগু পিছু !
নাই রে কিছুই যেন ভূধর কানন !
নাইক শরীর দেহ,
জগতে নাইক কেহ—
একেলা রয়েছে যেন কমলার মন !
কে আছে— কে আছে— আজি কর গো বারণ !

বালিকা ত্যজিতে প্রাণ করেছে মনন !
বারণ কর গো তুমি গিরি হিমালয় !
শুনেছ কি বনদেবী— করুণা-আলয়—
বালিকা তোমার কোলে করিত ক্রন্দন,
সে নাকি মরিতে আজ করেছে মনন ?

বনের কুসুমকলি
তপনতাপনে জ্বলি
শুকায়ে মরিবে নাকি করেছে মনন !
শীতল শিশিরধারে
জীয়াও জীয়াও তারে
বিশুষ্ক হৃদয়মাঝে বিতরি জীবন !

উদিল প্রদোষতারা সাঁঝের আঁচলে—
এখনি মুদিবে আঁখি ?
বারণ করিবে না কি ?
এখনি নীরদ কোলে মিশাবে কি বোলে ?
অনন্ত তুষারমাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
মোহস্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে
চৌদিকে তুষাররাশি শিখর আবরি !

উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি

দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন !
বনবালা থাকি থাকি
সহসা মুদিল আঁখি
কাঁপিয়া উঠিল দেহ ! কাঁপি উঠে মন !

অনন্ত আকাশমাঝে একেলা কমলা !
অনন্ত তুষারমাঝে একেলা কমলা !
সমুচ্চ শিখর-'পরে একেলা কমলা !
আকাশে শিখর উঠে
চরণে পৃথিবী লুটে—
একেলা শিখর-'পরে বালিকা কমলা !

ওই— ওই— ধর্— ধর্— পড়িল বালিকা !
ধবলতুষারচ্যুতা পড়িল বিহ্বল !—
খসিল পাদপ হতে কুসুমকলিকা !
খসিল আকাশ হতে তারকা উজ্জ্বল !

প্রশান্ত তটিনী চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
ধরিল বুকের পরে কমলাবালায় !
উচ্ছ্বাসে সফেন জল উঠিল নাচিয়া !
কমলার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায় !

কমলার দেহ বহে সলিল-উচ্ছ্বাস !
কমলার জীবনের হল অবসান !
ফুরাইল কমলার দুখের নিঃশ্বাস,
জুড়াইল কমলার তাপিত পরান !

কল্পনা ! বিষাদে দুখে গাইনু সে গান !
কমলার জীবনের হল অবসান !
দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন !
কমলার— প্রতিমার হল বিসর্জন !

ভগ্নহৃদয়

ভগ্নহৃদয়।

—

(গীতি-কাব্য)

—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

—

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

কাব্যের পাত্রগণ

কবি	
অনিল	
মুরলা	অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্যসহচরী
ললিতা	অনিলের প্রণয়িনী
নলিনী	এক চপলস্বভাবা কুমারী
চপলা	মুরলার সখী
লীলা	
সুরুচি	নলিনীর সখীগণ
মাধবী প্রভৃতি	
সুরেশ	
বিজয়	নলিনীর বিবাহ বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
বিনোদ প্রভৃতি	

ভূমিকা

এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে, দৃষ্টান্তরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।

উপহার

শ্রীমতী হে———————,

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত ।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায়ে শুকায়ে যাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায় ।
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায় !

২

জীবনসমুদ্রে তব জীবনতটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর ।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি উর্মি যত উঠে জাগি
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া—
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে— বিরাম পাবে— তোমার চরণে গিয়া ।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া ।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে ।
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে !

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে ;
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে ।
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন-শশী—
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে ম্রিয়মাণ,
সুখ শান্তি অবসান— কাঁদিব আঁধারে বসি !

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান?

ভগ্নহৃদয়

প্রথম সর্গ

দৃশ্য— বন। চপলা ও মুরলা

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা ?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে হয়েছি যে সারা !
এমন আঁধার ঠাঁই— জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারি দিকে ঝুঁকি !
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড়ো লাগে ভয়,
কি সাহসে রয়েছিস্ বসিয়া এখানে ?

মুরলা। সখি, বড়ো ভালোবাসি এই ঠাঁই !
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি,
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই !
বিছায়ে শুকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি !
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর ভালো লাগিবে না তোর,
তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্ গিয়ে খেলা !

চপলা। মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ ?
তুই হেথা বসে র'বি, কত আছে কাজ !
কত ভোরে উঠে বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে লয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখি নি বাকি !
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল,
কুসুমরেণুতে মাখা।
কাঁটা বিঁধে, সখি, হয়েছিনু সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা !
তুলেছি করবী গোলাপ-গরবী,
তুলেছি টগরগুলি,

যূথিকুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখ্‌সে আজ—
হরষের হাসি অধরে ধরে না,
কিছু যদি আছে লাজ!

মুরলা। আহা সখি, বড়ো তারা ভালোবাসে দুই জনে!

চপলা। হাঁ সখি, এমন আর দেখি নি তো বর-কনে!
জানিস্ তো, সখি, ললিতার মতো
অমন লাজুক মেয়ে
অনিলের সাথে দেখা করিবারে
প্রতিদিন যায় বিপাশার ধারে
সরমের মাথা খেয়ে!
কবরীতে বাঁধি কুসুমের মালা,
নয়নে কাজলরেখা,
চুপি চুপি যায়, ফিরে ফিরে চায়,
বনপথ দিয়ে একা!
দূর হতে দেখি অনিলে অমনি
সরমে চরণ সরে না যেন!
ফিরিবে ফিরিবে মনে মনে করি
চরণ ফিরিতে পারে না যেন!
অনিল অমনি দূর হতে আসি
ধরি তার হাতখানি
কহে যে কত-কি হৃদয়-গলানো
সোহাগে মাখানো বাণী।
আমি ছিনু, সখি, লুকিয়ে তখন
গাছের আড়ালে আসি,
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিতেছিলেম
রাখিতে পারি নে হাসি!
কত কথা ক'য়ে কত হাত ধরি
কত শত বার সাধাসাধি করি
বসাইল যুবা ললিতা বালারে
বকুল গাছের ছায়।
মাথার উপরে ঝরে শত ফুল—
যেন গো করুণ তরুণ বকুল
ফুল চাপা দিয়ে লাজুক মেয়েরে
ঢাকিয়া ফেলিতে চায়!
ললিতার হাত কাঁপে থর থর,
আঁখি দুটি নত মাটির উপর,
ভূমি হতে এক কুসুম তুলিয়া
ছিঁড়িতেছে শত ভাগে।

লাজনত মুখ ধরিয়া তাহার
অনিল রাখিল বুকের মাঝার,
অনিমিষ আঁখি মেলিয়া যুবক
চাহি থাকে মুখবাগে !
আদরে ভাসিয়া ললিতার চোখে
বাহিরে সলিলধার—
সোহাগে সরমে প্রণয়ে গলিয়া
আঁখি দুটি তার পড়িল ঢলিয়া,
হাসি ও নয়নসলিলে মিলিয়া
কি শোভা ধরিল মুখানি তার !
আমি, সখি, আর নারিনু থাকিতে—
সুমুখে পড়িনু আসি,
করতালি দিয়ে উপহাস কত
করিলাম হাসি হাসি !
ললিতা অমনি চমকি উঠিল,
মুখেতে একটি কথা না ফুটিল,
আকুল ব্যাকুল হইয়া সরমে
লুকাতে ঠাঁই না পায় ।
ছুটিয়ে পলায়ে এলেম অমনি,
হেসে হেসে আর বাঁচি নে সজনি,
সেদিন হইতে আমারে হেরিলে
ললিতা সরমে মরিয়া যায় !

মুরলা । আহা; কেন বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে ?

চপলা । বাধা না পাইলে, সখি, সুখেতে কি সুখ আছে ?

মুরলা । সূর্যমুখী ফুল, সখি, আমি ভালোবাসি বড়ো—
দু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ জড়ো ।
মনে বড়ো সাধ তার দেখে রবিমুখ-পানে,
রবি যেথা মাথা তার লয়ে যায় সেইখানে !
তবু মনোআশা হায় মনেই মিশায়ে যায়,
মুখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড় !
সে ফুলে সাজাবি দেহ লাজময়ী ললিতার,
লজ্জাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার ;
কমল আনিয়া তুলি লাজে-রাঙা পাপড়িগুলি
গাঁথি গাঁথি নিরমিয়া দিবি ঘোমটার ধার !
পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো লাজুক গোলাপ দুটো
আনিস, দুলায়ে দিবি সুচারু অলকে তার !
সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে—
আকুল সে ফুলগুলি যতনে আনিস্ তুলি,
তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার ।

চপলা। তুই, সখি, আয়— একেলা আমার
ভালো নাহি লাগে বালা!
দুটি সখী মিলি হাসিতে হাসিতে
গুন্ গুন্ গান গাহিতে গাহিতে
মনের মতন গাঁথিব মালা!
বল্ দেখি, সখি, হ'ল কি তোর?
হাসিয়া খেলিয়া কুসুম তুলিয়া
করিবি কোথায় ভাবনা ভুলিয়া
কুমারীজীবন ভোর—
তা না, একি জ্বালা? মরমে মিশিয়া
আপনার মনে আপনি বসিয়া
সাধ করে এত ভালো লাগে, সখি,
বিজনে ভাবনা-ঘোর!
তা হবে না, সখি, না যদি আসিস্
এই কহিলাম তোরে—
যত ফুল আমি আনিয়াছি তুলি
আঁচল ভরিয়া ল'ব সবগুলি,
বিপাশার স্রোতে দিব লো ভাসায়ে
একটি একটি করে!

মুরলা। মাথা খা, চপলা, মোরে জ্বালাস্ নে আর!

চপলা। ভালো, সই, জ্বালাব না চলিনু এবার!

[গমনোদ্যম : পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়া]

না না, সখি, এই আঁধার কাননে
একেলা রাখিয়া তোরে
কোথায় যাইব বল্ দিখি তুই,
যাইব কেমন করে?
তোরে ছেড়ে আমি পারি কি থাকিতে?
ভালোবাসি তোরে কত!
আমি যদি, সখি, হতেম তোমার
পুরুষ মনের মতো
সারাদিন তোরে রাখিতাম ধরে,
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে!
অমিয়া-মাখানো মুখানি তোমার
দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর!
ও মুখানি লয়ে কি যে করিতাম
বুকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম,
ভাবিয়া পেতাম তা কি?
সখি, কার তুমি ভালোবাসা-তরে

ভাবিছ অমন দিনরাত ধরে,
পায়ে পড়ি তব খুলে বলো তাহা—
কি হবে রাখিয়া ঢাকি ?

মুরলা। ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর !
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার !
যে গোপন কথা, সখি, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেবমন্ত্র-সম পূজি অনিবার
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
লুকানো থাক্ তা, সখি, হৃদয়ে আমার !
ভালোবাসি, শুধায়ো না কারে ভালোবাসি !
সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি !
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার !
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবীকাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হা-রে,
তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার !

চপলা। কে জানে সজনি, বুঝিতে না পারি
এ তোর কেমন কথা !
আজিও তো সখি না পেনু ভাবিয়া
একি প্রণয়ের প্রথা !
প্রণয়ীর নাম রসনার, সখি,
সাধের খেলেনা-মতো,
উলটি পালটি সে নাম লইয়া
রসনা খেলায় কত !
নাম যদি তার বলিস্, তা হ'লে
তোরে আমি অবিরাম
শুনাব তাহারি নাম—
গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া
সদা গাব সেই গান !
রজনী হইলে সেই গান গেয়ে
ঘুম পাড়াইব তোরে,
প্রভাত হইলে সেই গান তুই
শুনিবি ঘুমের ঘোরে !
ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি দিব সেই নাম—
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি,
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি

নামের কুসুমদান !
যখনি গাহিবি তাহার গান,
যখনি কহিবি তাহার নাম,
সাথে সাথে সখি আমিও গাহিব,
সাথে সাথে সখি আমিও কহিব,
দিবারাতি অবিরাম—
সারা জগতের বিশাল আখরে
পড়িবি তাহারি নাম !
যখনি বলিবি তোর পাশে তারে
ধরিয়া আনিয়া দিব—
সুমুখ হইতে পলাইয়া গিয়া
আড়ালেতে লুকাইব ।
দেখিব কেমন দুখ না ছুটে
ওই মুখে তোর হাসি না ফুটে—
ভুলিবি এ বন, ভুলিবি বেদন,
সখীরেও বুঝি ভুলিয়া যাবি !
বল্, সখি, প্রেমে পড়েছিস্ কার !
বল্, সখি, বল্ কি নাম তাহার !
বলিবি নি কি লো ? না যদি বলিস্
চপলার মাথা খাবি !

মুরলা । [নেপথ্যে চাহিয়া] জীবন্ত স্বপ্নের মতো, ওই দেখ্, কবি
একা একা ভ্রমিছেন আঁধার অটবী ।
ওই যেন মূর্তিমান ভাবনার মতো
নত করি দু-নয়ন শুনিছেন একমন
স্তব্ধতার মুখ হতে কথা কত শত !

কবির প্রবেশ

কবি । বনদেবীটির মতো এই যে মুরলা,
প্রভাতে কাননে বসি ভাবনাবিহ্বলা !
প্রকৃতি আপনি আসি লুকায়ে লুকায়ে
আপনার ভাষা তোরে দেছে কি শিখায়ে ?
দিনরাত কলস্বরে তটিনী কি গান করে
তাহা কি বুঝিতে তুই পেরেছিস্ বালা ?
তাই হেথা প্রতিদিন আসিস্ একালা !
মুরলা ! আজিকে তোরে বনবালা-মতো করে
চপলা সাজায়ে দিক্ দেখি একবার ।
এলোথেলো কেশপাশে লতা দে বাঁধিয়া,
অলক সাজায়ে দে লো তৃণফুল দিয়া—
ফুলসাথে পাতাগুলি একটি একটি তুলি
অযতনে দে লো তাহা আঁচলে গাঁথিয়া !
হরিণশাবক যত ভুলিবে তরাস,

পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিবি তুলি,
সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!
আমি হয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখানি তোর,
কল্পনার ঘুমঘোর পশিবে পরানে!
ভাবিব, সত্যই হবে বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে!

চপলা। বল্ দেখি মোরে, কবি গো, হ'ল কি
তোমাদের দু-জনার?
সখীরে আমার কি গুণ করেছ
বল দেখি একবার!
সখীর আমার খেলাধূলা নেই,
সারাদিন বসি থাকে বিজনেই—
জানি না তো, কবি, এত দিন আছি
কিসের ভাবনা তার!
ছেলেবেলা হতে তোমরা দুজনে
বাড়িয়াছ এক সাথে,
আপনার মনে ভ্রমিতে দুজনে
ধরি-ধরি হাতে হাতে!
তখন না জানি কি মন্ত্র, কবি গো,
দিলে মুরলার কানে!
কি মায়া না জানি দিয়েছিলে পড়ি
সখীর তরুণ প্রাণে!
বেলা হয়ে এল সজনি এখন,
করিয়াছে পান প্রভাতকিরণ
ফুলবধূটির অধর হইতে
প্রতি শিশিরের কণা।
তুই থাক্ হেথা, আমি যাই ফিরে,
অমনি ডাকিয়া ল'ব মালতীরে—
একেলা তো, বালা, অত ফুলমালা
গাঁথিবারে পারিব না!

[প্রস্থান

কবি। মুরলা, তোমার কেন ভাবনার ভাব হেন?
কতবার শুধায়েছি বল নি আমারে!
লুকায়ো না কোনো কথা, যদি কোনো থাকে ব্যথা
রুধিয়া রেখো না তাহা হৃদয়মাঝারে!
হয়ত হৃদয়ে তব কিসের যাতনা
আপনি মুরলা তাহা জানিতে পার না!
হয়ত গো যৌবনের বসন্তসমীরে
মানসকুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,

প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হ'য়ে বুঝি পড়েছে সে ফুল ?
পেয়েছ কি যুবা কোনো মনের মতন ?
ভালোবাসো, ভালোবাসা করহ গ্রহণ—
তা হ'লে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।

মুরলা। [স্বগত] বুঝিলে না— বুঝিলে না— কবি গো, এখনো
বুঝিলে না এ প্রাণের কথা !
দেবতা গো বল দাও, এ হৃদয়ে বল দাও,
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।
জানি, কবি, ভালো তুমি বাস' নাক মোরে—
তা হ'লে এ মন তুমি চিনিবে কি কোরে ?
একটুকু ভালো যদি বাসিতে আমারে
তা হ'লে কি কোনো কথা এ মনের কোনো ব্যথা
তোমার কাছেতে, কবি, লুকায়ে থাকিতে পারে ?
তাহা হ'লে প্রতি ভাবে, প্রতি ব্যবহারে,
মুখ দেখে, আঁখি দেখে, প্রত্যেক নিশ্বাস থেকে
বুঝিতে যা গুপ্ত আছে বুকের মাঝারে।
প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম কি লুকানো থাকে ?
তবে থাক্, থাক্ সব, বুকে থাক্ গাঁথা—
বুক যদি ফেটে যায়— ভেঙে যায়— চুরে যায়—
তবু রবে লুকানো এ কথা।
দেবতা গো বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা !

কবি। বহুদিন হ'তে, সখি, আমার হৃদয়
হয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
চরাচর-ব্যাপী এই বোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া !
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি-তরে !

নবজাত উল্কানেত্র মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়,
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই—
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই।

তাই এই মহারণ্যে অমারাত্রে আসি গো একাকী,
মহান্ ভাবের ভারে দুরন্ত এ ভাবনারে
কিছুক্ষণ-তরে তবু দমন করিয়া যেন রাখি ।
চন্দ্রশূন্য আঁধারের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রমাঝারে
সমস্ত জগৎ যবে মগ্ন হয়ে গেছে একেবারে
অসহায় ধরা এক মহামন্ত্রে হয়ে অচেতন
নিশীথের পদতলে করিয়াছে আত্মসমর্পণ,
তখন অধীর হৃদি অভিভূত হয়ে যেন পড়ে—
অতি ধীরে বহে শ্বাস, নয়নেতে পলক না নড়ে ।

. . .

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহমাঝারে,
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে !
মনের এ রুদ্ধস্রোত দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত !
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলেনা কেবল;
চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি
আনন্দসংগীতস্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি,
উষার কনকস্রোতে প্রতিদিন করিত সে স্নান,
জোছনা-মদিরাধারা পূর্ণিমায় করিত সে পান,
ঘূর্ণ্যমান ঝটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা
কৌতুকে দেখিত যত বিদ্যুৎ-বালিকাদের খেলা,
দুরন্ত ঝটিকা হোথা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া
তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর চরণ বিক্ষেপিয়া ।
হরষে বসিত গিয়া ধূমকেতুপাখার উপরে,
তপনের চারি দিকে ভ্রমিত সে বর্ষ বর্ষ ধরে ।
চরাচর মুক্ত তার অবারিত বাসনার কাছে,
প্রকৃতি দেখাত তারে যেথা তার যত ধন আছে ;
কুসুমের রেণুমাখা বসন্তের পাখায় চড়িয়া
পৃথিবীর ফুলবনে ভ্রমিত সে উড়িয়া উড়িয়া ;
সমীরণ কুসুমের লঘু পরিমলভার বহি
পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম লভিছে রহি রহি,
সেই পরিমল সাথে অমনি সে যাইত মিলায়ে—
ভ্রমি কত বনে বনে পরিমলরাশি-সনে
অতি দূর দিগন্তের হৃদয়েতে যাইত মিশায়ে ।
তটিনীর কলস্বর পল্লবের মরমর
শত শত বিহগের হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস

সমস্ত বনের স্বর মিশে হ'ত একস্তর
একপ্রাণ হয়ে তারা পরশিত উন্নত আকাশ।
তখন সে সংগীতের তরঙ্গে করিয়া আরোহণ
মেঘের সোপান দিয়া অতি উচ্চ শূন্যে গিয়া
উষার আরক্ত ভাল পারিত গো করিতে চুম্বন!
কল্পনা, থাম গো থাম, কোথায়— কোথায় যাও নিয়ে?
ক্ষুদ্র এ পৃথিবী, দেবি, কোন্‌খেনে রেখেছি ফেলিয়ে?
মাটির শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা যে গো রয়েছে চরণ,
যত উচ্চে আরোহিব তত হবে দারুণ পতন!
কল্পনার প্রলোভনে নিরাশার বিষ ঢাকা,
শূন্য অন্ধকার মেঘে সন্ধ্যার কিরণ মাখা,
সেই বিষ প্রাণ ভোরে সখি লো করিনু পান—
মন হ'য়ে গেল, সখি, অবসন্ন— ম্রিয়মাণ।

মুরলা। কবি গো, ও-সব কথা ভেবো নাকো আর,
শ্রান্ত মাথা রাখ এই কোলেতে আমার।

কবি। সখি, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন
হাহা করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে!
পারি নে, পারি নে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমিসম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই, যেদিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য— শূন্য— মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে, সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী-সম!
কে আছে, অজস্র স্রোতে প্রণয় অমৃত ভরি
অবসন্ন এ হৃদয় তুলিবে সজীব করি!
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়—
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি।

মুরলা। [স্বগত] হা কবি, ও হৃদয়ের শূন্য পুরাইতে
অভাগিনী মুরলা গো কি না পারে দিতে!
কি সুখী হতেম, যদি মোর ভালোবাসা
পুরাতে পারিত তব হৃদয়পিপাসা!
শৈশবে ফুটে নি যবে আমার এ মন
তরুণ-প্রভাত-সম, কবি গো, তখন
প্রতিদিন ঢালি ঢালি দিয়েছ, শিশির—
প্রতিদিন যোগায়েছ শীতল সমীর!
তোমারি চোখের 'পরে করুণ কিরণে
এ হৃদি উঠেছে ফুটি তোমারি যতনে!
তোমারি চরণে, কবি, দেছি উপহার,
যা কিছু সৌরভ এর তোমারি— তোমার।

[প্রকাশ্যে] তোল কবি, মাথা তোল, ভেবো না এমন—
দুজনে সরসীতীরে করিগে ভ্রমণ।
ওই চেয়ে দেখ, কবি, তটিনীর ধারে
মধ্যাহ্নকিরণ লয়ে বনদেবী স্তব্ধ হয়ে
দিতেছে বিবাহ দিয়া আলোকে আঁধারে।
সাধের সে গান তব শুনিবে এখন ?
তবে গাই, মাথা তোল, শোন দিয়ে মন।

গান

কত দিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত খেলিয়াছি খেলা,
ফুল তুলিয়াছি কত দুইটি আঁচল ভোরে !
ছিনু সুখে যত দিন দুজনে বিরহহীন
তখন কি জানিতাম ভালোবাসি তোরে ?
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,
ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী,
তখন জানিনু, সখি, কত ভালোবাসি।

দ্বিতীয় সর্গ

ক্রীড়াকানন। নলিনী ও সখীগণ

নলিনী। সখি ! অলকচিকুরে কিশলয়-সাথে
একটি গোলাপ পরায়ে দে।
চারু ! দেখি ও আরশীখানি ;
বালা ! সিঁথিটি দে তো লো আনি ;
লীলা ! শিথিল কুন্তল দেখ্ বার বার
কপোলে দুলিয়া পড়িছে আমার,
একটু এপাশে সরায়ে দে।
সুরুচি। মাধবী ! বল্ তো মোরে একবার
আজিকে হ'ল কি তোর !
কতখন ধ'রে গাঁথিছিস্ মালা
এখনো কি শেষ হ'ল না তা বালা ?
এক মালা গেঁথে করিবি না কি লো
সারাটি রজনী ভোর ?

অনিলের হবে ফুলশয্যা আজ,
সাঁঝের আগেই শেষ করি সাজ
সব সখী মিলি যেতে হবে সেথা
তা কি মনে আছে তোর ?

অলকা। মরি মরি কিবা সাজাবার ছিরি,
চেয়ে দেখ্ একবার !
সখীর অমন ক্ষীণ দেহমাঝে
কমলফুলের মালা কি লো সাজে ?
বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া
কমলের ফুলহার !

নলিনী। ওই দেখ্, সখি, দাঁড়ের উপরে
মাথাটি গুঁজিয়া পাখার ভিতরে
শ্যামাটি আমার— সাধের শ্যামাটি
কেমন ঘুমায়ে আছে !
আন্ সখি ওরে কাছে !
গান গেয়ে গেয়ে, তালি দিয়ে দিয়ে,
ঘিরে বসি ওরে সকলে মিলিয়ে—
দেখিব কেমন ফিরে ফিরে ফিরে
তালে তালে তালে নাচে।

শ্যামার প্রতি গান

নাচ্, শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতসুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
নাচ্, শ্যামা, নাচ্ তবে !

নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে ?
বনে তোর পাখি আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মতো
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমলকরের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস্ কবে ?
নাচ, শ্যামা, নাচ তবে !

বন্দী বলে তোর কিসের দুখ ?
বনে বল্‌ তোর কি ছিল সুখ ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই
আছে লোক কত শত
যারা, শ্যামা, তোর মতো
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায় !
এই গীতরবে হয়ে ভরপূর
শুনি শুনি এই চরণনূপুর
জনম জনম নাচিতে চায় !

সাধ করে ধরা দেয় গো তারা,
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা,
ফিরেও দেখি নে— ফিরেও চাহি নে—
বড়ো জ্বালাতন করে গো যখন
অশরীরী বাজ করি বরিষণ—
উপেখা-বাণের ধারা !
তবে দেখ্‌, পাখি, তোর
কেমন ভাগ্যের জোর !
বড়ো পুণ্যফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা !
আয় পাখি, আয় বুকে !
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্‌ নাচ্‌ নাচ্‌ সুখে !
বড়ো দুখ মনে, বনের বিহগ,
কিছু তুই বুঝিলি না !
এমন কপোল অমিয়মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্‌ কি না !
প্রতি পাখা তোর উঠে নি শিহরি ?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না ?
নাচ্‌ নাচ্‌ তালে তালে !
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্‌, শ্যামা, তালে তালে !

দামিনী । শুনেছিস সখি, বিবাহসভায়
বিনোদ আসিবে আজ !
ভালো করে কর্‌ সাজ !

নলিনী। আহা মরে যাই কি কথা বলিলি,
শুনিয়া যে হয় লাজ !
বিনোদ আসিবে আজ ?
এ বারতা দিয়ে কেন, লো সজনি,
মাথায় হানিলি বাজ ?
সারাখন মোর সাথে সাথে ফিরে
ক্ষান্ত নহে একটুক,
মুখখানা তার দেখিবারে পাই
যে দিকে ফিরাই মুখ !
এক-দৃষ্টে হেন রহে সে তাকায়ে
থেকে থেকে ফেলে শ্বাস,
মুখেতে আঁচল চাপিয়া চাপিয়া
রাখিতে পারি নে হাস !

লীলা। শুনেছি প্রমোদ আসিবে, যাহারে
ভ্রমর বলিয়া ডাকি—
যাহারে হেরিলে হরষে তোমার
উজলিয়া উঠে আঁখি।

নলিনী। গা ছুঁয়ে আমার বল্, লো সজনি,
সত্য সে আসিবে নাকি ?
দেখ্ দেখি সখি, অভাগীর তরে
কোথাও নিস্তার নাই,
মরি মরি কিবা ভ্রমর আমার !
ভ্রমরের মুখে ছাই !
সে ছাড়া ভ্রমর আর কি নাই ?
তা হলে এখনি— সখি রে, এখনি
নলিনী-জনম ঘুচাতে চাই !

চারুশীলা। লুকাস্ নে মোরে, আমি জানি সখি,
কে তোমার মনোচোর।
বলিব ? বলিব ? হেথা আয় তবে,
বলি কানে কানে তোর !

[কানে কানে কথা]

নলিনী। জ্বালাস্ নে চারু, জ্বালাস্ নে মোরে,
করিস্ নে নাম তার !
সুরেশ ?— তাহার জ্বালায়, সজনি,
বেঁচে থাকা হ'ল ভার !
কে জানিত আগে বল্ তো, সখি লো,
রূপের যাতনা অতি ?
সাধ যায় বড়ো কুরূপা হইয়া
লভি শান্তি এক রতি !
[লীলার প্রতি জনান্তিকে]

মাধবী। শোন্ বলি লীলা, জানি কারে সখি
মনে মনে ভালো বাসে।
দেখিনু সেদিন বিজয়ের সাথে
বসি আছে পাশে পাশে।
মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা,
কভু লাজে শির নত,
কভু ল'য়ে কেশ বেণী ফেলি খুলে—
জড়ায়ে জড়ায়ে মৃণাল আঙ্গুলে
আনমনে খেলে কত!
কখন বা শুনে অতি একমনে
বিজয়ের কথাগুলি,
শুনিতে শুনিতে শির নত করি
তুলি কুঁড়ি এক কতখন ধরি
খুলি খুলি দেয় মুদিত পাপড়ি,
ফুটাইয়া তারে তুলি।
কভু বা সহসা উঠিয়া যায়,
কভু বা আবার ফিরিয়া চায়—
মৃদু মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ করে
উঠে এক গান গেয়ে!
এমন মধুর অধীরতা তার!
এমন মোহিনী মেয়ে!

বিনো। সখি লো, তা নয়, কতবার আমি
দেখিয়াছি লুকাইয়া
অশোকের সাথে বসি আছে একা
প্রমোদকাননে গিয়া!
জানি আমি তারে হেরিলে সখীর
সুখে নেচে উঠে হিয়া।

নলিনী। হেথা আয় তোরা, দে দেখি সাজায়ে
শ্যামা পাখিটিরে মোর!
দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়,
বেলকুঁড়ি-মালা কেমন মানায়
সুগোল গলায় ওর!
ওই দেখ্ সখি! দেখি নি কখনো
এমন দুরন্ত পাখি!
যতগুলি ফুল দিলেম পরায়ে
সবগুলি দেখ্ ফেলেছে ছড়ায়ে,
শত শত ভাগে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া
একটি রাখে নি বাকি!
ভালো, পাখি যদি না চায় সাজিতে
আমারে সাজা লো তবে।

চারু। তোর সাজ ফুরাইবে কবে?

লীলা। সখি, আবার কিসের সাজ!
সুরুচি। দেখ্, এসেছে হইয়া সাঁঝ।
নলিনী। দেখ্ লো সুরুচি, লীলা ভালো করে
বাঁধিতে পারে নি চুল—
এই দেখ্ হেথা পরায়ে দিয়াছে
অলকে শুকানো ফুল।
বেণী খুলে চুল বেঁধে দে আবার,
কানে দে পরায়ে দুল।
সুরুচি। না লো সখি, দেখ্, আঁধার হতেছে,
দেরি হয়ে যায় ঢের—
চল্ ত্বরা করে যাই দেখিবারে
ফুলশয্যা অনিলের।
অলকা। এতখনে, সখি, এসেছে সেথায়
যতেক গ্রামের লোক।
দামিনী। [হাসিয়া] এসেছে বিনোদ!
লীলা। [হাসিয়া] এসেছে প্রমোদ!
বিনো। [হাসিয়া] এসেছে সেথা অশোক!
মাধবী। [হাসিয়া] এসেছে বিজয়!
চারু। [চিবুক ধরিয়া] সুরেশ রয়েছে
পথ চেয়ে তোর তরে!
অলকা। আয় তবে ত্বরা করে!
নলিনী। ভালো, সখি, ভালো, চল্ তবে চল্—
জ্বালাস্ নে আর মোরে!

তৃতীয় সর্গ

মুরলা ও অনিল

অনিল। ও হাসি কোথায় তুই শিখেছিলি বোন?
বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।
অতি ঘন মেঘমালা ভেদি স্তরে স্তরে, বালা,
সায়াহ্ন জলদপ্রান্তে দেয় যথা দেখা
ম্লান তপনের মৃদু কিরণের রেখা।
কত ভাবনার স্তর ভেদ করি পর পর
ওই হাসিটুকু আসি পঁহুছে অধরে!
ও হাসি কি অশ্রুজলে সিক্ত থরে থরে?
ও হাসি কি বিষাদের গোধূলির হাস?

ও হাসি কি বরষার   সুকুমারী লতিকার
ধৌতরেণু ফুলটির অতি মৃদু বাস ?
মুরলা রে, কেন আহা, এমন তু' হলি !
এত ভালোবাসা কারে দিলি জলাঞ্জলি ?
যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
আপনারি ভাব নিয়া   উলটিয়া পালটিয়া
দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে আঁকিতেছে— শতবার দেখিতেছে—
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে   চাহিয়া আকাশ-পানে,
আঁখি যার অনিমিষ আকাশের প্রায়,
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী, লুটাইয়া পড়িলি কি বলে ?
সে কি রে, অবোধ মেয়ে   বারেক দেখিবে চেয়ে ?
জানিতেও পারিবে না, যাইবে সে চ'লে
যূথিকাহৃদয় তোর ধূলি-সাথে দ'লে।
এত ভালোবাসা তারে কেন দিলি হায় ?
সাগর-উদ্দেশ-গামী তটিনীর পায়
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া যথা অবহেলে
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী দেয় আপনারে ঢেলে।
নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর
শূন্য হৃদয়ের তাপে হইয়া অধীর
কুসুমকানন দিয়া যায় যবে বয়ে
আকুল রজনীগন্ধা কথাটি না কয়ে
প্রণের সুরভি সব দিয়া তার পায়
পরদিন বৃন্ত হতে ঝরে পড়ে যায়।
মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কি রে সারাটি যৌবন ?
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে দীন অতিশয়—
আপনার পানে তবে   চাহিয়া দেখিবি যবে
দেখিবি জীবনদিন সন্ধ্যা হয় হয় !
যে মেঘ-মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘমাঝে থাকি অস্ত গেলি রাতে।

মুরলা।   কী জানি কেমন
মুরলার সুখের কি দুঃখের জীবন !
সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে
রেখেছে সায়াহ্ন করি এ শান্ত হৃদয়ে।
হেন আলিঙ্গনে তারা রয়েছে সদাই
যেন তারা দুটি সখা, যেন দুটি ভাই।

জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন
তেমনি মিলিয়া তারা রয়েছে দুজন।
সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা,
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।
একা যবে বসে থাকি স্তব্ধ জোছনায়,
বহে বাতায়ন-পানে নিশীথের বায়,
বড়ো সাধ যায় মনে যারে ভালোবাসি
একবার মুহূর্ত সে বসে কাছে আসি,
দুটি শুধু কথা কহে— একটু আদর—
সেই স্তব্ধ জোছনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়
মরিয়া যাই গো তারি বুকের উপর।
যখনি কবিরে দেখি সব যাই ভুলে,
কিছুই চাহি না আর— কিছুই ভাবি না আর—
শুধু সেই মুখে চাই দুটি আঁখি তুলে।
দেখি দেখি— কী যে দেখি, কী বলিব কী সে!
হৃদয় গলিয়া যায় জোছনায় মিশে।
জোছনার মতো সেই বিগলিত হিয়া
প্রাণের ভিতরে ধরি একেবারে মগ্ন করি
কবিরে চৌদিকে যেন থাকে আবরিয়া।
মনে মনে মন যেন কাঁদিয়া দু-করে
কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে,
আঁখি মুদি "কবি! কবি!" বলে শতবার—
শতবার কেঁদে বলে "আমার! আমার!"
"আমার আমার" যেন বলিতে বলিতে
চাহে মন একেবারে জীবন ত্যজিতে!
সুখেতে কি দুখে যেন ফেটে যায় বুক—
সুখ বলে দুখ আমি, দুখ বলে সুখ।
কোথা কবি, কোথা আমি! সে যে গো দেবতা—
তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা?
কবি যদি ভুলে কভু মোরে ভালোবাসে
তা হলে যে ম'রে যাব সংকোচে উল্লাসে।
চাই না চাই না আমি প্রণয় তাঁহার,
যাহা পাই তাই ভালো স্নেহসুধাধার।
শুকতারা স্নেহমাখা করুণ নয়ানে
চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে,
তেমনি চাহেন যদি কবি স্নেহভরে
মুরলার ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের 'পরে
তাহা হলে নয়নের সামনে তাঁহার
হাসিয়ে ফুরায়ে যাবে জীবন আমার।

অনিল। স্বার্থপর, আপনারি ভাবভরে ভোর,
আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর?

সর্বস্ব তাহারি পদে দিয়া বিসর্জন
কাঁদিয়া মরিছে এক দীনহীন মন,
ইহাও কি পড়িল না নয়নে তাহার ?
আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার ?
নিশ্চয় দেখেছে, তবু দেখেও দেখে নি।
দেখেছে সে— নিরুপায় নিতান্তই অসহায়
ভালোবাসিয়াছে এক অভাগা রমণী।
দেখেছে— হৃদয় এক ফাটিয়া নীরবে
একান্ত মরিবে, তবু কথা নাহি কবে !
দেখেও দেখে নি তবু, পশু সে নির্দয় !
ভাঙিয়া দেখিতে চাহে রমণীহৃদয়।
শতধা করিতে চায় মন রমণীর,
দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।
এমন সুন্দর মন মুরলা তোমার—
এমন কোমল, শান্ত, গভীর, উদার—
ও মহান্ হৃদয়েতে প্রেমজলধির
নাই রে দিগন্ত বুঝি, নাই তার তীর।
করিস নে, করিস নে ও হৃদি বিনাশ !
যৌবনেই প্রণয়েতে হোস নে উদাস !
কহিগে প্রণয় তোর কবির সকাশে,
শুধাইগে ভালো তোরে বাসে কি না বাসে।
ভালো যদি নাই বাসে কেন সেই জন
মিছা স্নেহ দেখাইয়া বেঁধে রাখে মন ?
না যদি করিতে পারে তোরে আপনার,
আপনার মতো কেন করে ব্যবহার ?
কথা নাহি কহে যেন, না করে আদর,
পরের মতন থাকে— দেখে তোরে পর !
নিরদয়-দয়া তোরে নাই বা করিল !
শত্রুতার ভালোবাসা নাই বা বাসিল !
মুহূর্তসুখের তোরে দিয়া প্রলোভন
অসুখী করিবে কেন সারাটি জীবন ?
দু-দণ্ডের আদরেতে কভু ভুলিস না !
আধেক সুখেতে কভু পূরে না বাসনা।
এখনি চলিনু তবে তার কাছে যাই,
ভালোবাসে কি না বাসে শুধাইতে চাই।

মুরলা। মনে করেছিনু, ভাই, এ প্রাণের কথা
কাহারেও বলিব না যত পাই ব্যথা।
সেদিন সায়াহ্নকালে উচ্ছ্বসি উঠিয়া
বড়ো নাকি কেঁদে মোর উঠেছিল হিয়া,
তাই আমি পাগলের মতো একেবারে
ছুটিয়া তোমারি কাছে গেনু কাঁদিবারে।

উচ্ছ্বসি বলিনু যত কাহিনী আমার !
কেন রে বলিলি হা রে, দুর্বল, অসার ?
ভালোবাসিতেই যদি করিলি সাহস,
লুকাতে নারিস তাহা হা হৃদি অবশ ?
পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল
আশ কি মেটে না তোর রে আঁখি দুর্বল ?
মুরলা রে, অভাগী রে, কেন ভালোবাসিলি রে ?
যদি বা বাসিলি ভালো কেন তোর মন
হ'ল হেন নীচ হীন, দুর্বল এমন ?
একটি মিনতি আজি রাখ গো আমার !
সহস্র যাতনা পাই আর কখন তো, ভাই,
ফেলিব না তব কাছে অশ্রুবারিধার—
যেও না কবির কাছে ধরি তব পায়,
ভুলে যাও যত কথা কহেছি তোমায় !
দয়া করে আরেকটি কথা মোর রাখ,
যদি গো কবির 'পরে রোষ করে থাক
মোর কাছে কভু আর কোরো নাকো নাম তাঁর—
সে নাম ঘৃণার স্বরে কভু সহিব না !
জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা !

অনিল। তবে কি এমনি শুধু মিছে ভালোবেসে
শূন্য এ জীবন তোর ফুরাইবে শেষে !

মুরলা। যায় যদি যাক্ ভাই, ফুরায় ফুরাক,
প্রভাতে তারার মতো মিশায় মিশাক—
মুরলার মতো ছায়া কত আসে কত যায়,
কী হয়েছে তায় !
অবোধ বালিকা আমি, মিছে কষ্ট পাই—
এ জীবনে মুরলার কোনো কষ্ট নাই !
স্নেহের সমুদ্র সেই কবি গো আমার—
অনন্ত স্নেহের ছায়ে আমারে রেখেছে পায়ে,
তাই যেন চিরকাল থাকে মুরলার !
সে স্নেহের কোলে শুয়ে কাটায় জীবন !
সে স্নেহের কোলে প্রাণ করে বিসর্জন !
কুসুমিত সে অনন্ত স্নেহরাজ্য-'পরে
তিল স্থান থাকে যেন মুরলার তরে !
যত দিন থাকে প্রাণ— ব্যাপি সেইটুকু স্থান
মাটিতে মিশায়ে রবে হৃদয় আমার।
কোনো— কোনো— কোনো সুখ নাহি চাহি আর।

'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

চতুর্থ সর্গ

কবি

প্রথম গান

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে
একটি মধুর মুখ।
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি!
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।

দ্বিতীয় গান

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া,
দেখি সেই মুখখানি—
কুসুমমাঝারে রয়েছে ফুটিয়া
কুসুমগুলির রানী!
আপনা-আপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আনমন হয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছুখন সেইখানে।
আর কিছু নহে, এ ভাব আমার
কবির সৌন্দর্যতৃষা,
কলপনা-সুধা-বিভল কবির
মনের মধুর নেশা!
গোলাপের রূপ, বকুলের বাস,
প্যাপিয়ার বনগান,
সৌন্দর্যমদিরা দিবস রজনী
করিয়া করিয়া পান

শিথিল হইয়া পড়েছে হৃদয়—
নয়নে লেগেছে ঘোর—
বিকশিত রূপ বড়ো ভালো লাগে
মুগধ নয়নে মোর !

তৃতীয় গান

প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি ?
আলিঙ্গিতে গ্রীবা তার লতাগুলি চারি ধার
আছে শত বাহু তুলি শত ফুলহারে সাজি ।
দূর-বন হতে ছুটি আসিয়া প্রভাতবায়
সে বয়ান না দেখিয়া শূন্য বাতায়ন দিয়া
প্রবেশি আঁধার গৃহে করিতেছে হায় হায় !
কতখন— কতখন— কত খন ভ্রমি একা,
গনিনু ফুলের দল, মাটিতে কাটিনু রেখা ।
কতখন— কতখন— গেল চলি কতখন—
খনে খনে দেখি চাহি, তবু না পাইনু দেখা !
ফিরিনু আলয়মুখে, চলিনু আপন মনে,
চলিতে চলিতে ধীরে ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে
বার বার এসে পড়ি সেই— সেই বাতায়নে !
নিরাশ-আশার মোহে চেয়ে দেখি বার বার,
শূন্য— শূন্য— শূন্য সব বাতায়ন অন্ধকার !
ফুলময় বাহু দিয়া আঁধারকে বুকে নিয়া
আঁধারকে আলিঙ্গিয়া রয়েছে সে লতাগুলি,
তবু ফিরি ফিরি সেথা আসিলাম ভুলি ভুলি !
তেমনি সকলি আছে— বাতায়ন ফুলে সাজি,
দুলিছে তেমনি করি বাতাসে কুসুমরাজি !
শুধু এ মনে আমার এক কথা বার বার
এক সুরে মাঝে মাঝে উঠিতেছে বাজি বাজি—
"প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি ?
কেন না দেখিনু তারে, কেন না দেখিনু আজি ?"
অতিধীর পদক্ষেপে আলয়ে আসিনু ফিরি,
শতবার আনমনে বলিলাম ধীরি ধীরি—
"প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি ?"

চতুর্থ গান

কাল যবে দেখা হ'ল পথে যেতে যেতে চলি
মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি ?
অজানা পথিকে হেরি এত কি সরম হবে ?
কি যেন গো কথা আছে, আটকিয়া রহিয়াছে !
আধ-মুদা দুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে !

সরম না হয় যদি, এ ভাব কিসের তবে ?
কাল তাই বোসে বোসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
স্বপনে দেখেছি তার ঢ'লে-পড়া দু-নয়ন !
প্রভাতে বসিয়া আজ ভাবিতেছি নিরিবিলি—
"মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি ?"

পঞ্চম গান

সত্য কি তাহারে ভালোবাসি ?
ভুলিনু কি শুধু তার দেখে রূপরাশি ?
স্বপনে জানি না তার হৃদয় কেমন,
সহসা আপনা ভুলে— শুধু কি রূপসী ব'লে
জীবন্তপুত্তলী-পদে বিসর্জিনু মন ?

ষষ্ঠ গান

মোর এ যে ভালোবাসা রূপমোহ এ কি ?
ভালো কি বেসেছি শুধু তার মুখ দেখি ?
মুখেতে সৌন্দর্য তার হেরিনু যখনি
তখনি কি মন তার দেখিতে পাই নি ?
মধুর মুখেতে তার আঁখি-দরপণে
মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কল্পনানয়নে !
সেই যে মুখানি তার মধুর-আকার
বেড়াতেছে খেলাইয়া হৃদয়ে আমার !
কত কথা কহিতেছে হরষে বিভোর,
কত হাসি হাসিতেছে গলা ধরে মোর !
কি করিয়া হাসে আর কি ক'রে সে কয়,
কি ক'রে আদর করে ভালোবাসাময়,
মুখানি কেমন হয় মৃদু অভিমানে,
সকলি হৃদয় মোর না জানিয়া জানে !
যেন তারে জানি কত বর্ষ অগণন,
এ হৃদয়ে কিছু তার নহে গো নূতন !
মুখ দেখে শুধু ভালোবেসেছি কি তারে ?
মন তার দেখি নি কি মুখের মাঝারে ?

সপ্তম গান

দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পারে !
কবিতা আমার যত সুধীরে শুনাই তারে !
দোঁহে মিলি একপ্রাণ গাহিতেছি এক গান,
দু জনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
দু জনে দু জন-পানে চেয়ে থাকি অনিমিষে,

দু জনের আঁখি হতে দু জনে মদিরা পিয়া
আসিবে অবশ হয়ে দোঁহার বিভল হিয়া !
মুখে কথা ফুটিবে না, আঁখিপাতা উঠিবে না,
আমার কাঁধের পরে নোয়াবে মাথাটি তার—
দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পার !

অষ্টম গান

শুনেছি— শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি— শুনেছি তাহা !
নলিনী— নলিনী— নলিনী— নলিনী—
কেমন মধুর আহা !
নলিনী— নলিনী— বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম !
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী— নলিনী— নলিনী নাম !
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তার নলিনী— নলিনী—
নলিনী বলে গো তাকে !
নামেতে কি যায় আসে ?
রূপেতে কি যায় আসে ?
হৃদয় হৃদয় দেখিবারে চায়
যে যাহারে ভালোবাসে !
নলিনীর মতো হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম—
কোমল— কোমল— কোমল অতি—
যেমন কোমল নাম !
যেমন কোমল তেমনি বিমল,
তেমনি সুরভধাম !
নলিনীর মতো হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম !

পঞ্চম সর্গ

কানন

রাত্রি

অনিল ললিতা। নলিনী ও সখীগণ। বিজয় সুরেশ বিনোদ প্রমোদ অশোক নীরদ

কাননের এক পাশে ললিতার প্রতি অনিলের গান

বউ! কথা কও!

সারাদিন বনে বনে ভ্রমিছি আপন মনে,
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়ো— বউ, কথা কও!
শুন লো, বকুল-ডালে লুকায়ে পল্লবজালে
পিক-সহ পিকবধূ মুখে মুখ মিলায়ে
দু জনেতে এক প্রাণ গাহিতেছে এক গান,
রাশি রাশি স্বরসুধা বাতাসেরে বিলায়ে।
সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া
সন্ধ্যাকালে নীড়ে ফিরে আসিয়াছে পাপিয়া।
প্রিয়ারে না দেখি তার ঢালিতেছে স্বরধার
অধীর বিলাপ তার লতাপাতা-ভিতরে,
গলি সে আকুল ডাকে বসি অতি দূর-শাখে
প্রাণের বিহগী তার "যাই যাই" উতরে।
অতি উচ্চ শাখে উঠি দেখ লো কপোত দুটি
মুখে মুখে কানে কানে কত কথা বলিছে,
বুকে বুক মিলাইয়া চঞ্চুপুট বুলাইয়া,
কপোতী সে কপোতের আদরেতে গলিছে!
এসো প্রিয়ে, এসো তবে মধুর—মধুর রবে
জুড়াও শ্রবণ মোর— বউ! কথা কও!
যদি বড়ো হয় লাজ আমার বুকের মাঝ
পাখার ভিতরে মুখ লুকাও তোমার!
অতি ধীরে মৃদু-মধু বুকের কাছেতে, বধূ,
দু-চারিটি কথা শুধু বল একবার!

[কিছুক্ষণ থামিয়া] তবে কি কবে না কথা, পূরাবে না আশা?
ভালো ভালো, কোয়ো নাকো, মুখ ফিরাইয়া থাকো,
বুঝিনু আমার পরে নাই ভালোবাসা।

ললিতা। [স্বগত] কি কহিব কথা সখা? কহিতে না জানি!
বুদ্ধি নাই— ক্ষুদ্র নারী— ফুটেনাকো বাণী।
মনে কত ভাব যুঝে, হৃদয় নিজে না বুঝে,
প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায়।
হৃদয়ে যে ভাব উঠে হৃদয়ে মিলায়।
তবে কি কহিব কথা— ভেবে নাহি পাই—
কথা কহিবার, সখা, ক্ষমতা যে নাই!
কি এমন কথা কব ভালো যা লাগিবে তব?

তুমি গো শুনাও মোরে কাহিনী বিরলে,
এক মনে শুনি আমি বসি পদতলে।
মাথার উপর দিয়া তারাগুলি যত
একটি একটি করি হবে অস্তগত।
শ্রান্তি তৃপ্তি নাহি জানি ও মুখের প্রতি বাণী
তৃষিত শ্রবণে মোর শুনিতে শুনিতে
কখন প্রভাত হ'ল নারিব জানিতে।

অনিল। জান তো— জান তো, সখি, মানুষের মন ?
যে কথা সে ভালোবাসে শত শতবার তা সে
ঘুরে ফিরে শুনিবারে চায় প্রতিক্ষণ।
জানি ভালোবাস তুমি, ললিতা, আমারে—
তবু, সখি, প্রতিক্ষণে বড়ো সাধ যায় মনে
বাহিরে সে প্রেমের প্রকাশ দেখিবারে।
দু-দিনে নীরব প্রেম হয় পুরাতন।
বিচিত্রতা নাহি তায়, শ্রান্ত হয় মন।
আদরতরঙ্গ-মালা নিয়ত যে করে খেলা,
তাইতে দেখায় প্রেম নিয়ত-নূতন।
নিত্য নব নব উঠি আদরের নাম
নিয়ত নবীন রাখে প্রণয়ের ধাম।
আদর প্রেমের, সখি, বরষার জল—
না পেলে আদর-ধারা হয় সে যে বলহারা,
ভূমে নুয়াইয়া পড়ে মুমূর্ষু বিকল।
ওকি বালা, কেন হেন কাতর নয়ানে
এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ভূমিতল-পানে !
হাসিতে হাসিতে, সখি, দুটা ক্ষুদ্র কথা
কহিনু, তা'তেই মনে পেয়েছে কি ব্যথা ?

ললিতা। [স্বগত] একা বসে ভাবিয়াছি কত— কতবার,
কোনো গুণ নাই মোর, কি হবে আমার ?
হা ললিতা ! কি করিস্— দেখিস্ না চেয়ে ?
শুধু দুটা কথা হা— রে— পারিস্ না কহিবারে ?
দুটা আদরের কথা— বুদ্ধিহীন মেয়ে !
দেখিস্ না— দুটা কথা কহিলি না ব'লে,
আদরের ধন তোর— প্রাণের সর্বস্ব ; তোর
হারায়— হারায় বুঝি— যায় বুঝি চলে !
শুধু দুটা কথা তুই কহিলি না ব'লে !
কি কহিবি ! হা অবোধ, ভাবনা কি তায় !
মুক্তকণ্ঠে বল্ মন যা বলিতে চায় ?—
মনের গোপন ধামে ডাকিস যে শত নামে
সেই নাম মুখ ফুটে ডাক্ রে তাহার !
একবার প্রাণ খুলে বল্ প্রাণেশ্বরে—

"মোর প্রেম, চিন্তা, আশা সব তোমা-'পরে ;
নির্বোধ নির্গুণ ব'লে— নাথ— স্বামী— প্রভু,
অসহায় অবলারে ত্যজিও না কভু !"
দিবস রজনী ভুলি বুকে তারে রাখ্ তুলি,
"ভালোবাসি" "ভালোবাসি" বল্ শতবার,
আলিঙ্গনে বেঁধে বেঁধে হৃদয় তাহার !
কিন্তু লজ্জা ?— দূর হ রে— লজ্জা, দূর হ রে—
বিষময় বাহু তোর বাঁধি বাঁধি শত ডোর
জীর্ণ করিয়াছে মোর মন স্তরে স্তরে !
আর না— আর না লজ্জা— দূর হ এখন !
চূর্ণ চূর্ণ ভেঙে আর ফেলিস না মন !
শিথিল করে দে তোর শতেক বন্ধন-ডোর,
মুহূর্তের তরে মুখ তুলি একবার—
বন্ধনজর্জর মন শুধু রে মুহূর্ত ক্ষণ
বাহিরে বাতাসে গিয়া বাঁচুক আবার !
অনিল। আজি শুভদিনে ওকি অশ্রুবারিপাত ?
অশ্রুজলে কাটাবে কি ফুলশয্যা-রাত ?

কাননের অপর পার্শ্বে

অভিমান করিয়া বিজয়ের প্রতি

নলিনী। মিছে বোলোনাকো মোরে ভালোবাস ভালোবাস !
নয়নেতে ঝরে বারি হৃদয়ে হৃদয়ে হাস !
সারহীন— ভাবহীন দুটা লঘু কথা ব'লে—
হেসে দুটা মিষ্ট হাসি, দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে,
শূন্য রসিকতা করি দুই দণ্ড কাল হরি'
সরলহৃদয় চাহ লভিবারে অবহেলে !
অবশেষে আড়ালেতে কহো হাসি হাসি কত
রমণীর ক্ষুদ্র মন লঘু তৃণটির মতো !
ভালোবাসা খেলা নয়, খেলেনা নহে গো হৃদি,
নারী ব'লে মন তার দলিতে সৃজে নি বিধি !
ভালো যদি বাস, তবে ভালোবাস প্রাণপণে—
ক্ষুদ্র মনে ক'রে খেলা করিও না মোর সনে !
হৃদয়ের অশ্রু ফেল দিবানিশি পদতলে,
মিছা হাসিও না হাসি— কথা কহিও না ছলে !
বিজয়। কেন বালা, আমি তো লো দিনরাত্রি ভুলে
অশ্রু ঢালিয়াছি তব প্রেমতরুমূলে,
আজিও তো কিছু তার হয় নিকো ফল,
ব্যর্থ হইয়াছে মোর এত অশ্রুজল !
নলিনী। ওই যে সুরুচি হোথায় আছে,
যাই একবার তাহার কাছে !
[দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া] দেখি নি এমন জ্বালা !

হাত হতে খসি পড়েছে কোথায়
বেল ফুলে গাঁথা বালা !
[সহসা উপরে চাহিয়া] ওই দেখ হোথা কামিনী-শাখায়
ফুটেছে কামিনীগুলি—
পাতাগুলি সাথে দু-চারিটি, সখা,
দাও-না আমারে তুলি !

বিজয়। কি পাইব পুরস্কার ?

নলিনী। পুরস্কার ?— মরি লাজে !
একটি কুসুম যদি ঠাঁই পায়
আমার অলকমাঝে—
একটি কুসুম নুয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল-'পরে,
একটি পাপড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুধু মুহূর্তের তরে,
ভুলে যদি রাখি একটি কুসুম
রচিতে এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব
আর কিবা পুরস্কার !

বিজয়ের ফুল তুলিয়া দেওন ও তাহা
চরণে দলিয়া

নলিনী। এই তব পুরস্কার !
অনুগ্রহ করি এ চরণ দিয়া
ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া,
এই তব পুরস্কার !

বিজয়। আহা ! আমি যদি হতেম, সজনি,
একটি কুসুম ওর—
ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যজিতাম দেহ মোর !
গাছের দিকে চাহিয়া নলিনীর

মৃদুস্বরে গান

খেলা কর্— খেলা কর্—
তোরা কামিনী-কুসুমগুলি !
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুসুমগুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার— ফিরায়ে ও ধার
দুইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি !
তোরা খেলা কর্— তোরা খেলা কর্
কামিনী-কুসুমগুলি।

কভু পাতা-মাঝে লুকা রে মুখ,
কভু বায়ু-কাছে খুলে দে বুক—
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্ কভু নাচ্
বায়ু-কোলে দুলি দুলি !
দু-দণ্ড বাঁচিবি— খেলা' তবে খেলা',
প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
ত্যেজিবি ভাবনা ভুলি !

অশোক । [দূর হইতে দেখিয়া]
ওই যে হোথায় নলিনী রয়েছে
বসি বিজয়ের সাথে ।
কত কাছাকাছি !— কত পাশাপাশি !
হাত রাখি তার হাতে !
অসার হৃদয়, লঘু, হীন মন
কোনো গুণ নাই যার—
শুধু ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
তারে দেহ আপনার ?
কতবার, প্রেম, যাস্ পলাইয়া
ভয়ে ফুলডোর দেখি—
ধনের সোনার শিকল হেরিয়া
আজ ধরা দিলি একি ?

সুরেশ । খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাই না দেখিতে
নলিনী কোথায় আছে ।
ওই যে হোথায় লতাকুঞ্জতলে
বসিয়া বিজয়-কাছে !
কি ভয় হৃদয় ! জানি গো নিশ্চয়
সে আমারে ভালোবাসে,
মন তার আছে আমারি কাছেতে
থাকুক সে যার পাশে !

বিনোদ । কথা শুনে তার— ভাব দেখে তার
কতবার ভাবি মনে—
নলিনী আমার— আমারেই বুঝি
ভালোবাসে সংগোপনে !
সত্য হয় যদি আহা !
সে আশ্বাসবাণী, সে হাসি মধুর,
সত্য যদি হয় তাহা !

নীরদ । কে আমার সংশয় মিটায় !
কে বলি দিবে সে ভালোবাসে কি আমায় ?
তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গরাশি
এক মুহূর্তের শান্তি কে দিবে গো হায় !
পারি নে পারি নে আর বহিতে সংশয়ভার,

চরণে ধরিয়া তার শুধাইব গিয়া,
হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া !
কিন্তু এ সংশয়ও ভালো, পাছে গো সত্যের আলো
ভাঙে এ সাধের স্বপ্ন বড়ো ভয় গনি—
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি !

নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দূরে গমন, ও নলিনীর
নিকটে গিয়া প্রমোদের গান

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতীবালা,
আছিস কেন ফুটিয়া ?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া !
মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মুখানি !
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখি
লভিয়া তোর সুরভিশ্বাস
যায় না তোরে বাখানি !

নলিনী। [হাসিয়া] শুনিয়া ধীরে মালতীবালা
কহিল কথা সুরভি-ঢালা,—
"আঁধার বনে আছি গো ভালো,
অধিক আশা রাখি না !
তোদের চিনি চতুর অলি,
মনো-ভুলানো বচন বলি
ফুলের মন হরিয়া লয়ে
রাখিয়া যাস যাতনা !
অবলা মোরা কুসুমবালা
সহিব মিছা মনের জ্বালা
চিরটি কাল, তাহার চেয়ে
রহিব হেথা লুকায়ে !
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে !"

অশোকের নিকট গিয়া

অশোক, হোথায় দূরে কেন তুমি
দাঁড়াইয়া এক ধার ?
কত দিন হ'ল আমার কাছেতে
আস নি তো একবার !
ভুলেছ যে প্রেম, ভুলেছ যে মোরে,
তোমার কি দোষ আছে ?
এ মুখ আমার এ রূপ আমার
পুরাতন হইয়াছে ?
ভালো, সখা, ভালো, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে ?
যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়,
বন্ধুত্বে কি দোষ আছে ?
যদি সারাদিন রহিয়া তোমার
প্রাণের রূপসী-সাথে
কোনো সন্ধ্যাবেলা মুহূর্তের তরে
অবকাশ পাও হাতে,
আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে—
এসো একবার তবে !
দু-চারিটা গান গাব সবে মিলি
দু-চারিটা কথা হবে !

অশোক। [স্বগত] পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার
কাছে তার যাবনাকো মুখ দেখিব না আর,
তার মুখ হতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে—
দূরে যেতে এক পদ শুধু বাড়ায়েছি সবে,
অমনি সে কাছে ঢ'লে দু একটি কথা ব'লে
পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধূলিসাৎ করিয়াছে !
শুধু দুটি কথা ব'লে, একবার এসে কাছে !
জানি না কি শুধু সে গো মন ভোলাবার কথা ?
হে হাসি— সে মিষ্টি হাসি— নিদারুণ কপটতা ?
জানে জানে সব জানে— তবু মন নাহি মানে,
প্রতিবার ঘুরে ফিরে তবুও সে যায় তথা।
জেনে শুনে তবু তার ভালো লাগে কপটতা,
সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভুলাবার কথা !
যবে ভুলাবার তরে কপট আদর করে,
মোর মুখপানে চেয়ে গাহে প্রণয়ের গীত,
সাধ করে মন যেন হতে চায় প্রতারিত !
হা হৃদয় ! লঘু, নীচ, হীন— হীন অতি—
খেলেনার 'পরে তোর এতই আরতি ?
কখনো না— কখনো না— হোক যা হবার,
এই যে ফিরানু মুখ ফিরিব না আর !

ধিক্— ধিক্— শিশু-হৃদি ! ধিক্ ধিক্ তোরে—
লজ্জার পাথারে আর ডুবাস্ নে মোরে !
কপট রমণী এক, অধম, চপল,
নির্দয়, হৃদয়হীন, অসার দুর্বল—
দুর্বল হাতে সে তার যেথা ইচ্ছা সেই ধার
টলাইয়ে নুয়াইবে এ মোর হৃদয় ?
তৃণ— শুষ্ক পত্র এক— দুর্বলতা-ময় ?
কাঁদাইবে, হাসাইবে— দূরে যেতে নাহি দিবে—
নিশ্বাসে উড়ায়ে দেবে প্রতিজ্ঞা আমার !
ইচ্ছা, সাধ, চিন্তা, আশা— দুঃখ, সুখ, ভালোবাসা
সমস্ত রাখিবে চাপি পদতলে তার !
শিকলি— পশুর সম— বাঁধিবে গলায় মম,
মুহূর্ত নহিবে শক্তি মাথা তুলিবার—
ধূলিতে পড়িবে লুটি এ মাথা আমার !
হা হৃদয়, কি করিলি ? তুই কি উন্মাদ হলি ?
সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জন !
ধন, মান, যশ, আশা— সখাদের ভালোবাসা,
লুটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ ?
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে ?
কাঁদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইঙ্গিতে ?
খেলেনা হইতে তার ভ্রূকুটি-হাসির ?
কেন এত গেলি গ'লে ! শুধু রূপ আছে ব'লে ?
ক্ষণস্থায়ী জড়রূপ গঠিত মাটির !
কুঞ্চিত-কুন্তল তার, আরক্ত কপোল,
সুদীর্ঘ নয়ন তার কটাক্ষ বিলোল,
তাই কি ত্যজিলি তুই সমস্ত সংসার ?
জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার ?
সমস্ত জগৎ হাসে ধিক্ ধিক্ বলি—
প্রতিক্ষণে আত্মগ্লানি উঠে জ্বলি জ্বলি—
তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া
শুধু তার আঁখি দুটি সুদীর্ঘ বলিয়া ?
কি মদিরা আছে, বালা, নয়নে তোমার !
ফেলেছ বিহ্বল করি হৃদয় আমার !
ফিরাও ফিরাও আঁখি— পাতা দিয়া ফেল ঢাকি—
হৃদয়েরে দূরে যেতে দাও একবার !
করেছি দারুণ পণ করিবারে পলায়ন,
নিষ্ঠুর মধুর বাক্যে ফিরায়ো না আর !
ও অনল হতে সাধ দূরে থাকিবার—
ফিরায়ো না মোরে, সখি, ফিরায়ো না আর !

ষষ্ঠ সর্গ

কবি ও মুরলা

কবি। উন্মাদিনী কল্লোলিনী ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী
শিলা হতে শিলান্তরে লুটিয়া লুটিয়া,
নেচে নেচে, অট্টহেসে, ফেনময় মুক্তকেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া !
শুধু মুহূর্তের তরে তিল বিচলিত করে
সে প্রশান্ত সলিলের শুধু এক পাশ—
উনমত্ত কোলাহল অধীর তরঙ্গদল
মুহূর্তের মাঝে সব পায় গো বিনাশ !
দেখ, সখি, গৃহমাঝে দেখ গো চাহিয়া,
নাচ, গান, বাদ্য, হাসি— আমোদ কল্লোলরাশি—
নিশীথপ্রশান্তি-মাঝে পড়িছে ঝাঁপিয়া !
আলোকে আলোকে গৃহ উঠেছে মাতিয়া,
স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিদ্যুতিয়া,
শত রমণীর পদ পড়ে তালে তালে।
চরণের আভরণ নেচে নেচে প্রতিক্ষণ
শত আলোকের বাণ হানে এককালে,
মূর্ছিয়া পড়িছে আলো হীরকে হীরকে !
শতকৃষ্ণ আঁখিতারা হানিছে আলোকধারা—
শত হৃদে পড়ে গিয়া ঝলকে ঝলকে !
চারি দিকে ছুটিতেছে আলোকের বাণ,
চারি দিকে উঠিতেছে হাসি বাদ্য গান।
কিন্তু হেথা চেয়ে দেখ কি শান্ত যামিনী !
কি শুভ্র জোছনা ভায় ! কি শান্ত বহিছে বায় !
কেমন ঘুমন্ত আছে প্রশান্ত তটিনী !
বল, সখি, পূর্ণিমা কি আমোদের রাত ?
এস তবে দুই জনে বসি হেথা এক সনে,
করি আপনার মনে রজনী প্রভাত !

গান

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে— অতি ধীরে গাও গো !
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো !
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি— অতি— অতি ধীরে কর সখি গান !

নিশার কুহক-বলে নীরবতাসিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর—
প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাস-ময় সংগীতের স্বর !
তটিনী কি শান্ত আছে ! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদুহস্ত-পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বনধ্বনি শুনে চমকে আপনি !
তাই বলি অতি ধীরে— অতি ধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো !

মুরলার প্রতি

কেন লো মলিন, সখি, মুখানি তোমার ?
কাছে এসো, মোর পাশে বোসো একবার !
কেন, সখি, বল্ মোরে, যখনি দেখেছি তোরে
মাটি-পানে নত দুটি বিষণ্ণ নয়ান !
আননের দুই পাশ অবদ্ধ কুন্তলরাশ—
করুণ ও মুখখানি বড়ো, সখি, ম্লান !

মুরলা । সত্য ম্লান কি গো, কবি, এ মুখ আমার ?
নিশীথবাতাস লাগি মনে কত উঠে জাগি
নিস্তব্ধ জোছনারাতে ভাবনার ভার !

[স্বগত] আহা কি করুণ, সখা, হৃদয় তোমার !
কবি গো ! বুক যে যায়— ভেঙে যায়, ফেটে যায়—
অশ্রুজল রুধিবারে পারিনাক আর !
পারি নে— পারি নে সখা, পারি নে গো আর !
ভেঙে বুঝি ফেলে তারা মর্মকারাগার !
একবার পায়ে ধরে কেঁদে নিই প্রাণ ভরে—
একবার শুধু, কবি, শুধু একবার !
যুঝিছে বুকের মাঝে শত অশ্রুধার !

কবি । একটি প্রাণের কথা রয়েছে গোপনে,
বলিব বলিব তোরে করিতেছি মনে !
আজ জোছনার রাতে বিপাশার তীরে
কাছে আয়, সে কথাটি বলি ধীরে ধীরে !

মুরলা । কি কথা সে ? বলো কবি ! করহ প্রকাশ !

কবি । কে জানে উঠেছে হৃদে কিসের উচ্ছ্বাস !
খেলিছে মর্মের মাঝে অধীর উল্লাস !
অথচ, উল্লাস সেই সুকুমার হেন,
শিশিরের বাষ্প দিয়ে গঠিত সে যেন !
হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার,
মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার ।

সূক্ষ্ম আবরণ, গাঁথা সন্ধ্যামেঘস্তরে,
পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের 'পরে !
কিছু যেন দেখেও দেখে না আঁখিদ্বয়,
সকলি অস্ফুট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময় !
শোন্ বলি, মুরলা লো, আরো আয় কাছে—
শূন্য এ হৃদয় মোর ভালো বাসিয়াছে !

মুরলা। ভালোবাসে ? কারে কবি ? কারে সখা ? কারে ?

কবি। মধুর নলিনী-সম নলিনী বালারে !

মুরলা। নলিনী ? নলিনী সখা ! নলিনী বালারে ?
কবি মোর ! সখা মোর ! ভালোবাস তারে ?

কবি। হাঁ মুরলা, সেই নলিনী বালারে,
তারে তুমি জান না কি ?
এমন মধুর মুখভাব তায় ?
এমন মধুর আঁখি !
এত রাশি রাশি খেলাইছে হাসি
হৃদয়ের নিরালায়—
নয়ন অধর ভাসাইয়া দিয়া
উথলি পড়িয়া যায় !
যে দিকে সে চায় হাসিময় চোখে
হাসি উঠে চারি ধার,
যে দিকে সে যায়— আঁধার মুছিয়া
চলে জ্যোতি-ছায়া তার !
তার সে-নয়ন-নিঝর হইতে
হাসি সুধারাশি ঝরি,
এই হৃদয়ের আকাশ পাতাল
রেখেছে জোছনা করি !

মুরলা। [স্বগত] দেবি গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মা গো— কোথা গিয়ে কাঁদি !
দুর্বল এ মন দে মা পাষাণেতে বাঁধি !
[প্রকাশ্যে] আহা, কবি, তাই হোক্— সুখে তুমি থাক।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ করে রাখ !
নয়নের জল তব কিছুতে মোছে নি,
হৃদয়-অভাব তব কিছুতে ঘোচে নি—
আজ, কবি, ভালোবেসে সুখী যদি হও শেষে,
আজ যদি থামে তব নয়নের ধার,
দেবতা গো, তাই করো ! চিরজন্ম সুখী করো
কবিরে আমার, বাল্য-সখারে আমার !

কবি। মুছ অশ্রুজল, সখি, কেঁদো না অমন—
যে হাসির কিরণেতে পূর্ণ হ'ল মন
একেলা বিজনে বসি কবিরে তোমার

কাঁদিতে দেখিতে, সখি, হবেনাক আর !
আজ হতে মিলাবে না হাসি এ অধরে,
বিষণ্ণ হবে না মুখ মুহূর্তের তরে।
আয় সখি, আয় তবে, কাছে আয় মোর—
মুছাইয়া দিই আহা অশ্রুজল তোর !

মুরলা। অশ্রু মুছায়ো না আর— বহুক যা বহিবার—
এখনি আপনা হতে থামিবে উচ্ছ্বাস !
এ অশ্রু মুছাতে, কবি, কিসের প্রয়াস !
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ
আপনি সে জাগি উঠে— আপনি শুকায় ফুটে,
চেয়েও দেখে না কেহ উঠুক-পড়ুক !
এসো সখা, ওই কাঁধে রাখি এই মুখ
একে একে সব কথা কহ গো আমারে—
বড়ো ভালোবাস কি সে নলিনী বালারে ?

কবি। শুধু যদি বলি, সখি, ভালোবাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়।
ভালোবাসো ভালোবাসো সবাই তো কয়,
ভালোবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময় !
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা বলে
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয় !
মনে হয় যেন, সখি, এত ভালোবাসা
কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই—
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা !

মুরলা। তাই হোক, ভালো তারে বাস প্রাণপণে !
তারে ছাড়া আর কিছু না থাকুক মনে !

কবি। সে আমার ভালোবাসা না যদি পূরায় !
যেই প্রেম-আশা লয়ে রয়েছি উন্মত্ত হয়ে,
বিশ্ব দেখি হাস্যময় যাহার মায়ায়,
যদি সখি, ফিরে নাহি পাই ভালোবাসা—
ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে সেই প্রেম-আশা—
মুমূর্ষু আশার সেই গুরু দেহভার
সমস্ত জগৎ-ময় বহিয়া বেড়াতে হয়—
শ্রান্ত হৃদি দিবানিশি করে হাহাকার !
অসুস্থ আশার সেই মুমূর্ষু-নিশ্বাসে
যদি এ হৃদয় হয় শূন্য মরুভূমিময়,
হৃদয়ের সব বৃত্তি শুকাইয়া আসে—
দিনরাত্রি মৃত ভার করিয়া বহন
ম্রিয়মাণ হয়ে যদি পড়ে এই মন !

মুরলা। ও কথা বোলো না, কবি, ভেবোনাক আর—
নিশ্চয় হইবে পূর্ণ প্রণয় তোমার।
কি-জানি কী-ভাবময় ওই তব মুখ—

ওই তব সুধাময়— প্রেমময়— স্নেহময়—
সুকুমার— সুকোমল— করুণ ও মুখ—
হাসি আর অশ্রুজলে মাখানো ও মুখ—
রাখিতে প্রাণের কাছে   এমন কে নারী আছে
পেতে না দিবেক তার প্রেমময় বুক !
শত ভাব উথলিছে ওই আঁখি দিয়া,
শত চাঁদ ওই খানে আছে ঘুমাইয়া—
মুছাইতে ও মধুর নয়নের ধার
কোন্ নারী দিবেনাক আঁচল তাহার !
মধুময় তব গান   দিবারাত করি পান
ঘুমাইয়া পড়িবে সে হৃদয়ে তোমার ।
বসি ওই পদমূলে   মুগ্ধ আঁখিপাতা তুলে
দিন রাত্রি চেয়ে রবে ওই মুখপানে
সূর্য্যমুখী ফুল-সম অবাক নয়ানে !
হেন ভাগ্যবতী নারী কে আছে ধরায়
যেজন কবির প্রেম না চাহিয়া পায় !

[স্বগত] মুরলা রে, কোনো আশা পূরিল না তোর—
কাঁদ্ তুই অভাগিনী এ জীবন-ভোর !
এ জনমে তোর অশ্রু মুছাবে না কেহ,
এ জনমে ফুটিবে না তোর প্রেম স্নেহ !
কেহ শুনিবে না আর তোর মর্মব্যথা,
ভালোবেসে তোর বুকে রাখিবে না মাথা !
বড়ো যদি শ্রান্ত হয়ে পড়ে তোর মন
কেহ নাহি কহিবারে আশ্বাসবচন !
মাতৃহারা শিশু-মত কেঁদে কেঁদে অবিরত
পথের ধূলার পরে পড়িবি ঘুমায়ে—
একটি স্নেহের নেত্র দেখিবে না চেয়ে ?

নলিনীর প্রবেশ

[দূর হইতে] পূর্ণিমারূপিণী বালা ! কোথা যাও, কোথা যাও !

কবি । একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও !
কি আনন্দ ঢেলেছ যে,   কি তরঙ্গ তুলেছ যে
আমার হৃদয়মাঝে একবার দেখে যাও !
দিবানিশি চায়, বালা, অধীর ব্যাকুল মন
ও হাসি-সমুদ্র-মাঝে করে আত্মবিসর্জন !
হেরি ওই হাসিময় মধুময় মুখপানে
উন্মত্ত অধীর হৃদি তিল দূর নাহি মানে—
চায়, অতি কাছে গিয়া ওই হাত দুটি ধরি
অচেতনে কাটাইয়া দেয় দিবা বিভাবরী !
একটি চেতনা শুধু জাগি রবে অনিবার—
সে চেতনা তুমি-ময়— ওই মিষ্ট হাসি-ময়—

ওই সুধামুখ-ময়— কিছু— কিছু নহে আর !
আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি—
তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ-'পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে !
তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে-কিরণে-ভরা
উড়েছে কল্পনা, কোথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা !
হরিত-আসন-'পরে নন্দনবনের কাছে
ফুলবাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল-'পরে
তোমারে কল্পনারাণী বসায়েছে সমাদরে—
চারি দিকে জুঁইফুল   চারি দিকে বেলফুল—
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে অজস্র কুসুমকুল,
শাখা হতে নুয়ে প'ড়ে পরশিয়া এলো চুল
শতেক মালতীকলি   হেসে হেসে ঢলাঢলি,
কপালে মারিছে উঁকি   কপোলে পড়িছে ঝুঁকি
ওই মুখ দেখিবারে কৌতূহলে সমাকুল,
অজস্র গোলাপ-রাশি পড়িয়া চরণতলে
না জানি কি মনোদুখে আকুল শিশিরজলে !
তোমার প্রতিমা লয়ে কল্পনা এমনি করি
খেলাইয়া বেড়াইছে, নাহি দিবা বিভাবরী—
কভু বা তারার মাঝে কভু বা ফুলের 'পরে
কভু বা উষার কোলে কভু সন্ধ্যামেঘস্তরে ;
কত ভাবে দেখিতেছে,   কত ছবি আঁকিতেছে—
প্রফুল্ল-আনন কভু হরষের হাসি-মাখা,
অভিমান-নত আঁখি কভু অশ্রুজলে ঢাকা ।
কাছে এসো, কাছে এসো, একবার মুখ দেখি—
তোল গো, নলিনীবালা, হাসিভারে নত আঁখি !
মমর্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয়তলে,
ওই হাতে হাত দিয়ে   প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
বসন্তের বায়ু সেবি কুসুমের পরিমলে
নীরব জোছনা রাতে বিপাশাতটিনীতীরে
ফুলপথ মাড়াইয়া দোঁহে বেড়াইব ধীরে !
আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর,
ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর !
আহা সে কি হয় সুখ ! কল্পনায় ভাবি মনে
বিহ্বল আঁখির পাতা মুদে আসে দু-নয়নে !

মুরলা । [স্বগত] হৃদয় রে !
এ সংসারে আর কেন রয়েছি আমরা ?
তুচ্ছ হতে তুচ্ছ আমাদেরও তরে আজ
তিলমাত্র স্থান কি রে রাখিয়াছে ধরা !

এখনো কি আমাদের ফুরায় নি কাজ ?
হৃদয় রে ! হৃদয় রে ! ওরে দগ্ধ মন !
আমাদের তরে ধরা হয় নি সৃজন !

কবি। মুরলা লো ! চেয়ে দেখ্— চেয়ে দেখ্ হোথা !
বল্ দেখি এত হাসি এত মিষ্ট সুধারাশি
হেন মুখ হেন আঁখি দেখেছিস্ কোথা ?

মুরলা। এমন সুন্দরী আহা কভু দেখি নাই—
কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই !
কবিতার উৎস-সম ও নয়ন হতে
ঝরিবে কবিতা তব হৃদে শত-স্রোতে !
হাসিময় সৌন্দর্য্যের কিরণ-পরশে
বিহঙ্গম-হৃদি তব গাহিবে হরষে—
মধুর সংগীতে বিশ্ব করিবে প্লাবন !
সুখে থাকো পূর্ণ মনে, ভালোবাসো প্রাণপণে
প্রেমযোগ্য নারী যবে পেয়েছ এমন !

[স্বগত] কেন এত অশ্রু আজি করি বরিষণ ?
কেন রে কিসের দুখ ? কেন এত ফাটে বুক ?
কিসের যন্ত্রণা মর্ম্ম করিছে দংশন ?
কখনো তো কবির অমূল্য ভালোবাসা
অভাগিনী মনে মনে করি নাই আশা !
জানিতাম চিরদিন রূপহীন গুণহীন
তুচ্ছ মুরলার এই ক্ষুদ্র ভালোবাসা
পূরাতে নারিবে তাঁর প্রণয়পিপাসা—
মোরে ভালোবেসে কবি সুখী হইবে না !
তবু আজ কিসের গো, কিসের যাতনা !
আজ কবি মুছেছেন অশ্রুবারিধার,
বহুদিনকার আশা পূরেছে তাঁহার !
আহা কবি, সুখে থাকো, আর কিছু চাই নাকো—
এই মুছিলাম অশ্রু, আর কাঁদিব না !
কিসের যাতনা মোর, কিসের ভাবনা !

কবি। ওই দেখ ফুল তুলে আঁচলটি ভরি
কামিনীর শাখা লয়ে ওই দেখ ভয়ে ভয়ে
অতি যত্নে রাখিয়াছে নোয়াইয়া ধরি,
পাছে কুসুমের দল ভুঁয়ে পড়ে ঝরি !
ওই দেখ উচ্চ শাখে ফুটিয়াছে ফুল,
তুলিবার তরে আহা কতই আকুল !
কিছুতে তুলিতে নারে কত চেষ্টা করি—
শাখাটি ধরিয়া শেষে নাড়িছে মধুর রোষে,
কুসুম শতধা হয়ে পড়িতেছে ঝরি।
বিফল হইয়া শেষে সখীদের কোলে
ওই দেখ হেসে হেসে পড়িতেছে ঢলে !

মুরলা। স্বগত

আমি যদি হইতাম হাস্যোল্লাসময়
নির্ঝরিণী, বরষার নবোচ্ছ্বাসময় !
হরষেতে হেসে হেসে কবির কাছেতে এসে
ডুবাতেম ভালোবেসে আদরে আদরে !
যদি কভু দেখিতাম মুহূর্তের তরে
বিষাদ ছাইছে পাখা কবির অধরে,
হাসিয়া কত-না হাসি ঢালিয়া সংগীতরাশি
মৃদু অভিমান করি' মৃদু রোষভরে—
মৃদু হেসে মৃদু কেঁদে বাহুতে বাহুতে বেঁধে
দিতেম বিষাদভার সব দূর করে !
কিন্তু আমি অভাগিনী ছেলেবেলা হতে
এ গম্ভীর মুখে মম অন্ধকার ছায়া-সম
রহিয়াছি সতত কবির সাথে সাথে !
আমি লতাগুরুভার মেলি শাখা অন্ধকার
হেন ঘন আলিঙ্গনে করেছি বেষ্টন,
উন্নত মাথায় তাঁর পড়িতে দিই না আর
চাঁদের হাসির আলো, রবির কিরণ !
হা মুরলা, মুরলা রে, এমনি করেই হা রে
হারালি— হারালি বুঝি ভালোবাসা-ধন !
বুক, ফেটে যা রে, অশ্রু কর্ বরিষণ—
কবি তোর অশ্রুধার দেখিতে পাবে না আর,
যে কিরণে আছে ডুবি তাঁহার নয়ন !
দুর্বল— দুর্বল হৃদি ! আবার ! আবার !
আবার ফেলিস্ তুই অশ্রুবারিধার ?
আবার আবার কেন হৃদয়দুয়ারে হেন
পাষাণে পাষাণে গাঁথা কে যেন হানিছে মাথা,
কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার—
সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার !
থাম্ থাম্, থাম্ হৃদি, মোছ্ অশ্রুধার !
কবি যদি সুখী হয় কি ভাবনা আর !
আহা কবি, সুখী হও ! তুমি কবি সুখী হও !
আমি কে সামান্য নারী ?— কি দুঃখ আমার !
তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার ?
ও চাঁদের কলঙ্কও হতে নাহি পারি
এত ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি নারী !

চপলার প্রবেশ ও গান

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ?
সখি, যাতনা কাহারে বলে ?

তোমরা যে বল দিবস রজনী
ভালোবাসা ভালোবাসা,
সখি, ভালোবাসা কারে কয় ?
সে কি   কেবলি যাতনাময় ?
তাহে   কেবলি চোখের জল ?
তাহে   কেবলি দুখের শ্বাস ?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ ?
জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা,
আমরা তাহার খেলেনা—
আমাদের কিবা সুখ !
সখি,   আমাদের কিবা দুখ !
সখি,   আমাদের কিবা যাতনা !
তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল
ব্যথা বড়ো বাজে বুকে—
তবু তো, সজনি, বুঝিতে পারি নে
কাঁদ যে কিসের দুখে।
আমার চোখেতে সকলি শোভন—
সকলি নবীন— সকলি বিমল—
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মতো !
কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত !
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায় !
আমার মতন সুখী কে আছে !
আয় সখী, আয় আমার কাছে !
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ !
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা !

[মুরলার প্রতি]

এই যে আমার সখীর অধরে
ফুটেছে মৃদুল হাসি !
আয়, সখি, মোরা দুজনে মিলিয়া
ললিতারে দেখে আসি।
মালতী সেথায়, মাধবী সেথায়,
সখীরা এসেছে সবে,
এতক্ষণে সেথা ফাটিছে আকাশ
কমলার হাসিরবে।

মুরলা। চল্ সখি, চল্ তবে।

সপ্তম সর্গ

অনিল ললিতা

অনিল। [গাহিতে গাহিতে]

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না !
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠে না !
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না !
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না !
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না !
লাজময়ি ! তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না !

ললিতা। [স্বগত]

পাষাণে বাঁধিয়া মন আজ করেছিনু পণ
কাছে যাব— কথা কব— যাচিব আদর আজ !
ওরে মন, ওরে মন, কার কাছে তোর লাজ ?
আপনার চেয়ে যারে করেছিস্ আপনার
তার কাছে বল্ দেখি কিসের সরম আর ?

অনিল। ফুল তুলিবার ছলে ওই যে ললিতা আসে,
মনে মনে জানা আছে এলেই আমার কাছে
অমনি হাতটি ধরি বসাব আমার পাশে।

অন্য দিক -পানে আমি চাহিয়া রহিব আজ,
দেখিব কেমন করি কোথা তার থাকে লাজ ?

ললিতা। [ফুল তুলিতে তুলিতে]
নাহয় বসিনু কাছে, কি তাহাতে দোষ আছে ?
বসিব নাথের পাশে তাহাতে কি আসে যায় ?
আর, লজ্জা— লজ্জা নয়— লজ্জারে করিব জয়—
নাহয় বসিনু কাছে, কিসের সরম তায় !
কোথা লজ্জা— লজ্জা কোথা ? এই তো বসিনু হেথা—
এই তো করিমু জয়, এই তো বসিনু কাছে—
বসিব নাথের পাশে কি তাহাতে দোষ আছে ?
এখনো— এখনো মোরে দেখিতে পান নি তবে—
তবে কি গো আরো কাছে— আরো কাছে যেতে হবে ?
আর নয়— আরো কাছে যাইব কেমন করে ?
হেথা তবে বসে থাকি, মালাগুলি গেঁথে রাখি,
এখনি ভাবনা ভাঙি দেখিতে পাইবে মোরে !
যদি-বা দেখিতে পায় কি তবে করিবে মনে ?
যদি গো বুঝিতে পারে দেখিতে এসেছি তারে,
মিছে মালা-গাঁথা ছলে বসে আছি এইখানে ?

অনিল। এই যে ললিতা হোথা— ফুরালো কি মালা গাঁথা ?
আরেকটু কাছে এসে নাহয় গাঁথিতে মালা !
এই হেথা কাছে আয়— কিসের সরম তায় ?
কেমন গাঁথিলি ফুল একবার দেখি বালা !
আদরিণী— আদরিণী— দেখি হাতখানি তোর !
এমনি করিয়া সখি, বাঁধ্ লো হৃদয় মোর !
একবার দেখি সখি, কাছে আন্ মুখখানি—
এমনি করিয়া রাখ্ বুকের মাঝারে আনি !
কেন, লাজ এত কেন— আঁখি দুটি নত কেন ?
কি করেছি ? একটি শুধু চুম্বন বইত নয় !
আরেকটি এই লও— আরেকটি এই লও—
আর নয় করিব না বড়ো যদি লাজ হয় !
নাহয় কুন্তল দিয়ে ঢেকে দিই মুখখানি !
দেখিতে আনন তোর ওই চন্দ্র ভাবে-ভোর
এক দৃষ্টে চেয়ে, সখি, রয়েছে অবাক্ মানি !
ওই দেখ্ তারাগুলি সহস্র নয়ন খুলি
ওই মুখটির তরে খুঁজিছে সমস্ত ধরা—
উচিত কি হয়, সখি, তাদের নিরাশ করা—
নয়নে নয়ন রাখি একবার মেল আঁখি,
মিশাও কপোলে মোর ললিত কপোল তব !
কথা কও কানে কানে, মৃদু প্রণয়ের গানে
জাগাও ঘুমন্ত হৃদে সুখস্বপ্ন নব নব !
মনে আছে সেই রাত্রে কত সাধনার পরে

একটি সংগীত, সখি, গিয়াছিলে গাহিবারে—
আরম্ভ করেই সবে অমনি থামালে গীত,
নিজের কণ্ঠের স্বরে নিজে হয়ে সচকিত !
সেই আরম্ভের কথা এখনো রয়েছে কানে,
সেই আরম্ভের সুর এখনো বাজিছে প্রাণে !
সে আরম্ভ শেষ, বালা, আজিকে করিতে চাই !
বড়ো কি হতেছে লাজ ? ভালো, সখি, কাজ নাই !

ললিতা । [স্বগত] কি কহিব ? বড়ো, সখা, মনে মনে পাই ব্যথা,
না জানি গাহিতে গান, না জানি কহিতে কথা !
কত আজ বেছে বেছে তুলেছি কুসুমভার,
কতখন হতে আজ ভেবেছি ভুলিয়া লাজ
নিশ্চয় এ ফুলগুলি দিব তারে উপহার !
হাতটি এগিয়ে আজ গিয়েছিনু কতবার,
অমনি পিছায়ে হাত লইয়াছি শতবার !
সহস্র হউক লাজ, এ কুসুমগুলি আজ
নিশ্চয় দিব গো তাঁরে না হবে অন্যথা তার !
কিন্তু কি বলিয়া দিব ? কি কথা বলিতে হবে ?
বলিব কি— "ফুলগুলি যতনে এনেছি তুলি,
যদি গো গলায় পর' মালা গেঁথে দিই তবে" ?
ছি ছি গো বলি কি করে— সরমে যে যাব মরে—
নাইবা বলিনু কিছু, শুধু দিই উপহার !
দিই তবে ? দিই তবে ? দিই তবে এইবার ?
দূর হোক, কি করিব ? বড়ো যে গো লজ্জা করে !
থাক্ গো এখন থাক্— দিব আরেকটু পরে !

অনিল । কি হয়েছে ? দিতে কি লো চাস্ ফুল-উপহার ?
দে-না লো গলায় গেঁথে, কিসের সরম তার ?
একটি দাও তো সখি, পরাই তোমার চুলে ।
আর দুটি দাও সখি, পরাইব কর্ণমূলে ।
মোরে দাও সবগুলি— গাঁথিব ফুলের বালা,
গলায় দুলায়ে দিব গাঁথিয়া চাঁপার মালা,
আসন রচিয়া দিব দিয়ে শত শতদল !
তা হলে কি দিবি মোরে— বল্ সখি বল্ বল্—
যতগুলি ফুল গাঁথি যত তার দল আছে
ততেক চুম্বন আমি লইব তোমার কাছে !
যত দিন না পারিবি শুধিতে চুম্বন-ধার
এ ভুজে রহিবি বদ্ধ এই বক্ষকারাগার !
দিবানিশি সজনি লো রেখে দেব চোখে চোখে !
বল তবে ফুলসাজে সাজায়ে দেব কি তোকে ?
বলিবি না ? ভালো, সখি, দুইটি চুম্বন দাও—
নাহয় একটি দিও, মহার্ঘ হল কি তাও ?

ললিতা। [স্বগত]
আরেকটি বার, সখা, কর গো চুম্বন মোরে—
আরেকটি বার, সখা, রাখ গো বুকেতে ধরে !
জান আমি মুখ ফুটে সরমে বলিতে নারি,
তাই কি সহিতে হবে ? এত শাস্তি, সখা, তারি ?
আদরে হৃদয়ে যদি রাখ এ মাথাটি মোর,
আদরে চুম গো যদি আঁখির পাতাটি মোর,
তাহাতে আমার, সখা, অসাধ কি হতে পারে ?
তবে কেন ব্যথা দিতে শুধাইছ বারে বারে ?
আকুল ব্যাকুল হৃদি মিলিবারে তব পাশে
শতবার ধায়, সখা, শতবার ফিরে আসে !
দীন আপনারে হেরে এমন সে লাজ পায়
তোমার কাছেতে, সখা, সংকোচে না যেতে চায় !
সখা, তারে ডেকে নাও— তুমি তারে ডেকে নাও—
তোমারি সে মুখ চেয়ে দাঁড়াইয়া একধার,
একটু আদর পেলে স্বর্গ হাতে পাবে তার !

অনিল। ডুবিছে চতুর্থী চাঁদ বিপাশার নীরে।
আয় সখি, আয় মোরা ঘরে যাই ফিরে।
আঁধারে কাননপথ দেখা নাহি যায়,
আয় তবে আরো কাছে— আরো কাছে আয়।
হাতখানি রাখ্ মোর হাতের উপর,
শ্রান্ত যদি হোস্ মোর কাঁধে দিস্ ভর।
দেখিস্, বাধে না যেন চরণ লতায়—
আঁচল না ছিঁড়ে যায় গাছের কাঁটায় !
চমকি উঠিলি কেন ? কিছু নাই ভয়—
বাতাসের শব্দ শুধু, আর কিছু নয় !
এই দিকে পথ, বালা, এই দিকে আয়—
বাম পাশে বিপাশার স্রোত বহে যায়।
শ্রান্তি কি হতেছে বোধ ? লজ্জা কেন প্রিয়ে ?
বেষ্টন কর না মোর স্কন্ধ বাহু দিয়ে !
কিসের তরাস এত— ও কি বালা, ও কি ?
ঝরিয়া পড়েছে শুধু শুষ্ক পত্র সখি !
ওই গেল গেল চাঁদ, ওই ডোবে ডোবে—
একটু জোছনারেখা এখনো যেতেছে দেখা,
আর নাই— আর নাই— ওই গেল ডুবে !

অষ্টম সর্গ

মুরলা ও চপলা

চপলা। দেখ্‌, সখি, মোর, সত্য কহি তোরে
প্রাণে বড়ো ব্যথা বাজে—
চপলার কেহ সখী নাই হেথা
এত বালিকার মাঝে!
তোদের ও মুখ হেরিলে মলিন
হৃদয় কাঁদিয়া উঠে,
আকুল হইয়া শুধাবার তরে
তাড়াতাড়ি আসি ছুটে।
শতবার করে শুধাই তোদের,
কথা না কহিস্‌ তবু—
ভাবিস চপলা অবোধ বালিকা
কিছু সে বুঝে না কভু!
চোখের জলের কাহিনী বুঝে না,
বুঝে না সে ভালোবাসা,
পড়িতে পারে না প্রাণের লিখন
দুখের সুখের ভাষা!
ভালো, সখি, ভালো, নাইবা বুঝিল
তাহাতে কি যায় আসে?
চপলা কি শুধু হাসিতেই জানে,
কাঁদিতে কি জানে না সে?
মুরলা আমার, তোরে আমি এত
ভালোবাসি প্রাণ ভ'রে—
তবু একদিন তোর তরে, সখী,
কাঁদিতে দিবি নে মোরে?

মুরলা। চপলাটি মোর, হাসিরাশি মোর,
আমার প্রাণের সখি!
নিজের হৃদয় নিজেই বুঝি না,
অপরে তা বুঝাব কি?
যাহাদের সুখে আমি সুখে রই
সকলেই সুখী তারা—
তবে কেন আমি একেলা বসিয়া
ফেলি এ নয়নধারা?
সকলেই যদি সুখে থাকে, সখি,
আমি থাকিব না কেন?
প্রমোদ তেয়াগি বিজনে আসিয়া
কেন বা কাঁদিব হেন?
নিজের মনেরে বুঝানু কতই,
কিছুই না পেনু সাড়া—

মুরলার কথা শুধাস্ নে আর,
মুরলা জগত-ছাড়া !

চপলা। এত দিনে দেখি কবির অধরে
হরষকিরণ জ্বলে—
যেন আঁখি তার ডুবিয়া গিয়াছে
সুখের স্বপনতলে !
জোছনা উদিলে কুসুমকাননে
একেলা ভ্রমিয়া ফিরে,
ভাবে-মাতোয়ারা আপনার মনে
গান গাহে ধীরে ধীরে।
নয়নে অধরে মলয়-আকুল
বসন্ত বিরাজ করে,
মধুর অথচ উদাস হরষ
ঘুমায় মুখের 'পরে !
হেন ভাব কেন হেরি লো তাহার
শুধাইব তোর কাছে।
বড়োই সে সুখে আছে।

মুরলা। চপলা, সখি লো, দেখেছিস তারে ?
বড়ো কি সে সুখে আছে ?
কেমনে বুঝিলি বল্ তাহা বল্
বল্ সখি মোর কাছে !
বড়ো কি সে সুখে আছে ?

চপলা। হাঁ লো, সখি, হাঁ লো— শোন্ বলি তোরে—
আয়, সখি, মোর পাশে—
কবি আমাদের নলিনীবালারে
মনে মনে ভালোবাসে।
সত্য কহি তোরে, নলিনীরে বড়ো
ভালো নাহি লাগে মোর—
শুনিয়াছি নাকি পাষাণ হতেও
মন তার সুকঠোর !

মুরলা। সে কি কথা বালা ! মুখখানি তার
নহে কি মধুর অতি ?
নয়নে কি তার দিবস রজনী
খেলে না মধুর জ্যোতি ?

চপলা। শুনেছি সে জ্যোতি আলেয়ার চেয়ে
কপট, চপল নাকি—
পথিকের পথ ভুলাবারি তরে
জ্বলি উঠে থাকি থাকি !
শুনেছি সে বালা সারাটি জীবন
চড়িয়া পাষাণরথে
চাকায় দলিয়া চলিবারে চায়

হৃদয়বিছানো পথে !
শুনেছি সে নাকি একটি একটি
হৃদয় গনিয়া রাখে—
কি কুখনে, আহা, কবি আমাদের
ভালো বাসিয়াছে তাকে !

মুরলা। চপলা, চপলা, পায়ে ধরি তোর,
ক'স্ নে অমন করে।
তুই লো বালিকা হৃদয় তাহার
চিনিবি কেমন করে ?

চপলা। কে জানে, সজনি, বুঝিতে পারি নে
কেন যে হইল হেন—
তাহারে হেরিলে মুখ ফিরাইতে
সাধ যায় মোর যেন ?
সেদিন যখন দেখিনু নলিনী
বসিয়া কবির সাথে,
সরমের বেশে লাজহীন হাসি
খেলিছে আঁখির পাতে,
দেখিনু কপোল ঢাকিয়া তাহার
অলক পড়েছে ঝুলি,
আঁচলেতে গাঁঠ বাঁধি শতবার
শতবার ফেলে খুলি,
কে জানে আমার ভালো না লাগিল
চলে এনু ত্বরা করে—
কপট সরম দেখিলে, সজনি,
সরমেতে যাই ম'রে !
মুরলা আমার, অমন করিয়া
কেন লো রহিলি বসি !
দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া
এসেছে ও মুখশশী !
ভাবিস্ নে, সখি, কমলা কয়েছে
কাল মোর কাছে এসে
পাষাণহৃদয়া নলিনীও নাকি
ভালোবাসে কবিরে সে।
শুনেছি নলিনী কবিরে দেখিতে
নদীতীরে যায় নাকি।
কবিরে দেখিলে ঢ'লে পড়ে তার
অনুরাগনত আঁখি।

মুরলা। নলিনীবালারে ভালোবেসে যদি
কবি মোর সুখে থাকে
তাহা হলে, সখি, বল্ দেখি মোরে
কেন না বাসিবে তাকে ?

মোরা তাহা লয়ে ভাবি কেন এত ?
চপলা লো, আমরা কে ?

চপলার গান

যে ভালো বাসুক— সে ভালো বাসুক—
সজনি লো, আমরা কে !
দীনহীন এই হৃদয় মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে ?
তবে কেন বলো ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভালোবাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বলো
কেবা কাঁদে, কেবা হাসে !
আমাদের মন কেহই চাহে না,
তবে মনখানি লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্ ।
যদি, সখি, কেহ ভুলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি-পালটি দু-দণ্ড ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায় !
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্ ।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্ !

নবম সর্গ

নলিনী ও সখীগণ

নলিনী । [গাহিতে গাহিতে]
কি হল আমার ? বুঝি বা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি !
প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মনফুল দলি চলি বেড়াইতে—

সহসা, সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা, সজনি, দেখিনু চাহিয়া
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি !
পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে
হৃদয় হারিয়েছি !
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায় !
তার 'পর দিয়া চলিয়া যায় !
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে—
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায় !
আমার কুসুমকোমল হৃদয়
কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহে নি ভ্রমরচরণ-ভর !
চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত,
জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত,
হাসিপরিমলে অধর ভরিয়া
লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে—
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে—
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি !
এখনো যদি গো খুঁজিয়া পাই
এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি—
এখনো তাহারে দলে নাই কেহ,
আমার সাধের কুসুমখানি ।
এখনো, সজনি, একটি পাপড়ি
ঝরে নি তাহার জানি লো জানি ।
শুধু হারায়েছে, খুঁজিয়া পাইলে
এখনি তাহারে কুড়ায়ে আনি ।
ত্বরা কর্ তবে, ত্বরা কর্ তোরা,
হৃদয় খুঁজিতে যাই—
শুকাবার আগে ছিঁড়িবার আগে
হৃদয় আমার চাই !

সখীদের প্রতি

বিপাশাতীরের পথে, সখি, আয়
আয়, ত্বরা করে আয় !
জানিস্ কি, সখি, নদীতীরে কবি
কখন বেড়াতে যায় ?

জানিস্ তো, সখি, পথের ধারেতে
একটি অশোক আছে,
বনলতা কত ফুলে ফুলে ভরা
উঠিয়াছে সেই গাছে—
সেই খানে, সখি, সেই গাছতলে
বসিয়া থাকিতে হবে।
সেই পথ দিয়া যাইবে তো কবি ?
আয় ত্বরা করে তবে।
বল্ দিখি তোরা হল কি আমার !
যখন কবির সুমুখে থাকি
একটিও কথা পারি নে বলিতে,
পারি নে তুলিতে আনত আঁখি !
কতবার, সখি, করিয়াছি মনে
পরিহাস করি কহিব কথা—
নিদারুণ হাসি হাসিয়া হাসিয়া
হৃদয়ে হৃদয়ে দিব গো ব্যথা,
কৃষ্ণহীরা-সম কৃষ্ণ আঁখি-তারা
আঁধার-আগার হতে আলো-ধারা
হানিবে হেথায়, হানিবে হোথায়
আকুলিয়া দশ দিশ—
মূরছিয়া তার পড়িবেক মন,
মুদিয়া আসিবে অবশ নয়ন,
যতই ঢালিব এ অধর হতে
মিষ্ট সুধাময় বিষ !
কিন্তু কি করে সে চেয়ে থাকে, সখি,
না জানি নয়নে কি আছে জ্যোতি !
এমন সে গান গায় ধীরে ধীরে,
কথা কয়, সখি, মৃদুল অতি—
মুখেতে আমার কথা নাহি ফুটে,
চাহিতে পারি নে আঁখির পানে,
হাসির লহরী খেলে না অধরে,
নয়নে তড়িৎ নাহিক হানে !
আয় ত্বরা করে— বেলা হয়ে এল,
অস্তাচলে যায় রবি,
পথের ধারেতে বসি রব' মোরা
সেই পথে যাবে কবি !

দশম সর্গ

মুরলা

যার কোনো রূপ নাই, যার কোনো গুণ নাই,
তবুও যে হতভাগ্য ভালোবাসে মনে,
দুই দিন বেঁচে থাকে, কেহ নাহি জানে তাকে,
ভালোবাসে, দুঃখ সহে, মরে গো বিজনে।
ক্ষুদ্র তৃণফুল এক জন্মে অন্ধকারে,
দুই দণ্ড বেঁচে থাকে কীটের আগার—
শুকায়ে পড়ে সে নিজ কাঁটার মাঝারে,
নিজেরি কাঁটার মাঝে সমাধি তাহার।
কি কথা কোস্ রে তুই অকৃতজ্ঞ মন!
স্নেহময় দয়াময় কবি সে আমার,
এই তৃণফুলেরে কি করে নি যতন?
এরেও কি রাখে নাই হৃদয়ে তাহার?
ছেলেবেলা হতে মোরে রেখেছেন পাশে।
যখনি পূরিত মন নব গীতোচ্ছ্বাসে
আমারেই তাড়াতাড়ি শুনাতেন তিনি,
এত তাঁর ছিল সঙ্গী আছিল সঙ্গিনী!
এত যে পাইনু, তাঁরে কি পারিনু দিতে?
মুরলার যাহা কিছু ছিল— ভালোবাসা—
ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা!
একটু পারি নি তাঁরে সান্ত্বনা করিতে,
মুছাই-নি এক বিন্দু নয়নের ধার—
যাহা কিছু সাধ্য ছিল করেছি আমার!
আমি যদি না হতেম বাল্যসখী তাঁর,
নলিনীবালারে যদি পেতেন সঙ্গিনী,
করিতে হত না তাঁরে এত হাহাকার—
কতই না সুখী আহা হতেন গো তিনি!
বিধাতা! বিধাতা! যদি তাই গো করিতে!
মুরলা জন্মিল কেন নলিনী থাকিতে!
এখনো কেন গো তার হয় না মরণ?
এ সংসারে মুরলারে কার প্রয়োজন?
ওই আসিছেন কবি!— এসো কবি!— এসো কবি!
একবার অতি কাছে এসো মুরলার!
তুমি যবে কাছে থাক কবি গো আমার—
আপনারে ভুলে যাই— ওই মুখপানে চাই
তোমা ছাড়া কিছু মনে নাহি থাকে আর!
তুমি যবে দূরে থাক, কবি গো, তখন
আপনারি ক্ষুদ্র দুঃখে থাকি অচেতন!
বড় যে দুর্বল দীন মুরলা তোমার!

যুঝিতে মনের সাথে পারে না সে আর !
থেকো না, থেকো না দূরে থেকো না গো প্রভু,
মুরলারে ত্যাগ করে যেও না গো কভু !
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি দীন— বলহীন রক্তহীন
ধুলায় লুণ্ঠিত এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
তোমার মনের ছায়ে দেহ এরে স্থান !
আমারে লুকায়ে রাখ প্রসারিয়া পাখা,
তোমারি বুকের কাছে রব আমি ঢাকা !
নহিলে দুর্বল এই দীন অসহায়
পথ হারাইয়া কোথা ভ্রমিয়া বেড়ায় ?
তুমি, কবি, ছিলে নাকো— একেলা বিজনে
নিজ হাতে বসি হেথা দুঃখের কণ্টকলতা
রোপিতেছিলাম, কবি, আপনারি মনে।
তাই নিয়ে অনুক্ষণ যেন আদরের ধন
আত্মদাহী কল্পনায় খেলায়েছি কত,
যতনে ঢেলেছি তায় অশ্রুধারা শত,
এবে প্রতি মূল তার হৃদয়ের চারি ধার
দংশে শত বাহু মেলি বৃশ্চিকের মত !
তুমি, সখা, এসো কাছে— মরিতেছি জ্বলি—
ও চরণ দিয়ে, কবি, ফেল সব দলি—
প্রতি শাখা— প্রতি পত্র— প্রতি মূল তার !
এসো, কবি, বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও—
আর কভু বর্ষিব না অশ্রুবারিধার !

কবির প্রবেশ

কবি। সকাল হইতে, মুরলা সখি লো,
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে,
বড়োই অধীর-হরষে আমার
হৃদয় গিয়েছে ভরে।
পারি নে রাখিতে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আকুল ব্যাকুল করিতে প্রকাশ,
অধীর হইয়া সকাল হইতে
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে।
তোরে না কহিলে হৃদয়ের কথা
মন শান্তি নাহি মানে !
কেন, সখি, তুই ব'সে রয়েছিস্
একা একা এই খানে ?
দেখ, সখি, আজ গিয়েছিনু আমি
প্রমোদকাননে তার,
গাছের ছায়াতে আপনার মনে
বসেছিনু একধার।—

মুরলা, হেথায় অন্ধকার ঘোর,
দেখিতে পাই নে মুখখানি তোর,
এত অন্ধকার ভালো নাহি লাগে,
ওই খানে যাই উঠে ।
ওখানে পড়েছে রবির কিরণ,
সমুখে সরসী হাসিছে কেমন,
গাছের উপরে শাখা শাখা ভরে
বকুল রয়েছে ফুটে ।
এইখানে আয়, এইখানে বোস্ !
শোন্ সখি তার পরে—
গাছের তলায় ছিলাম বসিয়া
মগন ভাবনা-ভরে ।
গীতস্বর শুনি চমকি উঠিনু,
শুনিনু মধুর বাঁশরী বাজে ।
গীতের প্লাবনে আকাশ পাতাল
ডুবিয়া গেল গো নিমেষমাঝে ।
আকাশব্যাপিনী জোছনার, সখি,
মরমে মরমে পশিল গান !
পৃথিবী-ডুবান' জোছনারে, সখি,
ডুবায়ে দিল সে মধুর তান !
একটি একটি করি কথা তার
পশিতে লাগিল শ্রবণে যত,
শোণিত লাগিল উঠিতে পড়িতে,
হৃদয় হইল পাগল-মতো ।
একটি একটি একটি করিয়া
গাঁথিতে লাগিনু কথা,
গান গাওয়া তার ফুরাল' যখন
ফুরাল' আমার গাঁথা ।
মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে
কি গান গাহিতেছিল মধুস্বরে
বিশ্ব করি বিমোহিত !
আমারি রচিত— আমারি রচিত—
আমারি রচিত গীত !
মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে
কে গান গাহিতেছিল মধুস্বরে
উনমাদ করি মন !
আমারি নলিনী— আমারি নলিনী—
আমারি হৃদয়ধন ।
সখি, মোর সেই মনের কথা,
সখি, মোর সেই গানের কথা,
দিয়াছে মাজিয়া তার স্বর দিয়া—

প্রতি কথা তার উঠে উজলিয়া
মেঘে রবিকর যথা।
শুনিবি কি গান গাহিতেছিল সে
অমৃতমধুর রবে ?
শোন্ মন দিয়ে তবে।

গান

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার ?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙে গেল— গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর !
তোমার সৌন্দর্যভারে দুর্বল হৃদয় হা রে
অভিভূত হয়ে যেন পড়েছে আমার !
এসো তবে হৃদয়েতে, রেখেছি আসন পেতে—
ঘুচাও এ হৃদয়ের সকল আঁধার !
তোমার চরণে দিণু প্রেম-উপহার—
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা বালা, থাক' হৃদি করি আলা,
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য তোমার !

একাদশ সর্গ

অনিল

অনিল। কিছুই তো হল না !
সেই-সব— সেই-সব— সেই হাহাকাররব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা !
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা-কিছু চাই !
ভালো তো গো বাসিলাম— ভালোবাসা পাইলাম,
এখনো তো ভালোবাসি— তবুও, কি নাই !
তবুও কেন রে হৃদি শিশুর মতন
দিবানিশি নিরজনে করিছে রোদন !
মনোমত হয় নি বা যা কিছু পেয়েছে,
সকলেরি মাঝে বুঝি অভাব রয়েছে !
আশ মিটাইয়া বুঝি ভালোবাসি নাই,
ভালোবাসা পাই নি বা যতখানি চাই !
যেন গো যাহার তরে মন ব্যগ্র আছে
অশরীরী ছায়া তার দাঁড়াইয়া কাছে,

দুই বাহু বাড়াইয়া করি প্রাণপণ
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে করি আলিঙ্গন—
ছায়া শুধু— ছায়া শুধু— হৃদয় না পূরে—
তা চেয়ে রহে না কেন শত ক্রোশ দূরে ?
আমার এ উর্দ্ধশ্বাস পিপাসিত মন
নাহি অনুভবে তার হৃদয়স্পন্দন।
মন চায় হাতে তার রাখি মোর হাত
বুকে তার মাথা রাখি করি অশ্রুপাত !
সেই তো ধরিনু হাত বুকে মাথা রাখি,
দৃঢ় আলিঙ্গন তারে করি থাকি থাকি—
কিন্তু এ কি হল দায়, এ কিসের মায়া ?
কিছু না ছুঁইতে পাই, ছায়া সব ছায়া !
তাই ভাবি, মন মোর যা কিছু পেয়েছে
সকলেরি মাঝে বুঝি অভাব রয়েছে !
তৃষিত হৃদয় চায় ভালোবাসা যত
ললিতা ফিরায়ে বুঝি দেয় নাকো তত !
আমি চাই এক সুরে দুই হৃদি বাজে,
আবরণ নাহি রয় দুজনার মাঝে !
সমুদ্র চাহিয়া থাকে আকাশের পানে,
আকাশ সমুদ্রে চায় অবাক্ নয়ানে,
তেমনি দোঁহার হৃদি হেরিবে দোঁহায়—
পড়িবে উভের ছায়া উভয়ের গায় !
কিন্তু কেন, ললিতার এত কেন লাজ !
এত কেন ব্যবধান দুজনার মাঝ ?
মিলিবার তরে যাই হইয়া অধীর,
মাঝেতে কেন রে হেন লৌহের প্রাচীর ?
আমি যাই তাড়াতাড়ি করিতে আদর,
তারে হেরে উল্লাসেতে নাচে গো অন্তর,
মিলিবারে অর্দ্ধপথে সে আসে না ছুটে—
তার মুখে একটিও কথা নাহি ফুটে !
জানি গো ললিতা মোরে ভালোবাসে মনে,
যাতে আমি ভালো থাকি করে প্রাণপণে—
কিন্তু তাহে কিছুতেই তৃপ্ত নহে প্রাণ !
দুজনার মাঝে কেন এত ব্যবধান ?
যেমন নিজের কাছে লাজ নাহি থাকে
তেমনিই মনে কেন করে না আমাকে ?
কিছুই গো হল না !
সেই-সব, সেই-সব— সেই হাহাকাররব
সেই অশ্রুবারিধারা হৃদয়বেদনা !

ললিতার প্রবেশ

ললিতা। কেন গো বিষণ্ণ হেরি নাথের বদন ?
না জেনে কি দোষ কিছু করেছি এমন ?
একবার কাছে গিয়ে ধরি দুটি হাত
শুধাব কি— "হয়েছে কী ? অবোধ ললিতা সে কি
না বুঝে হৃদয়ে তব দিয়েছে আঘাত ?"
সেদিন তো শুধালেন নাথ যবে আসি
"একবার বল্ তো রে ভালো কি বাসিস মোরে ?"
মুক্তকণ্ঠে বলেছিনু "নাথ, ভালোবাসি !"
একেবারে সব লজ্জা দিনু বিসর্জন,
বুকে তাঁর মুখ রেখে করেছি রোদন—
কাঁদিয়ে কহেছি কথা, জানায়েছি সব ব্যথা
যত কথা রুদ্ধ ছিল মরমতলেতে,
এত দিন বলি বলি পারি নি বলিতে !
সেদিন তো কোনো লজ্জা ছিল নাকো আর,
কিন্তু গো আবার কেন উদিল আবার !
হেথায় দাঁড়ায়ে আমি রহি এক ধারে—
এখনি দেখিতে নাথ পাবেন আমারে !
ডাকিলেই কাছে গিয়ে সব লজ্জা বিসর্জিয়ে
একেবারে পায়ে ধরে কেঁদে গিয়ে কব,
"বলো, নাথ, কী করেছি ? কী হয়েছে তব ?"

অনিল। এমন বিষণ্ণ হয়ে বসে আছি হেথা
তবুও সে দূরে আছে— তবু সে এল না কাছে,
তবুও সে শুধালে না একটিও কথা !
পাষাণ বজ্রেতে গড়া এ লজ্জা তাহার
প্রেমবরিষার নদী ভাঙিতে নারিল যদি,
দয়াতেও ভাঙিবে না হেরি অশ্রুধার ?
লজ্জার একাধিপত্য যে নিষ্ঠুর মনে,
প্রেম দয়া যে হৃদয়ে বাস করে ভয়ে ভয়ে,
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা লজ্জার শাসনে—
অনিল, কি করিবি রে লয়ে হেন মন ?
তুই চাস মুখে তোর হেরিলে বিষাদ ঘোর
অশ্রুজলে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ !
কত না আদরে তোরি মুছাবে নয়ন !
তুই কি চাস রে হেন পাষাণমুরতি
দূরে দাঁড়াইয়া রবে— একটি কথা না কবে,
সান্ত্বনার তরে যবে তুই ব্যগ্র অতি ?
হায় রে অদৃষ্ট মোর, কিছুই হল না—
সেই-সব, সেই-সব— সেই হাহাকাররব
সেই অশ্রুবারিধারা হৃদয়বেদনা !

[অনিলের বেগে প্রস্থান

ললিতা। [স্বগত]

নয়নে আঁধার হেরি, ঘুরিছে সংসার,
মা গো মা— কোথায় মা গো— পারি নে মা আর!
বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া
গেলে তবে গেলে চলি নিষ্ঠুর— নিষ্ঠুর—
ললিতা যে এক ধারে দাঁড়ায়ে রয়েছে হা রে
একটু আদর-তরে হয়ে তৃষাতুর!
কখন্ ডাকিবে ব'লে আছে মুখ চেয়ে,
একটু ইঙ্গিতে পায়ে পড়িত গো ধেয়ে—
দেখেও, দেখেও তারে গেলে গো চলিয়া?
একবার ডাকিলে না ললিতা বলিয়া?
দোষ কি করেছি কিছু সখা গো আমার?
তার লাগি কেন না করিলে তিরস্কার?
একবার চাহিলে না, ফিরেও গো দেখিলে না,
এমন কি অপরাধ পারি করিবারে?
তবে কেন, কেন, নাথ, বলো নি আমারে?
যদি সখা, পায়ে ধ'রে শত-শতবার ক'রে
শুধাই গো, বলিবে কি, কি দোষ করেছি?
অভাগিনী যদি, নাথ, যদি ম'রে যাই—
মরণশয্যায় শুয়ে শেষ ভিক্ষা চাই,
চরণদুখানি ধুয়ে শেষ অশ্রুজলে,
দুখিনী ললিতা তব কেঁদে কেঁদে বলে,
তবুও কি ফিরিবে না? তবুও কি চাহিবে না?
তবুও কি বলিবে না কি দোষ করেছি!
তবুও কি, সখা, তুমি যাইবে চলিয়া?
একবার ডাকিবে না 'ললিতা' বলিয়া?

দ্বাদশ সর্গ

নলিনী বিজয় বিনোদ প্রমোদ অশোক সুরেশ নীরদ ও অনিল

সুরেশ। যাইতে বলিছ বালা, কোথা যাব আর?
দিগ্বিদিক হারাইয়া ও রূপ-অনলে গিয়া
এ পতঙ্গ পাখা দুটি পুড়ায়েছে তার!
রূপসী, ক্ষমতা আর নাই উড়িবার!

নলিনী। রূপ কিছু মোর না যদি থাকিত
বড়ো হইতাম সুখী,
দেখিতাম যত পতঙ্গ তোমরা
আসিতে কি লোভ দেখি!

রূপ— রূপ— রূপ— পোড়া রূপ ছাড়া
আর কিছু মোর নাই ?
তোমাদের মতো পতঙ্গের দল
চারি দিকে ঘিরে করে কোলাহল,
দিবস রজনী করে জ্বালাতন,
ঝাঁপায়ে পড়ে গো, না মানে বারণ—
পোড়া রূপ থেকে এই যদি হল
হেন রূপ নাহি চাই !
হেন কেহ নাই হায়
শুধু ভালোবাসে নলিনীবালারে,
আর কিছু নাহি চায় !

অশোকের প্রতি

এই যে অশোক ! ওই দেখ সখা—
দিবে কি আমারে দিবে কি তুলে
বক্ষ হতে মোর ফুল উড়ে গিয়ে
পড়েছে তোমার চরণমূলে !
যদি সখা ওটি রাখিতে চাও
তোমারি কাছেতে রাখিয়া দাও—
দুদণ্ডেই ওটি যাইবে শুকায়ে,
শুকায়ে গেলেই দিও গো ফেলে !
যতখন ওটি নাহি প'ড়ে ঝ'রে
ততখনো যদি মনে রাখ মোরে,
ততখনো যদি না থাক ভুলে,
তা হলেও, সখা, বড়ো ভাগ্য মানি
চিরকাল মনে সে কথা রবে !
যদি, সখা, নাহি লইতে চাও
এখনি ভূতলে ফেলিয়া দাও,
চরণে দলিয়া ফেল গো তবে !
কত শত হেন অভাগা কুসুম
আপনি পড়েছে চরণে আসি,
কত শত লোক চেয়েও দেখে নি,
চরণে দলিয়া গিয়াছে হাসি !
তবে আর কেন, ফেল গো দলিয়া—
কিসের সরম আমার কাছে ?
যে কুসুম, সখা, শাখা হতে ঝ'রে
চরণের নীচে পড়ে সাধ ক'রে,
কে না জানে বলো তাহার কপালে
চরণে দলিয়া মরণ আছে !

নীরদের প্রতি

এই যে নীরদ, এনেছ গাঁথিয়া
গোলাপ ফুলের হার !
ভুলে গেছ কেন বাছিয়া ফেলিতে
কাঁটাগুলি, সখা, তার ?
তবে গো পরায়ে দাও—
নাহয় কাঁটায় ছিঁড়িবে হৃদয়,
নাহয় এ বুক হবে রক্তময়,
এনেছ গাঁথিয়া গোলাপ যখন
তবে গো পরায়ে দাও !
কতই না কাঁটা বিঁধিয়াছে হেথা
রাখিতে গোলাপ বুকের কাছে,
জলুক্ হৃদয়— বহুক্ শোণিত—
তা বলে গোলাপ ফেলিতে আছে ?

প্রমোদের প্রতি

চাই নে তোমার ফুল-উপহার,
যাও— হেথা হতে যাও !
দুটি ফুল দিয়ে, ফুলবিনিময়ে
হাসি কিনিবারে চাও !
নলিনী, নলিনী, কেন রে হলি নি
পাষাণকঠিন-মন
দুটো কথা শুনে, দুটো ফুল পেয়ে
ভাঙে কেন তোর পণ ?
পলকে পলকে ভাঙিস গড়িস—
ভেঙে যায় মৃদু শ্বাসে,
যার 'পরে তুই করিস লো মান
সেই মনে মনে হাসে !
দেখি আজ তুই কেমন পারিস
থাকিবারে অভিমানে ?
কহিস নে কথা, হাসিস নে হাসি,
চাহিস নে তার পানে !

বিনোদ । একটি কথাও কহিল না মোরে,
পাশ দিয়া গেল চলি !
গর্বভারগুরু প্রতি পদক্ষেপে
মরমে মরমে দলি ।
কেন গো, কেন গো ; কি আমি করেছি—
কিছু তো না পড়ে মনে !

কহেছে তো কথা প্রমোদের সাথে,
অশোক নীরদ-সনে !
গেল যে হৃদয়— কতদিন আর
রবে সে এমন করি
কখনো উঠিয়া আকাশের 'পরে
কখনো পাতালে পড়ি !

অনিল। [দূর হইতে দেখিয়া]
না জানি কিসের জ্যোতি নয়নে আছে গো বালা !
যে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিক করিছ আলা।
অন্ধকারভেদী এক হাসিময় তারা-সম
প্রাণের ভিতর-পানে চাহিয়া মম !
ফিরায়ে লইনু মুখ, তবুও কেন গো দেখি
চাহিছে হৃদয়-পানে দুটি হাসিমাখা আঁখি !
আঁখি মুদি, তবু কেন হেরি গো প্রাণের কাছে
দুটি আঁখি চেয়ে আছে   এক দৃষ্টে চেয়ে আছে !
হেথা না পাইবি ঠাঁই— দূর হ তুই রে তারা—
চন্দ্রমা জোছনা করি   এ হৃদি রেখেছে ভরি,
তুই তারা সে আলোকে হইবি আপনাহারা !
দূর হ রে— দূর হ রে— দূর হ রে ক্ষুদ্র তারা !
কিন্তু কি মধুর মুখ ভাবভরে ঢলঢল !
কোমলকুসুমসম সমীরণে টলমল !
দেখি নি এহেন মুখ সুমধুর ভাবময় !
কেন ? ললিতার মুখ এ হতে কি ভালো নয় ?
আহা সে মধুর বড়ো ললিতার মুখখানি—
আঁখি কত কথা কয়, মুখেতে নাইক বাণী,
বাহির হইতে চায় তার সেই মৃদু হাসি—
অধরের চারি ধারে   কতবার উঁকি মারে,
লজ্জায় মরিয়া যায় কেবল দুই পা আসি !
তার মুখ পূর্ণরাকা   শরমের মেঘে ঢাকা,
মধুর মুখানি তার আমি বড়ো ভালোবাসি !
ললিতার চেয়ে কি গো মুখখানি ভালো এর ?
উভেরই মধুর মুখ— দুই ভাব দু-জনের—
ললিতা সে লাজময়ী মুখেতে নাইক কথা,
মাটি-পানে চেয়ে আছে যেন লজ্জাবতী লতা ;
নলিনী, নলিনীসম কেমন রয়েছে ফুটি,
বরষার নদীজল   করিতেছে টলমল
হেলি দুলি লহরীতে পড়িতেছে লুটি লুটি।
উভেরই মধুর মুখ ললিতার, নলিনীর—
অধীর সৌন্দর্য কারো- কারো বা প্রশান্ত স্থির !
কিন্তু নলিনীর মুখ ভাবের খেলার গেহ—
সেথা ভাবশিশুগুলি   করিতেছে কোলাকুলি,

কেহ বা অধরে হাসে, নয়নে নাচিছে কেহ,
এই যে অধরে ছিল এই সে নয়নে গেছে,
দু-দণ্ড খেলায়ে কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে !
কভু বা দু-তিন জনে নাচিতেছে এক সনে,
পলক পড়িতে চোখে আর তো তাহারা নাই—
নলিনীর মুখখানি ভাবের খেলার ঠাঁই !
নলিনীর মুখপানে যতই চাহিয়া থাকি
নূতন নূতন শোভা দেখিতে পায় যে আঁখি !
কিন্তু ললিতার মুখ কখনো এমন নয় ।
এত সে কয় না কথা, এত ভাব নাই সেথা,
নহে গো এমনতর অধীমাধুর্যময় !
নাই বা এমন হ'ল তাহাতে কি আছে হানি ?
নাহয় দেখিতে ভালো নলিনীর মুখখানি !
তবু ললিতারে মোর ভালো আমি বাসি তো রে !
তবু তো সৌন্দর্য তার এ হৃদি রয়েছে ভ'রে !
রূপেতে কি যায় আসে ? রূপ কেবা ভালোবাসে ?
ললিতা নলিনী-কাছে নাহয় রূপেতে হারে—
ভালোবাসি—ভালোবাসি— তবু আমি ললিতারে !

বিনোদের কাছে পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়া

নলিনী । কেন হেন আহা মলিন আনন,
আঁখি নত মাটি-পানে !
তোমারে, বিনোদ, পাই নি দেখিতে
দাঁড়াইয়া এইখানে !
শিথিল হইয়া পড়েছে ঝুলিয়া
ফুলের বলয় মোর,
দাও-না গো, সখা, দাও না তুলিয়া,
বাঁধ গো আঁটিয়া ডোর !

নলিনীর গান

এসো মন, এসো, তোমাতে আমাতে
মিটাই বিবাদ যত !
আপনার হয়ে কেন মোরা দোঁহে
রহি গো পরের মতো ?
আমি যাই এক দিকে, মন মোর !
তুমি যাও আর দিকে—
যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন
তুমি চাও তার দিকে !
তার চেয়ে এসো দুজনে মিলিয়ে
হাত ধরে যাই এক পথ দিয়ে,
আমারে ছাড়িয়া অন্য কোনোখানে
যেয়ো না কখনো আর !

পারি না কি মোরা দুজনে থাকিতে,
দোঁহে হেসে খেলে কাল কাটাইতে ?
তবে কেন তুই না শুনে বারণ
যাস্ রে পরের দ্বার ?
তুমি আমি মোরা থাকিতে দুজন,
বল্ দেখি, হৃদি, কিবা প্রয়োজন
অন্য সহচরে আর ?
এত কেন সাধ বল্ দেখি, মন,
পর-ঘরে যেতে যখন তখন—
সেথা কি রে তুই আদর পাস্
বল্ তো কত-না সহিস যাতনা ?
দিবানিসি কত সহিস লাঞ্ছনা ?
তবু কি রে তোর মিটে নি আশ ?
আয়, ফিরে আয়, মন, ফিরে আয়—
দোঁহে এক সাথে করিব বাস !
অনাদর আর হবে না সহিতে,
দিবস রজনী পাষাণ বহিতে,
মরমে দহিতে, মুখে না কহিতে,
ফেলিতে দুখের শ্বাস !
শুনিলি নে কথা ? আসিলি নে হেথা ?
ফিরিলি নে একবার ?
সখি লো, দুরন্ত হৃদয়ের সাথে
পেরে উঠি নে তো আর !
"নয় রে সুখের খেলা ভালোবাসা !"
কত বুঝালেম তায়—
হেরিয়া চিকণ সোনার শিকল
খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল,
খেলাতে খেলাতে না জেনে না শুনে
জড়ায় নিজের পায় !
বাহিরিতে চায়, বাহিরিতে নারে,
করে শেষে হায়-হায় !
শিকল ছিঁড়িয়ে এসেছে ক'বার,
আবার কেন রে যায় ?
চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
না জানি কি সুখ পায় !
তিলেক রহে না আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি,
এমন দুরন্ত হৃদয় লইয়া,
সজনি, বল্ কি করি ?

—

অনিল। ওঠ্ হেথা হতে— চল্ চল্ যাই,
কি কারণে হেথা আছিস্ আর!
মুদিয়া আসিছে মনের নয়ন,
মনের চরণে পড়িছে ভার!
ললিতা আমার, না থাকুক্ রূপ,
নাই বা গাহিতে পারিলি গান,
ভালোবাসি তোরে, ভালোবাসিব রে
যত দিন দেহে রহিবে প্রাণ!

নলিনী ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান

নলিনী। পারি নে তো আর, বসি এইখানে,
ওই যে এ দিকে আসিছে কবি!
কথা আজ মোরে কহিতে হইবে,
র'ব না বসিয়া অচল ছবি!
কি কথা বলিব? ভাবিতেছি মনে,
কিছুই তো ভেবে নাহিক পাই!
বলিব কি তারে— "তোমরা কবি গো,
তোমাদের ভালোবাসিতে নাই!
বুঝিতে পার না আপনার মন,
দিবানিশি বৃথা কর গো শোক!
ভালোবাসা-তরে আকুল হৃদয়,
ভালোবাসিবার পাও না লোক!
মনে তোমাদের সৌন্দর্য জাগিছে
ধরায় তেমন পাও না খুঁজে,
তবুও তো ভালোবাসিতেই হবে
নহিলে কিছুতে মন না বুঝে।
অবশেষে কারে পাও দেখিবারে
নেশায় আপনা ভুলি,
সাজাইয়া দেয় কলপনা তারে
নিজের গহনা খুলি।
আসি কলপনা কুহকিনীবালা
নয়নে কি দেয় মায়া,
কলপনা তারে ঢেকে রাখে নিজে
দিয়ে নিজ জ্যোতিছায়া
কল্পনাকুহকে মায়া মুগ্ধ চোখে
কি দেখিতে দেখ কিবা,
অপরূপ সেই প্রতিমা তাহার
পূজ মনে নিশি দিবা!
যত যায় দিন, যত যায় দিন,
যত পাও তারে পাশে,

দেবীর জ্যোতি সে হারায় তাহার
মানুষ হইয়া আসে !
ভালোবাসা যত দূরে চলি যায়
হাহাকার কর মনে,
কলপনা কাঁদে ব্যথিত হইয়া
আপনার প্রতারণে !
আমি গো অবলা— কবির প্রণয়
অত নাহি করি আশা,
আমি চাই নিজ মনের মানুষ
সাদাসিদে ভালোবাসা !"
এমনি করিয়ে বাতাসের 'পরে
মিছে অভিমান বাঁধি
অকারণে তার করিব লাঞ্ছনা
অভিমানে কাঁদি কাঁদি ।
কিছুতে সান্ত্বনা না আমি মানিব,
দূরেতে যাইব চলে—
কাছেতে আসিতে করিব বারণ
করুণ চোখের জলে !

ত্রয়োদশ সর্গ

অনিল ও ললিতা

ললিতা । ভেঙেছে ভেঙেছে যত লজ্জা ললিতার ।
মুক্তকণ্ঠে শুধাইছে, সখা, বার বার—
কী করিব বলো দেখি তোমার লাগিয়া ?
কি করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া ?
এই পেতে দিনু বুক— রাখ, সখা, রাখ মুখ—
ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিব জাগিয়া !
খুলে বলো, বলো সখা, কী দুঃখ তোমার !
অশ্রুজলে মিশাইব অশ্রুজলধার ।
একদিন বলেছিলে মোর ভালবাসা
পেলেই পূরিবে তব প্রণয়পিপাসা !
বলেছিলে সব তব করিছে নির্ভর
পৃথিবীর সুখ দুঃখ আমারি উপর ।
কই সখা ? প্রাণ মন করেছি তো সমর্পণ,
দিয়েছি তো যাহা কিছু ছিল আপনার—
তবু কেন শুকাল না অশ্রুবারিধার ?

অনিল। ললিতা রে, ললিতা রে, আমার কিসের দুখ
হৃদয়ে জাগিছে যবে ওই তোর মধুমুখ!
জীবননিশীথ মোর ও রবিকিরণে তোর
একেবারে মিশায়েছি আপনারে পাশরিয়া—
মাঝে মাঝে হৃদাকাশে যদিও বা মেঘ আসে,
ভিতরে তবুও হাসে সে রবিকিরণ প্রিয়া!
ওই স্নিগ্ধ আঁখি দুটি হৃদয়ে রহিয়া ফুটি
রেখেছে ফুল ফুটায়ে প্রাণের বিজন বনে!
তব প্রেমসুধাধারা ঝরিয়া নির্ঝর-পারা
তুলেছে হরিত করি এই মরুভূমি-মনে।
তব হাসি জ্যোৎস্না-সম এ মুগ্ধ নয়নে মম
সারা জগতের মুখে ফুটায়ে রেখেছে হাসি।
তুমি সদা আছ কাছে তাই দিবালোক আছে,
নহিলে জগতে মোর কাঁদিত আঁধাররাশি।
আয় সখি, বুকে আয়, উলসি উঠেছে প্রাণ—
ত্বরা ক'রে যা লো বালা, বাঁশি আন্, বীণা আন্!
আজি এ মধুর সাঁঝে রাখি এ বুকের মাঝে
মধুর মুখানি তোর, ধীরে ধীরে কর্ গান।

ললিতা। না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন!
যবে অশ্রুজল হায় উচ্ছ্বসি উঠিতে চায়,
রুধিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ।
চিনি সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি,
ওর চেয়ে কত ভালো অশ্রুজলরাশি।
মাথা খাও, অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা!
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
ভালো যদি বাস তবে রাখ এ প্রার্থনা!

চতুর্দশ সর্গ

মুরলা ও কবি

কবি। কত দিন দেখিয়াছি তোরে, লো মুরলে,
একেলা কাঁদিতেছিস বসিয়া বিরলে।
করতলে রাখি মুখ— কি জানি কিসের দুখ—
বড়ো বড়ো আঁখিদুটি মগ্ন অশ্রুজলে!
বড়ো, সখি, ব্যথা লাগে হেরি তোর মুখ!
এমন করুণ আহা! ফেটে যায় বুক।

ভালো কি বাসিস কারে ? কত দিন বল্
পোষণ করিবি হৃদে হৃদয়ে-অনল ?
যত তোর কথা আছে বলিস আমার কাছে,
এত স্নেহ কোথা পাবি— এত অশ্রুজল ?

মুরলা। কারে বা ভালোবাসিব কবি গো আমার ?
ভালোবাসা সাজে কি গো এই মুরলার ?
সখা, এত আমি দীন, এতই গো গুণহীন,
ভালোবাসিতে যে, কবি, মরি গো লজ্জায় !
যদি ভুলি আপনারে, যদি ভালোবাসি কারে,
সে জন ফিরেও কভু দেখে কি আমায় ?
যদি বা সে দয়া ক'রে আদর করে গো মোরে,
সংকোচেতে দিবানিশি দহি না কি তবু ?
তাই, কবি, বলি তাই— ভালো যে বাসিতে নাই,
ভালোবাসা মুরলারে সাজে কি গো কভু ?
দূর হোক— মুরলার কথা দূর হোক—
মুরলার দুখজ্বালা মুরলার র'ক—
বলো, কবি, গেছিলে কি নলিনীর কাছে ?
নলিনীর কথা কিছু বলিবার আছে ?

কবি। সখি লো, বড়োই মনে পাইয়াছি ব্যথা !
কাল আমি সন্ধ্যাকালে গিয়েছিনু সেথা—
পথপার্শ্বে সেই বনে নীরবে আপনমনে
দেখিতেছিলাম একা বসি কতক্ষণ
সন্ধ্যার কপোল হতে সুধীরে কেমন
মিলায়ে আসিতেছিল সরমের রাগ—
একটি উঠেছে তারা, বিপাশা হরষে হারা
ছায়া বুকে লয়ে কত করিছে সোহাগ !
কতক্ষণ পথ চেয়ে রয়েছি বসিয়া—
এমন সময়ে হেরি সখীদের সঙ্গে করি
আসিছে নলিনীবালা হাসিয়া হাসিয়া !
নাচিয়া উঠিল মন হরষে উল্লাসে,
রহিনু অধীর হয়ে মিলনের আশে।
কিন্তু নলিনীর কেন চরণ উঠে না যেন,
দুই পা চলিয়া যেন পারে না চলিতে !
কেহ যেন তার তরে বসে নাই আশা ক'রে,
সে যেন কাহারো সাথে আসে নি মিলিতে !
কোনো কাজ নাই তাই এসেছে খেলিতে !
যেতে যেতে পথমাঝে যদি হেরে ফুল
করতালি দিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি যায় ছুটে—
আনে তুলে, পরে চুলে, হেসেই আকুল !
কভু হেরি প্রজাপতি কৌতূহলে ব্যগ্র অতি
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া যায় তার কাছে।

কভু কহে, "চল্ সখি, সেই চাঁপা গাছে
আজিকে সকাল বেলা কুঁড়ি দেখেছিনু মেলা,
এতক্ষণে বুঝি তারা উঠিয়াছে ফুটে,
চল্, সখি, একবার দেখে আসি ছুটে !"
কত-না বিলম্ব পথে করিল এমন,
বড়োই অধীর হয়ে উঠিল গো মন ।
কতক্ষণ পরে শেষে গান গেয়ে হেসে হেসে
যেথা আমি বসেছিনু আসিল সেথায়—
চলিয়া গেল সে, যেন দেখে নি আমায় !
একেলা বসিয়া আমি রহিনু আঁধারে
সমস্ত রজনী, সখি, সেই পথধারে ।
কেন, সখি, এত হাসি, এত কেন গান ?
কিসের উল্লাসে এত পূর্ণ ছিল প্রাণ ?
মন এক দলিবার আছে গো ক্ষমতা,
যখন তখন খুসী দিতে পারে ব্যথা,
তাই গর্বে কোনো দিকে ফিরেও না চায় ?
তাই এত হাসে হাসি, এত গান গায় ?
কৃপাণ যে হাসি হাসে ঝলসি নয়ন,
বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে অশনিদশন !
অথবা হয়ত, সখি, আমারিই ভুল ;
হয়ত সে মনে মনে কল্পনায় অকারণে
প্রণয়ে সন্দেহ ক'রে হয়েছে আকুল !
অভিমানে জানাইতে চায় মোর কাছে—
রাখে না আমার আশা, নাই কিছু ভালোবাসা,
ভালো না বেসেও মোরে বড়ো সুখে আছে !
যখন গাহিতেছিল মরমে দহিতেছিল—
হাসি সে মুখের হাসি আর কিছু নয়,
গোপনে কাঁদিতেছিল অশান্ত হৃদয় !
আজ আমি তার কাছে যাই একবার—
শুধাই, অমন ক'রে কেন সে নিষ্ঠুরা মোরে
দিয়াছে বেদনা দলি হৃদয় আমার ?

[কবির প্রস্থান

মুরলা । আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে নিস্তব্ধ গভীর—
তারা নাহি দেখা যায় কুয়াশা-ভিতরে,
একটি একটি করে পড়িছে শিশির
মুরলার মাথার শুকানো ফুল-'পরে !
জীর্ণ শাখা শীতবায়ে উঠে শিহরিয়া,
গাছের শুকানো পাতা পড়িছে ঝরিয়া !
ওঠ্ লো মুরলা, ওঠ্, দিন হল শেষ,
পর্ লো মুরলা, পর্ সন্ন্যাসিনীবেশ ।
মুরলা ? মুরলা কোথা ? গেছে সে মরিয়া—

সেই যে দুখিনী ছিল বিষণ্ণ মলিন,
সেই যে ভালোবাসিত হৃদয় ভরিয়া,
সেই যে কাঁদিত বনে আসি প্রতিদিন,
সে বালা মরিয়া গেছে, কোথায় সে আর ?
ছিন্ন বস্ত্র, ম্লান মুখ, লয়ে দুঃখভার,
তাহার সে বুকের লুকানো কথা লয়ে
মরেছে সে বালা আজ সন্ধ্যার উদয়ে !
তবে এ কাহারে হেরি নিশীথে শ্মশানে ?
ও একটি উদাসিনী সন্ন্যাসিনী যায়—
কারেও বাসে না ভালো, কারেও না জানে,
আপনার মনে শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়
একটি ঘটনা ওর ঘটে নি জীবনে,
একটি পড়ে নি রেখা ওর শূন্য মনে !
পথ ছাড়, পান্থ, কিবা শুধাইছ আর ?
জীবনে কাহিনী কিছু নাই বলিবার !
মুরলা, সত্যই তবে হলি সন্ন্যাসিনী ?
সত্যই ত্যজলি তোর যত কিছু আশা ?
তবে রে বিলম্ব কেন, বসিয়া আছিস হেন
এখনো কি— এখনো কি সব ফুরায় নি ?
এখনো কি মনে মনে চাস ভালোবাসা ?
বড়ো মনে সাধ ছিল রহিব হেথায়—
কষ্ট পাই, দুঃখ পাই, রব তাঁরি সাথ—
আজন্ম কালের তাঁর সহচরী হায়
আমরণ বেড়াইব ধরি তাঁরি হাত !
কিছুতে নারিনু অশ্রু করিতে দমন,
কিছুতে এল না হাসি বিষণ্ণ বদনে,
সদাই এড়াতে হ'ত কবির নয়ন,
কাঁদিতে আসিতে হ'ত এ আঁধার বনে !
আজিকে সুখের দিন কবির আমার,
হৃদয়ে তিলেক নাই বিষাদ-আঁধার,
নূতন প্রণয়ে মগ্ন তাঁহার হৃদয়
বিশ্বচরাচর হেরে হাস্যসুধাময় !
এখন, মুরলা আমি, কেন রহি আর ?
যেখানেই যান কবি হর্ষে হাসি হাসি
সেথাই দেখিতে পান এ মুখ আমার—
বিষাদের প্রতিমূর্তি অন্ধকাররাশি !
ওঠ্ লো মুরলা তবে— দিন হ'ল শেষ !
পর্ লো মুরলা তবে সন্ন্যাসিনীবেশ !
বেড়াইবি তীর্থে তীর্থে, ত্যজিবি সংসার—
ভুলে যাবি যত কিছু আছে আপনার !
কত শত দিন কত বর্ষ যাবে চলি—

তখন কপালে তোর পড়েছে ত্রিবলী,
নয়ন হইয়া তোর গেছে জ্যোতিহীন,
কত কত বর্ষ গেছে কত দিন—
এই গ্রামে ফিরিয়া আসিবি একবার,
যাইবি মাগিতে ভিক্ষা কবির দুয়ার,
দেখিবি আছেন সুখে নলিনীরে লয়ে
দুইজনে একমন একপ্রাণ হয়ে !
কত-না শুনাইছেন কবিতা তাহারে !
কত-না সাজাইছেন কুসুমের হারে !
মোরে হেরে কবি মোর অবাক্ নয়নে
মোর মুখপানে চেয়ে রহিবেন কত,
মনে পড়ি পড়ি করি পড়িবে না মনে
নিশীথের ভুলে-যাওয়া স্বপনের মতো!
কতক্ষণ মুখপানে চেয়ে থেকে থেকে
সবিস্ময়ে নলিনীরে কহিবেন ডেকে,
"যেন হেন মুখ আমি দেখেছিনু প্রিয়া !
কিছুতেই মনে তবু পড়িছে না আর !"
অমনি নলিনীবালা উঠিবে হাসিয়া—
কহিবে, "কল্পনা, কবি, কল্পনা তোমার !"
শুনিয়া হাসিবে কবি, ফিরাবে নয়ন,
নলিনীর পাখিটিরে করিবে আদর—
আমিও সেখান হতে করিব গমন
ভ্রমিয়া বেড়াতে পুনঃ দূর দেশান্তর !
ওঠ্ লো মুরলা তবে— দিন হ'ল শেষ
পর্ লো মুরলা তবে সন্ন্যাসিনীবেশ !
থাক্ থাক্, আজ থাক্, আজ থাক্ আর !
কবিরে দেখিতে হবে আরেকটি বার !
কাল হব সন্ন্যাসিনী, বরিব বিরাগে—
দেখিব আরেক বার যাইবার আগে ।

পঞ্চদশ সর্গ

কবি ও মুরলা

মুরলা । কবি গো আমার, যদি আমি ম'রে যাই
তা হলে কি বড়ো কষ্ট হয় গো তোমার ?
কবি । ওকি কথা মুরলা লো, বলিতে যে নাই !
তুই ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী আমার !
কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, মোছ্ অশ্রুধার !

আহা, সখি, বড়ো সুখী হই আমি মনে
যদি দেখি প্রেমে তুই পড়েছিস্ কার,
সুখেতে আছিস্ তোরা মিলি দুইজনে !
নিরাশ্রয় মনে আসে কত কি ভাবনা,
কিছুতে অধীর হৃদি মানে না সান্ত্বনা—
সজনি, অমন সব ভাবনা-আঁধার
ভাবিস্ নে কখনো লো, ভাবিস্ নে আর !

মুরলা। কবি গো, রজনীগন্ধা ফুটেছিল গাছে—
তুমি ভালোবাস ব'লে আপনি এনেছি তুলে,
নেবে কি এ ফুলগুলি, রাখিবে কি কাছে ?

কবি। সখি লো, নলিনী কাল দুটি চাঁপা তুলে
পরায়ে দেছিল মোর দুই কর্ণমূলে,
পরশিতে দলগুলি পড়িছে ঝরিয়া,
এখনো সুবাস তার যায় নি মরিয়া !

মুরলা। দেখি সখা, একবার দেখি হাতখানি—
এ হাত কাহারে, কবি, করিবে অর্পণ ?
কত ভালো তোমারে সে বাসিবে না জানি !
না জানি, তোমারে কত করিবে যতন !
কিসে তুমি রবে সুখী সকলি সে জানিবে কি ?
দেখিবে কি প্রতি ক্ষুদ্র অভাব তোমার ?
তোমার ও মুখ দেখি অমনি সে বুঝিবে কি
কখন পড়েছে হৃদে একটু আঁধার !
অমনি কি কাছে গিয়ে কত-না সান্ত্বনা দিয়ে
দূর করি দিবে সব বিষাদ তোমার ?
তাই যেন হয়, কবি, আর কিবা চাই—
তা হ'লেই সুখী হব রহি না যেথাই।

কবি। মুরলা, সখি লো,
কেন আজ মন মোর উঠিছে কাঁদিয়া ?
বিষাদ ভুজঙ্গসম কেন রে হৃদয় মম
দলিতেছে চারি দিকে বাঁধিয়া বাঁধিয়া ?
ছেলেবেলা হতে যেন কিছুই হল না,
যত দিন বেঁচে রব কিছুই হবে না,
এমনি করেই যেন কাটিবেক দিন,
কাঁদিয়া বেড়াতে হবে সুখশান্তিহীন !
কেহ যেন নাই মোর, রবে নাকো কেহ—
ধরায় নাইক যেন বিশ্রামের গেহ।
কিছু হারাই নি তবু খুঁজিয়া বেড়াই,
কিছুই চাই না তবু কি যেন কি চাই !
কোনো আশা না করিয়া নৈরাশ্যেতে দহি,
কোনো কষ্ট না পাইয়া তবু কষ্ট সহি !
কেন রে এমন কেন হল আজ মন ?

দিয়েছি তো, পেয়েছি তো ভালোবাসা-ধন !
তুই কাছে আয় দেখি, আয় একবার,
মুখ তোর রাখ্ দেখি বুকেতে আমার !
দেখি তাহে এ হৃদয় শান্তি পায় যদি !
কে জানে উচ্ছ্বসি কেন উঠিতেছে হৃদি !
দেখি তোর মুখখানি সখি, তোর মুখখানি—
বুকে তোর মুখ চাপি—কেন, সখি, কেন
সহসা উচ্ছ্বসি কাঁদি উঠিলি রে হেন ?
যেন বহুক্ষণ হতে যুঝিয়া যুঝিয়া
আর পারিল না, হৃদি গেল গো ভাঙিয়া !
কী হয়েছে বল্ মোরে, বল্, সখি, বল্—
লুকাস্ নে, লুকাস্ নে দুখ-অশ্রুজল !
পৃথিবীতে কেহ যদি নাহি থাকে তোর
এই হেথা এই আছে এই বক্ষ মোর !
এ আশ্রয় চিরকাল রহিবে তোমার,
এ আশ্রয় কখনোই হারাবি নে আর !
কাঁদিবি যখন চাস্ হেথা মুখ ঢাকি,
তোর সাথে বরষিবে অশ্রু মোর আঁখি !

মুরলা। তুমি সুখী হও, কবি, এই আমি চাই—
তুমি সুখী হলে মোর কোনো দুঃখ নাই !

কবি। আমি সুখী নই সখি, সুখী কেবা আর ?
বল্ দেখি মুরলা লো কি দুঃখ আমার !
অমন নলিনী মোর হৃদয়ের ধন
সে আমার— সে আমার আছে গো যখন,
পেয়েছি যখন আমি তার ভালোবাসা,
তখন আমার আর কিসের বা আশা ?
পেয়েছি যখন আমি তোর মতো সখী—
দুখে মোর দুখ পায়, সুখে মোর সুখী—
তবে বল্ দেখি, সখি, কি দুঃখ আমার ?
তবে যে উঠেছে মনে বিষাদ-আঁধার
শরতের মেঘসম দু-দণ্ডে মিলাবে,
কোথা হতে আসিয়াছে কোথায় বা যাবে !
এখনি নলিনী-কাছে যাই একবার,
এখনি ঘুচিবে এই বিষাদের ভার !
মুরলা সখি লো, তুই থাকিস্ হেথাই,
ফিরে এসে পুনঃ যেন দেখিবারে পাই !

[কবির প্রস্থান

মুরলা। ফিরে এসে মুরলারে পাবে না দেখিতে !
কবি মোর, আরেকটু যদি গো থাকিতে !
নলিনী তো চিরজন্ম রহিবে তোমার,
আমি যে ও মুখ কভু হেরিব না আর !

ও মুখ কি আর কভু পাব না দেখিতে
যত দিন হবে মোরে বাঁচিয়া থাকিতে ?
পল যাবে, দণ্ড যাবে, দিন যাবে, মাস যাবে,
বর্ষ বর্ষ করি যাবে জীবন আমার—
ও মুখ দেখিতে তবু পাব নাকো আর ?
মুরলা, পারিবি তুই ? পারিবি থাকিতে ?
দারুণ পাষাণে মন বাঁধিয়া রাখিতে ?
না, না, না, মুরলা তুই যাইবি কোথায় ?
অসীম সংসারে তোর কে আছে রে হায় ?
হবে যা অদৃষ্টে আছে, থাকিস কবির কাছে—
কবি তোর সুখ শান্তি হৃদয়ের ধন,
থাকিস জড়ায়ে ধরি কবির চরণ,
কবির চরণে শেষে ত্যজিস জীবন !
কিন্তু স্বার্থপর তুই কি করিয়া র'বি ?
বিষণ্ণ ও মুখ তোর নিরখিয়া কবি
এখনো কাঁদেন যদি, এখনো তাঁহার হৃদি
পুরানো বিষাদ যদি করে গো স্মরণ ?
সেই ছেলেবেলাকার বিষাদযন্ত্রণাভার
আমি যদি তাঁর মনে জাগাইয়া রাখি—
তবে, রে হতভাগিনী, কি বলিয়া থাকি !
তবে আমি যাই, তবে যাই, তবে যাই—
কেহ মোর ছিল নাকো, কেহ মোর নাই !
মুরলা বলিয়া কেহ আছে কি ভুবনে ?
মুরলা বলিয়া যারে ভাবিতেছি মনে
সে একটি নিশীথের স্বপ্ন মোহময়,
দেখিব স্বপন ভাঙি মুরলা সে নয় !
নাই তার সুখ দুখ, নাই ভালোবাসা,
নাই কবি— নাই কেহ— নাই কোনো আশা !
কেহই সে নয়, আর কেহ তার নাই,
তবে কি ভাবনা আর— যেথা ইচ্ছা যাই !
কিন্তু কবি মোর, আহা ভালোবাসাময়,
আমারে না দেখে যদি তাঁর কষ্ট হয় ?
থাম্ থাম্, মুরলা রে, কেন মিছে বারে বারে
মনেরে প্রবোধ দিস ও কথা বলিয়া !
শুনিলে জগৎ যে রে উঠিবে হাসিয়া !
চল্ তুই, চল্ তুই— যেথা ইচ্ছা চল্ তুই,
কেহ নাই তোর লাগি কাঁদিবার তরে !
তবে চলিলাম, কবি, দূর দেশান্তরে !
অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
যদি আমি ভালোবাসি কবিরে আমার
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—

সখারে আমার আমি ভালোবাসি যত
নলিনীবালাও যেন ভালোবাসে তত !
নলিনীবালার যত আছে দুখজ্বালা
সব যেন মোর হয়, সুখে থাক্ বালা !
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম—
মুরলা করিছে এই বিদায়প্রণাম !

ষোড়শ সর্গ

ললিতা

কে জানে নাথের কেন হল গো এমন ?
জানি না কি ভাবিবারে যান বিপাশার ধারে,
ললিতার চেয়ে ভালোবাসেন বিজন !
কভুবা আছেন যবে বিরলে বসিয়া
আমি যদি যাই কাছে হাসিয়া হাসিয়া
বিরক্তিতে ভুরু কেন আকুঞ্চিয়া উঠে যেন,
বিরক্তি জাগিয়া উঠে অধরখানিতে,
আপনি যেন গো তাহা নারেন জানিতে !
সহসা চমকি উঠি কি যেন হয়েছে ত্রুটি
আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান,
কি কথা ভাবিতেছেন বুঝাইতে চান,
না পারেন বুঝাইতে— সরমে আকুল চিতে
কি কথা বলিতে হবে ভাবিয়া না পান !
কেন ত্যজি ললিতারে এলেন বিপাশাপারে
শতেক সহস্র তার কারণ দেখান,
তা লাগি করেছি যেন কত অভিমান !
আপনি বলেন আসি "ভালোবাসি ভালোবাসি",
সন্দেহ করেছি যেন প্রণয়ে তাঁহার,
তা লাগি করেছি যেন কত তিরস্কার !
সহসা কাননে এলে আমারে দেখিতে পেলে
লুকাইয়া দ্রুত পদে পালান চকিতে
মনে ভাবি' আমি তাঁরে পাই নি দেখিতে !
কি করি ! কি হবে মোর ! বড়ো হয় ভয় !
লজ্জা ক'রে ললিতা রে হারালি প্রণয় !
লজ্জা কই, ললিতার লজ্জা কোথা আজ ?
ভেঙেছেও ললিতা সে ভেঙেছে তো লাজ !

ক্রুদ্ধ হইয়া

ধিক্ রে ! এই কি লজ্জা ভাঙিবার কাল ?
ভেঙেছে শরম যবে ভেঙেছে কপাল !
আর কিছু দিন আগে ঘোচে নাই ভ্রম ?
আর কিছু দিন আগে ভাঙে নি শরম ?
কাঁদিতে বসিলি আজ শিশুটির মতো ?
কিছু দিন আগে কেন ভাবিলি নে এত ?
মিছা কি মনেরে তুই দিস রে প্রবোধ ?
দেখি নি তো' হতে আর অধম অবোধ !
তুই যদি কষ্ট পাস দোষ দিব কার ?
তোর মতো অবোধের কষ্ট পুরস্কার !
যত কষ্ট আছে তুই সব কর্ ভোগ—
অশ্রুজলে তোর দিন অবসান হোক !
নিজের চরণ দিয়া নিজহৃদি বিদলিয়া
হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোন্ দিন রাত !
হারায়ে সর্বস্ব ধন কর্ অশ্রুপাত !
আগে কেন বুঝিলি নে, আগে কেন ভাবিলি নে,
কিছু দিন আগে লজ্জা নারিলি ভাঙিতে !
মিছা হৃদয়েরে আজ চাস প্রবোধিতে !
যেমন করিলি কাজ ফল ভোগ কর্ আজ,
পর হোক যেই জন ছিল আপনার—
তুই যদি কষ্ট পাস দোষ দিব কার ?

সপ্তদশ সর্গ

মুরলা। প্রান্তরে

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে—
তারি তরে উঠে রবি শশী তারা,
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাইকো আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
একটি যাহার নাই সখা সখী
কেহই তাহার নহেক পর !
আর কি সে চায় ? রয়েছে যখন
আপনি সে আপনার,
কিসের ভাবনা তার ?

কিন্তু যে জনের প্রাণের মনের
একজন শুধু আছে,
রবি শশী তার সেই এক জন,
সেই তার প্রাণ, সেই তার মন,
সেই সে জগৎ তাহার কাছে—
জগৎ সেজন-ময়,
আর কেহ কেহ নয় !
পৃথিবীর লোক সেই এক জন—
যদি সে হারায় তাকে
আর তার তরে রবি নাহি উঠে,
আর তার তরে ফুল নাহি ফুটে,
কিছু তার নাহি থাকে !
বহিছে তটিনী, বহিছে তটিনী,
তটিনী রহিছে না—
গাহিছে বিহগ, গাহিছে বিহগ,
বিহগ গাহিছে না ।
সমস্ত জগৎ গেছে ধ্বংস হয়ে,
নিভেছে তপন শশী—
সারা জগতের শ্মশানমাঝারে
সে শুধু একেলা বসি !
কি একটি বালু-কণার উপরে
তাহার সমস্ত জগৎ ছিল !
নিশ্বাস লাগিতে খসিল বালুকা,
নিমেষে জগৎ মিশায়ে গেল !
হা রে হা অবোধ, জীবন লইয়া
হেন ছেলেখেলা করিতে আছে
ক্ষণস্থায়ী ওই তিলেকের 'পরে
সমস্ত জগৎ গড়িতে আছে !
মুহূর্তকালের ক্ষীণমুষ্টিমাঝে
তোর চিরকাল রাখিতে আছে !
রাখ্ রে ছড়ায়ে হৃদয়টি তোর
সমস্তজগৎময় !
জগৎসাগরে বিম্ব যত আছে
কেহই কাহারো নয় !
সে বিম্বের 'পরে রাখিস্ নে তুই
কোন আশা মন মোর !
সহসা দেখিবি বিম্বটির সাথে
ভেঙেছে সর্বস্ব তোর ।
ওরে মন, তোর অগাধ বাসনা
সমস্ত জগৎ করুক গ্রাস !
সমস্ত জগৎ ঘেরিয়া রাখ্ রে,

হৃদয় রে, তোর সুখের আশ।
সন্ন্যাসিনী তুই, কাঁদিস রে কেন ?
কেন রে ফেলিস দুখের শ্বাস ?
গেছে ভেঙে তোর একটি জগৎ,
আরেক জগতে করিবি বাস।
সে জগৎ তোর তরে হয় নি রে,
অদৃষ্টের ভুলে গেছিলি সেথা—
সেথায় আলয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কতই না তুই পাইলি ব্যথা !
তোর নিজদেশে এসেছিস এবে,
কেহ নাই তোরে কহিতে কথা—
আদর কাহারো পাস নে কখনো,
আদর কাহারো চাস নে হেথা।
এখনো তো এই নূতন জীবনে
সুখ দুখ কিছু ঘটে নি তোর—
দিবসের পরে আসিছে দিবস,
রজনীর পরে রজনী ভোর !
দিবস রজনী নীরব চরণে
যেমন যেতেছে তেমনি যাক—
কাঁদিস নে তুই, হাসিস নে তুই
যেমন আছিস তেমনি থাক্ !
সে জগতে ছিল কাহারো বা দুখ
কারো বা সুখের রাশি,
এ জগতে যত নিবাসী জনের
নাহিক রোদন হাসি—
সকলেই চায় সকলের মুখে,
শুধায় না কেহ কথা—
নাইক আলয়, চলেছে সকলে
মন যার যায় যেথা !

অষ্টাদশ সর্গ

ললিতা

আদর করিয়া কেন না পাই আদর ?
লজ্জা নাই কিছু নাই, না ডাকিতে কাছে যাই—
সংকোচে চরণ যেন করে থর থর—
ধীরে ধীরে এক পাশে বসি পদতলে !
বড়ো মনে সাধ যায় মুখখানি তুলে চায়,
বারেক হাসিয়া কাছে বসিবারে বলে !

বড়ো সাধ কাছে গিয়ে মুখখানি তুলে নিয়ে
চাপিয়া ধরি গো এই বুকের মাঝার,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে কাঁদি একবার !
সে কেন্ বারেক চেয়ে কথাও না কয়,
পাষাণে গঠিত যেন, স্থির হয়ে রয় !
যেন রে ললিতা তার কেহ নয়— কেহ নয়—
দাসীর দাসীও নয়, পথের পথিকো নয় !
যেন একেবারে কেহ— কেহ নাই কাছে,
ভাবনা লইয়া তার একেলা সে আছে !
কী যেন দেখিছে ছবি আকাশের পটে,
মুহূর্তের তরে যেন মনে মনে ভাবে হেন—
"ললিতা এসেছে বুঝি, বসেছে নিকটে,
সে এমন মাঝে মাঝে এসে থাকে বটে !"
মাঝে মাঝে আসে বটে, পারে না যে নাথ—
সখা গো, নিতান্ত তাই কথাটি শুধাতে নাই ?
বারেক করিতে নাই স্নেহনেত্রপাত ?
নিতান্তই পদতলে পড়ে থাকে বটে !
সখা, তাই কি গো তারে তুলিয়া উঠাবে না রে,
বারেক রাখিবে নাকি বুকের নিকটে !
লতা আজ লুটাইয়া আছে পদমূলে,
মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে— আপনারে ভুলে—
প্রাণপণে ভালোবেসে জড়ায়ে জড়ায়ে শেষে
এক দিন উঠিবে সে বুকে মাথা তুলে,
শাখাটি বাঁধিতে দিবে আলিঙ্গনে তার,
দুখিনীর সে আশা কি বড়ো অহংকার ?
কি করেছি অপরাধ বুঝিতে না পারি !
দিন রাত্রি, সখা, আমি রয়েছি তোমারি—
কিসে তুমি ভালো রবে, কিসে তুমি সুখী হবে,
দিন রাত সে ভাবনা জাগিছে অন্তরে !
মুহূর্ত ভাবি না আমি আপনার 'তরে ।
তারি বিনিময়ে কি গো এত অনাদর !
শতখানা ফেটে যায় বুকের ভিতর ।
সখা, আমি অভিমান কভু করি নাই—
মনে করিতেও তাহা লাজে মরে যাই ।
ধীরে ধীরে এনে কাছে মনে মনে হাস পাছে—
"দুখিনী ললিতা সেও অভিমান করিয়াছে !"
তাই অভিমান কভু মনেও না ভায়,
অশ্রুজল হেরে পাছে হাসি তব পায় !
বুকে বড়ো ব্যথা বাজে, তাই ভাবি মাঝে মাঝে
ভিক্ষুকের মতো গিয়া পড়ি তব পায়—
কেঁদে গিয়ে ভিক্ষা করি করিয়া বিনয়,

"সর্বস্ব দিয়েছি ওগো— পরান হৃদয়—
হৃদয় দিয়েছি বলে হৃদয় চাহি না ভুলে—
একটু ভালোবাসিও, আর কিছু নয় !"
পাছে গো চাহিলে ভিক্ষা, ধরিলে চরণে,
বিরক্ত বা হও তাই ভয় করি মনে।
তবে গো কি হবে মোর ! জানাব কি করে ?
এমন ক'দিন আর রব প্রাণ ধরে ?
হা দেবি ! হা ভগবতি ! জীবন দুর্ভর অতি !
কিছুতে কি পাব নাকো ভালোবাসা তাঁর ?
তবে নে মা, কোলে নে মা, কোথাও আশ্রয় দে মা—
একটু স্নেহের ঠাঁই দেখা মা আমার !

চপলার প্রবেশ

চপলা। ললিতাও হলি নাকি মুরলার মতো !
তেমনি বিষাদময় আঁখি দুটি নত।
তেমনি মলিন মুখে আছিস কিসের দুখে,
তোদের একি এ হল ভাবি লো কেবল—
চপলারে তোরা বুঝি করিবি পাগল !
ছেলেবেলা বেশ ছিলি, ছিল না তো জ্বালা—
সদা মৃদুহাসিময়ী লাজময়ী বালা।
এক দিন— মনে পড়ে ? সরসীর তীরে
বসেছিলি নিরিবিলি, কেবল দেখিতেছিলি
নিজের মুখের ছায়া পড়েছিল নীরে।
বুঝি মেতে গিয়েছিলি রূপে আপনার !
(তোর মতো গরবিনী দেখি নি তো আর !)
সহসা পিছন হ'তে ডাকিলাম তোরে,
কি দারুণ শরমেতে গিয়েছিলি ম'রে ?
আজ তোর হ'ল কি লো ললিতা আমার ?
সে-সব লাজের ভাব নাই যে লো আর !
শুধু বিষাদের হাসি, মুরলার মতো !
বল্ তোরা হলি একি ? পৃথিবীর মাঝে দেখি
কেবল চপলা সুখী, দুঃখী আর যত !
মোরে কিছু বলিবি নে ?— আহা ম'রে যাই !—
অনিল সে কত ক'রে আদর করে যে তোরে
লুকায়ে লুকায়ে আমি যেন দেখি নাই !
ভালো, ভালো, বলিস নে, আমার কী তায় ?
চল্ তুই, ললিতা লো, মুরলা যেথায় !
যাহা তোর মনে আছে কহিস তাহারি কাছে,
তা হলে ঘুচিয়া যাবে হৃদয়ের ভার।
ত্বরা করে চল্ তবে ললিতা আমার !

কবির প্রবেশ

চপলা। [কবির প্রতি]
চল, কবি, মুরলার কাছে—
বড়ো সে মনের দুঃখে আছে !
তুমি, কবি, তারে দেখো— সদা কাছে কাছে রেখো,
তুমি তারে ভালো ক'রে করিও যতন !
তুমি ছাড়া কে তাহার আছে বা স্বজন !

কবি। মুরলার মুখ দেখে প্রাণে বড়ো বাজে—
কিসের যে দুঃখ তার শুধায়েছি কতবার,
কিছুতে আমার কাছে প্রকাশে না লাজে !
কত দিন হতে মোরা বাঁধা এক ডোরে—
যাহা কিছু থাকে কথা, যাহা কিছু পাই ব্যথা,
দুজনে তখনি তাহা বলি দুজনেরে।
কিছু দিন হতে একি হ'ল মুরলার,
আমারে মনের কথা বলে না সে আর !
মাঝে মাঝে ভাবি তাই— বড়ো মনে ব্যথা পাই—
বুঝি মোর 'পরে নাই প্রণয় তাহার !
এত কথা বলি তারে এত ভালোবাসি,
সে কেন আমারে কিছু কহে না প্রকাশি !

উনবিংশ সর্গ

অনিল

উহু, কি না করিলাম হৃদয়ের সাথ !
ঘোর উন্মত্তের মতো সবলে যুঝিনু কত,
অশান্তির বিপ্লাবনে গেছে দিন রাত !
নিশীথে গিয়েছি ছুটে দারুণ অধীর—
নয়নেতে নিদ্রা নাই, চোখে না দেখিতে পাই,
হাহা করে ভ্রমিয়াছি বিপাশার তীর !
করেছে দারুণ ঝড় বজ্রদন্ত কড়্‌মড়্‌,
চারি দিকে অন্ধকার সম্মুখে পশ্চাতে—
মাথার উপরে চাই— একটিও তারা নাই,
সৃষ্টি যেন ঠাঁই নাহি পেতেছে দাঁড়াতে !
সাধ গেছে, ঝটিকার রুদ্রদেবগণ
বিশাল চরণ দিয়া দলি যায় এই হিয়া—
নিষ্পেষিত করি ফেলে কীটের মতন।

চূর্ণ হয়ে একেবারে মিশে ধূলিরাশে
উড়ে পড়ে চারি দিকে বাতাসে বাতাসে !
অশান্তির এক উপদেবতার মতো
নিজের হৃদয়-সাথে যুঝিয়াছি কত !
করি অশ্রুবারিপাত গেছে চলি দিনরাত,
অবশেষে আপনি হলেম পরাভূত !
ইচ্ছা করে ছিঁড়ি ছিঁড়ি হৃদয় আমার
শকুনী গৃধিনীদের যোগাই আহার !
এহেন অসার দীন হৃদি অতি বলহীন,
যোগ্য শুধু শিশুর খেলেনা গড়িবার ।
এ হৃদি কি বলবান পুরুষের মন—
সামান্য বহিলে যায় সঘনে কাঁপিবে কায়,
মাটিতে নোয়াবে মাথা লতার মতন !
কেন ধরা, কেন ওরে, জন্ম দিয়েছিলি মোরে ?
এমন অসার লঘু দুর্বল এ প্রাণ ?
এখনি গো দ্বিধা হও, লও মোরে কোলে লও !
এ হীন জীবনশিখা কর গো নির্বাণ
আর একবার দেখি, যদি এ হৃদয়
পারি আমি বজ্রবলে করিবারে জয় !
কিন্তু হায় কে আমরা ? ভাগ্যের খেলেনা,
প্রচণ্ড অদৃষ্টস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণকণা !
অন্তরে দুর্দান্ত হৃদি পড়িছে উঠিছে,
বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে
যা কিছু ধরিতে চাই কিছুই খুঁজে না পাই,
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মতো
দিগ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞানহত ।
চোখে না দেখিতে পাই, কানে না শুনিতে পাই,
তীব্রবেগে বহে বায়ু বধিরি শ্রবণ—
চারি দিকে টলমল তরঙ্গের কোলাহল,
আকাশে ছুটিছে তারা উল্কার মতন—
ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে পড়ি গো আবর্তে এসে,
চৌদিকে ফেনায়ে উঠে উর্মির পর্বত—
মস্তক ঘুরিয়া উঠে, সঘনে শোণিত ছুটে,
ঘুরিতে ঘুরিতে যাই কোথায় ভেবে না পাই—
তলায়ে তলায়ে যাই পাতালের পথ—
আঁধারে দেখিতে নারি এনু কোন্ ঠাঁই,
ঊর্ধ্বে হাত তুলি কিছু ধরিতে না পাই—
ঘুরি ঘুরি রাত্রি দিন হয়ে পড়ি জ্ঞানহীন,
নিম্নে কে চরণ ধরি করে আকর্ষণ !
কোথায় দাঁড়াব গিয়ে কে জানে তখন !
তবে আর কি করিব ! যাই— যাই ভেসে—

পাষাণ বজ্রের মতো [illegible] মুষ্টি শত
হৃদয়েরে আকর্ষিছে ধরি তার কেশে !
কি করিতে পারি বলো আমি ক্ষুদ্র নর !
অদৃষ্টের সাথে কভু সাজে কি সমর !
দিন রাত্রি তুষানলে মরি তবে জ্ব'লে জ্ব'লে—
হাসুক সমস্ত ধরা তীব্র ঘৃণাহাসি,
সে মোরে করুক ঘৃণা যারে ভালোবাসি !
আপনার কাছে সদা হয়ে থাকি দোষী,
হৃদয়ে ঘনাতে থাক্ কলঙ্কের মসী !
যায় ভালোবাসা-তরে আকুল হৃদয়,
যার লাগি সহি জ্বালা তীব্র অতিশয়—
তারে ভালোবাসি ব'লে, তারি লাগি কাঁদি ব'লে,
তারি লাগি সহি ব'লে এতেক যাতনা—
সেই মোরে ঘৃণা ক'রে ভালোবাসিবে না !
তাই হোক, তাই হোক, ভাগ্য, তাই হোক—
অভাগার কাছ হতে সবে দূরে র'ক—
যাই যাই ভেসে যাই— যা হবার হবে তাই—
কে আছে আমার তরে করিবারে শোক ?

ললিতার প্রবেশ

এই যে, এই যে হেথা, ললিতা, আমার,
আয়, আয়, মুখখানি দেখি একবার !
আসিবি কি ফিরে যাবি তাই যেন ভাবি ভাবি
অতি ধীর মৃদুগতি সংকোচে তোমার—
আয় বুকে ছুটে আয়, ভাবিস নে আর !
কেন লো ললিতারাণি, বিষণ্ণ ও মুখখানি ?
কেন লো অধরে নাই হাসির আভাস ?
নয়ন এ মুখে কেন চাহিতে চাহে না যেন—
কি কথা রয়েছে মনে, বলিতে না চাস্ !
অপরাধ করেছি কি প্রেয়সী আমার ?
বল্ লো কি শাস্তি মোরে দিতে চাস তার !
যা দিবি তাহাই সব', মাথায় পাতিয়া লব,
তাহে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় লো তাহার !
সজনি, জানিস্ হা রে, ভাল তু বাসিস যারে
মন তার অতি নীচ, অতি অন্ধকার !
অপরাধ করিবে সে, আশ্চর্য কি তার ?
সখি লো, মার্জনা তুই করিস নে তারে,
চিরকাল ঘৃণা কর হৃদয়মাঝারে !
সখি, তুই কেন ভালো বাসিলি আমায়
তাই ভেবে দিবানিশি মরি যাতনায় !
কেন, সখি দুজনের দেখা হল আমাদের,

দারুণ মিলন হেন কেন হল হায় ?
জানি যে রে এ হৃদয় দারুণকলঙ্কময় !
কি ব'লে দিব এ হৃদি চরণে তোমার !
চরণে ফেল লো দলি হেন উপহার !
সতত শরমে বিঁধি লুকাতে চাহি এ হৃদি—
এ হৃদে বাসিলে ভালো মরে যাই লাজে,
হেন নীচ হৃদয়েরে ভালোবাসা সাজে !
ভালো আমি বাসি তোরে, চিরকাল বাসিব রে,
তবু চাহি নাকো আমি তোর ভালোবাসা—
লয়ে তোর নিজ মন সুখে থাক্ অনুক্ষণ,
হেন নীচ হৃদয়ের রাখিস নে আশা !
বল লো কিসের ব্যথা পেয়েছিস মনে ?
থাক্, থাক্, কাজ নেই, থাক্ তা গোপনে—
হয়েছে তো যা হবার, বলে তা কি হবে আর !
হয়ত আমিই কিছু করিয়াছি দোষ !
কাজ কি সে কথা তুলে, সে-সব যা না লো ভুলে,
একবার কাছে আয় এইখেনে বোস্ !
আধেক অধর-ভরা দেখি সেই হাসি,
ঢাল্ লো তৃষিত নেত্রে সুধা রাশি রাশি !
সখি মুখ তুলে চা' লো, একটি কথা ক' না লো—
ললিতা রে, মৌন হয়ে থাকিস নে আর !
একবার দয়া করে কর তিরস্কার !
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে গেল দিনমান্—
একটি রাখিবি কথা ? গাহিবি কি গান ?

ললিতার গান

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা— সে-সব পুরানো কথা
মনে করে দেয় শুধু, ভাঙে এ হৃদয় ।
প্রতি হাসি, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার—
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর !
প্রেম যদি ভুলে থাক' সত্য ক'রে বল'-নাকো,
করিব না মুহূর্তের তরে তিরস্কার !
আমি তো বলেই ছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নাহি অধিকারী ।
আর কারে ভালোবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালোবেসো নাথ, না করি বারণ ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
পুরানো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ !

অনিল। [স্বগত]
কি !—শেষে এই হ'ল, এই হ'ল হায় !
কি করেছি যার লাগি এ গান সে গায় ?
তবে সে সন্দেহ করে প্রণয়ে আমার !
বিশ্বাস নাইক তবে মোর 'পরে আর !
বিশ্বাস নাইক তবে ? তাই হবে, তাই হবে—
এত করে এই তার হ'ল পুরস্কার !
সন্দেহ করিবে কেন ? কি আমি করেছি হেন !
সন্দেহ করিতে তার কোন্ অধিকার ?
আমি কি রে দিন রাত রহি নি তাহারি সাথ ?
সতত করি নি তারে আদর যতন ?
বার বার তারে কি রে শুধাই নি ফিরে ফিরে
মুহূর্তের তরে হেরি বিষণ্ণ আনন ?
একটি কথার তরে কত-না শুধাই তারে—
একটি হেরিতে হাসি রজনী পোহাই !
তাই কি রে এই হল ? শেষে কি রে এই হল ?
তাইতে সংশয় এত ? অবিশ্বাস তাই ?
কল্পনায় অকারণে সে যদি কি করে মনে,
আমি কেন তার লাগি সব' তিরস্কার ?
তবে কি সে মনে করে ভালবাসি নাকো তারে !
সকলি কপট তবে প্রণয় আমার ?
নাহয় ভালো না বাসি, দোষ তাহে কার ?
কখনো সে কাছে এসে করেছে আদর ?
কখনো সে মুছায়েছে অশ্রুবারি মোর ?
আমি তারে যত্ন যত করেছি সতত
বিনিময় আমি তার পেয়েছি কি তত ?
করেছি তো আমার যা ছিল করিবার,
সহিতে হয় নি কভু অনাদর তার !
তবু সে কি করে আশা ! হৃদয়ের ভালোবাসা ?
আদরেই ভালোবাসা বাহিরে বাহিরে প্রকাশ,
তবু সে করিবে কেন মোরে অবিশ্বাস ?

[প্রস্থান

ললিতা। আর কেন অনুক্ষণ রহি তার পাশে
নিতান্তই যদি মোরে ভালো নাহি বাসে ?
বিরক্তিতে ওষ্ঠ তার কাঁপিতেছে বার বার,
তবুও ললিতা তার পায়ে পড়ে আছে !
সঙ্গ তার তেয়াগিয়া আছেন বিরলে গিয়া,
সেথাও ললিতা ছুটে গেছে তাঁর কাছে !
এই মুখে হাসি ছিল তারে দেখি মিলাইল,
তবু সে রয়েছে বসি পদতলে তাঁর !
যেখানেই তিনি যান সেথাই দেখিতে পান

এই এক পুরাতন মুখ ললিতার !
প্রমোদ-আগারে বসি— সেথা এই মুখ !
বিরলে ভাবনা-মগ্ন— সেথা এই মুখ !
বিজনে বিষাদভরে নয়নে সলিল ঝরে,
সেথাও সমুখে আছে এই— এই মুখ !
কি আছে এ মুখে তোর ললিতা অভাগী ?
ওই মুখ— ওই মুখ— দিবানিশি ওই মুখ
যেথা যান সেথা লয়ে যাস্‌ রে কি লাগি ?
ছিনু ওই পদতলে প'ড়ে দিন রাত—
করেছিনু পথরোধ, দিয়েছে তাহার শোধ—
ভালোই করেছ, সখা, করেছ আঘাত !
মনে করেছিনু, সখা, প্রণয় আমার
ফুলময় পথ হবে, তোমারে বুকেতে লবে—
চরণে কঠিন মাটি বাজিবে না আর !
কিন্তু যদি ও পদের কাঁটা হয়ে থাকি
এখনিই তুলে ফেল, এমননিই দ'লে ফেল—
এমন পথের বাধা কি হবে গো রাখি ?
আজ হতে দিবানিশি রব নাকো কাছে ?
নিতান্তই ফাটে বুক, অশ্রুবারি আছে—
বিজনে কাঁদিতে পারি— একেলা ভাবিতে পারি—
আর কি করি গো আশা ? হবে যা হবার,
না ডাকিলে কাছে কভু যাবে নাকো আর !
এক দিন, দুই দিন, চলে যাবে কত দিন,
তবু যদি ললিতারে না পান দেখিতে—
যে ললিতা দিন রাত রহিত গো সাথে সাথ,
সতত রাখিত তাঁরে আঁখিতে আঁখিতে,
বহু দিন যদি তারে না দেখেন আর
তবু কি তাহারে মনে পড়ে নাকো তাঁর ?
ভাবেন কি একবার— "তারে যে দেখি না আর ?
ললিতা কোথায় গেল ? কোথায় সে আছে ?"
হয়ত গো একবার ডাকিবেন কাছে—
দেখিবেন ললিতার মুখে হাসি নাই আর,
কেঁদে কেঁদে আঁখি গেছে জ্যোতিহীন হয়ে—
একবার তবু কি রে আদর করেন মোরে
অতি শীর্ণ মুখ মোর বুকে তুলে লয়ে ?
তখন কাঁদিয়া কব পা-দুখানি ধরে
"বড়ো কষ্ট পেয়েছি গো, আর, সখা, সহে নাকো !
মাঝে মাঝে একবার দেখা দিয়ো মোরে !"

বিংশ সর্গ

নলিনী

গান

সখি লো, শোন্ লো তোরা শোন্,
আমি যে পেয়েছি এক মন !
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুধার,
সমস্ত আমার কাছে তার—
পেয়েছি পেয়েছি আমি, সখি,
একটি সমগ্র মন প্রাণ !
লাজ ভয় কিছু নাই তার,
নাই তার মান অভিমান !
রয়েছে তা আমারই মুঠিতে,
সাধ গেলে পারি তা টুটিতে,
যা ইচ্ছা করিতে পারি তাই—
সাধ গেলে হাসাই কাঁদাই,
সাধ গেলে ফেলে তারে দিই,
সাধ গেলে তুলে তারে রাখি,
ইচ্ছা হয় তাড়াইতে পারি,
ইচ্ছা হয় কাছে তারে ডাকি !
জানে না সে রোষ করিবারে,
ফিরে যেতে নাহি পারে আর,
শুধু জানে হাসিতে কাঁদিতে—
আর কিছু সাধ্য নাই তার !
সখি লো, এমন্ মন এক
পেয়েছি— পেয়েছি তোরা দেখ !
আমি কভু চাই নি এ মন,
ইহাতে মোর কি প্রয়োজন ?
পথিক সে, পথে যেতে যেতে
দেখা হল চোখেতে চোখেতে—
মনখানা হাতে ক'রে নিয়ে
আপনি সে রেখে গেল পায়
চলে গেল দূর দুরান্তরে
মনে পড়ে রহিল ধূলায় ।
দু-দণ্ড চাহিয়া দেখিলাম,
ভাবিনু "মোর কি প্রয়োজন !"
আঁখি দুটি লইনু তুলিয়া,
দূরে যেতে ফিরানু বদন !
অমনি সে নূপুরের মতো
চরণ ধরিল জড়াইয়া,

সাথে সাথে এল সারা পথ
রুণু ঝুনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
সখি, আমি শুধাই তোদের
সত্য ক'রে মোরে বল্ দেখি,
পায়ে স্বর্ণভূষণের চেয়ে
হৃদয়ের নূপুর শোভে কি ?
কী করিব বল্ দেখি তাহা—
আপনি সে গেল যদি রেখে !
আমি তো চাই নি তারে ডেকে !
আমারেই দিলে কেন আসি,
রূপসী তো ছিল রাশি রাশি !
সুহাসি কমলা ছিল না কি ?
শুনেছি মধুর তার আঁখি !
বিনোদিনী ছিল তো সেথায়,
রূপ তার ধরে না ধরায় !
তবে কেন মনখানি তার
আমারে সে দিল উপহার ?
দেব কি ইহারে দূরে ফেলে,
অথবা রাখিব কাছে ক'রে,
তাই ভাবিতেছি মনে মনে—
কী করিব বল্ তাহা মোরে ।

একবিংশ সর্গ

অনিল

কেমন ? এখন তোর ঘুচেছে তো ভ্রম ?
ভেঙে দিলি হাল তুই তুলে দিলি পাল তুই,
করিলি প্রবৃত্তিস্রোতে আত্মবিসর্জন—
ভেবেছিলি যাবি ভেসে কোনো ফুলময় দেশে
চাঁদের চুম্বনে যেথা ঘুমায়ে গোলাপ
সুখের স্বপনে কহে সুরভিপ্রলাপ !
কিন্তু রে ভাঙিলি তরী কঠিন শৈলের 'পরি,
কিছুতেই পারিলি নে সামালিতে আর !
এখন কি করিবি রে ভাব্ একবার !
ভগ্নকাষ্ঠ বুকে ধরি উন্মত্ত সাগর-'পরি
উলটিয়া পালটিয়া যাবি ভেসে ভেসে—
নাই দ্বীপ, নাই তীর, উনমত্ত জলধির
ফেনজটা ঊর্মি যত নাচে অট্ট হেসে ।

কেমন ? এখন তোর ঘুচেছে তো ভ্রম ?
এই তো নলিনী তোর ? প্রাণের দেবতা তোর ?
ছি ছি রে, কোথায় গিয়ে ঢাকিবি শরম ?
নীচে হতে নীচ অতি— হীন হতে হীন—
পথের ধুলার চেয়ে অসার মলিন।
এই এক ধূলিমুষ্টি কিনিয়া রাখিতে
সমস্ত জগৎ তোর চেয়েছিলি দিতে !
রাজপথে মনের দোকান খুলিয়াছে—
রঙ মাখাইয়া কত ঝুঁটা মন শত শত
সাজাইয়া রেখেছে সে দুয়ারের কাছে,
যে-কোনো পথিক আসে ডাকি তারে লয় পাশে,
হৃদয়ের ব্যবসায় করে সে রমণী—
আমারেও প্রতারণা করেছে এমনি !
যে মন কিনিয়াছিনু কিছুই সে নয়,
রঙ-করা দুটা হাসি দুটা কথা-ময় !
প্রতি পিপাসিত আঁখি যে হাসি লুটিছে,
প্রতি শ্রবণের কাছে যে কথা ফুটিছে,
যে হাসির নাই বাস, নাই অন্তঃপুর,
চরণে যে বেঁধে রাখে মুখর নূপুর,
যে হাসি দিবস রাতি ভিক্ষার অঞ্জলি পাতি
প্রতি পথিকের কাছে নাচিয়া বেড়ায়—
অনিল রে ! তারি তরে কেঁদেছিল হায় !
যে কথা, পথের ধারে পঙ্কের মতন,
জড়াইয়া ধরে প্রতি পান্থের চরণ,
সেই একটি কথা -তরে হৃদয় আমার,
দিবানিশি ছিল পড়ে দুয়ারে তাহার !
হৃদয়ের হত্যা করা যার ব্যবসায়
সেই মহা পাপিষ্ঠার তুলনা কোথায় ?
শরীর তো কিছু নয়, সে তো শুধু ধুলা—
ধূলির মুষ্টির সাথে হয় তার তুলা—
সমস্ত জগৎ তুল্য হৃদয়ের পাশে
সাধ ক'রে হেন হৃদি যেজন বিনাশে,
তোর মাথা পরশিল তাহারি চরণ !
তারেই দেবতা ব'লে করিলি বরণ !
তারি পদতলে তুই সঁপিলি হৃদয়—
তোর হৃদি— যার কাছে কিছুই সে নয় !
শতেক সহস্র হেন নলিনী আসুক কেন
মনের পথের তোর ধূলিও না হয় !
বিধাতা, এ সৃষ্টি তব সব বিড়ম্বনা,
সত্য ব'লে যাহা কিছু পরশিতে গেছি পিছু
ছুঁয়েছি যেমনি আর কিছুই রহে না !

হৃদে হৃদে ভালোবাসা করেছ সঞ্চার,
অথচ দাও নি লোক ভালোবাসিবার !
সমস্ত সংসার এই খুঁজিয়া দেখিলে
দুটি হৃদি একরূপ কেন নাহি মিলে ?
ওই-যে ললিতা হেথা আসিছে আবার !
করেছে সমস্ত মুখ বিষণ্ণ আঁধার ?
কেন ? তার হয়েছে কী ভেবে তো না পাই
যা লাগি বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে সদাই !
চায় কি সে দিনরাত্রি বুকে তারে রাখি,
অবাক মুখেতে তার তাকাইয়া থাকি ?
দিবানিশি বলি তারে শত শত বার
"ভালোবাসি— ভালোবাসি প্রেয়সী আমার" !
তবেই কি মুখ তার হইবে উজ্জ্বল ?
তবেই মুছিবে তার নয়নের জল ?
এত ভালো কত জন বাসে এ ধরায় ?
নিঃশব্দে সংসার তবু চ'লে কি না যায় !
ঘরে ঘরে অশ্রুবারি ঝরিত নহিলে,
জগৎ ভাসিয়া যেত নয়নসলিলে !
দিনরাত অশ্রুবারি আর তো সহিতে নারি—
দূর হোক, হেথা হতে লইব বিদায়,
অদৃষ্টের অত্যাচার সহা নাহি যায় !

[অনিলের প্রস্থান

ললিতার প্রবেশ

ললিতা। এমনি ক'রেই তোর কাটিবে কি দিন ?
ললিতা রে, আর তো সহে না !
এ জীবন আর তো রহে না !
বিধাতা, বিধাতা, তোর ধরি রে চরণ—
বল্ মোরে কবে মোর হইবে মরণ ?
নাইক সুখের আশা— চাই নাকো ভালোবাসা—
সুখসম্পদের আশা দুরাশা আমার—
কপালে নাইক যাহা চাই না তা আর !
এক ভিক্ষা মাগি ওরে— তাও কি দিবি নে মোরে ?
সে নহে সুখের ভিক্ষা— মরণ— মরণ !—
মরণ— মরণ দে রে— আর কিছু চাহি নে রে,
আর কোনো আশা নাই— মরণ মরণ !
এখনি মুদিলে আঁখি যদি রে আর না থাকি,
অমনি বায়ুর স্রোতে মিশাইয়া যাই—
এখনি এখনি আহা হয় যদি তাই !

অনিলের প্রবেশ

ললিতা। কোথা যাও, কোথা যাও, সখা, তুমি কোথা যাও—
একবার চেয়ে দেখো এই দিক-পানে !

কহি গো চরণ ধরে— ফেলিয়া যেয়ো না মোরে !
আর তো যাতনা, সখা, সহে না এ প্রাণে ।
ভালোবাসা চাই না তো, সখা গো, তোমার—
একটুকু দয়া শুধু কোরো একবার !
একটুকু কোরো, সখা, মুখের যতন—
মুহূর্তের তরে, সখা, দিয়ে দরশন !
নিতান্ত সহিতে নারি যবে পা-দুখানি ধরি
আঘাত করিয়া, সখা, ফেলিয়ো না দূরে—
এইটুকু দয়া শুধু কোরো তুমি মোরে !
কোথা যাও বলো বলো, কোথা যাও চলে !
যেতেছ কি হেথা হ'তে আমি আছি বলে ?
গভীর রজনী এবে ঘুমেতে মগন সবে—
বলো, সখা, কোথা যাও, চাও কী করিতে ?

অনিল । মরিতে ! মরিতে বালা ! যেতেছি মরিতে !
ললিতা, বিধবা তুই আজ হতে হলি !
ফেল্ অনিলের আশা মন হতে দলি !
আর তুই সাথে সাথে আসিস নে মোর,
হেথা রহি যাহা ইচ্ছা করিস রে তোর !
আবার ! আবার !
থাক্ ওইখেনে তুই, এগোস নে আর !
শত শত বার ক'রে বলিতে কি হবে তোরে ?
দাঁড়া হোথা, এক পদ আসিস নে আর !
আসিস নে বলি তোরে, বলি বার বার !
শান্তিতে মরিব যে রে তাও তুই দিবি নে রে !
মরিতে যেতেছি, তবু রাহুর মতন
পদে পদে সাথে সাথে করিবি গমন ?
দাঁড়া হোথা, সাথে সাথে আসিস নে আর,
এই তোর 'পরে শেষ আদেশ আমার !

অনিলের প্রস্থান ও ললিতার মূর্ছিত হইয়া পতন

দ্বাবিংশ সর্গ

নলিনীর প্রতি বিনোদের গান

তুই রে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন ।
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাননে করিস বিচরণ—

নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন !
তোর নহে সুখের জীবন !
যেথা দিয়া তুই যাস পদতলে চারি পাশ
ফুলেরা খুলিয়া দেয় প্রাণ !
বুকের উপর দিয়া যাস তুই মাড়াইয়া,
কিছু না করিস অবধান !
শুনিতে মুখের কথা আকুল হইয়া লতা
কত তোরে সাধাসাধি করে—
দুটা কথা শুনিলি বা, দুটা কথা বলিলি বা,
চলে যাস দূর দূরান্তরে !

পাখিরা খুলিয়া প্রাণ করে তোর গুণগান,
চারি দিকে উঠে প্রতিধ্বনি :
বকুলের বালিকারা হইয়া আপন-হারা
ঝরি পড়ে সুখেতে অমনি !
তবু রে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন !

আছে যশ, আছে মান, আছে শত মন প্রাণ—
শুধু এ সংসারে তোর নাই
এক তিল দাঁড়াবার ঠাঁই !
তাই রে জোছনারাতে অথবা বসন্তপ্রাতে
গাস যবে উল্লাসের গান,
সে রাগিণী মনোমাঝে বিষাদের সুরে বাজে,
হাহাকার করে তাহে প্রাণ !

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়—
শ্যামল বাহুর ডোরে বাঁধিয়া রাখিব তোরে
ছোটো সেই কুঞ্জটির ছায় ?
তুই সেথা র'স যদি তবে সেথা নিরবধি
মধুর বসন্ত জেগে রবে,
প্রতি দিন শত শত নব নব ফুল যত
ফুটিবেক, তোরি সব হবে ।
তোরি নাম ডাকি ডাকি একটি গাহিবে পাখি,
বাহিরে যাবে না তার স্বর !
সে কুঞ্জেতে অতি মৃদু মানিক ফুটাবে শুধু
বাহিরের মধ্যাহ্নের কর ।
নিভৃত নিকুঞ্জছায় হেলিয়া ফুলের গায়
শুনিয়া পাখির মৃদু গান
লতার-হৃদয়ে-হারা সুখে-অচেতন-পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ !

তাই বলি, বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয় !
অতৃপ্ত মনের আশ লুটিয়া সুখের রাশ,
কেন রে করিস্ হায় হায় !

ত্রয়োবিংশ সর্গ

কবি

মুরলা কোথায় ?
সে বালা কোথায় গেল ? কোথায় ? কোথায় ?
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, কিন্তু রে মুরলা কই ?
খুঁজে খুঁজে ভ্রমি তারে হেথায় হোথায় ?
সে মোর সন্ধ্যার দীপ, কোথা গেল বল্ !
একটি আঁধার ঘরে একাকী সে জ্বলিত রে
সন্ধ্যার দীপের মতো বিষণ্ণ উজ্জ্বল ।
সন্ধ্যা হ'লে ধীরে ধীরে আসিতাম ঘরে ফিরে
শ্রান্ত পদক্ষেপে অতি মৃদু গান গেয়ে,
সুদূর প্রান্তর হতে দেখিতাম চেয়ে—
মোর সে বিজন ঘরে শূন্য বাতায়ন-'পরে
একটি সন্ধ্যার দীপ আলো করে আছে—
আমারি— আমারি তরে পথ চেয়ে আছে—
আমারেই স্নেহভরে ডাকিতেছে কাছে ।
হা মুরলা, কোথা গেলি, মুরলা আমার ?
ওই দেখ ক্রমশই বাড়িছে আঁধার ?
সমস্ত দিনের পরে কবি তোর এল ঘরে—
প্রশান্ত মুখানি কেন দেখি না তোমার ?
ওই তো দ্বারের কাছে দীপটি জ্বালানো আছে,
আসন আমার ওই রেখেছিস পেতে—
আমি ভালোবাসি ব'লে যতনে আনিয়া তুলে
রজনীগন্ধার মালা দিয়েছিস গেঁথে !
কিন্তু রে দেখি না কেন তোর মুখখানি ?
শত শত বার ক'রে ভ্রমিতেছি ঘরে ঘরে—
কোথাও বসিতে নারি, শান্তি নাহি মানি !
হুহু করি উঠিতেছে সন্ধ্যার বাতাস,
প্রতি ঘরে ভ্রমিতেছে করি হাহুতাশ !
কাঁপে দীপশিখা তাহে, নিভিয়া যাইতে চাহে—
প্রাচীরে চমকি উঠে ছায়ার আঁধার !

সে মুখ দেখি নে কেন ?   সে স্বর শুনি নে কেন ?
প্রাণের ভিতরে কেন করে হাহাকার ?
জানি না হৃদয়খানা ফাটিয়া কেন রে
আঁখি হতে শতধারে অশ্রুবারি ঝরে ?
কে যেন প্রাণের কাছে   কী-জানি-কী বলিতেছে,
কী-জানি-কী ভাবিতেছি ভাবিয়া না পাই !
কোথা যাই— কোথা যাই— বল্ কোথা যাই !
মুরলা রে— মুরলা, কোথায় ?
কোথায় গেলি রে বালা ? কোথায় ? কোথায় ?

চপলার প্রবেশ

চপলা। কবি গো, কোথায় গেল মুরলা আমার ?
দারুণ মনের জ্বালা   আর সহিল না বালা—
বুঝি চ'লে গেল তাই, ফিরিবে না আর !
বুঝি সে মুরলা মোর, সমস্ত হৃদয়
তোমারে সঁপিয়াছিল— আর কারে নয়।
বুঝি-বা সে ভালো ক'রে পেলে না আদর,
কাঁদিয়া চলিয়া গেল দূর দেশান্তর।
চলো কবি, মুরলারে খুঁজিবারে যাই—
আরেকটি বার যদি তার দেখা পাই,
ভালো ক'রে তারে তুমি করিয়ো যতন,
কবি গো কহিয়ো তারে স্নেহের বচন।
করুণ মুখানি তার বুকে তুলে নিয়ো,
অশ্রুজলধারা তার মুছাইয়া দিয়ো !

চতুর্বিংশ সর্গ

নলিনী

সে জন চলিয়া গেল কেন ?
কী আমি করেছি বল্ হেন !
সে মোরে দেছিল ভালোবাসা,
আমি তারে দিয়েছিনু আশা।
হেসেছি তাহার পানে চেয়ে,
তুষেছি তাহারে গান গেয়ে !
এক সাথে বসেছি হেথায়,
তবে বল' আর কী সে চায় ?
চায় কি সঁপিব তারে প্রাণ,
করিব জগৎ মোর দান ?

মোর অশ্রুজল— মোর হাসি—
আমার সমস্ত রূপরাশি ?
কে তার হৃদয় চেয়েছিল ?
আপনি সে এনে দিয়েছিল ।
পাছে তার মন ব্যথা পায়,
জ্ব'লে মরে প্রেম-উপেক্ষায়,
দয়া ক'রে হেসেছিনু তাই—
তাই তার মুখপানে চাই ।
দয়া ক'রে গান গেয়েছিনু,
দয়া ক'রে কথা কয়েছিনু ।

একি তবে মন-বিনিময় ?
হৃদয়ের বিসর্জন নয় ?
সখি, তোরা বল্ দেখি, সত্য চ'লে গেল সে কি ?
ফিরায়ে কি লইল হৃদয় ?
এবার যদি সে আসে যাইব তাহার পাশে,
ভালো করে কথা কব হেসে—
গান গাব তার কাছে এসে ?
এত দূরে গেছে তার মন,
গলাতে কি নারিব এখন ?

পঞ্চবিংশ সর্গ

মুরলা

ওই ধীরে সন্ধ্যা হয়-হয় !
গ্রামের কানন হল অন্ধকারময় !
যতই ঘনায়ে আসে সন্ধ্যার আঁধার—
কাঁদিয়া ওঠে গো কেন হৃদয় আমার ?
দুঃখ যেন অতিশয় ধীরে ধীরে আসে—
পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, বসে মোর পাশে !
মরমেতে আঁখি রাখে, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে
কী মন্ত্র পড়িতে থাকে বুকের উপরে !
কেন গো এমন হয় প্রাণের ভিতরে ?
সন্ধ্যাদীপ ঘরে ঘরে উঠিল জ্বলিয়া—
বাহিরে যে দিকে চাই কিছু না দেখিতে পাই—
আঁধার বিশালকায় আছে ঘুমাইয়া !
ভিতরে কুঁড়ের বুকে নিভৃতে মনের সুখে
ছোটো ছোটো আলোগুলি রয়েছে জাগিয়া !

আমার আলয় নাই— ভাই নাই, বন্ধু নাই,
কেহ নাই এক তিল করিবারে স্নেহ—
দিবস ফুরায়ে এলে মোর তরে কেহ
জ্বালায়ে রাখে না কভু প্রদীপটি ঘরে,
পথপানে চেয়ে কেহ নাই মোর তরে !
দিবসের শ্রমে ক্লান্ত— সন্ধ্যা যবে হয়
কোথায় যে যাব, নাই স্নেহের আলয় !
বিরাম বিশ্রাম নাই— আদর যতন নাই—
পথপ্রান্তে ধূলি'পরে করি গো শয়ন,
চেয়ে দেখিবার লোক নাই এক জন।
অন্ধকার শাখা মেলি শুধু বৃক্ষ যত
কী ক'রে যে চেয়ে থাকে অবাকের মতো !
তারকার স্নেহশূন্য লক্ষ লক্ষ আঁখি
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দূরাকাশে থাকি !
স্নেহের অভাব মনে জেগে উঠে কেন ?
আশ্রয়ের তরে মন হুহু করে যেন !
এত লক্ষ লক্ষ আছে সুখের কুটীর,
একটিও নহে ওর এই অভাগীর !
সারাদিন নিরাশ্রয় ঘুরিয়া বেড়াই,
সন্ধ্যায় যে কোথা যাব তারো নাই ঠাঁই !
কত শত দিন হল ছেড়েছি আলয়—
আজো কেন ফিরে যেতে তবু সাধ হয় ?
ঘুরে ঘুরে পথশ্রান্ত, নাই দিগ্বিদিক—
আকাশ মাথার 'পরে চেয়ে অনিমিখ !
লক্ষ্য নাই, আশা নাই, কিছু নাই চিতে—
এমন ক'দিন আর পারিব থাকিতে ?

আহা সে চপলা মোর, থাকিত সে কাছে।
হয়তো তাহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে !
আমি কোথা হ'তে এক আসিয়া আঁধার
মলিন করিয়া দিনু হৃদয় তাহার।
সদাই সে থাকে আহা প্রমোদের ভরে,
মুহূর্ত সে মোর তরে কাঁদিবে কেন রে ?
এতক্ষণে কবি মোর এসেছে ভবনে,
কে রয়েছে তাঁর তরে বসি বাতায়নে ?
পদশব্দ শুনি তাঁর ত্বরায় অমনি
দিতেছে দুয়ার খুলি কে গো সে রমণী !
প্রতিদিন মালা গেঁথে দিতাম যেমন,
আজো কি তেমনি কেহ করে গো রচন ?
হয়তো আলয় তাঁর রয়েছে আঁধার,
হয়তো কেহই নাই বাতায়নে তার।

হয়তো গো কবি মোর ম্রিয়মাণ মন,
কেহ নাই যার সাথে কথাটিও কন !
হয়তো গো মুরলার তরে মাঝে মাঝে
করুণ হৃদয়ে তাঁর ব্যথা বড়ো বাজে !
হা নিষ্ঠুর মুরলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
হয়তো রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর !
বড়ো স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
কাঁদিয়া কাটিয়া হ'ত এ জীবন ভোর,
তাই কি ফেলিয়া আসে কবিরে একেলা !
ফিরে চল্ মুরলা রে, চল্ এই বেলা !
হা অভাগী, সন্ন্যাসিনী, আবার, আবার ?
কোথা কবি ? কোন্ কবি ? কে গো সে তোমার ?
মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে !
স্বপনের অশ্রুজল ত্বরা ফেল মুছে !
জীবনের স্বপ্ন তোর ভাঙিবে ত্বরায়—
জীবনের দিন তোর ফুরায়-ফুরায় !
ওই দেখ্ মৃত্যু তোর সমুখে বসিয়া
কঙ্কালের ক্রোড় তার আছে প্রসারিয়া !
সম্বন্ধ হয়েছে তোর মরণের সাথে,—
দে রে তোর হাত তার অস্থিময় হাতে !
এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালোবাসে
সে কেবল ওই মৃত্যু— ওই রে আকাশে !
গুরুভার রক্তহীন হিমহস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার !
হে মরণ ! প্রিয়তম— স্বামী গো, জীবন মম,
কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে ?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে ?

ষড়্বিংশ সর্গ

নলিনী

আজ তার সাথে দেখা হল,
মুখ ফিরাইয়া চলে গেল !
হা অদৃষ্ট, কাল মোরে হেরিয়া যে জন
নলিনী নলিনী বলি হত অচেতন,
নিমেষ ভুলিত আঁখি, পূরিত না আশ—
আমার সৌন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস,

মোর রাঙা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন !
আঁখির পিপাসা তার হৃদয়ের আশা তার
নলিনীরে দেখে সেও ফিরালে নয়ন !
পাশ দিয়া চলে গেল স্পর্ধিতগমন ?
বিশ্বাসঘাতক যদি কাল পুন আসে
নলিনী নলিনী বলি ফিরে পাশে পাশে,
ভালোবাসা ভালোবাসা করে দিন রাত,
তাহার পানে কি আর ফিরে চাই একবার !
করি না কি বজ্রসম কটাক্ষনিপাত !
হাসির ছুরিকা দিয়ে বিঁধি তার মন
দারুণ ঘৃণার বিষে করি অচেতন !
ভিখারি বালক সেই দিবস রজনী যেই
একটি হাসির তরে ছিল মুখ চেয়ে,
একটি ইঙ্গিত পেলে আসিত যে ধেয়ে,
আজ মোরে— নলিনীরে— হেরি সেই জন
যেন আজ, আমি রে নলিনী নই আর—
কাল যাহা ছিল আজ কিছু নাই তার !
এ হৃদে আঘাত দিবে মনে করে সে কি !
সে যদি ফিরে না চায়, সে যদি চলিয়া যায়,
তাহা হলে নলিনী এ কেঁদে মরিবে কি !
এই যে উড়াই ধুলা চরণের ঘায়
বায়ুভরে এও তো পশ্চাতে চলে যায়,
তাই নলিনীর আঁখি অশ্রু বরষিবে না কি !
হা কপাল, এও সে কি ছিল মনে ক'রে
কথা না কহিয়া সেও ব্যথা দিবে মোরে !
এ যে হাসিবার কথা— সেও মোরে দিবে ব্যথা,
কাল যারে নিতান্ত করেছি অবহেলা,
কৃপা করে দেখিতাম যার প্রেমখেলা,
সেও আজ ভাবিয়াছে ব্যথিবে এ মন
শুধু কথা না কহিয়া, ফিরায়ে নয়ন !

সপ্তবিংশ সর্গ

কবি

মুরলা রে— মুরলা, কোথায় ?
দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোথায়— কোথায় ?
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধুধু করিতেছে,
সে মাঠেতে অন্ধকার— বিস্তারিয়া বাহু তার
ভূমিতে রাখিয়া মুখ কেঁদে মরিতেছে ?
কোথা তুই— কোথা মুরলা রে,
কোথা তুই গেলি বল্— শুধাইব কারে ?
উদিল্ সন্ধ্যার তারা ওই রে গগনে ?
ওই তারা কত দিন দেখেছি দুজনে !
তা কি তোর মুরলা রে মনে আর পড়ে না রে ?
সে-সকল কথা তুই ভুলিলি কেমনে ?
কত দিন— কত কথা— কত সে ঘটনা—
মনের ভিতরে কি রে আকুলি ওঠে না ?
তবে তুই কি পাষাণে বেঁধেছিলি হিয়া ?
কেমনে কবিরে তোর গেলি তেয়াগিয়া ?
বিজন আকাশে মোর ছিলি রে সতত
স্থিরজ্যোতি ওই সন্ধ্যাতারাটির মতো,
যদি রে মুহূর্ত-তরে আপনারে ভুলে
মেঘখণ্ড রেখে থাকি এ হৃদয়ে তুলে,
তাই কি রে অভিমানে অস্ত যেতে হয় ?
এ জনমে আর কি রে হবি নে উদয় ?
আজ আমি লক্ষ্যহীন দিক হারাইয়া !
অসীম সংসারে কোথা বেড়াই ভাসিয়া !
দেখিতে যে পাব নাকো তোরে একেবারে—
সে কথা পারি নে কভু মনে করিবারে !
শব্দ কোনো শুনিলেই আপনারে ছলি
মুদিয়া নয়ন-দুটি মনে মনে বলি—
"যদি এই শব্দ তারি পদশব্দ হয় !
যদি খুলিলেই আঁখি— অমনি তাহারে দেখি !
সুমুখে সে মুখ আসি হয় রে উদয় !"
কোথায় মুরলা ! দেখা দে রে একবার,
খুঁজিয়া বেড়াতে হবে কত দূর আর ?
মুরলা রে— মুরলা কোথায় ?
একেলা ফেলিয়া মোরে গেলি রে কোথায় ?

অষ্টাবিংশ সর্গ

নলিনী

ভালো ক'রে সাজায়ে দে মোরে।
বুঝি রূপ পড়িতেছে ঝ'রে !
করিতে করিতে খেলা জীবনের সন্ধ্যাবেলা
বুঝি আসে তিল তিল করে !
বড়ো ভয় হয় প্রতিক্ষণ
নলিনী হতেছে পুরাতন,
একে একে সবে তারে তেয়াগি যেতেছে হা রে—
কেন, সখি, হতেছে এমন !
ভুলে যে আমার কাছে আসে
তখনি তো যাই তার পাশে,
দ্বিগুণ আদরে ডাকি, হাসি, গাই, কাছে থাকি,
তবুও কেন লো থাকে না সে !
ছিল তো আমার রূপরাশ
একেবারে পেলে কি বিনাশ ?
সংসারে কেবলই তবে রূপের কাঙাল সবে ?
কচি মুখানির সবে দাস ?
ভালোবাসা ব'লে কিছু নাই ?
স্বার্থপর পুরুষ সবাই ?
চির-আত্মবিসর্জন করে যে ভকতমন
হেন মন কোথা, সখি, পাই ?
মুখেরই রাজত্ব যদি ভবে
এ মুখ সাজায়ে দে লো তবে !

ঊনত্রিংশ সর্গ

ললিতা

সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেষিয়া
ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে—
তাই বলি একবার আমারে ঘুমাতে দাও—
শীতল করি এ হৃদি বিরামের স্নিগ্ধ জলে !
শ্রান্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথকাল,
বিস্মৃতি-আঁধারে ডুবি ভুলি সব দুখজ্বালা,
নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ,
মিশাতে মহাসমুদ্রে জীবনের স্রোতোমালা ?

শরীর অবশ অতি— নয়ন মুদিয়া আসে
মৃত্যুর দ্বারের কাছে বসিয়া সন্ধ্যার বেলা,
চৌদিকে সংসার-পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি—
আধ' স্বপ্নে আধ' জেগে দেখি গো মায়ার খেলা !
কত শত লোক আছে— কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
কেহ ঘৃণা করে, কেহ প্রাণপণে ভালোবাসে—
একটি কথার তরে কেহ-বা কাঁদিয়া মরে,
একটি চাহনি-তরে চেয়ে আছে কত মাস—
একটি হাসির ঘায়ে কেহ-বা কাঁদিয়া উঠে,
একটি হেরিয়া অশ্রু কারও মুখে ফুটে হাস !
কেহ বসে, কেহ ওঠে— কেহ থাকে, কেহ যায়—
জীবনের খেলা দেখি মরণের দ্বারে শুয়ে—
হাসি নাই, অশ্রু নাই— সুখ নাই, দুঃখ নাই—
হাসি অশ্রু সুখ দুখ দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে ।
শুধু শ্রান্তি, শুধু শ্রান্তি— আর কিছু, কিছু নহে—
নহে তৃষা, নহে শোক, নহে ঘৃণা, ভালোবাসা—
দারুণ শ্রান্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম
সেই ঘুম ঘুমাইব— আর কোনো নাই আশা !

ত্রিংশ সর্গ

নলিনী

বড়ো সাধ গেছে মনে ভালোবাসিবারে—
সখি, তোরা বল্ দেখি ভালোবাসি কারে ?
বসন্তে নিকুঞ্জবনে বেষ্টিত সহস্র মনে
নলিনী প্রাণের খেলা শুধু খেলিয়াছে,
খেলা ছাড়া সত্যকার জীবন কি আছে ?
সে জীবন দেখিবারে বড়ো সাধ গেছে ?
মনেতে মিশায়ে মন সচেতনে অচেতন
জগত হইয়া আসে মৃদুছায়াময়,
দুটি মন চেয়ে থাকে, দোঁহে দোঁহা ঢেকে রাখে—
সজনি লো, সে বড়ো সুখের মনে হয় !
সে সুখ কি পাই যদি ভালোবাসি কারে ?
বড়ো সাধ যায়, সখি, ভালোবাসিবারে !
এতে যে হৃদয় আছে, ভ্রমে নলিনীর কাছে—
নলিনীর নহে কি গো একটিও তার ?
যদি কারও দ্বারে যাই, কাঁদিয়া আশ্রয় চাই,
কেহই কি খুলিবে না হৃদয়ের দ্বার ?

হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া
খেলেছি মনের খেলা সকলে মিলিয়া—
সিংহাসন নিরমিত',   আমারে বসায়ে দিত,
পদতলে ফুল তুলে দিত সবে আনি—
গরবে উন্মত্তহিয়া   আপনারে বিসরিয়া
ভাবিতাম আমি বুঝি হৃদয়ের রানী
চারি দিকে আমার হৃদয়-রাজধানী!
দিবস সায়াহ্ন হল, বসন্ত ফুরায়,
খেলাবার দিন যবে অবসান-প্রায়,
মাথায় পড়িল বাজ— সহসা দেখিনু আজ
আমি কেহ নই, শুধু খেলাবার রানী—
বালুকার 'পরে গড়া খেলা-রাজধানী!
নিতান্ত ভিখারি আজি   দীনহীন বেশে সাজি
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমি আশ্রয়ের তরে,
সবাই ফিরায় মুখ উপেক্ষার ভরে।
খেলা যবে ফুরাইল   কে কোথায় চলে গেল—
তাই বড়ো সাধ যায় ভালোবাসিবারে?
সখি, তোরা বল্ দেখি ভালোবাসি কারে?

একত্রিংশ সর্গ

অনিল ও কবি

অনিল। একবার এসো তুমি, চলো গো হোথায়—
দেখে যাও কী হৃদয় দ'লেছ দু-পায়।
যখন কোরক সবে, খোলে নাই আঁখি,
তখন হৃদয়ে তার বসিয়া একাকী
দিনরাত— দিনরাত বিষদন্ত বিঁধি
আহা সেই সুকুমার কিশলয়হৃদি
বিন্দু বিন্দু রক্ত তার করেছ শোষণ!
কথাটি সে বলে নাই— মুখটি সে তুলে নাই,
হৃদয়ঘাতীরে হৃদে দিয়েছে আসন!
আজ সে যৌবনে যবে খুলিল নয়ন—
দেখিল হৃদয়ে তার নাই রক্তলেশ,
যৌবনের পরিমল হয়েছে নিঃশেষ!
কথাটি সে বলিল না— মুখটি সে তুলিল না,
দুর্বল মাথাটি আহা পড়িল গো নুয়ে—
মাটিতে মিশাবে কবে, চেয়ে আছে ভুঁয়ে!

এসো তবে বিষকীট, দেখো সে আসিয়া—
হলাহলময় হাসি মরিয়ো হাসিয়া—
একটু একটু করি কী করে যেতেছে মরি,
একটি একটি দল পড়িছে খসিয়া !
বিষাক্ত নিশ্বাসে তব বিষাক্ত চুম্বনে
কী রোগ পশিল তার সুকোমল মনে ?
তার চেয়ে কেন তীব্র অশনি আসিয়া
দারুণ চুম্বনে তারে ফেলে নি নাশিয়া !
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জ্বরি জ্বরি হলাহলে
মর্মে মর্মে শিরে শিরে হত না দহিতে,
মনের ব্যথার 'পরে দংশন সহিতে !
মুহূর্তের আলিঙ্গনে মরিত, ফুরাত—
মুহূর্ত জ্বলিয়া শেষে সকল জুড়াত !
যে কৌশলে ধীরে ধীরে হৃদয়ের শিরে শিরে
দারুণ মৃত্যুর রস করেছ সঞ্চার,
সে কৌশল সফল যে হয়েছে তোমার !
তাই একবার এসো— দেখো সে ত্বরায়
কেমন করিয়া তার জীবন ফুরায় !
নিদারুণ বিষ তব ফলে কী করিয়া,
জ্বরিয়া মরিতে হলে মরে কী করিয়া !
সে বালা, আসন্ন তার দেখিয়া মরণ,
কাঁদিয়া তোমারি কাছে করেছে প্রেরণ !
এখনো চাও গো যদি, শেষ রক্তে তার
দিবে গো সে প্রক্ষালিয়া চরণ তোমার ।
নিতান্ত দুর্বল বুকে করিবে ধারণ
ওই তব নিরদয় কঠিন চরণ ?
রক্তময় পদতলে বুক ফাটি গিয়া
নিতান্ত মরিবে বালা কথা না কহিয়া !
তবে এসো তার কাছে এসো একবার—
আরম্ভ করিলে যাহা শেষ দেখো তার ?

দ্বাত্রিংশ সর্গ

নলিনী

আজ আমি নিতান্ত একাকী—
কেহ নাই, কেহ নাই হায় !
শূন্য বাতায়নে বসি পথপানে চেয়ে থাকি,
সকলেই গৃহমুখে চলে যায়— চলে যায় !
নলিনীর কেহ নাই হায় !

পুরানো প্রণয়ী-সাথে চোখে চোখে দেখা হলে
শরমে আকুল হয়ে তাড়াতাড়ি যায় চলে !
প্রণয়ের স্মৃতি শুধু অনুতাপ-রূপে জাগে,
ভুলিবারে চাহে যেন ভালো যে বাসিত আগে ।
বিবাহ করেছে তারা, সুখেতে রয়েছে কিবা—
ভাই বন্ধু মিলি সবে কাটাইছে নিশি দিবা ।
সকলেই সুখে আছে যে দিকে ফিরিয়া চাই,
আমি শুধু করিতেছি 'কেহ নাই— কেহ নাই' ।
তাদের প্রেয়সী যদি মোরে দেখিবারে পায়
হাসিয়া লুকানো হাসি মোর মুখ-পানে চায়—
অবাক হইয়া তারা ভাবে কত মনে মনে,
"এই কি নলিনী সেই মুখে যার হাসি নেই,
বিষাদ-আঁধার জাগে জ্যোতিহীন দু-নয়নে !
এই কি নাথের মন হরেছিল একেবারে !"
কিছুতে সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে নারে !
হয়তো সে অভিমানে তুলিয়া পুরানো কথা
নাথের হৃদয়ে তার দিতে চায় মনোব্যথা ।
অমনি সে সসংকোচে যেন অপরাধী-মতো
মরমে মরিয়া গিয়া বুঝাইতে চায় কত !
সেদিন খেলিতেছিল নীরদের ছেলে দুটি,
কচি মুখে আধ' আধ' কথা পড়িতেছে ফুটি,
অযতনে কপালেতে পড়ে আছে চুলগুলি—
চুপিচুপি কাছে গিয়ে কোলেতে লইনু তুলি ।
বুকেতে ধরিনু চাপি, হৃদয় ফাটিয়া গিয়া
পড়িতে লাগিল অশ্রু দর দর বিগলিয়া !
ডাগর নয়ন তুলি মুখপানে চেয়ে চেয়ে
কিছুখন পরে তারা চলিয়া গেল গো ধেয়ে !
আজ মোর কেহ নাই হায়,
সকলেরি গৃহ আছে, গৃহমুখে চলে যায়—
নলিনীর কিছু নাই হায় !

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

পর্ণশয্যায় শয়ান মুরলা । চপলা

চপলা । কী করিয়া এত তুই হলি রে নিষ্ঠুর,
ললিতা সে, এত ভালো বাসিতিস যারে,
কী করিয়া ফেলি তারে যাবি দূর— দূর
এতদিনকার প্রেম ছিঁড়ি একেবারে !

কবি তোরে এত ভালোবাসে যে মুরলে,
তারেও কি তুই, সখি, ফেলে যাবি চলে ?

কবি ও অনিলের প্রবেশ

কবি। কী করিলি বল্ দেখি ! কী করেছি তোর ?
মুরলা রে, মুরলা রে, মুরলা আমার, হা— রে,
কী করেছি এত তুই হলি যে কঠোর ?
প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার—
একবার বল বালা, বল একবার
ছাড়িয়ে যাবি নে মোরে ফেলি এ সংসার-ঘোরে,
নিতান্ত এ হৃদয়েরে রাখি অসহায়।
আয়, সখি, বুকে থাক্, এই হেথা মাথা রাখ্,
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মুরলা, এ বুক তুই ত্যজিস্ নে আর—
চিরদিন থাক, সখি, হৃদয়ে আমার !

মুরলা। লও কবি, এই লও, এই মাথা তুলে লও—
অবসন্ন এ মাথা যে পারি নে তুলিতে,
একবার রাখ সখা, রাখ ও কোলেতে !
নিতান্তই স্বার্থপর হৃদয় আমার,
অতি নীচ হীন হৃদি এই মুরলার—
নির্দয়— নির্দয় বড়ো— পাষাণ হতেও দড়,
ধূলি হতে লঘুতর হৃদয় আমার ?
নহিলে কী করে আমি, কবি, কবি মোর,
(হৃদয়ে ঘনায়ে ছিল কি মোহের ঘোর !)
স্নেহময় তোমারেও ত্যজি অনায়াসে
কি ক'রে আইনু চলি এ দূর প্রবাসে ?
ও করুণ নয়নের অশ্রুবারিধার
একবারো মনে নাহি পড়িল আমার ?
অমন স্নেহের পানে ফিরে না চাহিয়ে
পারিনু আঘাত দিতে ও কোমল হিয়ে ?
মার্জনা করিও এই অপরাধ তার,
কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মুরলার !
এমন দুর্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে চিরকাল ধ'রে ছিল তব কাছে
এ অপরাধের, কবি, মার্জনা কি আছে ?
সখা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার—
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার !
কেন আজ মুখখানি শীর্ণ ও মলিন—
বড়ো যেন শ্রান্ত দেহ, অতি বলহীন—

রাখ কবি, মাথা রাখ, এই বুকে মাথা রাখ,
একটু বিশ্রাম কর হৃদয়ে আমার !
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো, মুরলার কথা রাখো—
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রুবারিধার !

কবি। এত দিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই;
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন !

মুরলা। কি যে সুখ পেতেছি তা বলিব কি ক'রে—
বলো সখা, এখনি কি যাব আমি ম'রে ?
এই মরণের দিন না যদি ফুরায়
মরিতে মরিতে যদি বেঁচে থাকা যায়—
দিন যায়, দিন যায়, মাস চলে যায়,
তবু মরণের দিন না যদি ফুরায় !
সখা ওগো, দাও মোরে, দাও মোরে জল—
সুখেতে হয়েছি শ্রান্ত, অতি দুরবল।

কবি। বিবাহ হইবে, সখি, আজ আমাদের—
দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে, সই,
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের !
আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের !
আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
হোক তবে, হোক, সখি, বিবাহ সুখের—
চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের !

মুরলা। তবে তুলে আন ত্বরা রাশি রাশি ফুল !
চিতাশয্যা হোক আজি কুসুমে আকুল !
রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো ত্বরায়,
সে মালা বদল করি দিও এ গলায়—
সেই মালা প'রে আমি তোমার সমুখে, স্বামি,
করিব শয়ন সুখে সুখের চিতায় !
সেই মালা প'রে যেন দগ্ধ হয় কায় !

অনিলের ফুল আনিতে প্রস্থান

কবি গো, বড়োই সাধ ছিল মনে মনে
এক দিন কেঁদে নেব ধরি ও চরণে—
দেখি, কবি, পা-দুখানি দেখি একবার,
বড়ো সাধ গেছে মনে সুখে কাঁদিবার !
কই, ফুল এল না তো, আসিবে কখন ?
এখনি ফুরায়ে পাছে যায় এ জীবন !
আরো কাছে এসো কবি, আরো কাছে মোর—
রাখ হাত দুইখানি হাতের উপর !

কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কভু
শেষদিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু।
এখনো এল না ফুল! সখা গো আমার,
বড়ো যে হতেছি শ্রান্ত, পারি নে যে আর!

ফুল লইয়া অনিলের প্রবেশ

[অনিলের প্রতি] ললিতা কেমন আছে? বল্ ভাই বল্!
অনিল। ললিতা কেমন আছে? সে আছে রে ভালো!
মুরলা। চিরকাল ভালো যেন থাকে আদরিণী,
চিরকাল পতিসুখে থাকে সোহাগিনী!
কথা ক' চপলা, সখি, মাথা খা আমার—
নীরবে নীরবে বসি কাঁদিস না আর!
মরণের দিনে দুঃখ র'য়ে গেল চিতে
হাসিখুশি মুখ তোর পেনু না দেখিতে!
সুখে থাক্— সখি, তুই চিরসুখে থাক্—
হাসিয়া খেলিয়া তোর এ জীবন যাক্!
ওই-যে এসেছে মালা— কবি গো, ত্বরায়
পরায়ে দাও গো তাহা এ মোর গলায়।
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হতে মোরে কত দয়া স্নেহ ক'রে
রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে,
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
এ হাত আমার, কবি, করিও গ্রহণ—
যেথা যাবে সেথা রব, দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন!
কবি। বিবাহ মোদের আজ হল এই তবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!
মুরলা। [কবিকে]এসো কবি, বুকে এসো!
[অনিলকে] এসো ভাই, কাছে বসো!
[চপলাকে] একটি চুম্বন, সখি,— বুঝি প্রাণ যায়,
এই শেষ দেখা এই দুখের ধরায়!
আসিছে আঁধার ঘোর— কবি, কোথা তুমি মোর!
আরো কাছে, আরো কাছে, এসো গো হেথায়!
আজ তবে বিদায়, বিদায়!
স্বামি, প্রভু, কবি সখা, আবার হইবে দেখা,
আজ তবে বিদায় বিদায়!

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

শয্যায় শয়ান ললিতা। অনিলের প্রবেশ

ললিতার গান

বায়ু ! বায়ু ! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা
কৌতুকে আকুল !
আমি একটি জুঁই ফুল !
সারা রাত এ মাথায় প'ড়েছে শিশির—
গনেছি কেবল !
প্রভাতে বড়োই শ্রান্ত ক্লান্ত, হে সমীর,
অতি হীনবল !
ভাঙা বৃন্তে ভর করি রয়েছি জীবন ধরি
জীবনে উদাস !
ওগো উষার বাতাস !
শ্রান্ত মাথা পড়ে নুয়ে— চাহিয়া রয়েছে ভুঁয়ে
মর'-মর' একটি জুঁই ফুল।
কাছেতে এসো না স'রে— এখনি পড়িবে ঝ'রে
সুকুমার একটি জুঁই ফুল !
ও ফুল গোলাপ নয় সুষমাসুরভিময়,
নহে চাঁপা, নহে গো বকুল !
ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী,
ও শুধু একটি জুঁই ফুল !
ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায়
হে প্রভাতবায় ?
প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে ?
হাসুক সরসে !
শিশিরে গোলাপগুলি কাঁদিছে হরষে ?
কাঁদুক হরষে !
ও এখনি বৃন্ত হ'তে কঠিন মাটিতে
পড়িবে ঝরিয়া—
শান্তিতে মরে গো যেন মরিবার কালে,
যাও গো সরিয়া !
মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে
দাঁড়াইয়া কাছে—
দেখিবারে— ক্ষুদ্র জুঁই মুখ নত করি
অভিমান ক'রে বুঝি আছে !
নয় নয়, তাহা নয়, সে সকল খেলা নয়—
ফুরায় জীবন !
তবে যাও, চ'লে যাও— আর কোনো ফুলে যাও
প্রভাতপবন !

ওরে কি শুধাতে আছে প্রেমের বারতা
মর'-মর' যবে ?
একটি কহে নি কথা, অনেক সহেছে—
মরমে মরমে কীট অনেক বহেছে—
আজ মরিবার কালে শুধাইছ কেন ?
কথা নাহি ক'বে !
ও যখন মাটি-'পরে পড়িবে ঝরিয়া
ওরে ল'য়ে খেলাস নে তুই !
উড়ায়ে যাস নে ল'য়ে হেথা হ'তে হোথা !
ক্ষুদ্র এক জুঁই !
যেথাই খসিয়া পড়ে সেথা যেন থাকে প'ড়ে,
ঢেকে দিস শুকানো পাতায় !
ক্ষুদ্র জুঁই ছিল কিনা কেহই তো জানিত না,
মরিলেও জানিবে না তায় !
কাননে হাসিত চাঁপা, হাসিত গোলাপ
আমি যবে মরিতাম কাঁদি,
আজো হাসিবেক তারা শাখায় শাখায়
হাতে হাতে বাঁধি !
সে অজস্র হাসি-মাঝে সে হরষরাশি-মাঝে
ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি !

সমাপ্ত

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড।

(নাটিকা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮০৩।

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই !
আগ্রহে অধীর হ'য়ে   ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালোবাসি, তার মতো কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

রুদ্রচণ্ড

নাটিকা

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য— পর্বতগুহা। রাত্রি

কালভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। মহাকালভৈরব-মুরতি,
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি!
কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কাঁপিছে ভব,
প্রলয়গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন।
তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,
অমাবস্যারাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি,
দশনবিদ্যুত-বিভা দিগন্তে খেলায়।
তোমার নিশ্বাসে খসি নিভে রবি, নিভে শশী,
শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।
প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের শ্মশানেতে
প্রেতসহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে—
নিদারুণ অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে করপুটে।
প্রলয়মূরতি ধর', থরহর সুর নর,
চারি পাশে দানবেরা করুক বিহার—
মহাদেব, শুন শুন নিবেদিনু পুন পুন
আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড সেবক তোমার।
যে সংকল্প আছে মনে সঁপিনু তা ও চরণে,
কৃপা করি লও দেব, লও তাহা তুলে।
এ দারুণ ছুরিখানি অর্ঘ্যরূপে দিনু আনি,
দু-দণ্ড এ ছুরিকাটি রাখ পদমূলে।
কৃপা তব হবে কবে মনো আশা পূর্ণ হবে,
মন হ'তে নেবে যাবে প্রতিজ্ঞা-পাষাণ!
সংকল্প হইলে সিদ্ধ এ হৃদি করিয়া বিদ্ধ
নিজের শোণিত দিব উপহারদান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য— অরণ্য। রুদ্রচণ্ড ও অমিয়া

রুদ্রচণ্ড।—

বার বার ক'রে আমি ব'লেছি, অমিয়া, তোরে
কবিতা আলাপ-তরে নহে এ কুটীর,
তবু তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ গাহি
বনের আঁধার চিন্তা দিস্‌ ভাঙাইয়া!
পাতালের গূঢ়তম অন্ধতম অন্ধকার!
অধিকার কর' এর বালিকা-হৃদয়,
ও হৃদের সুখ আশা ও হৃদের উষালোক
মৃদুহাসি মৃদুভাব ফেল গো গ্রাসিয়া।
হিমাদ্রিপাষাণ চেয়ে গুরুভার মন মোর,
তেমনি উহার মন হোক গুরুভার!
হিমাদ্রিতুষার চেয়ে রক্তহীন প্রাণ মোর,
তেমনি কঠিন প্রাণ হউক উহার!
কুটীরের চারি দিকে ঘনঘোর গাছপালা
আঁধারে কুটীর মোর রেখেছে ডুবায়ে—
এই গাছে, কতবার দেখেছি, অমিয়া, তুই
লতিকা জড়ায়েছিস আপনার মনে—
ফুলন্ত লতিকা যত ছিঁড়িয়া ফেলেছি রোষে,
এ সকল ছেলেখেলা পারি নে দেখিতে!
আবার কহি রে তোরে, বসি চাঁদ কবি-সনে
এ অরণ্যে করিস নে কবিতা-আলাপ!

অমিয়া।—

যাহা যাহা বলিয়াছ সব শুনিয়াছি পিতা—
আর আমি আনমনে গাহি না তো গান,
আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা,
আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না তো মালা!
কিন্তু পিতা, চাঁদ কবি, এত তারে ভালোবাসি,
সে আমার আপনার ভায়ের মতন—
বলো মোরে বলো পিতা, কেন দেখিব না তারে
কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা!
সেকি পিতা? তারে তুমি দেখেছ তো কত বার,
তবু কি তাহারে তুমি ভালোবাস নাই!
এমন মূরতি আহা, সে যেন দেবতা-সম,
এমন কে আছে তারে ভালো যে না বাসে!
এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে
এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে!

এই যে কুটীর এও কোল বাড়াইয়া দেয়,
অভ্যর্থনা করে নি যে কোনো অতিথিরে !
ভ্রূকুটি কোরো না পিতা, ওই ভ্রূকুটির ভয়ে
সমস্ত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন।
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর— এই ভিক্ষা দাও পিতা
এ ভালোবাসায় মোর করিও না রোষ !

রুদ্রচণ্ড। রুদ্রচণ্ড । মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ !
অথবা ভূমিষ্ঠশয্যা চিতাশয্যা তোর!

অমিয়া। অমিয়া । তাই যদি হ'ত, পিতা, বড়ো ভালো হ'ত !
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!
আগে তো লাগিত ভালো জোছনার আলো,
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছ, বকুলতলাটি—
ভ্রূকুটির ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া
তাহাদেরও 'পরে মোর জন্মেছে বিরাগ !
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
বড়োই হরষে পিতা সব যাই ভুলে,
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়!
সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে!
সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই!

রুদ্রচণ্ড। বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরঞ্জীবী হউক সে অগ্নিকুণ্ডমাঝে!
মুখ ঢাকিস নে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন!

অমিয়া। ও কথা বোল' না পিতা—

রুদ্রচণ্ড। চুপ্, শোন্ বলি;
জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর,
পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার
ওই বৃক্ষশাখা-'পরে দিব টাঙাইয়া,
ভিজিবে বর্ষার জলে, পুড়িবে তপনে
যতদিনে বাহিরিয়া না পড়ে কঙ্কাল!
শুনিয়া কাঁপিতেছিস, দেখিবি যখন
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!

আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি!
হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ, তারি সভাসদ!
সে পৃথ্বীরাজের হীন জীবন মরণ
এই ছুরিকার 'পরে রয়েছে ঝুলান'!

অমিয়া। থাম পিতা, থাম থাম, ও কথা বোল্লো না!
শত শত অভাগার শোণিতের ধারা
তোমার ছুরিকা ওই করিয়াছে পান,
তবুও— তবুও ওর মিটে নি পিপাসা?
কত বিধবার আহা কত অনাথার
নিদারুণ মর্ম্মভেদী হাহাকারধ্বনি
তোমার নিষ্ঠুর কর্ণ করিয়াছে পান,
তবুও তবুও ওর মিটে নি কি তৃষা?

রুদ্রচণ্ড। [আপনার মনে]—
মিটে নাই! মিটে নাই! মোরে নির্বাসন!
রাজ্য ছিল, ধন ছিল, সব ছিল মোর,
আরো কত শত আশা ছিল এই হৃদে—
রাজ্য গেল, ধন গেল, সব গেল মোর,
কূলে এসে ডুবে গেল যত আশা ছিল!
শুধু এই ছুরি আছে, আর এই হৃদি
আগ্নেয় গিরির চেয়ে জ্বলন্ত গহ্বর!
মোরে নির্বাসন! হায়, কি বলিব পৃথ্বী,—
এ নির্বাসনের ধার শুধিতাম আমি
পৃথ্বীতে থাকিত যদি এমন নরক
যন্ত্রণা জীবন যেথা এক নাম ধরে,
জীবননিদাঘে যেথা নাই মৃত্যুছায়া!
মোরে নির্বাসন ! কেন, কোন অপরাধে ?
অপরাধ! শতবার লক্ষবার আমি
অপরাধ করি যদি কে সে পৃথ্বীরাজ!
বিচার করিতে তার কোন অধিকার !
নাহয় দুরাশা মোর করিতে সাধন
শত শত মানুষের লয়েছি মস্তক—
তুমি কর নাই? তোমার দুরাশাযজ্ঞে
লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহুতি?
লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ কর নি উচ্ছিন্ন?
লক্ষ লক্ষ রমণীরে কর নি বিধবা?
শুধু অভিমান তব তৃপ্ত করিবারে—
ভ্রাতা তব জয়চাঁদ, তার রাজ্য দেশ
ভূমিসাৎ করিতে কর নি আয়োজন?
পৃথ্বীতেই তোমার কি হবে না বিচার?
নরকের অধিষ্ঠাতৃদেব, শুন তুমি,
এই বাহু যদি নাহি হয় গো অসাড়,

রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,
তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ!
হৃদয় এমন মোর হয়েছে অধীর
পারি নে থাকিতে হেথা স্থির হ'য়ে আর!
চলিনু, অমিয়া, আমি—তুই থাক্ হেথা,
চলিনু গুহায় আমি করিগে ভ্রমণ।
শোন্, শোন্, শোন্ বলি, মনে আছে তোর—
চাঁদ কবি পুন যদি আসে এ কুটীরে
জীবন লইয়া আর যাবে না সে ফিরে!

[প্রস্থান

অমিয়া। বড়ো সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সংকীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া—
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখি যদি হইতাম, দু-দণ্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভ'রে দিতেম সাঁতার!
আহা, কোথা চাঁদ কবি, ভাই গো আমার!
এ রুদ্ধ অরণ্য-মাঝে তোমারে হেরিলে
দু-দণ্ড যে আপনারে ভুলে থাকি আমি!

রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ

না—না পিতা, পায়ে পড়ি, পারিব না তাহা,
আর কি তাহারে কভু দেখিতে দিবে না?
কোন্ অপরাধ আমি করেছি তোমার
অভাগীরে এত কষ্ট দিতেছ যা লাগি!
কে জানে বুকের মধ্যে কি যে করিতেছে!
দাও পিতা, ওই ছুরি বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ভেঙে ফেল যাতনার এ আবাসখানা!
ওই ছুরি কত শত বীরের শোণিতে
মাথা তার ডুবায়েছে হাসিয়া হাসিয়া,
ক্ষুদ্র এই বালিকার শোণিত বর্ষিতে

ও দারুণ ছুরি তব হবে না কুণ্ঠিত!
হেসো না অমন করি, পায়ে পড়ি তব,
ওর চেয়ে রোষদীপ্ত ভ্রূকুটিকুটিল
রুদ্র মুখপানে তব পারি নেহারিতে!

রুদ্রচণ্ড। ঘুমাগে ঘুমাগে তুই, অমিয়া, ঘুমাগে—
একটু রহিব একা, তাও কি দিবি না?
আজ আমি ঘুমাব না, একেলা হেথায়
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রাত্রি করিব যাপন।
এনে দে কুঠার মোর, কাটিয়া পাদপ
এ দীর্ঘ সময় আমি দিব কাটাইয়া।
বিশ্রাম আমার কাছে দারুণ যন্ত্রণা!
বিশ্রাম, কালের প্রতি মুহূর্ত যেমন
দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার।
মরুভূমিপথমাঝে পথিক যখন
দূর গম্যদেশে তার করিতে গমন
যত অগ্রসর হয়, দিগন্তবিস্তৃত
নব নব মরু যদি পড়ে দৃষ্টিপথে,
তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর,
তেমনি আমার সেই উদ্দেশ্যের মাঝে
প্রত্যেক মুহূর্তকাল প্রত্যেক নিমেষ
অস্থির করিয়া তুলে হৃদয় আমার!

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

চাঁদ কবি ও অমিয়া

চাঁদ কবি। কেন লো অমিয়া, তোর কচি মুখখানি
অমন বিষণ্ণ হেরি, অমন গম্ভীর?
আয়, কাছে আয়, বোন, শোন্ তোরে বলি,
গান শিখাইব ব'লে দুটি গান আমি
আপনি রচনা ক'রে এনেছি অমিয়া!
বনের পাখিটি তুই, গান গেয়ে গেয়ে
বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে সাজে—

অমিয়া। চুপ কর, ওই বুঝি পদশব্দ শুনি!
বুঝি আসিছেন পিতা! না না, কেহ নয়!
শোন ভাই, এ বনে এসো না তুমি আর!
আসিবে না? তা হ'লে কি অমিয়ার সাথে
আর দেখা হবে নাক? হবে না কি আর?

চাঁদ কবি। কি কথা বলিতেছিস, অমিয়া, বালিকা!
অমিয়া। পিতা যে কি বলেছেন, শোন নাই তাহা—
বড়ো ভয় হয় শুনে, প্রাণ কেঁপে ওঠে!
কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হতে!
যেমন করিয়া হোক, কাটিবেক দিন—
অমিয়ার তরে, কবি, ভেবোনাক তুমি।
চাঁদ কবি। আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার,
কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে?
আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোর!
অমিয়া। কেহ না, কেহ না চাঁদ! আমি বলি ভাই,
পিতারে বুঝায়ে তুমি বোলো একবার!
বোলো তুমি অমিয়ারে ভালোবাস বড়ো.
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে!
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো!
তুমি যদি ভালো করে বলো বুঝাইয়া,
নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা!
বলিবে?
চাঁদ কবি। বলিব বোন! ও কথা থাকুক্!—
সে দিন যে গান তোরে দেছিনু শিখায়ে,
সে গানটি ধীরে ধীরে গা' দেখি অমিয়া!

গান

রাগিণী— মিশ্র ললিত

অমিয়া। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
সৌন্দর্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল
বসন্তলাবণ্যে সাজি গো—
একি হর্ষ— হর্ষ আজি গো!
উষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙা!
কুসুমভগিনীগণ চারি দিক হতে
আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে।
আকাশ সুনীল আজি কিবা,
অরুণনয়নে হাস্যবিভা,

বিমল শিশিরধৌত তনু
হাসিছে কুসুমরাজি গো—
একি হর্ষ— হর্ষ আজি গো!

মধুকর গান গেয়ে বলে,
'মধু কই, মধু দাও দাও!'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, 'এই লও লও!'
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
'ফুলবালা পরিমল দাও!'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
'যাহা আছে সব লয়ে যাও!'
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটিকুটি,
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি—
নূতন জগত দেখি রে
আজিকে হরষ একি রে!

—

অমিয়া। সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার,
না জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন!

চাঁদ কবি। অমিয়া, তুই তা, বল, বুঝিবি কেমনে!
তুই সুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি,
যখনি মেলিলি আঁখি, দেখিলি চাহিয়া—
শুষ্ক জীর্ণ পত্রহীন অতি সুকঠোর
বজ্রাহত শাখা-'পরে তোর বৃন্ত বাঁধা
একটিও নাই তোর কুসুমভগিনী,
আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি—
যেমনি মেলিলি আঁখি অমনি সভয়ে
মুদিতে চাহিলি বুঝি নয়নটি তোর।
না দেখিলি রবিকর, জোছনার আলো,
না শুনিলি পাখিদের প্রভাতের গান!
আহা বোন, তোরে দেখে বড়ো হয় মায়া!
মাঝে মাঝে ভাবি ব'সে কাজ-কর্ম ভুলি,
'এতক্ষণে অমিয়া একেলা বসে আছে,
বিশাল আঁধার বনে কেহ তার নাই!'
অমনি ছুটিয়া আসি দেখিবারে তোরে!
আরেকটি গান তোরে শিখাইব আজি,
মন দিয়ে শোন্ দেখি অমিয়া আমার!

গান

রাগিণী— মিশ্র গৌড়-সারঙ্গ

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা?
কেহ না— কেহ না!

মধুকর কাছে এসে বলে,
'মধু কই, মধু চাই চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে, 'কিছু নাই নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও'
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, 'আর কিবা আছে!'
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
খর দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

অমিয়া। ওই আসিছেন পিতা, লুকাও লুকাও,
পায়ে পড়ি— লুকাও লুকাও এই বেলা,
একটি আমার কথা রাখ চাঁদ কবি!
সময় নাইক আর— ওই আসিছেন,
কি হবে? কি হবে ভাই? কোথা লুকাইবে?

রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ

পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে;
আপনি এসেছি আমি চাঁদ কবি -কাছে,
চাঁদের কি দোষ তাহে বলো পিতা, বলো !
এসেছিনু, কিছুতেই পারি নি থাকিতে—
নিজে এসেছিনু আমি, চাঁদের কি দোষ?

রুদ্রচণ্ড। অভাগিনী!

চাঁদ কবি। রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা।

অমিয়া। থাম চাঁদ, কোনো কথা বোলো না পিতারে,
থাম থাম।

চাঁদ কবি। রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা!

অমিয়া। পিতা, পিতা, এই পায়ে পড়িলাম আমি,
যাহা ইচ্ছা কর তাই এখনি— এখনি।
চেয়ো না চাঁদের পানে অমন করিয়া।

চাঁদ কবি। দাঁড়ানু কৃপাণ এই পরশ করিয়া—
সূর্যদেব, সাক্ষী রহ, আমি চাঁদ কবি
আজ হতে অমিয়ার হনু পিতা মাতা।
তোর সাথে অমিয়ার সমস্ত বন্ধন
এ মুহূর্ত হতে আজ ছিন্ন হয়ে গেল।
মোর অমিয়ার কেশ স্পর্শ কর যদি
রুদ্রচণ্ড, তোর দিন ফুরাইবে ভবে!

অমিয়ার মূর্ছিত হইয়া পতন
উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও রুদ্রচণ্ডের পতন

রুদ্রচণ্ড। সম্বর সম্বর অসি, থাম চাঁদ, থাম!
কি! হাসিছ বুঝি! বুঝি ভাবিতেছ মনে,
মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচণ্ড!
জানিস নে মরণের ব্যবসায়ী আমি!
জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আজ
শত বার মৃত্যু এই হইল আমার!
রুদ্রচণ্ড যে মুহূর্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে
রুদ্রচণ্ড সে মুহূর্তে গিয়াছে মরিয়া!
আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম লয়ে
কেবল শরীর তার, কহিতেছি তোরে—
এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন!
এখনো— এখনো আছে! এখনো আমার
সংকল্প রয়েছে হ'য়ে দারুণ তৃষিত!
রুদ্রচণ্ড তোর কাছে ভিক্ষা মাগিতেছে
আর কি চাহিস চাঁদ? দিবি মোরে প্রাণ?

অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ
চাঁদ কবির প্রতি

দূত। মহাশয়, আসিতেছি রাজসভা হতে!
নিমেষ ফেলিতে আর নাই অবসর!
প্রতি মুহূর্তের 'পরে অতি ক্ষীণ সূত্রে
রাজত্বের শুভাশুভ করিছে নির্ভর!
প্রশ্নোত্তর করিবার নাইক সময়!

[সত্বর উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। অনুগ্রহ ক'রে মোরে চ'লে গেল, চাঁদ !
গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্নবদনে
রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেম অনুগ্রহ ক'রে?
অনুগ্রহ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা!
এ অনুগ্রহের ছুরি মর্ম্মের মাঝারে
—যত দিন বেঁচে রব— রহিবে নিহিত!
দিনরাত্রি রক্ত মোর করিবে শোষণ।
দুগ্ধপোষ্য শিশু চাঁদ— তার অনুগ্রহ!
ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়!
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে
তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব'।

অমিয়ার প্রবেশ

আবার রাক্ষসি, তুই আবার আইলি!
এ সংসারে আছে যত আপনার ভাই—
সকলেরে ডেকে আন্, পিতার জীবন
সে কুক্কুরদের মুখে করিস নিক্ষেপ।
পিতার শোণিত দিয়ে পুষিস তাদের।
দূর হ রাক্ষসি, তুই এখনি দূর হ।

অমিয়া। পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি
দূর হয়ে যাইতেছি এ কুটীর হ'তে—
বোলো না, অমন ক'রে বোলো না আমারে
বুঝিতে পারি নে যে গো কি আমি করেছি।
চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছিনু—
কেন পিতা, তার তরে এত শাস্তি কেন ?

রুদ্রচণ্ড। চুপ কর্, 'কেন' 'কেন' শুধাস নে আর।
'দূর হ রাক্ষসি' এই আদেশ আমার!
দিনরাত্রি, পাপিয়সি, 'কেন কেন' করি
করিস নে মোর আদেশের অপমান।

অমিয়া। কোথা যাব পিতা, আমি পথ যে জানি নে।
কারেও চিনি নে আমি— কি হবে আমার!
পিতা গো, জান তো তুমি, অমিয়া তোমার
নিতান্ত নির্বোধ মেয়ে কিছু সে বুঝে না—
না বুঝে করেছে দোষ ক্ষমা কর তারে।

রুদ্রচণ্ড। হতভাগী!

অমিয়া। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা!
আজ রাত্রে দূর ক'রে দিও না আমারে,

এক রাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে।

রুদ্রচণ্ড। শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিস তুই!
দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস!
এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্ তুই।
অশ্রুজলধারা মোর দু-চক্ষের বিষ।
আর নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার—
দূর হ রে—

অমিয়া। ধর পিতা, ধর গো আমায়—

রুদ্রচণ্ড। ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে মোরে, রাক্ষসি, ছুঁস্ নে।

অমিয়ার মূর্ছিত হইয়া পতন ও তাহাকে তুলিয়া লইয়া
বনান্ত-উদ্দেশে রুদ্রচণ্ডের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

অমিয়া। রাজপথে প্রাসাদসম্মুখে

অমিয়া। আর তো পারি না, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ।
বহিছে বহুক ঝড়, পুড়ুক অশনি,
ঘোর অন্ধকার মোরে ফেলুক গ্রাসিয়া।
এ কি এ বিদ্যুৎ মাগো! অন্ধ হ'ল আঁখি!
চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার!
সারাদিন উপবাসে পথে পথে ভ্রমি
'চাঁদ চাঁদ' ব'লে আমি খুঁজেছি তোমায়।
কোথাও পেনু না কেন ভাই গো আমার?
অতি ভয়ে ভয়ে গেছি পান্থদের কাছে—
শুধায়েছি, কেহ কেন বলে নি আমারে?
এ প্রাসাদ যদি হয় তাঁহারি আলয়!
যদি গো এখনি চাঁদ বাহিরিয়া আসে,
হেথা মোরে দেখিয়া কি করেন তা হ'লে?
হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার।
উহু কি বাতাস! শীতে কাঁপি থর থর!
যদি না থাকেন তিনি, আর কেহ এসে
যদি কিছু বলে মোরে, কি করিব তবে?
কে আছ গো, দ্বার খোল— আমি নিরাশ্রয়,
অমিয়া আমার নাম, এসেছি দুয়ারে।

দ্বার খুলিয়া একজন। কে তুই?

অমিয়া। [সভয়ে] অমিয়া আমি।

দ্বাররক্ষক। হেথা কেন এলি?

অমিয়া। চাঁদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেথা?
বড়ো শ্রান্ত ক্লান্ত আমি চাহি গো আশ্রয়।

দ্বাররক্ষক। এ রাত্রে দুয়ারে মিছা করিস নে গোল।
হেথা ঠাঁই মিলিবে না, দূর হ ভিখারি।

দ্বাররোধন। একটি পান্থের প্রবেশ

পান্থ। উঃ। একি মুহুর্মুহু হানিছে বিদ্যুৎ!
এ দুর্যোগে পথপার্শ্বে কে বসিয়া হোথা?
এমন বহিছে ঝড়, গর্জিছে অশনি,
আজ রাত্রে গৃহ ছেড়ে পথে কে রে তুই!

কাছে আসিয়া

একি বাছা, হেথা কেন একেলা বসিয়া?
পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংসারে?

অমিয়া। কাঁদিয়া উঠিয়া

ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
অমিয়া আমার নাম, বড়ো শ্রান্ত আমি,
সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ।

পান্থ। আয় মা, আমার সাথে আয় মোর ঘরে।
অরণ্যে আমার কুঁড়ে, বেশি দূর নয়।
আহা দাঁড়াবার বল নাই যে চরণে।
আয়, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে যাই।

অমিয়া। চাঁদ কবি, ভাই মোর, তারে জান তুমি?
কোথায় থাকেন তিনি পার কি বলিতে?

পান্থ। জানি নে মা, কোথাকার কে সে চাঁদ কবি।
আমরা বনের লোক, কাঠ কেটে খাই,
নগরে কে কোথা থাকে জানিব কি ক'রে?
চল্ মা, আজি এ রাত্রে মোর ঘরে চল্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাঁদ কবি। শিবির

চাঁদ কবি। সহস্র থাকুক কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা!
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার।
তোর দুঃখ গেনু আমি দূর করিবারে,
ফেলিনু দ্বিগুণ কষ্টে অমিয়া আমার।
জানিলি নে, অভাগিনী, সুখ কারে বলে!
শাসনের অন্ধকারে, অরণ্যবিজনে,
পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে
দারুণ কটাক্ষে তার থরথর কাঁপি
দিনরাত্রি রয়েছিস ম্রিয়মাণ হয়ে।
প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখি—
কবে এ আঁধার রাতি ফুরাইবে তোর?
ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে
গান গাবি, খেলাইবি প্রশান্ত হরষে!
এই যুদ্ধ শেষ হলে, অভাগিনী তোরে
আনিব রে নিষ্ঠুর পিতার গ্রাস হতে।
আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে,
এতদিনকার দুঃখ দিব দূর ক'রে।
রাজপুত ক্ষত্রিয়েরে করিবি বিবাহ,
ভালোবেসে দুই জনে কাটাবি জীবন।
অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল
দুঃস্বপ্নের মতো শুধু পড়িবেক মনে।

দূতের প্রবেশ

মহাশয়, এসেছে এসেছে শত্রুগণ,
তিন ক্রোশ দূরে তারা ফেলেছে শিবির।
রাত্রিযোগে অলক্ষ্যেতে এসেছে তাহারা,
সহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা।

চাঁদ। চল তবে—বাজাও বাজাও রণভেরী।
সৈন্যগণ, অস্ত্র লও, উঠাও শিবির।
দুয়ারে এসেছে শত্রু, বিলম্ব সহে না।
দাও মোরে বর্ম দাও, অশ্ব ল'য়ে এসো।
ত্বরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী।

কোলাহল

সপ্তম দৃশ্য

বন

একজন দূতের প্রবেশ

দূত। একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার !
চারি দিকে ঝোপঝাপ, পথ নাই কোথা !
ওই বুঝি হবে তার আঁধার কুটীর,
ওইখানে রুদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি !

রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ

দূত। প্রণাম !
রুদ্র। কে তুই !
দূত। আগে কুটীরেতে চল !
একে একে সব কথা করি নিবেদন !
রুদ্র। পথ ভুলে বুঝি তুই এসেছিস হেথা ?
আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগরনিবাসী তোরা হেথা কেন এলি ?
ঐশ্বর্য্যমাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস,
ননীর পুতুল যত ললনারে লয়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা,
ফুলের পাপড়ি, 'পরে পড়িলে চরণ
ব্যথায় অধীর হয়ে উঠিস যে তোরা—
নগরফুলের কীট হেথা তোরা কেন ?
আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড।
মৃদু মিষ্ট কথা শুনি আহ্লাদে গলিয়া
রাজ্যধন উপহার দিই নাকো আমি !
বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত
আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ ?
পুষ্টদেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি
কুটীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক ?
মনে কি করিলি এই অরণ্যবাসীরে
দুটা অনুগ্রহবাক্যে কিনিয়া রাখিবি ?
তাই আজ প্রাতঃকালে স্বর্ণময় বেশে
বিশাল উষ্ণীষ এক বাঁধিয়া মাথায়
এলি হেথা ধাঁধিবারে দরিদ্রনয়ন ?
জানিস কি, বনবাসী এই রুদ্রচণ্ড—
যতেক উষ্ণীষধারী আছয়ে নগরে
সবার উষ্ণীষে করে শত পদাঘাত !
দূত। রুদ্রচণ্ড, মিছা কেন করিতেছ রোষ !
উপকার করিতেই এসেছি হেথায় !

রুদ্র। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ!
তোমরা নগরবাসী স্ফীতদেহ সবে
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত!
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে!
এত উপকার তিনি করেছেন মোর
আর কারো উপকারে আবশ্যক নাই!

দূত। রুদ্রচণ্ড, বুঝি তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ,
আমি নহি পৃথ্বীরাজ-রাজ-সভাসদ।
রাজ-রাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী
তিনিই আমারে হেথা করেন প্রেরণ—
অধীর হোয়ো না, সব শোন একে একে—
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিছেন তিনি,
বহুদূর পর্যটনে শ্রান্ত সৈন্যদল—
থাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন—
আজ এক রাত্রি-তরে এ অরণ্য-মাঝে
রাজ-রাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয়!

রুদ্র। কি বলিলি দূত! তোর মহম্মদ ঘোরী,
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা!

দূত। এ বনে তো লোক নাই! ধীরে কথা কও!

রুদ্র। ধীরে ক'ব: যাব আমি নগরে নগরে,
ঊর্দ্ধকণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া,
'ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মতো আসে আক্রমিতে দেশ!'

দূত। শোন রুদ্র, পৃথ্বী তব রাজ্যধন কেড়ে
নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে—

রুদ্র। সংবাদের-আবর্জনা-ভিক্ষুক কুক্কুর,
এ সংবাদ কোথা হতে করিলি সংগ্রহ?

দূত। ধৈর্য্য ধর। পৃথ্বী তব রাজ্যধন লয়ে
নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে!
প্রতিহিংসা সাধিবার সাধ থাকে যদি
এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময়।
মহম্মদ ঘোরী হেথা—

রুদ্র। মহম্মদ ঘোরী?
কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ়!
এত দিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস
আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া?

যেমন পৃথ্বীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
তেমনি আমারো শত্রু কহি তোরে দূত !
পৃথ্বীর রাজত্ব প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে ।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি ।
অশুভ বারতা এই কবির প্রচার ।

কৃপাণ খুলিয়া রুদ্রচণ্ডকে দূতের সহসা আক্রমণ
উভয়ের যুদ্ধ ও দূতের পতন

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্য । পথ

নেপথ্যে গান

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার ।
চাহিয়া দেখিল চারি ধার !
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর,
নিরদয় অসীম সংসার ।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা !
কেহ না, কেহ না !
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে—
ফুলটির মৃদুপ্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় ।

নেপথ্যে

উত্তরের পথ দিয়া চল সৈন্যগণ !

সেনাপতিগণ সৈন্যগণ ও চাঁদ কবির প্রবেশ

চাঁদ কবি । অমিয়ার কণ্ঠ যেন শুনিনু সহসা,
এ মধ্যাহ্নে রাজপথে সে কেন আসিবে ?

সেনাপতি । সৈন্যগণ হেথা এসে দাঁড়াইলে কেন ?
বিশ্রাম করিতে কভু এই কি সময় ?

দ্বিতীয় সেনাপতি। শুনিনু যবনগণ যুঝে প্রাণপণে—
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত।
এখনো রয়েছে তারা সাহায্যের আশে,
নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে।
চাঁদ কবি। তবে চল, চল ত্বরা, আর দেরি নয়!

গমনোদ্যম। অমিয়ার প্রবেশ

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ— ভাই মোর—
সৈন্যগণ। কে তুই! দূর হ!
সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়, চল সৈন্যগণ!
চাঁদ কবি। [স্তম্ভিত হইয়া] অমিয়া রে—
সেনাপতি। চাঁদ কবি, এই কি সময়!
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেনু একি পথের ধারেতে?
চল চল, বাজাও, বাজাও রণভেরী!
চাঁদ। [যাইতে যাইতে] অমিয়া রে, ফিরে এসে—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি!

রণবাদ্য। প্রস্থান

অমিয়ার অবসন্ন হইয়া পতন

নবম দৃশ্য

নগর। রুদ্রচণ্ড

রুদ্র। বেধেছে তুমুল রণ; কোথা পৃথ্বীরাজ!
ওরে রে সংগ্রামদৈত্য শোণিতপিপাসী,
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজে রেখে দিস এ ছুরিকা-তরে।
পৃথ্বীরাজ আছে কোন্ শিবিরে না জানি!
ভ্রমিতেছি তার তরে প্রভাত হইতে।
আজ তার দেখা পেলে পূরাইব সাধ।
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে, দক্ষিনে বামে সহস্র বর্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারি দিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হতে চেয়ে শত শত আঁখি!
এত লোক, এত গোল সহ্য নাহি হয়!

একজন পান্থের প্রতি

কে গো তুমি মহাশয়, মুখপানে মোর
একেবারে চেয়ে আছ অবাক্ হইয়া ?
কখন কি দেখ নাই মানুষের মুখ ?
যেথা যাই শত আঁখি মোর মুখ চেয়ে,
আঁখিগুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে !
যেথা হেরি চারি দিকে সূর্য্যের আলোক,
নয়ন বিঁধিছে মোর বাণের মতন !
একটু আড়াল পাই, একটু আঁধার,
বাঁচি তবে দুই দণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া !
একি হেরি ? উর্দ্ধশ্বাস নাগরিকগণ
কোথায় ছুটেছে সব অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ?
ওগো পান্থ, বলো মোরে ত্বরা ক'রে বলো,
মরেছে কি পৃথ্বীরাজ ? ত্বরা ক'রে বলো !

পান্থ। কে তুই অসভ্য বন্য, কোথা হতে এলি ?
অকল্যাণ বাণী যদি উচ্চারিস মুখে
রসনা পুড়াব তোর জ্বলন্ত অঙ্গারে !

[প্রস্থান

রুদ্র। [আর একজনের প্রতি]
শোন পান্থ, বলো শোন পান্থ, বলো মোরে কোথা যাও সবে,
রণক্ষেত্রে অমঙ্গল ঘটে নি তো কিছু !

[উত্তর না দিয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। [একজন পান্থকে ধরিয়া]
অসভ্য বর্বর যত, বল্ মোরে বল্ !
ছাড়িব না, যতক্ষণ না দিবি উত্তর !
বল্ শুধু পৃথ্বীরাজ রয়েছে বাঁচিয়া !

[বলপূর্বক ছাড়াইয়া লইয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। নগরকুক্কুর যত মরুক— মরুক !
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল,
যুদ্ধের হুংকার শুনে ডরিয়া মরুক !
নবনীগঠিত যত সুখের শরীর—
নিজের অস্ত্রের ভারে পিষিয়া মরুক !
ঐশ্বর্যধূলায় অন্ধ নগরের কীট
নিজের গরবে ফেটে মরুক— মরুক !

দশম দৃশ্য

অমিয়া। পথ

অমিয়া। চ'লে গেল !— সকলেই চ'লে গেল গো !
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্তের তরে দেখা হল যদি,
চ'লে গেল ? একবার কথা কহিল না ?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া ?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো ?
অমিয়া রে, এত কি নির্বোধ তুই মেয়ে ?
সকলেরি কাছে কি করিস অপরাধ ?
পিতা তোরে জন্মতরে করিলেন ত্যাগ,
চাঁদ কবি ভাই তোর স্নেহের সাগর,
তাঁরো কাছে আজ কি রে হলি অপরাধী ?
তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ ?
কেহ তোর রহিল না অকূল সংসারে ?
কে আছে গো, ক্ষুদ্র এই শ্রান্ত বালিকারে
একবার নেবে গো স্নেহের কোলে তুলে ?
এই তো এসেছি সেই অরণ্যের পথে।
যাব কি পিতার কাছে ? যদি রুষ্ট হন !
আবার আমারে যদি দেন তাড়াইয়া !
যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাঁরি কাছে যাই !
ধরিয়া চরণ তাঁর রহিব পড়িয়া !
মা গো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর !
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিঁড়ে গেল সব !
চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হল যদি,
একবার ডাকিলে না 'অমিয়া' বলিয়া !

[প্রস্থান

একাদশ দৃশ্য

নাগরিকগণ

প্রথম। সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া—
শুনিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের।
দ্বিতীয়। অস্ত্রভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা
আয় সবে ত্বরা ক'রে, সময় যে নাই !
নগরদুয়ারে গিয়া দাঁড়াই আমরা।

সকলে। এখনি— এখনি চল যে আছ যেখানে !
তৃতীয়। চিতানল গৃহে গৃহে জ্বালাইতে বলো,
নগরশ্মশানে আজ রমণীরা যত
প্রাণবিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা !
চতুর্থ। মণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জ্বালি শোণিতমদিরা
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

দূতের প্রবেশ

দূত। শোন, শোন, পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন।
সকলে। বন্দী ?
প্রথম। রাজ-রাজ মহারাজ বন্দী আজি ?
দ্বিতীয়। লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে !
তৃতীয়। ভেঙে ফেল অট্টালিকা !
চতুর্থ। ভস্ম কর গ্রাম,
সকলে। সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনানগরী।

দ্বাদশ দৃশ্য

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। এখনো তো কিছু তার পেনু না সংবাদ
পৃথ্বীরাজ মরেছে কি রয়েছে বাঁচিয়া।
হীন প্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ !
ঋণ-করা প্রাণ আর বহিতে পারি না,
কবে তোরে ত্যাগ ক'রে বাঁচিব আবার !
ছিছি, তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম,
জীবন নামেতে এক মরণ পাইনু !
অদৃষ্ট রে, আরো কি চাহিস কবিবারে ?
অনুগ্রহ 'পরে মোর জীবন রাখিলি !
অনুগ্রহ— শিশু চাঁদ, তার অনুগ্রহ !

একটি দূতের প্রবেশ

দূত। বন্দী পৃথ্বীরাজ আজ হত হয়েছেন।
রুদ্রচণ্ড। [চমকিয়া]—
হত ? সে কি কথা ? মিথ্যা বলিস নে মূঢ় !
মরে নি সে, মরে নি, মরে নি পৃথ্বীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ।
কোথা যাস বল্ তুই এখনো সে আছে !

দূত। সহসা উন্মাদ আজি হলে নাকি তুমি ?
বন্দীভাবে পৃথ্বীরাজ হত হয়েছেন
যারে বলি সেই মোরে মারিতে উদ্যত,
কিন্তু হেন রোষ আমি দেখি নি তো কারো।

[প্রস্থান

রুদ্রচণ্ড। ছুরি নিক্ষেপ করিয়া—
মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন !
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্যশিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয়-মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহূর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর !
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।
আয়, ছুরি, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর—
এ শূন্য আসন তাঁর ভেঙে ফেল্ তবে।

বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া

ভেঙে ফেল্, ভেঙে ফেল্, ভেঙে ফেল্ তবে।

অমিয়ার প্রবেশ

অমিয়া। পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা !

চমকিয়া স্তব্ধ

রুদ্রচণ্ড। আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা !
এত দিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।
অমিয়া, মলিন বড়ো মুখখানি তোর !
আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে !
আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন।

অমিয়া। রুদ্রচণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া—
ও কথা বোলো না পিতা, বোলো না, বোলো না—
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর।
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার,
এসেছি পিতার কোলে বড়ো শ্রান্ত হয়ে।
যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
তোমারে তিলেক-তরে ছাড়িব না আর।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা আমার তুই থাক্ বুকে থাক্।
সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিনু!
এখন সময় মোর ফুরায়ে এসেছে,
আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা?
আশীর্বাদ করি, বাছা, জন্মান্তরে যেন
এমন নিষ্ঠুর পিতা তোর নাহি হয়!
অমিয়া মা, কাঁদিস্ নে, থাক্ বুকে থাক!

ত্রয়োদশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

ভ্রমিব সন্ন্যাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে।
অদৃষ্ট রে, একি তোর নিদারুণ খেলা,
এক দিনে করিলি কি ওলট্‌পালট্!
কিছু রাখিলি নে আজ, কাল যাহা ছিল!
পৃথ্বীরাজ, রাজদণ্ড, দোর্দণ্ড প্রতাপ,
হাসি-কান্না-লীলা-ময় নগর নগরী,
অচল অটল কাল ছিল বর্তমান,
আজ তার কিছু নাই! চিহ্ন মাত্র নাই!
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল,
একি সব শ্মশানেতে মরীচিকা আঁকা!
মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে মিলাইয়া যায়,
জগতের শ্মশান বাহির হ'য়ে পড়ে!
চিতার কোলের পরে অস্থিভস্মমাঝে
মানুষেরা নাট্যশালা করেছে স্থাপন!
সন্ন্যাসী, কোথায় যাস্ শ্মশানে ভ্রমিতে!
নগর নগরী গ্রাম সকলি শ্মশান!
পৃথ্বীরাজ, তুমি যদি গেলে গো চলিয়া,
কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার!
যত দিন বেঁচে রব' যশোগান তব
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াব গাহিয়া।
কুটীরের রমণীরা কাঁদিবে সে গানে,
বালকেরা ঘেরি মোরে শুনিবে অবাক্!
দেশে দেশে সে গান শিখিবে কত লোক,
মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ,
দিশে দিশে সে নামের হবে প্রতিধ্বনি!

এই এক ব্রত শুধু রহিল আমার,
জীবনের আর সব গেছে ধ্বংস হ'য়ে!
আহা সে অমিয়া মোর, সে কি বেঁচে আছে?
তার তরে প্রাণ বড়ো হয়েছে অধীর!
চৌদিকে উঠিছে যবে রণকোলাহল,
চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা,
করুণ সে মুখখানি, দীনহীন বেশ,
আঁখির সামনে ছিল ছবির মতন!
আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া
ভীষণ সমরক্ষেত্রে কাঁদিয়াছি আমি!
তার সেই 'চাঁদ' 'চাঁদ' স্নেহের উচ্ছ্বাস,
কানেতে বাজিতেছিল আকুল সে স্বর!
একটি কথাও তারে নারিনু বলিতে?
মুখের কথাটি তার মুখে র'য়ে গেল,
একটি উত্তর দিতে পেনু না সময়?
চাহিয়া পাষাণদৃষ্টি আইনু চলিয়া!
পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল?
যাই সে অরণ্যমাঝে যাই একবার!

চতুর্দশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

চাঁদ কবি। উহু, কি নিস্তব্ধ বন, হাহা করে বায়ু,
পদশব্দে প্রতিধ্বনি উঠিছে কাঁদিয়া!
আশঙ্কায় দেহ যেন উঠিছে শিহরি,
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিঃশ্বাস!
এই যে কুটীর সেই, সাড়াশব্দ নাই,
গোপন কি কথা ল'য়ে স্তব্ধ আছে যেন!
কাঁপিছে চরণ মোর! যাব কি ভিতরে!

দ্বার উদ্‌ঘাটন

গৃহমধ্যে রুদ্রচণ্ডের মৃতদেহ ও মুমূর্ষু অমিয়া

অমিয়া, অমিয়া মোর, স্নেহের প্রতিমা!
চাঁদ কবি, ভাই তোর এসেছে হেথায়।
অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ, আইলে কি? এসো কাছে এসো—
কখন আসিবে তুমি সেই আশা চেয়ে
বুঝি এতক্ষণ প্রাণ যায় নি চলিয়া!

কত দিন কত রাত্রি পথে পথে খুঁজি
দেখা হল, ছুটে গেনু ভায়ের কাছেতে,
একবার দাঁড়ালে না ? চলে গেলে চাঁদ ?
না জানি কি অপরাধ করেছে অমিয়া !
আজ, চাঁদ, জীবনের শেষ দণ্ডে মোর
শুনিতে ব্যাকুল বড়ো সে কি অপরাধ !
দেখিতে পাই নে কেন ? কোথা তুমি ভাই ?
সংসার চোখের 'পরে আসিছে মিলায়ে।
ত্বরা ক'রে বলো চাঁদ, সময় যে নাই,
একবার দাঁড়ালে না, চলে গেলে ভাই ?

মৃত্যু

চাঁদ কবি। একি হ'ল, একি হ'ল, অমিয়া, অমিয়া,
এক মুহূর্তের তরে রহিলি না তুই ?
করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল,
উত্তর শুনিতে তার দাঁড়ালি নে বোন ?
যত দিন বেঁচে রব ওই প্রশ্ন তোর
কানেতে বাজিবে মোর দিবস রজনী,
জীবনের শেষ দণ্ডে ওই প্রশ্ন তোর
শুনিতে শুনিতে বালা মুদিব নয়ন।
অমিয়া, অমিয়া মোর, ওঠ্ একবার।
প্রশ্ন শুধাবারে শুধু বেঁচেছিলি বোন,
এক দণ্ড রহিলি নে উত্তর শুনিতে ?
ভালো বোন, দেখা হবে আর-এক দিন,
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।

সমাপ্ত

কালমৃগয়া

কাল-মৃগয়া।

(গীতি-নাট্য।)

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে
অভিনয়ার্থ
রচিত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।
অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

মূল্য চারি আনা।

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

ঋষিকুমারের প্রবেশ

মিশ্র ভূপালী— যৎ

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়!
লীলা লীলা, খেলাবি আয়।

লীলার প্রবেশ

মিশ্র খাম্বাজ— কাওয়ালি

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি!
ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি!
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল।
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল!

মিশ্র খাম্বাজ— আড়খেমটা

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—
ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দ'লে পায়!

মিশ্র বিভাস— আড়খেমটা

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা
যাব নদীর কূলে—
শিব গড়িয়ে করব পুজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধ'রে,
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে!

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই ফিরে—
একলা আছেন অন্ধ পিতা
আঁধার কুটীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

মিশ্র সিন্ধু— ঢিমে তেতালা

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া,

দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।

তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!

সকলে। এসো সবে এসো সখি,
মোরা হেথা ব'সে থাকি।

প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি!

সকলে। আঁখি-'পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

রাগিণী মিশ্র কেদারা— একতালা

সকলে। ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

ছায়ানট— আধবা

প্রথম। নেহার' লো সহচরি,
কানন আঁধার করি,
ওই দেখ বিভাবরী আসিছে।
দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।
তৃতীয়। আয়, সখি, এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।
চতুর্থ। ওই দেখ নলিনী উথলিত সরসে
অফুট-মুকুল-মুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।
সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচয়নে,
ফুটায়ে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে!

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো হস্য স্রক্তয়ো দৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥

তস্য প্রাচী দিগ্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ স য এতমেবং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥

জয়জয়ন্তী— ঝাঁপতাল

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে।
শুকাইয়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে।

মেঘগর্জন

দেশ— ঢিমে তেতালা

না না কাজ নাই, যেয়ো না বাছা,—
গভীরা রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই, কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে—
তোরেও কি হারাব বাছা রে,
সে তো প্রাণে স'বে না!

খাম্বাজ— ঢিমে তেতালা

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি,
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

গৌড়মল্লার— কাওয়ালি

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী,
দিক-ললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে।

ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী,
গুরু গুরু নীরদগরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে—
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড় কড় বাজ !

[প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে। ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে।
দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা—
তৃতীয়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে !
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে !

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে। আয় লো সজনি, সবে মিলে !
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন,
এ বরষা-দিনে,
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকাদোলায় দুলে !
প্রথম। ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন।
দ্বিতীয়। মাখাব বরণ ফুলে ফুলে।
তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লবশ্যাম-দুকূলে।
দ্বিতীয়। নাচিব, সখি, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে !

ঋষিকুমারের প্রবেশ

গারা— কাওয়ালি

ঋষিকুমার। কী ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা !
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে
সরযূতটিনী-তীরে—
কোথায় সে পথ—
ওই কল কল রব !

আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বরা ।

বনদেবীগণ । এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস !
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে !
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে !
কি-জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা !

ঋষিকুমার । না; কোরো না মানা, যাব ত্বরা ।
পিতা আমার কাতর তৃষায়,
যেতেছি তাই সরযূনদীতীরে ।

মিশ্র বেলাওল— একতালা

বনদেবীগণ । মানা না মানিলি, তবুও চলিলি,
কি জানি কি ঘটে !
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে !
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্,
যা ঘরে যা ছুটে !
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয়স্নেহছায়ায় !
অয়ি বিভাবরী, রাখ বুকে ধরি
ভয় অপহরি রাখ এ জনায় !
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায় !

পঞ্চম দৃশ্য

শিকারীগণের প্রবেশ

ইমন কল্যাণ— কাওয়ালি

বনে বনে সবে মিলে চলো হো ! চলো হো !
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয় !
এমন রজনী বহে যায় রে !
ধনু বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয়, আয়, আয়, আয় রে !
বাজা শিঙা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপিবে বন,

আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে—
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

দশরথের প্রবেশ

সিন্দুড়া

শিকারীগণ । জয়তি জয় জয় রাজন্ বন্দি তোমারে,
কে আছে তোমা সমান ।
ত্রিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
তোমারে করি প্রণাম !

দশরথ । শিকারীদের প্রতি

বাহার

গহনে গহনে যা রে তোরা,
নিশি ব'হে যায় যে !
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ্ গে !
এই বেলা যা রে !
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্ ।
জ্বালায়ে মশাল আলো
এই বেলা আয় রে !

[প্রস্থান

অহং— কাওয়ালি

প্রথম শিকারী । চল চল, ভাই,
ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই ।
দ্বিতীয় । প্রাণপণ খোঁজ, এ বন, সে বন ।
তৃতীয় । চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই ।
প্রথম । না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই— কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই ।
তৃতীয় । বরা' ! বরা' !
প্রথম । আরে দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার ।

চুপিচুপি আয়, চুপিচুপি আয়
অশথতলায়—
এবার ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়ে সবে থাক্‌—
সাবধান, ধর বাণ, সাবধান, ছাড় বাণ—

২।৩ জন। গেল গেল ওই ওই পালায় পালায়—
চল্‌ চল্‌—
ছোট্‌ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

[প্রস্থান

বিদূষকের সভয়ে প্রবেশ

দেশ—খেমটা

প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কি!
বাবা রে!
আমি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা,
দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না—
বাহাবা, সাবাস তোরে,
সাবাস্‌ রে তোর ভরসা দেখি।
গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে
ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে!
মনে আশা ছিল মস্ত
চলবে ভালো দক্ষিণ হস্ত—
হা রে রে পোড়া কপাল,
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি!

শিকারীগণের প্রবেশ

শংকরা

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই ব'সে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধ ক'ষে!
বন বাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে,
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!

বিদূষক। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!

শিকার করতে যায় কে মরতে—
টুঁসিয়ে দেবে বরা' মোষে !
টুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না,
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ।

[হাসিতে হাসিতে শিকারীগণের প্রস্থান

মিশ্র সিন্ধু

বিদূষক । আঃ, বেঁচেছি এখন !
শর্মা ও দিকে আর নন ।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন ।
বাবা ! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি
কে জানে কখন ।
চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
চক্ষুদুটো মশাল-পারা,
গোঁ ভরে হেঁট-মুখে তাড়া
কল্লে সে যখন—
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপসে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি
শঙ্কাতে তখন ।

[প্রস্থান

শিকার স্কন্ধে শিকারীগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার !
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার !
বনবাদাড় তোলপাড়,
করেছি রে উজাড় !

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

বনদেবীদের প্রবেশ

মিশ্র মল্লার— পোস্ত

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে ।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া !

তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে !
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণনয়নে চাহিছে ।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে ।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
বিপদ ঘনছায়া ছাইয়া ।
কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া !

[প্রস্থান

দশরথের প্রবেশ

খাম্বাজ— কাওয়ালি

না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন ।
কোথা গেল সে করিশিশু, কোথা লুকাল !
একে তো জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন !
যাক্-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
যাব পিছে পিছে—
না না না না, ও কি শুনি !
ওই সে সরযূতীরে করিছে সলিল পান
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ !

নেপথ্যে বনদেবীগণ

ভৈরবী

হায় কী হ'ল ! হায় কী হ'ল !

বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন

বেহাগ— আড়াঠেকা

কি করিনু হায় !
এ তো নয় রে করিশিশু, ঋষির তনয় !
নিঠুর প্রখর বাণে রুধিরে আপ্লুতকায়
কার রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায় !
কি কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
কি মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ !
দেবতা, অমৃতনীরে হারা-প্রাণ দাও ফিরে,
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায় !

মুখে জলসিঞ্চন

খট— ঝাঁপতাল

ঋষিকুমার। কী দোষ করেছি তোমার,
কেন গো হানিলে বাণ!
একই বাণে বধিলে যে
দুটি অভাগার প্রাণ!
শিশু বনচারী আমি
কিছুই নাহিক জানি—
ফল মূল তুলে আনি,
করি সামবেদ গান!
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে—
কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেও,
এ দেহ তাঁর কোলে দিও—
দেখো, দেখো ভুলোনাকো,
কোরো তাঁরে বারিদান!
মার্জনা করিবেন পিতা,
তাঁর যে দয়ার প্রাণ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

মিশ্র ঝিঝিট খাম্বাজ— মধ্যমান

অন্ধঋষি। আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে—
হা তাত, একবার আয় রে!
ঘোরা রজনী, একাকী
কোথা রহিলে এ সময়ে!
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে—
কী হবে কে জানে!

লীলার প্রবেশ

রামকেলী— কাওয়ালি

বলো বলো পিতা, কোথা সে গিয়েছে!
কোথা সে ভাইটি মম, কোন্ কাননে!
কেন তাহারে নাহি হেরি!

খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তবু কেন এখন না এল ?
বনে বনে ফিরি 'ভাই' 'ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে !

বেহাগ— কাওয়ালি

অন্ধ। কে জানে কোথা সে !
প্রহর গনিয়া গনিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি !
একা হেথা, কুটীরদুয়ারে—
বাছা রে এলি নে !
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে—
জল আনিয়ে কাজ নাই,
তুই যে আমার পিপাসার জল !
কেন রে জাগিছে মনে ভয় !
কেন আজি তোরে,
হারাই হারাই মনে হয় !
কে জানে ! [লীলার প্রস্থান

মৃতদেহ লইয়া দশরথের প্রবেশ

সিন্ধু— চৌতাল

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলি রে !
হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে !
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রাতে,
এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি !
আছি সারানিশি হায় রে
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর—
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে !

রাজবিজয়ী

দশরথ। অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা, তাত, ধরি চরণে—
কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে !
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর
করী-ভ্রমে বধি তব পুত্রবর,
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে !

দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে
ঋষিকুমারের মৃতদেহ-স্থাপন

বাহার— ঢিমে তেতালা

অন্ধ। কী বলিলে, কী শুনিলাম, একি কভু হয় !
এই যে জল আনিবারে গেল সে সরযূতীরে—
কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয় !

সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে,
আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে !
না না না, কোথা সে আছে— এনে দে আমার কাছে,
সারা নিশি জেগে আছি বিলম্ব না সয় !
এখনো যে নিরুত্তর— নাহি প্রাণে ভয় !
রে দুরাত্মা— কী করিলি—

অভিশাপ

পুত্রব্যসনজং দুঃখং
যদেতন্মম সাংপ্রতম্ ।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন
রাজন্ কালং করিষ্যসি ।।

মিশ্র ভূপালি— কাওয়ালি

দশরথ । ক্ষমা করো মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জনা নাহি কি মোর !
ও ! সহে না যাতনা আর,
শান্তি পাইব কোথায়—
তুমি কৃপা না করিলে
নাহি যে কোনো উপায় !
আমি দীন হীন অতি—
ক্ষমো ক্ষমো কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ
এ পাপের পাথারে ।

কাফি— আড়াঠেকা

অন্ধ । আহা, কেমনে বধিল তোরে !
তুই যে স্নেহের পুতলি, সুকুমার শিশু ওরে !
বড়ো কি বেজেছে বুকে, বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধূলাতে কেন লুটায়ে, রাখিব বুকে ক'রে !

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও
অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া
দশরথের প্রতি

নটনারায়ণ

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে !

পুত্রের প্রতি

প্রভাতী

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলই আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি!
যাও রে অনন্তধামে, অমৃতনিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদারপ্রাণে!
দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে এক তানে!
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতিময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে!

যবনিকাপতন

পুনরুত্থান

ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান

ঝিঁঝিট খাম্বাজ— একতালা

সকলি ফুরাল স্বপনপ্রায়,
কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায় !
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখিরা কেন রে গাহে না গান,
ও ! সব হেরি শূন্যময়,
কোথা সে হায় !
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও ! সে আর আসিবে না,
কোথা সে হায় !

যবনিকাপতন

সমাপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র ১৮০৫ শক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মনের বাগান-বাড়ি

ভালোবাসা অথের আত্মসমর্পণ নহে। ভালোবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভালো তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে ; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালোবাস তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না ; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও ; হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না। প্রেম হৃদয়ের সারাভাগ মাত্র। হৃদয় মন্দন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়; কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান তাহাকেই তুমি অমৃত দাও, যাহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাকেই অমৃত দাও। কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে— আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।

যাঁহাকে তুমি ভালোবাস তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের সমস্তটা দেখাইও না। যেখানে তোমার হৃদয়ের পয়ঃপ্রণালী, যেখানে আবর্জনা, যেখানে জঞ্জাল, সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইও না ; তাহা যদি পার' তবে আর তোমার কিসের ভালোবাসা ! তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের এমন অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট জজ করিবে যেখানে ম্যালেরিয়া নাই, ওলাউঠা নাই, বসন্ত নাই। তাঁহাকে যে বাড়ি দিবে তাহার দক্ষিণ দিকে খোলা, বাতাস আনাগোনা করে, বড়ো বড়ো ঘর, সূর্যের আলোক প্রবেশ করে। ইহা যে করে সেই যথার্থ ভালোবাসে। এমন স্বার্থপর প্রণয়ী বোধ করি নাই যে মনে করে তাহার প্রণয়ীকে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাঁশঝাড়ে ঘুরাইয়া সমস্ত পচাপুকুরে স্নান করাইয়া, না বেড়াইলে যথার্থ ভালোবাসা হয় না। অনেকের মত তাহাই বটে, কিন্তু সংকোচে পারিয়া উঠে না। এ বড়ো অপূর্ব মত।

অনেকে বলিয়া উঠিবেন, "এ কিরকম কথা : যাঁহাকে তুমি খুব ভালোবাস, যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায়, তাঁহার নিকটে মনের কোনো ভাগ গোপন করা কি উচিত?" উচিত নহে তো কি? সর্বাপেক্ষা আত্মীয় "নিজের" নিকটে স্বভাবত অনেকটা গোপন করিতে হয়। না করিলে চলে না, না করিলে মঙ্গল নাই। প্রকৃতি যাহাদের চক্ষে পাতা দেন নাই, যাহারা আবশ্যকমত চোখ বুজিতে পারে না, মনে যাহা কিছু আসে, যে অবস্থাতেই আসে, তাহার কুম্ভীরচক্ষে পড়িবেই, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দশা। আমরা অনেক মনোভাব ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি না, চোখ বুজিয়া যাই। এরূপ করিলে সে ভাবগুলিকে উপেক্ষা করা হয়, অনাদর করা হয়। ক্রমে তাহারা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এই ভাবগুলি প্রবৃত্তিগুলি যদি ঢাকিয়া রাখা না যায়— পরস্পরের কাছে প্রকাশ করিয়া, বৈঠকখানার মধ্যে, কথাবার্তার মধ্যে তাহাদের ডাকিয়া আনা হয়— তাহাদের সহিত বিশেষ চেনাশুনা হইয়া যায়— তাহাদের কদর্য মূর্তি এমন সহিয়া যায় যে আর খারাপ লাগে না— সে কি ভালো ? ইহাতে কি তাহাদের অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয় না? একে তো যাহাকে ভালোবাসি তাহাকে ভালো জিনিষ দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়ত তাহাকে মন্দ জিনিষ দিলে মন্দ জিনিষের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া, প্রহার দেয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে ?

দোকানে-হাটে রাস্তায়-ঘাটে যাহাদের সঙ্গে আমাদের সচরাচর দেখাশুনা হয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানান কাজের সম্বন্ধ। তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানা সাংবাদিক ভাবের আদান প্রদান চলে। পরস্পরের দেখাশুনা হইলে, হয় কথাই হয় না, নয় অতি তুচ্ছ বিষয়ে কথা হয়, নয় কাজের কথা চলে। ইহারা তো সাধারণ মনুষ্য। কিন্তু এমন এক এক জনকে আমার চোখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে ; তাহার মনে যতটুকু আদর্শভাব সেইটুকু সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার অন্য কোনো কাজকর্মের সম্পর্ক নাই, কেনা বেচার সম্বন্ধ নাই, দলিল দস্তাবেজের আত্মীয়তা নাই। আমি তাহার নিকট আদর্শ, সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগান-বাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি, সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে। এ বাগানের কাছে কদর্য কিছুই নাই, দুর্গন্ধ কিছুই নাই। পরস্পরের উচিত, যাহাতে নিজের নিজের বাগান পরস্পরের নিকট রমণীয় হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। যত ফুলগাছ রোপণ করা যায়, যত কাঁটা-গাছ উপড়াইয়া ফেলা হয়, ততই ভালো। এত বাণিজ্য ব্যবসায় বাড়িতেছে, এত কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে, যে, গাছপালা-ফুলে-ভরা হাওয়া খাইবার জমি কমিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত তোমার মনের এক অংশে গাছপালা রোপণ করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে তোমার প্রিয়তম তোমার মনের মধ্যে আসিয়া মাঝে মাঝে হাওয়া খাইয়া যাইতে পারেন। সে স্থানে অস্বাস্থ্যজনক দূষিত কিছু না থাকে যেন, যদি থাকে তাহা আবৃত করিয়া রাখিও।

সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালোবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন এক জনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চা হইতে থাকে। ভালোবাসার খাতিরে লোককে মনের মধ্যে ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়, ইহাতে তাহার নিজের মনের স্বাস্থ্য-সম্পাদন হয়, আর তাহার মনোবিহারী বন্ধুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। নিজের মনের সর্বাপেক্ষা ভালো জমিটুকু অন্যকে দেওয়ায়, ভালোবাসা ছাড়া অমন আর কে করিতে পারে ? তাই বলিতেছি ভালোবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ করা নহে, ভালোবাসা অর্থে ভালো বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভালো বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভালো জায়গায় স্থাপন করা। যাঁহাদের হৃদয়কাননের ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারি দিকে কাঁটা জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্বরহৃদয় বিজ্ঞ বৃদ্ধেরাই ভালোবাসার নিন্দা করেন।

গরীব হইবার সামর্থ্য

অনেকের গরীব-মানুষি করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষি করিয়া উঠিতে পারে। আমার মনের এক সাধ আছে যে, এত বড়ো মানুষ হইতে পারি যে, অসংকোচে গরীব-মানুষি করিয়া লইতে পারি ! এখনো এত গরীব মানুষ আছি যে গিল্টি-করা বোতাম পরিতে হয়, কবে এত টাকা হইবে যে সত্যকার পিতলের বোতাম পরিতে সাহস হইবে ! এখনো আমার রূপার এত অভাব যে অন্যের সমুখে রূপার থালায় ভাত না খাইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। এখনো আমার স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয় ! আমার বিশ্বাস ছিল রাজশ্রী ক বাহাদুর খুব বড়ো-মানুষ লোক। সে দিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম তিনি নিজে গদীর উপরে বসেন ও অভ্যাগতদিগকে নীচে বসান, তখন জানিতে পারিলাম যে তাঁর গরীব-মানুষি করিবার মতো সম্পত্তি নাই। এখন আমাকে যেই বলে যে, ক রায়-বাহাদুর মস্ত বড়োমানুষ লোক, আমি তাহাকেই বলি, "সে কেমন করিয়া হইবে ? তাহা হইলে তিনি গদীর উপর

বসেন কেন ?" উপার্জন করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, অনেক টাকা করিয়াছি, কিন্তু এখনো এত বড়োমানুষ হইতে পারিলাম না যে আমি যে বড়োমানুষ এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিলাম। সর্বদাই মনে হয় আমি বড়োমানুষ। কাজেই আংটি পরিতে হয়, কেহ যদি আমাকে রাজাবাহাদুর না বলিয়া বাবু বলে, তবেই চোখ রাঙাইয়া উঠিতে হয়। যে ব্যক্তি অতি সহজে খাবার হজম করিয়া ফেলিতে পারে, যাহার জীর্ণ খাদ্য অতি নিঃশব্দে নিরূপদ্রবে শরীরের রক্ত নির্মাণ করে, সে ব্যক্তির চব্বিশ ঘণ্টা 'আহার করিয়াছি' বলিয়া একটা চেতনা থাকে না। কিন্তু যে হজম করিতে পারে না, যাহার পেট ভার হইয়া থাকে, পেট কামড়াইতে থাকে, সে প্রতি মুহূর্তে জানিতে পারে যে, হাঁ, আহার করিয়াছি বটে। অনেকের টাকা আছে বটে, কিন্তু নিঃশব্দে টাকা হজম করিতে পারে না, পরিপাকশক্তি নাই— ইহাদের কি আর বড়োমানুষ বলে ! ইহাদের বড়োমানুষি করিবার প্রতিভা নাই। ইহারা ঘরে ছবি টাঙায় পরকে দেখাইবার জন্য ; শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য ঘরটাকে একেবারে ছবির দোকান করিয়া তুলে। ইহারা গণ্ডা গণ্ডা গাহিয়ে বাজিয়ে নিযুক্ত রাখে, পাড়াপ্রতিবেশীদের কানে তালা লাগাইয়া দেয়, অথচ যথার্থ গান বাজনা উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। এই সকল চিনির বলদদিগকে প্রকৃতি গরীব মনুষ্য করিয়া গড়িয়াছেন। কেবল কতকগুলা জমিদারী ও টাকার থলিতে বেচারাদিগকে বড়োমানুষ করিবে কি করিয়া ?

কিন্তু-ওয়ালা

বড়োমানুষির কথা হইতে আরেক কথা মনে পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি স্বভাবত বড়োমানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে এ কথা পুরানো হইয়া গিয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন, অনেক জল থাকিলে মেঘ নামিয়া আসে, অনেক ফল ফলিলে গাছ নুইয়া পড়ে। গল্প আছে, নিউটন বলিয়াছেন তিনি জ্ঞানসমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়াইয়াছেন। নিউটন নাকি বিশেষ বড়োমানুষ লোক, তিনি ছাড়া এ কথা যে-সে লোকের মুখে আসিত না, গলায় বাধিয়া যাইত। অতএব দেখা যাইতে যাহারা স্বভাবত গরীব, প্রায় তাহারা অহংকারী হইয়া থাকে। ইহাও সহ্য হয়, কিন্তু এমন গরীবও আছে যাহারা প্রাণ খুলিয়া পরের প্রশংসা করিতে পারে না। প্রকৃতি সে ক্ষমতা তাহাদের দেন নাই। এমন লোক সংসারে পদে পদে দেখা যায়। এরূপ স্বভাব কাহাদের হয় ? সকলে যদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন— যাহারা স্বাভাবিক অহংকারী অথচ নিজের এমন কিছু নাই যাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারে, তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে। একটা ভালো কবিতাপুস্তক দেখিয়াই তাহাদের মনে হয় 'আমিও এইরূপ লিখিতে পারি', অথচ তাহারা কোনো জন্মে কবিতা লিখে নাই। অহংকার করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না, অথচ প্রশংসা করাও দায় হইয়া পড়িয়াছে। সে বলিতে চায়, এ কবিতাটি বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেয়েও ভালো কবিতা একটি আছে, অর্থাৎ সে কবিতাটি এখনো লেখা হয় নাই, কিন্তু লেখা যাইতেও পারে। ভালো কবিতাটি বাহির করিতে পারে না নাকি, সেই জন্য তাহার গায়ের জ্বালা ধরে। সুতরাং প্রশংসার মধ্যে একটা হুলবিশিষ্ট 'কিন্তু'র কীট না রাখিয়া থাকিতে পারে না। একটা যে বিকটাকার 'কিন্তু রাহু তাহার সকল প্রশংসাই গ্রাস করিয়া থাকে, সে রাহুটি আর কেহ নহে, সে তাহার অঙ্গহীন 'আমি', তাহার অপরিতৃপ্ত ক্ষুধিত অহংকার। সে দৈত্য, তাহার প্রশংসাসুধা খাইবার অধিকার নাই, এই জন্য সকল সুধাকর চাঁদকে মলিন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার নিজের জ্ঞান আছে সে একটা মস্ত লোক, অথচ প্রমাণ দিয়া অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিতেছে না, সুতরাং সে সকলের যশকেই অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেয়। সে মনে করে, 'আমার ভাবী যশের জন্য অথবা ন্যায্য যশের জন্য অনেকটা জায়গা করিয়া রাখা উচিত। আমি তো নিজে কোনো

যশের কাজ করিতে পারি নাই, অন্যের কোনো কাজকেই যখন খাতিরেই আনি না, তখন লোকদের বুঝা উচিত যে, হাতে-কলমে যদি কাজে প্রবৃত্ত হই তবে না জানি কি কারখানাই হয় !' সে মনে করে যে, সেই ভাবী সম্ভাবিত যশের জন্য একটা সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত, অন্যান্য সকলের যশের রত্নগুলি ভাঙিয়া এই সিংহাসনটি প্রস্তুত করা আবশ্যক। 'কিন্তু'-নামক অস্ত্র দিয়া সকলের যশ হইতে রত্নগুলি ভাঙিয়া ইহারা রাখিয়া দেয়। আহা, এ বেচারীরা কি অসুখী ! ইহাদের এ রোগ নিবারণ হয়, যদি সত্য সত্য ন্যায্য উপায়ে ইহারা যশ উপার্জন করিতে পারে। ইহাদের এমন স্বভাব নাই যে পরের প্রশংসা করিতে পারে, এমন শিক্ষা নাই যে পরের প্রশংসা করিতে পারে, এমন সম্বল নাই যে পরের প্রশংসা করিতে পারে— যে দিকে চাহি সেই দিকেই দারিদ্র্য। অনেক বড়োমানুষ অহংকারী আছে যাহাদের পরের প্রশংসা করিবার মতো সম্বল আছে, কিন্তু এমন হতভাগ্য দরিদ্র অহংকারী আছে যে নিজের অহংকার করিতেও পারে না আবার পরের প্রশংসা করিতেও পারে না। ইহাদের 'কিন্তু'-পীড়িত প্রশংসাতে কেহ যেন ব্যথিত না হন, কারণ ইহাতে তাহাদেরই দারিদ্র্য প্রকাশ করে। এই 'কিন্তু'গুলি তাহাদেরই ভিক্ষার ঝুলি। বেচারী যশ উপার্জন করিতে পারে নাই, এই নিমিত্ত তোমার উপার্জিত যশ হইতে কিছু অংশ চায়, তাই 'কিন্তু'-র ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছে।

দয়ালু মাংসাশী

বাঙ্গালীদের মাংস খাওয়ার পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমার বিশ্বজনীন প্রেম, সকলের প্রতি দয়া এত প্রবল যে, আমি মাংস খাওয়া কর্তব্য কাজ মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব পূর্ণ-আত্মার মধ্যে লীন করিয়া দেওয়াই সাধনার চরম ফল ! পূর্ণতর জীবের মধ্যে অপূর্ণতর জীবের নির্বাণমুক্তি প্রার্থনীয় নহে তো কি? একটা পশুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, সে মানুষ হইয়া গেল ; মানুষের জীবনীশক্তিতে অভাব পড়িলে একটা পশু তাহা পূরণ করিতে পারিল ; মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া গিয়া মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সুখ, স্বাস্থ্য, উদ্যম তেজ নির্মাণ করিতে পারিল, ইহা কি তাহার সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় ! প্রথমত সে নিজে স্বপ্নের অগোচর সম্পূর্ণতা লাভ করিল, দ্বিতীয়ত মানুষের মতো একটা উন্নত জীবকে সম্পূর্ণতর করিল। ছাগলদের মধ্যে এমন দার্শনিক কি আজ পর্যন্ত কেহ জন্মায় নাই, যে তাহার লম্বা দাড়ি নাড়িয়া সমবেত শিষ্যশিশুবর্গকে এই নির্বাণমুক্তির সম্বন্ধে ভ্যাকরণ-শুদ্ধ উপদেশ দেয় ! আহা, যদি কেহ এমন ছাগহিতৈষী জন্মিয়া থাকে তবে তাহার নিকট আমার ঠিকানাটা পাঠাইয়া দিই এবং সেই সঙ্গে লিখিয়া দিই যে, জ্ঞানালোকিত ইয়ং-ছাগদের মধ্যে যাঁহার মুক্তিকামনা আছে তিনি উক্ত ঠিকানায় আগমন করিলে সদয়হৃদয় উপস্থিত লেখক মহাশয় তাঁহাকে মুক্তিদানপূর্বক বাধিত করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, পশুদের উপকার করিবার জন্য, ব্যয়সাধ্য হইলেও, দয়ার্দ্রচিত্ত লোকদের মাংস খাওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহাদের মত এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজত্ব অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি ইংরাজদের মধ্যে একেবারে লীন হইয়া যাইতে পারে, তবে সুখের বিষয় হয়।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু। অধিক উদাহরণের আবশ্যক নাই— মুসলমানেরা আমাদের খাইয়াছেন, ইংরাজেরা আমাদের খাইতেছেন। যদি প্রমাণ হইল যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাইয়া থাকি, তবে দেখা যাক— বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক ? নির্বোধদের আমরা গাধা, গরু, মেড়া, হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, ভল্লুক, সিংহ, বা ব্যাঘ্রমূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে যে,

বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্নাম ঘুচে না। নহিলে "বাঁদর" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে, তাহাকে নির্বোধ বলা হইল ? পশুদের মধ্যে বানরের বুদ্ধির অভাব বিশেষ লক্ষিত হয় নাই, তাহার একমাত্র অপরাধ সে বেচারী উদ্ভিদ্‌ভোজী। অতএব অনর্থক এমন একটা দুর্নামভাজন হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি ? আর একটা কথা— উদ্ভিদ্‌ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভালো হজম হইল না ; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না, আহার করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া মাঝের হইতে বলহানি হইল, রোগ হইবার উপক্রম হইল। অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে আত্মত্ব বিসর্জন করিয়া পরের দেহের রক্ত নির্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে। মাংস খাইবার এক আপত্তি আছে যে, শাস্ত্রে মাংসকে অপবিত্র বলে। কিন্তু সে কোনো কাজের কথাই নহে। শাস্ত্রেই আছে, মেদিনী মাংসেই নির্মিত। আমরা মাংসের উপরেই বাস করি। এ মাংসের পৃথিবীতে মাংসেরই জয়।

অনধিকার

পূর্বাকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোনো গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার অধিকার-মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।" মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "মহারাজ, কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে আপনি তাহা নির্দেশ করুন ; আমি অবিলম্বেই আপনার ব্যাক্যানুসারে সেই সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।" ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাহা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ-পূর্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "ভগবন, যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোনো পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলানগরীতে, ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী-মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোনো পদার্থের আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না।"

—কালীসিংহের অনুবাদিত মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব। অনুগীতা পর্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। পৃ ৪২

জনক রাজার উক্তির তাৎপর্য এই যে, যাহা কিছুকে আমরা আমার বলি তাহার কিছুই আমার নয়। আমার সহিত তাহাদের ন্যূনাধিক সম্বন্ধ আছে এই পর্যন্ত, কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার কিছু মাত্র অধিকার নাই। আমরা ষষ্ঠীকে যে সম্বন্ধ-কারক বলি তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহাকে Possessive Case বলে তাহা অতি ভুল। মানুষের ব্যাকরণে সম্বন্ধ-কারক আছে কিন্তু Possessive Case নাই। একটি পরমাণুও আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারি না, সম্পূর্ণ জানিতে পারি না, ধ্বংস করিতে পারি না, নিয়মিত কালের অধিক রাখিতে পারি না। এমন কি, আমাদের শরীর ও মনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের অধিকার নাই। আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস করিতেছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র। একটি মন দিয়াছেন, একটি শরীর দিয়াছেন, আরো কতকগুলি ব্যবহার্য পদার্থ

দিয়াছেন। তাহার একটিকেও আমরা ভাঙিতে পারি না, স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি তাহা করিতে চেষ্টা করি, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি কখনো ভ্রমক্রমে আমরা মনে করি 'আমার শরীর আমার' ও সেই মনে করিয়া তাহার প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আসিয়া তাহার শাস্তি দেয়। এই জন্যই আমার শরীরকে পরের শরীরের মতো অতি সন্তর্পণে রাখিতে হয়, যেন কে তাহা আমার জিম্মায় রাখিয়াছে ; সর্বদা সশঙ্কিত, পাছে তাহাতে আঘাত লাগে, পাছে তাহাতে আঁচড় পড়ে, পাছে তাহা মলিন হয়। মনকে যদি তুমি মনে কর 'আমার' ও তাহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার কর, তবে চিরজীবন মনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য আমরা মনকে অতি সাবধানে রাখি, একটি কঠোর হস্ত তাহাকে ছুঁইবামাত্র আমরা সশঙ্কিত হইয়া উঠি। মন যদি আমার নয়, শরীর যদি আমার নয় তো কে আমার?

অধিকার

জনক রাজা কহিলেন, "এক্ষণে আমার মোহ নির্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোনো পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে ; অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে।"—

—মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব। অনুগীতা পর্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। পৃ ৪৩

জনক রাজার উপরি-উক্ত উক্তি লইয়া একটা তর্ক উপস্থিত হইল, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

আমি। যাহা কিছু আমি দেখিতে পাই, সকলই আমার।

তুমি। সে কিরকম কথা?

আমি। নহে তো কি? যে গুণে তুমি একটা পদার্থকে আমার বলো, সে গুণটি কি?

তুমি। অন্য সকলে যে পদার্থকে উপভোগ করিতে পায় না, অথবা আংশিক ভাবে পায়, আমিই কেবল যাহাকে সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে পাই, তাহাই আমার।

আমি। পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে আমরা সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি? কোন্‌টার ঘ্রাণ, কোন্‌টার শব্দ, কোন্‌টার স্বাদ, কোন্‌টার দৃশ্য, কোন্‌টার স্পর্শ আমরা ভোগ করি, অথবা একাধারে ইহাদের দুই-তিনটাও ভোগ করিতে পারি। কিংবা হয়ত ইহাদের সকলগুলিকেই এক পদার্থের মধ্যে পাইলাম, কিন্তু তবু তাহাকে সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি কই? জগতে আমরা কিছুই সর্বতোভাবে জানি না, একটি তৃণকেও না— তবে সর্বতোভাবে ভোগ করিব কি করিয়া? কে বলিতে পারে আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তবে এই তৃণটির মধ্যে দৃষ্টি স্বাদ গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি ব্যতীতও আরো অনেক উপভোগ্য গুণ দেখিতে না পাইতাম?

তুমি। তুমি অত সূক্ষ্মে গেলে চলিবে কেন? "সর্বতোভাবে উপভোগ করা"র অর্থ এই যে, মানুষের পক্ষে যত দূর সম্ভব তত দূর উপভোগ করা।

আমি। এই স্থলে তুমি উপভোগ শব্দ ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভ্রমাত্মক কথা কহিতেছ। প্রচলিত ভাষায় স্বত্ব থাকা, উপভোগ করা, উভয়ের এক অর্থ নহে। মনে কর এক জন হতভাগ্য নিজে ভাঙা ঘরে কুশ্রী পদার্থের মধ্যে বাস করে ও গৌরাঙ্গ প্রভুদের জন্য একটি অট্টালিকা ভালো ভালো ছবি, রঙীন কার্পেট ও ঝাড়-লণ্ঠন দিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে— সে অট্টালিকা, সে ছবি, সে উপভোগ করে না বলিয়াই কি তাহা তাহার নহে?

তুমি। উপভোগ করে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে।

আমি। সে কথা নিতান্তই ভুল, যদি সে কোনো অবস্থায় ছবি উপভোগ করিতে পারিত তবে তাহা নিজের ঘরেই টাঙাইত। মূর্খ একটি বই কিনিয়া কোনো মতেই তাহা বুঝিতে না পারুক, তথাপি সে বইটিকে আপনার বলিতে সে ছাড়িবে না।

তুমি। আচ্ছা, উপভোগ করা চুলায় যাউক। যে বস্তুর উপর সর্বসাধারণের অপেক্ষা তোমার অধিক ক্ষমতা খাটে, যে বইটিকে তুমি ইচ্ছা করিলে অবাধে পোড়াইতে পার, রাখিতে পার, দান করিতে পার, অন্যের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পার, তাহাতেই তোমার অধিকার আছে।

আমি। তবুও কথাটা ঠিক হইল না। শারীরিক ক্ষমতাকেই তো ক্ষমতা বলে না। মানসিক ক্ষমতা তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ। তাহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ভ্রম সহজেই দেখিতে পাইবে। তুমি অরসিক, তোমার বাগানের গাছ হইতে একটি গোলাপ ফুল তুলিয়াছ, তোমার হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাপটি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু সে গোলাপটির সৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই— ইচ্ছা করিলে আর সব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে উপভোগ করিতে পার না— আর, আমি তাহাকে ছিঁড়িতে পারি না বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারি। তাহার গোলাপ ছিঁড়িবার ক্ষমতা আছে, আমার গোলাপ উপভোগ করিবার ক্ষমতা আছে, কোন্ ক্ষমতাটি গুরুতর ? তবে কেন সে তাহাকে "আমার গোলাপ" বলে, আর আমি পারি না ? তবে, গোলাপ সম্বন্ধে যেটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা আমার তাহা আছে, তবু সে গোলাপের অধিকারী আমি নহি। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, যে বলদ চিনি বহন করিয়া থাকে প্রচলিত ভাষায় তাহাকেই চিনির অধিকারী কহে। আর যে মানুষ ইচ্ছা করিলেই সে চিনি খাইতে পারে সে মানুষের সে চিনিতে অধিকার নাই।

তুমি হয়ত বলিবে, যাহার উপর আমাদের শারীরিক ক্ষমতা খাটে, চলিত ভাষায় তাহাকেই "আমার" কহে। তাহাও ঠিক নহে, যাহার সহিত আমার হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ আছে তাহাকেও তো আমি "আমার" কহি।

তুমি। আচ্ছা, আমি হার মানিলাম। কিন্তু তুমি কি সিদ্ধান্ত করিলে শুনি।

আমি। যে কোনো পদার্থ আমরা দেখি, শুনি, ইন্দ্রিয় বা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের। তুমি যে ফুলকে "আমার" বলো তুমি তাহাকে দেখিতে পার, স্পর্শ করিতে পার, ঘ্রাণ করিতে পাও; আমি আর কিছু পাই না, কিন্তু যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সে মুহূর্তেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ বাঁধিয়া গেল, সে সম্বন্ধ হইতে কেহ আমাকে আর বঞ্চিত করিতে পারিবে না! তুমিও তাহার সব পাও নি, আমিও তাহার সব পাই নি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব; তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও সে, আমারও সে। এই জন্যই জনক কহিয়াছিলেন, "কোনো পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলত ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে।" সন্ধ্যা বা উষাকে কেহ "আমার সন্ধ্যা" "আমার উষা" বলে না কেন? যদি বলো তাহার কারণ তাহারা সকল মানুষের পক্ষেই সমান, তাহা হইলে ভুল বলা হয়। আমি সন্ধ্যাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক উপভোগ করি, অতএব সেই উপভোগ-ক্ষমতার বলে তোমাদের কাছ হইতে সন্ধ্যার দখলি-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকে বিশেষ করিয়া "আমার সন্ধ্যা" বলি না কেন? তাহার কারণ আমি সন্ধ্যাকে সর্বপ্রকারে অধিক উপভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের কাছ হইতে সে তো একেবারে ঢাকা পড়ে নাই। এইরূপে একটা পদার্থকে কেহ-বা কিছু উপভোগ করে, কেহ-বা অধিক উপভোগ করে, কিন্তু সে পদার্থটা তাহাদের উভয়েরই।

আত্মীয়ের বেড়া

একলা একজন মাত্র লোক কিছুই নহে। সে ব্যক্তিই নহে! সে, সাধারণ মনুষ্য সমাজের সম্পত্তি। শ্যামের সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, রামের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক। সে সরকারী। সে অমিশ্র জলজনন বাষ্পের মতো। যতক্ষণ জলজনন বাষ্প অমিশ্র ভাবে থাকে, ততক্ষণ বায়ুর সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, জলের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক। অবশেষে আর গুটি দুই তিন বাষ্প আসিয়া যখন তাহার সঙ্গে মেলে, তখন আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি সে জল কি বায়ু। তেমনি একক আমার সহিত যখন আর গুটি দুই তিন ব্যক্তি আসিয়া জমা হয়, তখন আমি ব্যক্তি-বিশেষ হইয়া দাঁড়াই। আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ আমার সীমা। সাধারণ মনুষ্যদের হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া রাখা, আমাকে ব্যক্তিবিশেষ করিয়া রাখাই তাঁহাদের কাজ। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের চারি দিকে কতকগুলি বিশেষ পরের আবশ্যক, সাধারণ পর হইতে তাহারা আমাদিগকে পর করিয়া রাখে। কতকগুলি পরকে আপনার করিতে না পারিলে আমি "আপনি" হইতে পারি না; "পর" দিয়া "আপনি"কে গড়িয়া তুলিতে হয়। নহিলে আমি মানুষ হই, ব্যক্তি হই না। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব-নামক কতকগুলি পর আছেন, তাঁহারা পরকে পর করেন, আপনাকে আপনি রাখেন। আমাদের কেহই যদি আত্মীয় না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরই বা কে থাকিত? তাহা হইলে সকলেরই সঙ্গে আমার সমান সম্পর্ক থাকিত। রেখাব-নামক একটি সুর যতক্ষণ স্বতন্ত্র থাকে ততক্ষণ সে বেহাগেরও যেমন সম্পত্তি কানেড়ারও তেমনি সম্পত্তি ও অমন শত সহস্র রাগিণীর সঙ্গে তাহার সমান যোগ। কিন্তু যেই তার চতুষ্পার্শ্বে আর কতকগুলি সুর আসিয়া একত্র হয় তখনি সে বিশেষ রাগিণী হইয়া দাঁড়ায় ও অবশিষ্ট সমুদায় রাগিণীকে পর বলিয়া গণ্য করে। তেমনি আমরা যে সকলে রেখাব গান্ধার প্রভৃতি এককেটি সুর না হইয়া বেহাগ ভৈরবী প্রভৃতি এককেটি রাগিণী হইয়াছি, তাহা কেবল আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের প্রসাদে। আমরা যে একলা থাকিতে পাই, বিরলে থাকিতে পারি, তাহার কারণ আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ আমাদিগকে চারি দিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া। নতুবা আমরা মুক্ত জগতে লক্ষ লোকের মধ্যে গিয়া পড়িতাম, শত সহস্রের কোলাহলের মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইত। অতএব কতকগুলি লোক ঘনিষ্ঠ ভাবে আমাদের কাছাকাছি না থাকিলে আমরা একলা থাকিতে পাই না, বিরলে থাকিতে পারি না। আকারহীন, ভাষাহীন, অন্তঃপুরহীন, কুহেলিকাময় কতকগুলা অপরিস্ফুট ভাবের দল আমাদের মনের মধ্যে যেমন ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া আনাগোনা করে, পরস্পরের কোলাহলে পরস্পরে মিশাইয়া থাকে, সমাজের মধ্যে আমরা তেমনি থাকি। অবশেষে সে ভাবগুলিকে যখন বিযুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদিগকে আকার দিয়া, ভাষাবদ্ধ করিয়া, তাহাদের জন্য এক একটা স্বতন্ত্র অন্তঃপুর স্থাপন করিয়া দিই, তখন তাহারা যেমন বিরলে থাকে, একক হইয়া যায়, আমরাও সংসারী হইয়া তেমনি হই।

বেশি দেখা ও কম দেখা

সাধারণের কাছে প্রেমের অন্ধ বলিয়া একটা বদনাম আছে। কিন্তু অনুরাগ অন্ধ না বিরাগ অন্ধ? প্রেমের চক্ষে দেখার অর্থই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা। তবে কি বলিতে চাও, যে সর্বাপেক্ষা অধিক দেখে সে কিছুই দেখিতে পায় না? যে প্রতি কটাক্ষ দেখে, প্রতি ইঙ্গিত দেখে, প্রতি কথা শোনে, প্রতি নীরবতা শোনে, সে মানুষ চিনিতে পারে না? যে ভাবুক কবিতা ভালোবাসে সে কবিতা বুঝিতে পারে না? যে কবি প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখে সে প্রকৃতিকে দেখিতে পায় না? বিজ্ঞানবিৎ কি কেবল দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যেই বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেন, তাঁহার কাছে যে

অনুরাগবীক্ষণ আছে তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না ? তুমি বলিবে প্রেম যদি অন্ধ না হইবে তবে কেন সে দোষ দেখিতে পায় না ? দোষ দেখিতে পায় না যে তাহা নহে। দোষকে দোষ বলিয়া মনে করে না। তাহার কারণ সে এত অধিক দেখে যে দোষের চারি দিক দেখিতে পায়, দোষের ইতিহাস পড়িতে পারে। একটা দোষবিশেষকে মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া দেখিলে তাহাকে যতটা কালো দেখায়, তাহার স্বস্থানে রাখিয়া তাহার আদ্যন্তমধ্য দেখিলে তাহাকে ততটা কালো দেখায় না। আমরা যাহাকে ভালোবাসি না তাহার দোষটুকুই দেখি, আর কিছু দেখি না। দেখি না যে মনুষ্যপ্রকৃতিতে সে দোষ সম্ভব, অবস্থাবিশেষে সে দোষ অবশ্যম্ভাবী ও সে দোষ সত্ত্বেও তাহার অন্যান্য এমন গুণ আছে যাহাতে তাহাকে ভালোবাসা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিরাগে আমরা যতটুকু দেখিতে পাই অনুরাগে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি অধিক দেখি। অনুরাগে আমরা দোষ দেখি, আবার সেই সঙ্গে তাহা মার্জনা করিবার কারণ দেখিতে পাই। বিরাগে কেবল দোষ মাত্রই দেখি। তাহার কারণ বিরাগের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, তাহার একটা মাত্র চক্ষু। আমাদের উচিত, ভালোবাসার পাত্রের দোষ গুণ আমরা যে নজরে দেখি, অন্যদের দোষ গুণও সেই নজরে দেখি। কারণ, ভালোবাসার পাত্রদেরই আমরা যথার্থ বুঝি। যাঁহাদের ভালোবাসা প্রশস্ত, হৃদয় উদার, বসুধৈব কুটুম্বকং, তাঁহারা সকলকেই মার্জনা করিতে পারেন। তাহার কারণ, তাঁহারাই যথার্থ মানুষদের বুঝেন, কাহাকেও ভুল বুঝেন না। তাঁহাদের প্রেমের চক্ষু বিকশিত, এবং প্রেমের চক্ষুতে কখনো নিমেষ পড়ে না। তাঁহারা মানুষকে মানুষ বলিয়া জানেন। শিশুর পদস্খলন হইলে তাহাকে যেমন কোলে করিয়া উঠাইয়া লন, আত্মসংযমনে অক্ষম একটি দুর্বল হৃদয় ভূপতিত হইলে তাহাকেও তেমনি তাঁহাদের বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করেন। দুর্বলতাকে তাঁহারা দয়া করেন, ঘৃণা করেন না।

বসন্ত ও বর্ষা

এক বিরহিণী আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন— বিরহের পক্ষে বসন্ত গুরুতর কি বর্ষা গুরুতর ? এ বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ঢের ভালো বুঝেন। তবে উভয় ঋতুর অবস্থা আলোচনা করিয়া যুক্তির সাহায্যে আমরা একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লইয়াছি। মহাকবি কালিদাস দেশান্তরিত যক্ষকে বর্ষাকালেই বিরহে ফেলিয়াছেন। মেঘকে দূত করিবেন বলিয়াই যে এমন কাজ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। বসন্তকালেও দূতের অভাব নাই। বাতাসকেও দূত করিতে পারিতেন। একটা বিশেষ কারণ থাকাই সম্ভব।

বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে এক স্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে ; আমাদের মন বাতাসের মতো, ফুলের গন্ধের মতো, জ্যোৎস্নার মতো, লঘু হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্তে বহির্জগৎ গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। বর্ষায় আমাদের মনের চারি দিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়। মন চারি দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যবনিকার মধ্যে এই চাঁদোয়ার তলে একত্র হয়। পাখির গানে আমাদের মন উড়াইয়া লইয়া যায়, কিন্তু বর্ষার বজ্রসংগীতে আমাদের মনকে মনের মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া রাখে। পাখির গানের মতো এ গান লঘু, তরঙ্গময়, বৈচিত্র্যময় নহে ; ইহাতে স্তব্ধ করিয়া দেয়, উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ষাকালে আমাদের “আমি” গাঢ়তর হয়, আর বসন্তকালে সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাক, বসন্তকালের বিরহ ও বর্ষাকালের বিরহে প্রভেদ কি। বসন্তকালে আমরা বহির্জগৎ উপভোগ করি; উপভোগের সমস্ত উপাদান আছে, কেবল একটি পাইতেছি না; উপভোগের একটা মহা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি। সেই জন্যই আর কিছুই ভালো লাগিতেছে না। এত দিন আমার সুখ ঘুমাইয়াছিল, আমার প্রিয়তম ছিল না; আমার আর কোনো সুখের উপকরণও ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না, বাতাস ও সুগন্ধে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সুখকে জাগাইয়া তুলিল; সে জাগিয়া দেখিল তাহার দারুণ অভাব বিদ্যমান। সে কাঁদিতে লাগিল। এই রোদনই বসন্তের বিরহ। দুর্ভিক্ষের সময় শিশু মরিয়া গেলেও মায়ের মন অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিয়া ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে থাকিলে তাঁহার কি কষ্ট!

বর্ষাকালে বিরহিণীর সমস্ত "আমি" একত্র হয়, সমস্ত "আমি" জাগিয়া উঠে; দেখে যে বিচ্ছিন্ন "আমি", একক "আমি" অসম্পূর্ণ। সে কাঁদিতে থাকে। সে তাহার নিজের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। চারি দিকে বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার করিয়াছে; কাহাকেও পাইবার নাই, কিছুই দেখিবার নাই; কেবল বসিয়া বসিয়া অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী একটি অসম্পূর্ণ, সঙ্গীহীন "আমি"র পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই বর্ষাকালের বিরহ। বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ অসম্পূর্ণ, বর্ষাকালে বিরহিণীর "স্বয়ং" অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। সুতরাং বর্ষাকালের বিরহ গুরুতর। এ বিরহে যৌবন মদন প্রভৃতি কিছুই নাই, ইহা বস্তুগত নহে। মদনের শর বসন্তের ফুল দিয়া গঠিত, বর্ষার বৃষ্টিধারা দিয়া নহে। বসন্তকালে আমরা নিজের উপর সমস্ত জগৎ স্থাপিত করিতে চাহি, বর্ষাকালে সমস্ত জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। ঋতুসংহারে কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তিনি এই কাব্যে বর্ষা ও বসন্তের যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া চিনা যায়। বসন্তের উপসংহারে তিনি বলেন—

মলয়পবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিরম্যো
সুরভিমধুনিষেকাল্লব্ধগন্ধপ্রবন্ধঃ।
বিবিধমধুপযূথৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমন্তাদ্
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায়॥

কবি আশীর্বাদ করিতেছেন, বাহ্যসৌন্দর্যবিশিষ্ট বসন্তকাল তোমাকে সুখ প্রদান করুক। বর্ষায় কবি আশীর্বাদ করিতেছেন—

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতুর-
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥

বর্ষাকাল তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত হিত অর্পণ করুক। বর্ষাকাল তো সুখের জন্য নহে, ইহা মঙ্গলের জন্য। বর্ষাকালে উপভোগের বাসনা হয় না, "স্বয়ং"-এর মধ্যে একটা অভাব অনুভব হয়, একটা অনির্দেশ্য বাঞ্ছা জন্মে।

প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল

উপরে বসন্ত ও বর্ষার যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করিলাম, প্রভাত ও সন্ধ্যার সম্বন্ধেও তাহা অনেক পরিমাণে খাটে।

প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকি আর সমস্তই হারাইয়া যায়। প্রভাতে আমি শত সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন ; তখন জগতের যন্ত্রের কাজ আমি সমস্তই দেখিতে পাই ; বুঝিতে পারি আমিও সেই যন্ত্র-চালিত একটি জীব মাত্র ; যে মহা নিয়মে সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, জনকোলাহল জাগিয়াছে, আমিও সেই নিয়মে জাগিয়াছি, কার্যক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতেছি ; আমিও কোলাহলসমুদ্রের একটি তরঙ্গ, চারি দিকে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে নিয়মে উঠিতেছে পড়িতেছে, আমিও সেই নিয়মে উঠিতেছি পড়িতেছি। সন্ধ্যাকালে জগতের কল-কারখানা দেখিতে পাই না, এই জন্য নিজেকে জগতের অধীন বলিয়া মনে হয় না ; মনে হয় আমি স্বতন্ত্র, মনে হয় আমিই জগৎ।

প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা। প্রাতঃকালে আমা হইতে গণনা আরম্ভ হইয়া জগতে গিয়া শেষ হয়, আর সন্ধ্যাকালে অতি দূর জগৎ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়া আমাতে আসিয়া শেষ হয়। তখন আমিই জগতের পরিণাম, জগতের উপসংহার, জগতের পঞ্চমাঙ্ক। জগতের শোকান্ত বা মিলনান্ত নাটক আমাতে আসিয়াই তাহার সমস্ত উপাখ্যান কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। আমার পরেই যেন সে নাটকের যবনিকাপতন। প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি নাটকের সাধারণ পাত্রগণের মধ্যে একজন ছিল, সন্ধ্যাকালে সেই তাহার নায়ক হইয়া উঠে। প্রভাতে জগৎ অন্ধকারকে স্তব্ধতাকে ও সেই সঙ্গে "আমি"কে পরাজিত করিয়া তাহার নিজের রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। এইরূপে প্রাতঃকালে জগৎ রাজা হয় ও সন্ধ্যাকালে আমি রাজা হই। প্রাতঃকালের আলোকে "আমি" মিশাইয়া যাই ও সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে জগৎ মিশাইয়া যায়। প্রাতঃকাল চারি দিক উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে আমাদের নিকট হইতে অতি দূরে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যাকাল চারি দিক রুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের অতি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। এক কথায়, প্রভাতে আমি জগৎ-রচনার কর্মকারক ও সন্ধ্যাকালে আমি জগৎ-রচনার কর্তাকারক। প্রভাতে "আমি"-নামক সর্বনাম শব্দটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাবেলায় সে উত্তম পুরুষ।

আদর্শ প্রেম

সংসারের-কাজ-চালানে, মন্ত্রবদ্ধ, ঘরকন্নার ভালোবাসা যেমনই হউক, আমি প্রকৃত আদর্শ ভালোবাসার কথা বলিতেছি। যে-হউক এক জনের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া থাকা, এক ব্যক্তির অতিরিক্ত একটি অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকা, তাহার পাঁচটা অঙুলির মধ্যে ষষ্ঠ অঙুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া থাকাকেই ভালোবাসা বলে না। দুইটা আঠাবিশিষ্ট পদার্থকে একত্রে রাখিলে যে জুড়িয়া যায়, সেই জুড়িয়া যাওয়াকেই ভালোবাসা বলে না। অনেক সময়ে আমরা নেশাকে ভালোবাসা বলি। রাম ও শ্যাম উভয়ে উভয়ের কাছে হয়ত "মৌতাতের" স্বরূপ হইয়াছে, রাম ও শ্যাম উভয়কে উভয়ের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, রামকে নহিলে শ্যামের বা শ্যামকে নহিলে রামের অভ্যাস-ব্যাঘাতের দরুন কষ্ট বোধ হয়। ইহাকেও ভালোবাসা বলে না। প্রণয়ের পাত্র নীচই হউক, নিষ্ঠুরই হউক, আর কুচরিত্রই হউক, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাকে অনেকে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু, ইহা বিবেচনা করা উচিত, নিতান্ত অপদার্থ দুর্বলহৃদয় নহিলে কেহ নীচের কাছে নীচ হইতে পারে না। এমন অনেক ক্রীতদাসের কথা শুনা গিয়াছে যাহারা নিষ্ঠুর নীচাশয় প্রভুর প্রতিও অন্ধভাবে আসক্ত, কুকুরেরাও

সেইরূপ। এরূপ কুকুরের মতো, ক্রীতদাসের মতো ভালোবাসাকে ভালোবাসা বলিতে কোনো মতেই মন উঠে না। প্রকৃত ভালোবাসা দাস নহে, সে ভক্ত ; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ীর প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন ; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে তাহারই প্রতিমাকে ভালোবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাঁহার কর্ম নহে। তাহাকে তো ভালোবাসা বলে না, তাহাকে কর্দমবৃত্তি বলে। কর্দম একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক ! প্রকৃত ভালোবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্তি ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালোবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে— ভক্তের দাসত্বে স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে, কেননা দাসত্ববিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্যাদা, সেইখানেই সে হীন। ভালোবাসিবার জন্যই ভালোবাসা নহে, ভালো ভালোবাসিবার জন্যই ভালোবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালোবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তবে ভালোবাসা নিপাত যাক।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় অনেক তফাৎ আছে, কিন্তু ঝট্ করিয়া সে তফাৎ ধরা যায় না।

বন্ধুত্ব আটপৌরে, ভালোবাসা পোশাকী। বন্ধুত্বের আটপৌরে কাপড়ে দুই-এক জায়গায় ছেঁড়া থাকিলেও চলে, ঈষৎ ময়লা হইলেও হাশি নাই, হাঁটুর নীচে না পৌঁছিলেও পরিতে বারণ নাই। গায়ে দিয়া আরাম পাইলেই হইল। কিন্তু ভালোবাসার পোশাক একটু ছেঁড়া থাকিবে না, ময়লা হইবে না, পরিপাটি হইবে। বন্ধুত্ব নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া তোলাপাড়া সয়, কিন্তু ভালোবাসা তাহা সয় না। আমাদের ভালোবাসার পাত্র হীন প্রমোদে লিপ্ত হইলে আমাদের প্রাণে বাজে, কিন্তু বন্ধুর সম্বন্ধে তাহা খাটে না ; এমন-কি, আমরা যখন বিলাসপ্রমোদে মত্ত হইয়াছি তখন আমরা চাই যে, আমাদের বন্ধুও তাহাতে যোগ দিক ! প্রেমের পাত্র আমাদের সৌন্দর্যের আদর্শ হইয়া থাক্ এই আমাদের ইচ্ছা— আর, বন্ধু আমাদেরই মতো দোষে গুণে জড়িত মর্ত্যের মানুষ হইয়া থাক্ এই আমাদের আবশ্যক। আমাদের ডান হাতে বাম হাতে বন্ধুত্ব। আমরা বন্ধুর নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সাহায্য চাই ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই। কিন্তু ভালোবাসার স্থলে আমরা সর্বপ্রথমে ভালোবাসার পাত্রকেই চাই ও তাহাকে সর্বতোভাবে পাইতে চাই বলিয়াই তাহার নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সঙ্গ চাই। কিছুই না পাই যদি, তবুও তাহাকে ভালোবাসি। ভালোবাসায় তাহাকেই আমি চাই, বন্ধুত্বে তাহার কিয়দংশ চাই। বন্ধুত্ব বলিতে তিনটি পদার্থ বুঝায়। দুই জন ব্যক্তি ও একটি জগৎ। অর্থাৎ দুই জনে সহযোগী হইয়া জগতের কাজ সম্পন্ন করা। আর, প্রেম বলিলে দুই জন ব্যক্তি মাত্র বুঝায়, আর জগৎ নাই। দুই জনেই দুই জনের জগৎ। অতএব বন্ধুত্ব অর্থে দুই এবং তিন, প্রেম অর্থে এক এবং দুই।

অনেকে বলিয়া থাকেন বন্ধুত্ব ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া ভালোবাসায় উপনীত হইতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা নামিয়া অবশেষে বন্ধুত্বে আসিয়া ঠেকিতে পারে না। একবার যাহাকে ভালোবাসিয়াছি, হয় তাহাকে ভালোবাসিব নয় ভালোবাসিব না ; কিন্তু একবার যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছে, ক্রমে তাহার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে আটক নাই। অর্থাৎ বন্ধুত্বের উঠিবার নামিবার স্থান আছে। কারণ, সে সমস্ত স্থান আটক করিয়া থাকে না। কিন্তু ভালোবাসার উন্নতি অবনতির স্থান নাই। যখন

সে থাকে তখন সে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকে, নয় সে থাকে না। যখন সে দেখে তাহার অধিকার হ্রাস হইয়া আসিতেছে তখন সে বন্ধুত্বের ক্ষুদ্র স্থানটুকু অধিকার করিয়া থাকিতে চায় না। যে রাজা ছিল সে ফকির হইতে রাজি আছে, কিন্তু করদ জায়গীরদার হইয়া থাকিবে কিরূপে ? হয় রাজত্ব নয় ফকিরী, ইহার মধ্যে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। ইহা ছাড়া আর একটা কথা আছে— প্রেম মন্দির ও বন্ধুত্ব বাসস্থান। মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়া যায় তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

আত্মসংসর্গ

দুঃখের সুর একঘেয়ে কেন ? বলা বাহুল্য, মন যেখানে বৈচিত্র্য দেখে না সেখানে সে নিজের অন্তঃপুরের মধ্যে নিজে বসিয়া থাকে, কৌতূহল উদ্রেক না হইলে সে বাহির হইবার কোনো আবশ্যক দেখে না। যাহা কিছু একঘেয়ে, তাহাই আমাদিগকে আমাদের নিজের কাছে প্রেরণ করে। এই জন্যই একঘেয়ে সুরের মধ্যে একটি করুণ ভাব আছে।

যখনি আমরা আমাদের নিজের কাছে থাকি, তখনই আমাদের দুঃখ। আমরা নিজের কাছ হইতে পলাইয়া থাকিতে পারিলেই সুখে থাকি। যখন বাহ্য জগৎ সুন্দর আকার ধারণ করে, তখন আমরা কেন সুখে থাকি ? কারণ, তখন আমাদের মন তাহার নিজের হাত এড়াইয়া বাহিরে সঞ্চরণ করিতে পারে ; আর যখন আমাদের চারি দিকে বাহ্য জগৎ কদর্য মূর্তি ধারণ করে, তখন আমাদের মনকে দায়ে পড়িয়া নিজের কাছেই ফিরিয়া আসিতে হয় ও আমরা অসুখী হই। এই জন্যই, আমাদের অন্তর ও বাহির, আমাদের মন ও জগৎ, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও জগতের উপর আমাদের মনের সুখ এতটা নির্ভর করে যে, জগৎ বেঁকিয়া দাঁড়াইলেই আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে। সে নিজের কাছে কোনো মতেই থাকিতে চায় না। সে একটি অভাব মাত্র। সে এই বিশাল জগৎসংসারের মহাক্ষেত্রে প্রতি শব্দ, প্রতি দৃশ্য, প্রতি গন্ধ, প্রতি স্বাদকে শিকার করিয়া বেড়াইতেছে ; যতক্ষণ শিকার করে ততক্ষণ থাকে ভালো, অবশেষে যখন রিক্তহস্তে শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরিয়া আসে তখনি তাহার দুঃখ। আমরা ভালোবাসিতে চাই, কেননা আমরা আপনাকে চাই না, আর এক জনকে চাই ; আমরা একটা কিছু কার্য করিতে চাই, কেননা আমরা নিজের কাছে থাকিতে চাই না ; আমরা উপার্জন করিতে চাই, কেননা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিই অভাব। আমাদের মনের অর্থ—ভিক্ষার অঞ্জলি, জগতের অর্থ—ভিক্ষামুষ্টি। ভস্মলোচনকে যেমন নিজের মুখ দেখাইয়া বধ করা হইয়াছিল, তেমনি সমস্ত জগৎ যদি একটি বিশাল দর্পণ হইত চারি দিকে কেবল আমাদের নিজের মুখ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমরা মরিয়া যাইতাম। তাহা হইলে আমরা কি দেখিতাম ? একটা ক্ষুধা, একটা দুর্ভিক্ষ, একটা প্রার্থনা, একটা রোদন। আমাদের মন গোটাকতক ক্ষুধার সমষ্টি মাত্র। জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যের ক্ষুধা। আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত রহস্য। আমরা প্রাণের সহচর চাই, কিন্তু "লাখে না মিলল একে"। আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়। আমরা কৃষ্ণবর্ণ ; সূর্যরশ্মির সমস্ত বর্ণধারা পান করিয়া থাকি, তথাপি আমরা কালো। সূর্যরশ্মি পান করিবার আমাদের অনন্ত পিপাসা। এইরূপে অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্যে দন্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায়, অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা হইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান

হওয়াই মনুষ্যজীবন। এই নিমিত্তই মন নিজের কাছে থাকিতে চায় না, জগতের কাছে যাইতে চায় ; ক্ষুধা নিজের কাছে থাকিতে চায় না ; খাদ্যের কাছে থাকিতে চায়। আমরা মানুষরা কতকগুলা কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু, ক্ষুধার্ত পিপীলিকার মতো জগৎকে চারি দিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছি ; উষাকে, জ্যোৎস্নাকে, গানের শব্দকে দংশন করিতেছি, একটুখানি খাদ্য পাইবার জন্য। হায় রে, কোথায়! হে সূর্য, উদয় হও! চন্দ্র, হাস! ফুল, ফুটিয়া ওঠো! আমাকে আমার হইতে রক্ষা কর; আমাকে যেন আমার পাশে বসিয়া না থাকিতে হয় ; অনিচ্ছারচিত বাসরশয্যায় শুইয়া আমাকে যেন আমার আলিঙ্গনে পড়িয়া কাঁদিতে না হয়!

বধিরতার সুখ

অদ্বিতীয় রমণী ও অসাধারণ পুরুষ জর্জ এলিয়ট তাঁহার একটি উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে, আমরা জীবনে অনেক ছোটো ছোটো দুঃখঘটনা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা এত সাধারণ ও সামান্যকারণজাত যে, তাহাতে আর আমাদের করুণা উদ্রেক করিতে পারে না, তাহা যদি পারিত তবে জীবন কি কষ্টেরই হইত! যদি আমরা কাঠবিড়ালীর হৃদয়স্পন্দন শুনিতে পাইতাম, যখন একটি ঘাস মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গজাইতেছে তখন তাহার শব্দটুকুও শুনিতে পাইতাম, তবে আমাদের কানের পক্ষে কি দুর্দশাই হইত! আমরা যেমন দিগন্ত পর্যন্ত সমুদ্র প্রসারিত দেখিতে পাই, কিন্তু সমুদ্রের সীমা সেইখানেই নয়, তাহা অতিক্রম করিয়াও সমুদ্র আছে— তেমনি আমরা যাহাকে স্তব্ধতার দিগন্ত বলি তাহার পরপারেও শব্দের সমুদ্র আছে, তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত। পিপীলিকা যখন চলে তখন তাহারও পদশব্দ হয়, ফুল হইতে শিশির যখন পড়ে তখন সেও নীরব অশ্রুজল নহে সেও বিলাপ করিয়া ঝরিয়া পড়ে।

জর্জ এলিয়ট অন্যের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা নিজের সম্বন্ধেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখিব। মনে কর, আমাদের নিজের হৃদয়ের মধ্যে যাহা চলে তাহা সমস্তই আমরা যদি দেখিতে পাইতাম, শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দশাই হইত! জর্জ এলিয়ট দৃষ্টান্তস্বরূপে কাঠবিড়ালীর হৃদয়স্পন্দন ও তৃণউদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যদি নিজের দেহের ক্ষীণতম হৃদয়স্পন্দন, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-পতন, রক্তচলাচলের শব্দ, নখ ও কেশ -বৃদ্ধি, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে দেহায়তনবৃদ্ধির শব্দটুকুও অনবরত শুনিতে পাইতাম, তবে আমাদের কি দশাই হইত! যখন আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছি তখনো আমাদের হৃদয়ের মর্মস্থলে অতিপ্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া যে একটি বিষাদ, একটি অভাব নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা যদি শুনিতে পাইতাম তবে কি আর হাসি বাহির হইত? যখন আমরা দান করিতেছি ও সেই সঙ্গে "নিঃস্বার্থ পরোপকার করিতেছি" মনে করিয়া মনে মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তখন যদি আমরা আমাদের সেই পরোপচিকীর্ষার অতি প্রচ্ছন্ন অন্তর্দেশে যশোলিপ্সা বা আর একটা কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার বক্রমূর্তি দেখিতে পাই, তবে কি আর আমরা সেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারি? আবার আর এক দিকে দেখ। যেমন, এমন শব্দ আছে যাহা আমাদের কাছে নিস্তব্ধতা, তেমনি এমন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের কাছে বিস্মৃতি। আমরা যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরকালের মতো চিহ্ন দিয়া গিয়াছে। কোন্‌টা বা স্পষ্ট, কোন্‌টা বা অস্পষ্ট, কোন্‌টা বা এত অস্পষ্ট যে আমাদের দর্শন শ্রবণের অতীত। কিন্তু আছে। আমাদের স্মৃতিতে যত জিনিষ আছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যে শত সহস্র অচেনা লোককে চলিয়া যাইতে দেখিলাম তাহারা প্রত্যেকেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া গেল। উপরি উপরি যদি অনেক বার তাহাদের দেখিতাম, তবে তাহারা আমাদের স্মৃতিতে স্পষ্টতর ছাপ দিতে পারিত এই মাত্র। এইরূপে বাল্যকাল

হইতে যাহা কিছু দেখিয়াছি, যাহা কিছু শুনিয়াছি, যাহা কিছু পড়িয়াছি, সমস্তই আমার হৃদয়ে আছে, তিলার্ধও এড়াইতে পারে নাই। ছেলেবেলা হইতে কত গ্রন্থের কত হাজার হাজার পাত পড়িয়াছি, যদিও তাহা আওড়াইতে পারি না কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মুদ্রাকর তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমাদের স্মৃতির পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মনে করিলে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়। যদি আমরা আমাদের এই অতিবিশাল স্মৃতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্ত কণ্ঠস্বর একেবারেই শুনিতে পাইতাম, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতাম না, তাহা হইলে আমরা কি একেবারে পাগল হইয়া যাইতাম না? ভাগ্যে আমাদের স্মৃতি তাহার সহস্র মুখে একেবারে কথা কহিতে আরম্ভ করে না, তাহার সহস্র চিত্র একেবারে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয় না, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি। আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কার্য দেখিতে পাই না বলিয়াই রক্ষা। আমাদের হৃদয়রাজ্যের অনেক বিস্তৃত প্রদেশ আমাদের নিজের কাছেই যদি অনাবিষ্কৃত না থাকিত, কখন্ আমাদের অনুরাগের প্রথম সূত্রপাত হইল, কখন্ আমাদের অনুরাগের প্রথম অবসানের দিকে গতি হইল, কখন্ আমাদের বিরাগের প্রথম আরম্ভ হইল, কখন্ আমাদের বিষাদের প্রথম অঙ্কুর উঠিল, তাহা সমস্ত যদি আমরা স্পষ্ট দেখিতাম তাহা হইলে আমাদের মায়া মোহ অনেকটা ছুটিয়া যাইত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখশান্তিও অবসান হইত।

শূন্য

এক এক জন লোক আছে, তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে, একটা শূন্য (০) মাত্র, কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে! সংসারে শত সহস্র 'শূন্য' আছে, বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে— তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না, কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ এই যে, পরে বসিলে ইহারা ১কে ১০ করে বটে, কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়মানুসারে ১কে তাহার শতাংশে পরিণত করে (·০১) অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারায় চালিত হইলেই চমৎকার কাজ করে বটে, কিন্তু অন্যকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহারা এমন চমৎকার সৈন্য যে মন্দ সেনাপতিকেও জিতাইয়া দেয়, কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে ভালো সৈন্যদেরও হারাইয়া দেয়। স্ত্রী-মর্যাদা-অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১এর সহিত যতক্ষণ তাহারা যুক্ত না হয় ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে, সে দশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১এর পূর্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১ বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈণ পুরুষের আর এক নাম ·০১। কিন্তু এই অযৌক্তিক লোকদের সঙ্গে আমি মিলি না।

স্ত্রৈণ

আমি দেখিতেছি মহিলারা রাগ করিতেছেন, অতএব স্ত্রৈণ কাহাকে বলে তাহার একটা মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। এই কথাটা সকলেই ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহার অর্থ অতি অল্প লোকেই সর্বতোভাবে বুঝেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে কিছু বিশেষরূপ ভালোবাসে সাধারণত লোকে তাহাকেই স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রৈণ কে? না, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারে না, স্ত্রীর উপর

নির্ভর করে। বলিষ্ঠ পুরুষ হইয়াও অবলা নারীকে ঠেসান দিয়া থাকে ! যে ব্যক্তি পড়িয়া গেলে স্ত্রীকে ধরিয়া উঠে, মরিয়া গেলে স্ত্রীকে লইয়া মরে ; যে ব্যক্তি সম্পদের সময় স্ত্রীকে পশ্চাতে রাখে ও বিপদের সময় স্ত্রীকে সম্মুখে ধরে ; এক কথায় যে ব্যক্তি "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ইহাই সার বুঝিয়াছে, সেই স্ত্রৈণ। অর্থাৎ ইহারা সমস্তই উল্‌টাপাল্‌টা করে। ইংরাজ জাতিরা স্ত্রৈণের ঠিক বিপরীত। কারণ, তাহারা স্ত্রীকে হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দেয়, স্ত্রীর মুখে আহার তুলিয়া দেয়, স্ত্রীকে ছাতা ধরে ইত্যাদি। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে এতই দুর্বল মনে করে যে, সকল বিষয়েই তাহাদিগকে সাহায্য করে। ইহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রৈণ জাতি মুখে কাপড় দিয়া হাসে ও বলে "ইংরাজেরা কি স্ত্রৈণ। কোথায় গর্মি হইলে স্ত্রী সমস্ত রাত জাগিয়া তাহাকে বাতাস দিবে, না, সে স্ত্রীকে বাতাস দেয় ! কোথায় যতক্ষণ না বলিষ্ঠ পুরুষদের তৃপ্তিপূর্বক আহার নিঃশেষ হয় ততক্ষণ অবলা জাতিরা উপবাস করিয়া থাকিবে, না, বলীয়ান্ পুরুষ হইয়া অবলার মুখে আহার তুলিয়া দেয় ! ছি ছি, কি লজ্জা ! এমন যদি হইল তবে আর বল কিসের জন্য !"

জমা খরচ

এক গণিত লইয়া এত কথা যদি হইল তবে আরো একটা বলি ; পাঠকেরা ধৈর্য সংগ্রহ করুন। পাটিগণিতের যোগ এবং গুণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। সংসারের খাতায় আমরা এক একটা সংখ্যা, আমাদের লইয়া অদৃষ্ট অঙ্ক কষিতেছে। কখন বা শ্রীযুক্ত বাবু ৬এর সহিত শ্রীমতী ৩এর যোগ হইতেছে, কখন বা শ্রীযুক্ত ১এর সহিত শ্রীমান $\frac{1}{2}$ এর বিয়োগ হইতেছে ইত্যাদি। দেখা যায়, এ সংসারে যোগ সর্বদাই হয়, কিন্তু গুণ প্রায় হয় না। গুণ কাহাকে বলে ? না, যোগের অপেক্ষা যাহাতে অধিক যোগ হয়। ৩এ ৩ যোগ করিলে ৬ হয়, ৩এ ৩ গুণ করিলে ৯ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে গুণ করিলে যতটা যোগ করা হয়, এমন যোগ করিলে হয় না। মনোগণিতশাস্ত্রে প্রাণে প্রাণে গুণে গুণে মিলকে গুণ বলে ও সামান্যত মিলন হইলে যোগ বলে। সামান্যত বিচ্ছেদ হইলে বিয়োগ বলে ও প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ হইলে ভাগ বলে। বলা বাহুল্য গুণে যেমন সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ হয়, ভাগে তেমনি সর্বাপেক্ষা অধিক বিয়োগ হয়। এমন-কি, আমার বিশ্বাস এই যে, অদৃষ্ট পাটিগণিতের যোগ বিয়োগ ও গুণ পর্যন্ত শিখিয়াছে, কিন্তু ভাগটা এখনো শিখে নাই, সেইটে কষিতে অত্যন্ত ভুল করে। মনে কর, ৩কে ২ দিয়া গুণ করিয়া ৬ হইল, সেই ৬কে পুনর্বার ২ দিয়া ভাগ কর, ৩ অবশিষ্ট থাকিবে। তেমনি রাধাকে শ্যাম দিয়া গুণ কর রাধাশ্যাম হইল ; আবার রাধাশ্যামকে শ্যাম দিয়া ভাগ কর, রাধা অবশিষ্ট থাকা উচিত, কিন্তু তাহা থাকে না কেন ? রাধারও অনেকটা চলিয়া যায় কেন ? শ্যামের সহিত গুণ হইবার পূর্বে রাধা যাহা ছিল, শ্যামের সহিত ভাগ হইবার পরেও রাধা কেন পুনশ্চ তাহাই হয় না ? অদৃষ্টের এ কেমনতর অঙ্ক কষা! হিসাবের খাতায় এই দারুণ ভুলের দরুন তো কম লোকসান হয় না! প্রস্তাব-লেখক এইখানে একটি বিজ্ঞাপন দিতেছেন। একটি অত্যন্ত দুরূহ অঙ্ক কষিবার আছে, এ পর্যন্ত কেহ কষিতে পারে নাই। যে পাঠক কষিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দিব। আমার এই হৃদয়টি একটি ভগ্নাংশ ; আর একটি সংখ্যার সহিত গুণ করিয়া ইহা যিনি পূরণ করিয়া দিবেন তাঁহাকে আমার সর্বস্ব পারিতোষিক দিব।

মনোগণিত

পাটিগণিত, রেখাগণিত ও বীজগণিতের নিয়মসকল পণ্ডিতগণ বাহির করিলেন ; কিন্তু এখনো মনোগণিতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রতিভাসম্পন্ন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, একটা আবিষ্কারের পথ এই "উনবিংশ শতাব্দীতেও" গুপ্ত রহিয়াছে। অনেক অশিক্ষিত লোকে যেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী ও নিয়ম না জানিয়াও কেবল বুদ্ধি অভ্যাস ও শুভঙ্করের নিয়মে অঙ্ক কষিতে পারে, তেমনি কবিগণ এত কাল ধরিয়া মনোগণিতের অঙ্ক কষিয়া আসিতেছেন। শকুন্তলা কষিতেছেন, হ্যামলেট কষিতেছেন এবং মহাভারত রামায়ণে অঙ্কের স্তূপ কষিতেছেন। এইরূপ করিয়াই, বোধ করি, ক্রমে মনোগণিতের নিয়মসকল বাহির হইবে। ইহা যে নিতান্ত দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য ; ফরাসী জাতি, ইংরাজ জাতি, জর্মান জাতি এই মনোগণিতের এক একটা অঙ্কফল। ঐতিহাসিকগণ, কী কী অঙ্কের যোগে বিয়োগে এই সকল অঙ্কফল হইয়াছে তাহাই কষিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। কাহারও ভুল হয়, কাহারও ঠিক হয়, কিন্তু এত বড়ো অঙ্কবিৎ কেহ নাই যে, ঠিক মীমাংসা করিয়া দিতে পারে। আমাদের মধ্যে অদৃশ্য অলক্ষিতভাবে ভিতরে ভিতরে কী কম অঙ্ক-কষাকষি চলিতেছে ! তোমাতে আমাতে মিলন হইল। তোমার খানিকটা আমাতে আসিল, আমার খানিকটা তোমাতে গেল, আমার একটা গুণ হয়ত হারাইলাম, তোমার একটা গুণ হয়ত পাইলাম ও তাহা আমার আর একটা গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব আকার ধারণ করিল। এইরূপে মানুষে মানুষে ও তাহাই শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া সমস্ত জাতিতে ও অবশেষে জাতিতে জাতিতে যোগ গুণ ভাগ বিয়োগ হইয়া মনুষ্যজাতি-নামক একটা অতি প্রকাণ্ড অঙ্ক কষা হইতেছে। বিপ্লব (Revolution)-নাম কবিতায় Matthew Arnold বলেন যে "মানুষ যখন মর্ত্যলোকে আসিবার উদ্যোগ করিল তখন ঈশ্বর তাহাদের হাতে রাশীকৃত অক্ষর দিলেন ও কহিলেন, এই অক্ষরগুলি যথারীতি সাজাইয়া এক একটা কথা বাহির কর। মানুষেরা অক্ষর উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল; "গ্রীস" লিখিল, "রোম" লিখিল, "ফ্রান্স" লিখিল, "ইংলন্ড" লিখিল। কিন্তু কে ভিতরে ভিতরে বলিতেছে যে, ঈশ্বর যে কথাটি লিখাইতে চান সেটি এখনো বাহির হইল না। এই নিমিত্ত মানুষেরা অসন্তুষ্ট হইয়া এক একবার অক্ষর ভাঙিয়া ফেলে ; ইহাকেই বলে বিপ্লব।" কবি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিতে চাহি। আমি বলি কি, ঈশ্বর মর্ত্যভূমির অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে মনুষ্য-নামক কতকগুলি সংখ্যা দিয়াছেন ও পূর্ণ সুখ (যাহার আর এক নাম মঙ্গল)-নামক অঙ্কফল দিয়াছেন। এবং পৃথিবীর পত্রে এই অঙ্কফলটি কষিবার আদেশ দিয়াছেন। সে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই নিতান্ত দুরূহ অঙ্কটি কষিয়া আসিতেছে, এখনো কষা ফুরায় নি, কবে ফুরাইবে কে জানে ! তাহার এক একবার যখনি মনে হয় অঙ্কে ভুল হইল, তৎক্ষণাৎ সে সমস্তটা রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলে। ইহাকেই বলে বিপ্লব।

নৌকা

মানুষের মধ্যে এক একটা মাঝি আছে— তাহাদের না আছে দাঁড়, না আছে পাল, না আছে গুণ ; তাহাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে প্রবৃত্তি, না আছে অধ্যবসায়। তাহারা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া স্রোতের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। মাঝিকে জিজ্ঞাসা কর, "বাপু, বসিয়া আছ কেন ?" সে উত্তর দেয়, "আজ্ঞা, এখনো জোয়ার আসে নাই।" "গুণ টানিয়া চল না কেন ?" "আজ্ঞা, সে গুণটি নাই।" "জোয়ার আসিতে আসিতে তোমার কাজ যদি ফুরাইয়া যায় ?" "পাল-তুলা, দাঁড়টানা অনেক নৌকা যাইতেছে, তাহাদের বরাত দিব।" অন্যান্য চল্‌তি নৌকাসকল অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে কাছি দিয়া

পশ্চাতে বাঁধিয়া লয়, এইরূপে এমন শত শত নৌকা পার পায়। সমাজের স্রোত নাকি প্রায় একটানা, বিনাশের সমুদ্রমুখেই তাহার স্বাভাবিক গতি। উন্নতির পথে অমরতার পথে যাহাকে যাইতে হয়, তাহাকে উজান বাহিয়া যাইতে হয়। যে-সকল দাঁড় ও পাল -বিহীন নৌকা স্রোতে গা-ভাসান দেয়, প্রায় তাহারা বিনাশসমুদ্রে গিয়া পড়ে। সমাজের অধিকাংশ নৌকাই এইরূপ, প্রত্যহ রাম শ্যাম প্রভৃতি মাঝিগণ আনন্দে ভাবিতেছে, 'যেরূপ বেগে ছুটিয়াছি, না জানি কোথায় গিয়া পৌঁছাইব।' একটি একটি করিয়া বিস্মৃতির সাগরে গিয়া পড়ে ও চোখের আড়াল হইয়া যায়। সমুদ্রের গর্ভে ইহাদের সমাধি, স্মরণস্তম্ভে ইহাদের নাম লিখা থাকে না।

বুদ্ধি খাটাইয়া যাহাদের অগ্রসর হইতে হয় তাহাদের বলে— দাঁড়টানা নৌকা। অত্যন্ত মেহন্নত করিতে হয়, উঠিয়া পড়িয়া দাঁড় না টানিলে চলে না। কিন্তু তবুও অনেক সময়ে স্রোত সামলাইতে পারে না। অসংখ্য দাঁড়ের নৌকা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়াও হটিতে থাকে, অবশেষে টানাটানি করিতে কাহারও বা দাঁড় হাল ভাঙিয়া যায়। সকলের অপেক্ষা ভালো চলে পালের নৌকা। ইহাদের বলে— প্রতিভার নৌকা। ইহারা হঠাৎ আকাশের দিক হইতে বাতাস পায় ও তীরের মতো ছুটিয়া চলে। স্রোতের বিরুদ্ধে ইহারাই জয়ী হয়। দোষের মধ্যে যখন বাতাস বন্ধ হয়, তখন ইহাদিগকে নোঙর করিয়া থাকিতে হয়, আবার যখনি বাতাস আসে তখনি যাত্রা আরম্ভ করে। আর একটা দোষ আছে— পালের নৌকা হঠাৎ কাত হইয়া পড়ে। পার্থিব নৌকা হাল্কা, অথচ পালে স্বর্গীয় বাতাস খুব লাগিয়াছে, ঝট্ করিয়া উল্‌টাইয়া পড়ে। কেহ কেহ এমন কথা বলেন যে, সকলেরই কল বাহির হইতেছে, বুদ্ধিরও কল বাহির হইবে, তখন আর প্রতিভার পালের আবশ্যক করিবে না— মনুষ্যসমাজে স্টীমার চলিবে। মানুষ যতদিন অসম্পূর্ণ মানুষ থাকিবে ততদিন প্রতিভার আবশ্যক। যদি কখনো সম্পূর্ণ দেবতা হইতে পারে তখন কি নিয়মে চলিবে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রতিভার কল বাহির করিতে পারে, এত বড়ো প্রতিভা কোথায়?

ফল ফুল

পাঠক-খরিদ্দার লেখক-ব্যাপারীর প্রতি— "কেন হে, আজকাল তোমার এখানে তেমন ভালো ভাব পাওয়া যায় না কেন?"

লেখক— "মহাশয়, আমার এ ফল ফুলের দোকান। মিঠাই মণ্ডার নহে, যে, নিজের হাতে গড়িয়া দিব। আমার মাথার জমিতে কতকগুলা গাছ আছে। আপনি আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আপনাকে নিয়মিত ফল ফুল যোগাইতে হইবে। কিন্তু ঠিক নিয়ম-অনুসারে ফল ফুল ফলেও না, ফুটেও না; কখন্ ফলে, কখন্ ফুটে বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু তাহা করিলে চলে না, আপনি প্রত্যহ তাগাদা করিতে থাকেন, কই হে, ফুল কই, ফল কই? ফল ধোঁয়া দিয়া বলপূর্বক পাকাইতে হয়, কাজেই আপনারা গাছপাকা ভাবটি পান না। এমন একটা প্রবন্ধ তৈরি হয়, তাহার আঁঠির কাছটা হয়ত টক, খোসার কাছে হয়ত ঈষৎ মিষ্ট; তাহার এক জায়গায় হয়ত থল্‌থোলে, আর এক জায়গায় হয়ত কাঁচা শক্ত। ফুল ছিঁড়িয়া ফোটাইতে হয়; এমন একটা কবিতা তৈরি হয় যাহার ভালোরূপ রঙ ধরে নাই, গন্ধ জন্মে নাই, পাপ্‌ড়িগুলি কোঁকড়ানো। রহিয়া বসিয়া কিছু করিতে পারি না, সমস্তই তাড়াতাড়ি করিতে হয়। দেখুন দেখি গাছে কত কুঁড়ি ধরিয়াছে! কি দুঃখ যে, গাছে রাখিয়া ফুটাইতে পারি না। আমাদের দেশীয় কন্যার পিতারা যেমন মেয়েকুঁড়ি গাছে রাখিতে পারেন না, ৮ বৎসরের কুঁড়িটিকে ছিঁড়িয়া বিবাহ দিয়া বলপূর্বক ফুটাইয়া তুলেন ও বেচারিদের বিশ বৎসরের মধ্যে

ঝরিয়া পড়িবার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমার বলপূর্বক-ফোটান' কবিতার কুঁড়িগুলিও দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার আর একটা আপ্‌শোষ আছে ; আমার যে কুঁড়িগুলি ফুটিল না সেগুলি যদি ফুটিত, যে মুকুলগুলি ঝরিয়া গেল তাহাতে যদি ফল ধরিত, তবে কি কীর্তিই লাভ করিতাম !"

মাছ ধরা

উপরের কথা হইতে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। ভাবের সরোবরে আমরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারি না ; ছিপ ফেলিয়া ধরিতে হয়। মাছ ধরিবার জাল আবিষ্কার হয় নাই ; জানি না, কোনো কালে হইবে কি না। ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছি, কখন্ মাছ আসিয়া ঠোক্‌রায় ; কিন্তু ঠোক্‌রাইলেই হইল না, মাছকে ডাঙায় তোলাই আসল কাজ। জলের মধ্যে অনেক ভাব কিল্‌বিল্ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের ডাঙায় উঠাইয়া তোলা সাধারণ ব্যাপার নহে। ঠোক্‌রাইল, বঁড়শি লাগিল না ; বঁড়শি লাগিল, ছিঁড়িয়া পলাইল। অনেক মাছ যতক্ষণ জলে আছে, যতক্ষণ খেলাইতেছি, ততক্ষণ মনে হইতেছে প্রকাণ্ড ; তুলিয়া দেখি, যত বড়ো মনে হইয়াছিল তত বড়োটা নয়। ভাব আকর্ষণ করিবার জন্য কত প্রকার চার ফেলিতে হয়, কত কৌশল করিতে হয়, তাহা ভাবব্যবসায়ীরা জানেন। জল নাড়া না পায়, খুব স্থির থাকে ; ভাব যখন বঁড়শিবিদ্ধ হইল, তবুও জোর করিতেছে, উঠিতেছে না, তখন যেন অধীর হইয়া টানাহেঁচড়া করিয়া উঠাইবার চেষ্টা না করা হয়— তাহা হইলে সূতা ছিঁড়িয়া যায়— যথেষ্ট খেলাইয়া আয়ত্ত করিয়া তুলিবে। আমরা পরের মনঃসরোবর হইতেও মাছ তুলিয়া থাকি। আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিণী আছে কিন্তু ছিপ নাই। অবসরমত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানা প্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছগুলাকে আকর্ষণ করিয়া আনি ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমিতে তুলি।

ইচ্ছার দাম্ভিকতা

এক জন কবি স্মৃতি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, জীবনের প্রতি বিধাতার এ কি অভিশাপ যে, কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোনো একটা প্রবৃত্তি ভুলিয়া যাওয়া যখন আমাদের আবশ্যক হয়— মহত্তর উন্নততর প্রশান্ততর কর্তব্য আসিয়া যখন আদেশ করে 'ভুলিয়া যাও'— তখন আমরা ভুলি না ; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত, প্রতি দিন, সামান্য ঘটনার তুচ্ছ ধূলিকণাসমূহ আনিয়া আমাদের স্মৃতি ঢাকিয়া দেয় ও অবশেষে আমরা ভুলি ; ভুলিতেই হইবে বলিয়া ভুলি, ভুলিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া ভুলি না।— বাস্তবিক, এ কী দুঃখ ! আমরা নিজের মনের উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করিলাম, সে কোনো কাজে লাগিল না, আর আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বহিঃস্থিত সামান্য কতকগুলা জড় ঘটনা সেই কাজ সিদ্ধ করিল ! একটা কেন, এমন সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এক জন সর্বতোভাবে ভালোবাসিবার যোগ্যপাত্র— জানি তাহাকে ভালোবাসিলে সুখী হইব ও আমার সকল বিষয়ে মঙ্গল হইবে— প্রতিনিয়ত ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে ভালোবাসিতে পারিলাম না। আর এক জনকে ভালোবাসিলাম কেন ? না, তাহার সঙ্গে কী লগ্নে কী মহান্দ্রে ক্ষণে দেখা হইয়াছিল, তাহার কী একটি সামান্য কথার ভাব, কী একটি তুচ্ছ ভাবের আধখানা মাত্র দেখিয়াছিলাম, বলা নাই কহা নাই, ব্যস্তসমস্ত হইয়া একেবারে সমস্ত হৃদয়টা তাহার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিলাম। কোনো লেখক যখন কেবলমাত্র ইচ্ছাকে ভাব শিকার করিতে পাঠান,

তখন ইচ্ছার পায়ের শব্দ পাইলেই ভাবেরা কে কোথায় পলাইয়া যায় তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না ও সমস্ত দিনের পর শ্রান্ত ইচ্ছা তাহার বড়ো বড়ো কামান বন্দুক ফেলিয়া কপালের ঘর্মজল মুছিতে থাকে, অথচ কোথা-হইতে-কি-একটা সামান্য বিষয় সহসা ভাসিয়া বিনা আয়াসে এক মুহূর্তের মধ্যে শত সহস্র জীবন্ত ভাব আনিয়া উপস্থিত করে ও ইচ্ছার পশ্চাতে করতালি দিতে থাকে। কবিদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের কত বড়ো বড়ো ভাব দৈবাৎ কথার মিল করিতে গিয়া মনে পড়িয়াছে, ইচ্ছা করিলে মনে পড়িত না। মানুষের অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্ক্রিয়ার মূল অনুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে— একটা সামান্য একরত্তি ব্যাপার।

দেখা যাইতেছে আমাদের ইচ্ছা বলিয়া একটা বিষম দাম্ভিক ব্যক্তিকে আমাদের মন-গাঁয়ে অতি অল্প লোকেই মানিয়া থাকে, অথচ সে এক জন আপনি-মোড়ল। ছোটো ছোটো কতকগুলি সামান্য বিষয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য, অথচ সকলকেই তিনি আদেশ করিয়া বেড়ান। একটা কাজ সমাধা হইলে তিনি জাঁক করিয়া বেড়ান 'এ কাজের কল আমি টিপিয়া দিয়াছিলাম'। অথচ কত ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বিষয় তাঁহার নিজের কল টিপিয়া দিয়াছে তাহার খবর রাখেন না। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে, তিনি দেখিতেছেন দুচ্ছেদ্য লৌহের লাগাম দিয়া সমস্ত কাজকে তিনি চালাইয়া বেড়াইতেছেন, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন না তাঁহাকে কে মাকড়্ষার জালের চেয়ে সূক্ষ্মতর তুচ্ছতর সহস্র সূত্রে বাঁধিয়া নিয়মিত করিতেছে! মনে করিতে কষ্ট হয়— কত অল্প বিষয়ই আমাদের ইচ্ছার অধীন ও কত সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অধীন আমাদের ইচ্ছা!

অভিনয়

এই জন্যই বহুকাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে— আমরা অদৃষ্টের খেলেনা। আমাদের লইয়া সে খেলা করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে, নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। একটা নিয়ম আছে, একটা ফল আছে। অভিনয়ের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের তুলনা পুরানো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেবল মাত্র সেই অপরাধে সে তুলনাকে যাবজ্জীবন নির্বাসিত করা যায় না। অভিনয়ের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের অনেক মিল পাওয়া যায়। প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে সকলি ছাড়া-ছাড়া বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়, একটা অর্থ পাওয়া যায় না। তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনলীলা সাধারণ মনুষ্যজীবন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে নিতান্ত অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়, অদৃষ্টের ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে ; আমরা একটা মহানাটক অভিনয় করিতেছি, প্রত্যেকের অভিনয়ে তাহার উপাখ্যানভাগ পরিপুষ্ট হইতেছে। এক এক জন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে, নিজের নিজের পালা অভিনয় করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, সে জানে না তাহার ঐ জীবনাংশের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের উপাখ্যানভাগ কিরূপে সৃজিত হইতেছে। সে নিজের অংশটুকু জানে মাত্র ; সমস্তটার সহিত যোগটুকু জানে না। কাজেই সে মনে করিল, 'আমার পালা সাঙ্গ হইল এবং সমস্তই সাঙ্গ হইল।'

প্রত্যহ সে শত সহস্র অভিনেতা, সামান্যই হউক আর মহৎই হউক, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, সকলেই সেই মহা-উপাখ্যানের সহিত জড়িত, কেহ অধিক, কেহ অল্প ; কেহ বা নিজের অভিনয়াংশের সহিত সাধারণ উপাখ্যানের যোগ কিয়ৎপরিমাণে জানে, কেহ বা একেবারেই জানে না। মনে কর, এই মহানাটকের "ফরাসীবিপ্লব"-নামক একটা গর্ভাঙ্ক অভিনয় হইয়া গেল, কত শত বৎসর ধরিয়া কত শত রাজা হইতে কত শত দীনতম ব্যক্তি না জানিয়া না শুনিয়া ইহার অভিনয় করিয়া আসিতেছে ; তাহাদের প্রত্যেকের জীবন পৃথক্ করিয়া পড়িলে এক একটি প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সমস্তটা একত্র করিয়া পড়িবার ক্ষমতা থাকিলে প্রকাণ্ড একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নাটক পড়া যায়।

একবার কল্পনা করা যাক্, পৃথিবীর বহির্ভাগে দেবতারা সহস্র তারকানেত্র মেলিয়া এই অভিনয় দেখিতেছেন। কি আগ্রহের সহিত তাঁহারা চাহিয়া রহিয়াছেন ! প্রতি শতাব্দীর অঙ্কে অঙ্কে উপাখ্যান একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রতি দৃশ্যপরিবর্তনে তাঁহাদের কত প্রকার কল্পনার উদয় হইতেছে, কত কি অনুমান করিতেছেন ! যদি পূর্ব হইতেই এই কাব্য, এই নাটক পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও কী ব্যগ্রতার সহিত প্রত্যেক অভিনয়ের ফল দেখিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন ! যেখানে একটা ঔৎসুক্যজনক গর্ভাঙ্ক আসন্ন হইয়াছে, সেইখানে তাঁহারা আগ্রহরুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনে মনে বলিতে থাকেন, এইবার সেই মহা-ঘটনা ঘটিবে। কী মহান্ অভিনয় ! কী বিচিত্র দৃশ্য ! কী প্রকাণ্ড রঙ্গবেদী !

খাঁটি বিনয়

ভাল জহরী নহিলে খাঁটি বিনয় চিনিতে পারে না। এক দল অহংকারী আছে তাহারা অহংকার করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী, বিস্তর লোকের নিকট হইতে যশের খাজনা আদায় হয়, এই নিমিত্ত তাহাদের বিনয় করিবার উপযুক্ত সম্বল আছে। তাহারা সখ করিয়া বিনয় করিয়া থাকে। বাহিরে নাকি জমিজমা যথেষ্ট আছে, এই জন্য বাড়ির সমুখে একখানা বিনয়ের বাগান করিয়া রাখে। যে বেচারীর জমিদারী নাই, আধ পয়সা খাজনা মিলে না, সে ব্যক্তি পেটের দায়ে নিজের বাড়ির উঠানে, "অহং" এর বাস্তুভিটার উপরে অহংকারের চাষ করিয়া থাকে, তাহার আর সখ করিবার জায়গা নাই। নিজমুখে অহংকার করিলে যে দারিদ্র্য প্রকাশ পায়, সে দারিদ্র্য ঢাকিতে পারে এত বড়ো অহংকার ইহাদের নাই। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে এক দল সখ করিয়া বিনয়ী, আর এক দল দায়ে পড়িয়া অহংকারী, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্য।

নিজের গুণহীনতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন নির্গুণ শতকরা নিরেনব্বই জন, কিন্তু নিজের গুণ একেবারে জানে না এমন গুণী কোথায় ? তবে, চব্বিশ ঘণ্টা নিজের গুণগুলি চোখের সামনে খাড়া করিয়া রাখে না এমন বিনয়ী সংসারে মেলে। অতএব কে বিনয়ী ? না, যে আপনাকে ভুলিয়া থাকে, যে আপনাকে জানে না, তাহার কথা হইতেছে না।

বড়োমানুষ গৃহকর্তা নিমন্ত্রিতদিগকে বলেন, "মহাশয়, দরিদ্রের কুটিরে পদার্পণ করিয়াছেন ; আপনাদিগকে আজ বড়ো কষ্ট দেওয়া হইল" ইত্যাদি। সকলে বলে, "আহা মাটির মানুষ !" কিন্তু ইহারা কি সামান্য অহংকারী! অপ্রস্তুত হইলে লোকে যে কারণে কাঁদে না, হাসে, ইহারাও সেই কারণে বিনয়বাক্য বলিয়া থাকে। ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে, ইহাদের বাসস্থান প্রাসাদ, কুটির নহে। এ অহংকার সর্বদাই ইহাদের মনে জাগরূক থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়, পাছে বিনয়ের অভাব প্রকাশ পায়। অভ্যাগত আসিলেই তাড়াতাড়ি ডাকিয়া বলিতে হয়,"মহাশয়,এ কুটির,প্রাসাদ নহে।" তেমন বৃষ যদি কেহ থাকে তবে এই অহংকারী মশাদের বলে, "বাপু হে, তুমি যে এতক্ষণ আমার শিঙে বসিয়াছিলে, তাহা আমি মূলে জানিতেই পারি নাই, ভোঁ ভোঁ করিতে আসিয়াছ বলিয়া এতক্ষণে টের পাইলাম। তোমার এ বাড়িটা প্রাসাদ কি কুটীর, সে বিষয়ে আমি মুহূর্তের জন্য ভাবিও নাই, আমার নজরেই পড়ে নাই, অতএব ও কথা তুলিবার আবশ্যক কি?" আমাদের দেশে উক্ত প্রকার অহংকারী বিনয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সুকণ্ঠ বলেন "আমার গলা নাই", সুলেখক বলেন "আমি ছাই ভস্ম লিখি", সুরূপসী বলেন "এ পোড়ামুখ লোকের কাছে দেখাইতে লজ্জা করে"! এ ভাবটা দূর হইলেই ভালো হয়। ইহাতে না অহংকার ঢাকা পড়ে, না সরলতা প্রকাশ হয়! আর, এই সামান্য উপায়েই যদি বিনয় করা যাইতে পারে, তবে তো বিনয় খুব শস্তা!

আসল কথা এই যে, "বিনয়বচন" বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই। বিনয়ের মুখে কথা নাই, বিনয়ের অর্থ চুপ করিয়া থাকা। বিনয় একটা অভাবাত্মক গুণ। আমার যে অহংকারের বিষয় আছে

এইটে না মনে থাকাই বিনয়, আমাকে যে বিনয় প্রকাশ করিতে হইবে এইটে মনে থাকার নাম বিনয় নহে। যে বলে 'আমি দরিদ্র' সে বিনয়ী নহে ; যে স্বভাবতই প্রকাশ করে না যে 'আমি ধনী' সেই বিনয়ী। যাহার বিনয়বাক্য বলিবার আবশ্যক পড়ে না সেই বিনয়ী। তবে কি না, বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে ব্যাকরণ পড়িতে হয়, অভিধান মুখস্থ করিতে হয় ; বিনয় যাহাদের পক্ষে বিদেশী, তাহাদিগকে বিনয়ের অভিধান মুখস্থ করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার মুখস্থ বিনয় সংসারের এক্‌জামিন পাস করিতেই কাজে দেখে, পরীক্ষাশালার বাহিরে কোনো কাজে লাগে না।

ধরা কথা

সমস্ত জীবন যে তত্ত্বগুলিকে জানিয়া আসিতেছি, মাঝে মাঝে তাহাদের এক একবার আবিষ্কার করিয়া ফেলি। তাড়াতাড়ি পাশের লোককে ডাকিয়া বলি, ওহে, আমি এই তত্ত্বটি জানিয়াছি। সে বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, ও তো জানা কথা! কিন্তু ঠিক জানা কথা নয়। তুমি উহা জান বটে, তবুও জান না। একটা তুলনা দিলে স্পষ্ট হইবে। বাতাস সর্বত্রই বিদ্যমান। তথাপি এক জন যদি বলিয়া উঠে 'ওহে, এইখানে বাতাস আছে' তবে তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, তেমনি আমরা যে সকল সাধারণ তত্ত্বের মধ্যে বাস করিয়া থাকি সেই তত্ত্বগুলি অবস্থাবিশেষে এক এক জনের গায়ে লাগে, অমনি সে বলে— অমুক তত্ত্বটি পাইতেছি। এক জন বন্ধু বলিতেছিলেন যে, আজকাল সার্বজনীন-উদারতা (humanity) প্রভৃতি কতকগুলি প্রশস্ত কথা উঠিয়াছে, সহসা মনে হয়, কত কি মূল্যবান্ তত্ত্ব উপার্জন করিতেছি, কিন্তু সে সকল তত্ত্ব বাতাসের মতো। বাতাস অত্যন্ত উপকারী পদার্থ বটে, কিন্তু এত সাধারণ যে তাহার কোনো মূল্য নাই। তেমনি উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলি বড়ো বড়ো তত্ত্ব বটে, কিন্তু এত সাধারণ যে তাহার কোনো মূল্য নাই ; অথচ আজকাল তাহাদের এমনি বিশেষরূপে উত্থাপিত করা হইতেছে যে, যেন তাহারা কতই অসাধারণ! তাঁহার কথাটা ঠিক মানি না। মহাত্মাদিগের "বসুধৈব কুটুম্বকং" এ কথাটি সকলেই জানেন, অথচ সকলের গায়ে লাগে না। এ তত্ত্বটি মাঝে মাঝে এক এক জনের গায়ে প্রবাহিত হয় অমনি সে বসুধৈব কুটুম্বকং প্রচার করিয়া বেড়ায়। পুরানো-কথা ধরা-কথা পারতপক্ষে কেহ বলিতে চাহে না ; অতএব পুরানো কথা যখন কাহারও মুখে শুনা যায়, তখন বিবেচনা করা উচিত— সে তাহা জানিত বটে কিন্তু আজ নতুন পাইয়াছে, আমাদের ভাগ্যে এখনো তাহা ঘটে নাই। অনেক "উড়ো-কথা"র অপেক্ষা ধরা-কথাকে আমরা কম জানি। আমরা নিজের চোখ দেখিতে পাই না, দর্পণ পাইলেই দেখিতে পাই ; ধরা-কথা ধরিতে পারি না, বিশেষ অভিজ্ঞতা পাইলে ধরি। অতএব যাহারা জানা-কথা জানে, তাহারা সাধারণের চেয়ে অধিক জানে।

অন্ত্যেষ্টিসৎকার

ইংরাজশাসন-বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন— দেখ দেখি ইংরাজের কি অন্যায়! প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া তাহার সভ্যতা ; ভারতবর্ষের বিষয় পাইয়া সে ধনী ; অথচ সেই ভারতবর্ষের প্রতি তাহার কি অন্যায় ব্যবহার! আমার বক্তব্য এই যে, তাহারা তো ঠিক উত্তরাধিকারীর মতো কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের মুখাগ্নি করিতেছে, ভারতবর্ষের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আরও কি চাও! ভূত ভারতবর্ষ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপদ্রব করিতেছিল, তখন বড়ো বড়ো কামান-গোলার পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে। তাহা ছাড়া শাস্ত্রে বলে, নিজের সন্তানদের

প্রতিপালন করিয়া লোকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। চিত্রগুপ্তের ছোটো-আদালত হইতে এ ঋণের জন্য ইংরাজের নামে বোধ করি কোনো কালে ওয়ারেন্ট্ বাহির হইবে না। যে দেশে, যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ পাইয়াছে Jane Cow (John Bull এর স্ত্রীলিঙ্গ) সেইখানেই নিজের সন্তানগুলিকে চরাইয়া ও পরের সন্তানগুলিকে গুঁতাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব উত্তরাধিকারীর ও পূর্বপুরুষের কর্তব্য-সাধনে তাহাদের কোনো প্রকার শৈথিল্য লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নালিশ কি লইয়া ?

দ্রুত বুদ্ধি

অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকদের অনেকের সহসা নির্বোধ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। তাহার কারণ— বুঝিবার পদ্ধতিকে, বুঝিবার ক্রম-বিশিষ্ট সোপানগুলিকে অনেকে বুঝা মনে করেন। এই উভয়কে তাঁহারা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেন না, একত্র করিয়া দেখেন। যাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো, বজ্রবেগে যাঁহাদের মাথায় ভাব আসিয়া পড়ে, যাঁহাদের বুঝার সোপান দেখা যায় না, কঙ্কাল দেখা যায় না, ইঁট ও মালমস্‌লাগুলা দেখা যায় না, কেবল বুঝাটাই দেখা যায়, সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের নির্বোধ মনে করে, কারণ তাহারা তাঁহাদের বুঝাকে বুঝিতে পারে না। যাদুকরেরা যাহা করে, তাহা যদি আস্তে আস্তে করে, তাহার প্রতি অঙ্গ যদি দেখাইয়া দেখাইয়া করে, তবে দর্শক বেচারীরা সমস্ত বুঝিতে পারে। নহিলে তাহাদের ভেবাচেকা লাগিয়া যায়, কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে না ও সমস্তই ইন্দ্রজাল বলিয়া ঠাহরায়। অসাধারণ বুদ্ধির এক দোষ এই যে, সে বুঝিতে যেমন পারে বুঝাইতে তেমন পারে না। বুঝাইবে কিরূপে বলো ? নিজে সে একটা বিষয় এত ভালো জানে ও এত সহজে জানে যে, তাহাকেও আবার কি করিয়া সহজ করিতে হইবে ভাবিয়া পায় না। ইহারা আপনাকে অপেক্ষাকৃত নির্বোধ না করিয়া ফেলিলে অন্যকে বুঝাইতে পারে না। ইহাদের বুদ্ধি একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবামাত্র আবার তাহাকে সেখান হইতে বলপূর্বক বাহির করিয়া দিতে হয় ; যে পথ দিয়া বিদ্যুৎবেগে সে সেই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই পথ দিয়া অতি ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয় ; সে ব্যক্তি অভ্যাসদোষে মাঝে মাঝে ছুটিয়া চলিতে চায়, অমনি তাহাকে পাক্‌ড়া করিয়া বলিতে হয়— "আস্তে !" কেহ-বা ইচ্ছা করিলে এইরূপ নির্বোধ হইতে পারে, কেহ-বা পারে না। অনেকের বুদ্ধি কোনো মতেই রাশ মানে না, তাহাকে আস্তে চালাইবার সাধ্য নাই। এইরূপ লোকদের নির্বোধ লোকেরা নির্বোধ মনে করে। যাহারা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়-টানা নৌকায় যায়, তাহারা প্রতি ঝাঁকানিতে প্রতি দাঁড়ের শব্দে বুঝিতে পারে যে, নৌকা অগ্রসর হইতেছে। যাহারা পালের নৌকায় চলে, তাহারা সকল সময়ে বুঝিতে পারে না নৌকা চলিতেছে কি না।

লজ্জাভূষণ

সামাজিক লজ্জা বা অপরাধের লজ্জার কথা বলিতেছি না— আমি যে লজ্জার কথা বলিতেছি, তাহাকে বিনয়ের লজ্জা বলা যায়। তাহাই যথার্থ লজ্জা, তাহাই শ্রী। তাহার একটা স্বতন্ত্র নাম থাকিলেই ভালো হয়।

সংবাদপত্রে দোকানদারেরা যেরূপ বড়ো বড়ো অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি নিজেকে সমাজের চক্ষে সেইরূপ বড়ো অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, সংসারের হাটে বিক্রেয় পুতুলের মতো সর্বাঙ্গে রঙ্‌চঙ্ মাখাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, "আমি" বলিয়া দুটা অক্ষরের নামাবলী গায়ে দিয়া রাস্তার চৌমাথায়

দাঁড়াইতে পারে, সেই ব্যক্তি নির্লজ্জ। সে ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্র পেখমটি প্রাণপণে ছড়াইতে থাকে, যাহাতে করিয়া জগতের আর সমস্ত দ্রব্য তাহার পেখমের আড়ালে পড়িয়া যায় ও দায়ে পড়িয়া লোকের চক্ষু তাহার উপরে পড়ে। সে চায়— তাহার পেখমের ছায়ায় চন্দ্রগ্রহণ হয়, সূর্য্যগ্রহণ হয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহণ লাগে। যে লোক গায়ে কাপড় দেয় না তাহাকে সকলে নির্লজ্জ বলিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি গায়ে অত্যন্ত কাপড় দেয় তাহাকে কেন সকলে নির্লজ্জ বলে না ? যে ব্যক্তি রঙচঙে কাপড় পরিয়া হীরা জহরতের ভার বহন করিয়া বেড়ায়, তাহাকে লোকে অহংকারী বলে। কিন্তু তাহার মতো দীনহীনের আবার অহংকার কিসের ? যত লোকের চক্ষে সে পড়িতেছে তত লোকের কাছেই সে ভিক্ষুক। সে সকলের কাছে মিনতি করিয়া বলিতেছে, "ওগো, এই দিকে ! এই দিকে ! আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ !" তাহার রঙচঙে কাপড় গলবস্ত্রের চাদরের অপেক্ষা অধিক অহংকারের সামগ্রী নহে।

আমাদের শাস্ত্রে যে বলিয়া থাকে "লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ" সে কি ভাসুরের সাক্ষাতে ঘোমটা দেওয়া, না, শ্বশুরের সাক্ষাতে বোবা হওয়া ? "লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ" বলিলে বুঝায়, অধিক ভূষণ না পরাই স্ত্রীলোকের ভূষণ। অর্থাৎ লজ্জাভূষণ গায়ে পরিলে শরীরে অন্য ভূষণের স্থান থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণত স্ত্রীলোকের অন্য সকল্ ভূষণই আছে, কেবল লজ্জাভূষণটাই কম। রঙচঙ করিয়া নিজেকে বিক্রেয় পুত্তলিকার মতো সাজাইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের অত্যন্ত অধিক। লজ্জার ভূষণ পরিতে চাও তো রঙ মোছ, শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর, ময়ূরের মতো পেখম তুলিয়া বেড়াইও না। উষা কিছু অন্তঃপুরবাসিনী মেয়ে নয়, তাহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ হয়। কিন্তু সে এমনি একটি লজ্জার বস্ত্র পরিয়া, নিরলংকার শুভ্র বসন পরিয়া, জগতের সমক্ষে প্রকাশ পায় ও তাহাতে করিয়া তাহার মুখে এমনি একটি পবিত্র বিমল প্রশান্ত শ্রীপ্রকাশ পাইতে থাকে যে, বিলাস-আবেশ-ময় প্রমোদ-উচ্ছ্বাস উষার ভাবের সহিত কোনো মতে মিশ খায় না— মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জা কেবল মাত্র ভূষণ নহে, ইহা তাহাদের বর্ম।

ঘর ও বাসাবাড়ি

দশের চোখের উপরে যে দিনরাত্রির বাস করিতে চাহে, পরের চোখের উপরেই যাহার বাড়ি ঘর, তাহার আর নিজের ঘর বাড়ি নাই। সেই জন্যই সে রঙচঙ দিয়া পরের চোখ কিনিতে চায়, সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইলেই সে ব্যক্তি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারা বাসাড়ে লোক, খামখেয়ালী ঘরওয়ালা উচ্ছেদ করিয়া দিলে ইহাদের আর দাঁড়াইবার জায়গা থাকে না। কিন্তু ভাবুক লোকদিগের নিজের একটা ঘরবাড়ি আছে, পরের চোখ হইতে বিদায় হইয়া তাহার সেই নিজের ঘরের মধ্যে আসিলেই সে যেন বাঁচে। ভাবুক লোকেরা যথার্থ গৃহস্থ লোক। আর যাহারা নিজের মনের মধ্যে আশ্রয় পায় না, তাহারা কাজেই পরের চক্ষু অবলম্বন করিয়া থাকে ও রঙচঙ মাখিয়া পরের চক্ষুর খোশামোদ করিতে থাকে। ভাবুকদিগের নিজের মনের মধ্যে কি অটল আশ্রয় আছে ! এই জন্যই দেখা যায়, ভাবুক লোকেরা বাহিরের লোকজনের সহিত বড়ো একটা মিশিতে পারেন না, কণ্ঠাগ্র ভদ্রতার আইন কানুনের কহিত কোনো সম্পর্ক রাখেন না। যেখানে চল্লিশ জন অলস ভাবে হাসিতেছে সেখানে তিনি একচল্লিশ হইয়া তাহাদের সহিত একত্রে দন্ত বিকাশ করিতে পারেন না। দশ ব্যক্তির মধ্যে একাদশ হইবার ঐকান্তিক বাসনা তাঁহার নাই।

নিরহংকার আত্মম্ভরিতা

কেনই বা থাকিবে ? তিনি নিজের কাছে নিজে সর্বদাই সম্ভ্রমে নত হইয়া থাকেন। তাঁহার নিজের সহচর নিজেই। অত বড়ো সহচর দশের মধ্যে কোথায় মিলিবে ! প্রতিভা যখন মুহূর্ত কালের জন্য অতিথি হইয়া এক জন কবিকে বীণা করিয়া তাঁহার তন্ত্রী হইতে সুর বাহির করিতে থাকে তখন তিনি নিজের সুর শুনিয়া নিজে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বাল্মীকি তাঁহার নিজের রচিত রামকে যেমন ভক্তি করিতেন এমন কোনো ভক্ত করেন না এবং যতক্ষণ তিনি রামের চরিত্র সৃজন করিতেছিলেন ততক্ষণ তিনি নিজেই রাম হইয়াছিলেন ও তাঁহার নিজের মহান্ ভাবে নিজেই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা নিজেকে নিজেই ভক্তি করিতে পারেন, নিজের সাহচর্যে নিজে সুখ ভোগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর দশ জনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয় না। এক কথায়— যাঁহারা একলা থাকেন তাঁহারা আর পরের সহিত মিশিবার অবসর পান না। ইহাকেই বলে অহংকারবিবর্জিত আত্মম্ভরিতা।

আত্মময় আত্মবিস্মৃতি

কিন্তু ইহা বলিয়া রাখি, ভাবুক লোকদিগের নিজের প্রতি মনোযোগ দিবার যেমন অল্প অবসর ও আবশ্যক আছে, এমন আর কাহারও নহে। যাহাদের পরের সহিত মিশিতে হয় তাহাদের যেমন চব্বিশ ঘণ্টা নিজের চর্চা করিতে হয়, এমন আর কাহাকেও না। তাহাদের দিনরাত্রি নিজেকে মাজিতে-ঘষিতে সাজাইতে-গোজাইতে হয়। পরের চোখের কাছে নিজেকে উপাদেয় করিয়া উপহার দিতে হয়। এইরূপে যাহারা পরের সহিত মেশে, নিজের সহিত তাহাদের অধিকতর মিশিতে হয়। ইহারাই যথার্থ আত্মম্ভরি। ভাবুকগণ কবিগণ সর্বদাই নিজেকে ভুলিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের নিজেকে মনে করাইয়া দিবার জন্য পর কেহ উপস্থিত থাকে না। নিজের সহিত ব্যতীত আর কাহারও সহিত ইঁহারা ভালো করিয়া মেশেন না বলিয়া ইঁহারা নিজের কথা ভাবেন না। ইঁহারাই যথার্থ আত্মময় আত্ম-বিস্মৃত।

ছোটো ভাব

বর্তমান সভ্যতার প্রাণপণ চেষ্টা এই যে, কিছুই ফেলা না যায়, সকলই কাজে লাগে। মনোবিজ্ঞান একটা ক্ষুদ্র বালকের, একটা বদ্ধ পাগলের, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম চিন্তা খেয়াল মনোভাব সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়— কাজে লাগিবে। সমাজবিজ্ঞান, শিশু সমাজের, অসভ্য সমাজের, প্রত্যেক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান, অর্থহীন প্রথা, পুঁথিতে জমা করিয়া রাখিতেছে— কাজে লাগিবে। এখনকার কবিরাও এমন সকল ক্ষুদ্র যৎসামান্য বিষয়গুলিকে কবিতায় পরিণত করেন, যাহা প্রাচীন লোকেরা গদ্যেরও অনুপযুক্ত মনে করিতেন।

এখনকার শিল্পেও, যাহা সাধারণ লোকে অনাবশ্যক পুরাণ' গলিত বলিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাও একটা না একটা কাজে খাটিয়া যাইতেছে।

আমরা যখন বেড়াইতেছি, শুইয়া আছি, আহার করিতেছি, সংসারের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কাজ সমাধা করিতেছি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কত শত খুচরা বাজে ভাব আনাগোনা করিতে থাকে,

সেগুলিকে আমরা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া আবর্জনা মনে করিয়া ফেলিয়া দিই। খুব একটা দীর্ঘপ্রস্থ ভাব নহিলে আমরা তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা আমাদের মনের মধ্যে যে জাল পাতিয়া রাখি তাহা বড়ো মাছ ধরিবার জাল ; ছোটো ছোটো মাছেরা তাহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া গলিয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু এমনতর অমনোযোগিতা একালের রীতি-বহির্ভূত। ঐ ছোটো ভাব ধরিয়া জিয়াইয়া রাখিলে কত বড়ো হইত কে বলিতে পারে। একবার হাতছাড়া হইলে বড়ো হইয়া আবার যে তোমাকে ধরা দিবে তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। তাহা ছাড়া, আয়তন লইয়া আবশ্যক স্থির করে বালকেরা। সমাজের যতই বয়স বাড়িতেছে ততই এ বিষয়ে তাহার উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমার একটি বন্ধু আছেন, তিনি অতি সাবধানে তাঁহার মনের দ্বার আগলাইয়া বসিয়া আছেন, যখনি ভাব আসে তখনি পাক্‌ড়া করেন, তাহাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখেন; ভাবিতে থাকেন, ইহাকে কোনো প্রকারে মাজিয়া-ঘষিয়া ছাঁটিয়া বাড়াইয়া-কমাইয়া অক্ষরে লিখিবার উপযোগী করিতে পারি কি না। এই উপায়ে ইহার এমনি হাত পাকিয়া গিয়াছে যে, তুমি যে ভাব ব্যবহার করিয়া বা ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেও, তাহাই লইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে ইনি ব্যবহারের জিনিষ বা ঘর সাজাইবার খেলেনা গড়িয়া দিতে পারেন। লোকের অব্যবহার্য ভাঙাকাঁচের টুক্‌রা কুড়াইয়া কারিগরেরা ফানুষ গড়ে, ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া কাগজ গড়ে। আমার বন্ধুর প্রবন্ধগুলি সেইরূপ। তাহাদের মূল উপকরণ অনুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে ভাবের আবর্জনা, ছিন্ন টুক্‌রা, অব্যবহার্য চিন্তাখণ্ড লইয়া সমস্ত গড়িয়াছেন।

সকলের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, কোনো ভাব বিবেচনা না করিয়া যেন ফেলা না যায়। অনবরত এইটে যেন মনে করেন, এ ভাবটাকে কোনো প্রকারে লিখিয়া ফেলিতে পারি কি না ! যাহা কিছু মনে আসে সমস্ত ভাব লিখিয়া রাখা তাঁহার কর্তব্য কর্ম। অতএব অবিরত যেন হাতুড়ি, বাটালি, পালিশ করিবার যন্ত্রাদি হাতের কাছে মজুত থাকে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আমাদের মনে যত প্রকার ভাব উঠে সকলগুলিই লিখিবার উপযুক্ত। কিন্তু অতবড় লেখক হইবার উপযুক্ত প্রতিভা আমাদের নাই। বড়ো বড়ো কবিদিগের লেখা দেখিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ে এই বলিয়া আশ্চর্য হই যে, "এ ভাবটা আমার মনে কত শতবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি তো স্বপ্নেও মনে করি নাই এ ভাবটাও আবার এমন চমৎকার করিয়া লেখা যায় !" অনেকের মনে ভাব আছে, অথচ ভাব ধরা দেয় না, ভাব পোষ মানে না ; ভাবের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। আইস, আমরা অনবরত বুঝিতে চেষ্টা করি। মনোরাজ্যে এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লই যে, বাজে খরচ না হয়। কাহারও কি আশ্চর্য মনে হয় না যে কেবল মাত্র বেবন্দোবস্তের দরুন প্রত্যহ কত হাজার হাজার ভাব নিষ্ফল খরচ হইয়া যাইতেছে। তাহার হিসাব পর্যন্ত রাখা হইতেছে না। এক জন লেখক ও এক জন অলেখকের মধ্যে শুদ্ধ কেবল এই বন্দোবস্তের প্রভেদ লইয়া প্রভেদ। এক জন তাঁহার ভাব খাটাইয়া কারবার করেন, আর এক ব্যক্তির এই ভাবের টাকাকড়ির বিষয়ে এমনি গোলমেলে মাথা, যে কোন্ দিক্ দিয়া যে সমস্ত খরচ হইয়া যায়, উড়িয়া যায়, তাহার ঠিকানা করিতে পারেন না !

জগতের জন্ম-মৃত্যু

কত অসংখ্য কত বিচিত্র জগৎ আছে, তাহা একবার মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া দেখা হউক দেখি ! আমার কথা হয়ত অনেকে ভুল বুঝিতেছেন। অনেকে হয়ত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র একটি একটি গণনা করিয়া জগতের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু আমি আর এক দিক হইতে গণনা করিতেছি। জগৎ একটি বই নয়। কিন্তু প্রতি লোকের এক একটি যে পৃথক্ জগৎ আছে, তাহাই গণনা করিয়া দেখ দেখি ! কত সহস্র জগৎ ! আমি যখন রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি তখন কেন

জ্যোৎস্নার মুখ ম্লান হইয়া যায়, উষার মুখেও শ্রান্তি প্রকাশ পায়, সন্ধ্যার হৃদয়েও অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে ? অথচ সেই মুহূর্তে কত শত লোকের কত শত জগৎ আনন্দে হাসিতেছে ! কত শত ভাবে তরঙ্গিত হইতেছে ! না হইবে কেন ? আমার জগৎ যতই প্রকাণ্ড, যতই মহান্ হউক না কেন, "আমি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকণার উপর তাহার সমস্তটা গঠিত। আমার সহিত সে জন্মিয়াছে, আমার সহিত সে লয় পাইবে। সুতরাং আমি কাঁদিলেই সে কাঁদে, আমি হাসিলেই সে হাসে। তাহার আর কাহাকেও দেখিবার নাই, আর কাহারও জন্য ভাবিবার নাই। তাহার লক্ষ তারা আছে, কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য। এক জন লোক যখন মরিয়া গেল, তখন আমরা ভাবি না যে একটি জগৎ নিভিয়া গেল। একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌর-পরিবার গেল, একটি তরুলতাপশুপক্ষী-শোভিত পৃথিবী গেল।

অসংখ্য জগৎ

উপরের কথাটাকে আরো একটু বিস্তৃত করা যাক। একজন লোক মরিয়া গেল, আমরা সাধারণত মনে করি সেই গেল, তাহার সহিত আর কিছু গেল না। এরূপ ভ্রমে পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, আমরা সচরাচর মনে করি যে, সেও যে জগতে আছে আমরাও সেই জগতে আছি, সেও যাহা দেখিতেছে আমরাও তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু সেই অনুমানটাই ভ্রম নাকি, এই নিমিত্ত সমস্ত যুক্তিতে ভ্রম পৌঁছিয়াছে। সে যাহা দেখিতেছে আমরা তাহা দেখিতেছি না, সে যেখানে আছে আমরা সেখানে নাই। সে দেখিতেছে, ভাগীরথী পতিমিলনাশয়ে চঞ্চলা যুবতীর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, গান গাইতেছে ; আমি দেখিতেছি ভাগীরথী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তটভূমিকে স্তনপান করাইতেছেন, তরঙ্গহস্তে অনবরত তাহার ললাটে অভিঘাত করিয়া কলকণ্ঠে বৈচিত্র্যহীন ঘুম পাড়াইবার গান গাহিতেছেন। উভয় জগতের উভয় জাহ্নবীর মধ্যে এত প্রভেদ। এই প্রকার, যত লোক আছে সকল লোকেরই জগৎ স্বতন্ত্র। লোক অর্থে, মনুষ্য বিশেষ এবং লোক অর্থে জগৎ বুঝায়। অর্থাৎ একজন মনুষ্য বলিলে একটি জগৎ বলা হয়। আমি কে ? না, আমি যাহা কিছু দেখিতেছি— চন্দ্র সূর্য পৃথিবী ইত্যাদি— সমস্ত লইয়া একজন। তুমিও তাহাই। অতএব প্রতি লোকের সঙ্গে সঙ্গে শত শত চন্দ্র সূর্য জন্মগ্রহণ করে ও শত শত চন্দ্র সূর্য মরিয়া যায়। অতএব দেখ, জগৎ যেমন অসংখ্য তেমনি বিচিত্র। কাহারও জগতে সূর্যোদয় আছে, আঁধারের অপগমন ও আলোকের আগমন আছে, কিন্তু প্রভাত নাই। সে ব্যক্তি সূর্যোদয়-রূপ একটা ঘটনা দেখিতে পায় বটে, কিন্তু প্রভাত দেখিতে পায় না। প্রভাত-শিশির, প্রভাত-সমীরণ, প্রভাত-মেঘমালা, প্রভাত-অরুণরাগের সামঞ্জস্য দেখিতে পায় না ; সুতরাং তাহার জগতে প্রভাত ব্যতীত প্রভাতের আর সমস্তই আছে। কাহারও বা প্রভাত আছে, সন্ধ্যা নাই। বসন্ত আছে, শরৎ নাই। কাহারও জ্যোৎস্না হাসে, কাহারও জ্যোৎস্না কাঁদে। কাহারও জগতে টাকার ঝম্‌ঝম্ ব্যতীত সংগীত নাই, মলের ঝম্‌ঝম্ ব্যতীত কবিতা নাই, উদরের বাহিরে সুখ নাই, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে অস্তিত্ব নাই। এমন কত কহিব ! এ সকল তো স্পষ্ট প্রভেদ ; সূক্ষ্ম প্রভেদ কত আছে, তাহার নাম কে করিবে ?

জগতের জমিদারি

তুমি জমি কিনিতেই ব্যস্ত, জগতের জমিদারী বাড়াইতে মন দাও না কেন ? তুমি তো মস্ত ধনী, তোমার অপেক্ষা একজন কবি ধনী কেন ? তোমার জগতের অপেক্ষা তাঁহার জগৎ বৃহৎ। অত বড়ো জমি কাহার আছে ? তিনি যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তোমার জগতের মানচিত্রে উত্তরে আফিসের দেয়াল, দক্ষিণে আফিসের দেয়াল, পূর্বেও তাহাই, পশ্চিমেও তাহাই। কবিদিগের কাছে, জ্ঞানীদিগের কাছে বিষয়কর্ম শেখ। তোমার জগৎ-জমিদারীর সীমা বাড়াইতে আরম্ভ কর। আফিসের দেয়াল অতিক্রম করিয়া দিগন্ত পর্যন্ত লইয়া যাও, দিগন্ত অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্যন্ত বেষ্টন কর, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলে যাও এবং সমস্ত জগৎ অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে সীমা অগ্রসর করিতে থাক। আমি তো দেখিতেছি তোমার যতই জমি বাড়িতেছে ততই জগৎ কমিতেছে। এ যে ভয়ানক লোকসানের লাভ !

অল্প দিন হইল আমার এক বন্ধু গল্প করিতেছিলেন, যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন— জগৎ নিলাম হইতেছে, চন্দ্র সূর্য বিকাইয়া যাইতেছে। বোধ করি যেন এমন নিলাম হইয়া থাকে। ভাবুকগণ বুঝি পূর্বজন্মে চড়া দামে চন্দ্র সূর্য তারা বসন্ত মেঘ বাতাস কিনিয়াছিলেন, আর আমরা একটা স্থূল-উদর স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলবুদ্ধি লইয়া নিজের ভারে এমনি অবনত হইয়া পড়িয়াছি, যে ইহার উপরে এই সাড়ে তিন হস্তের বহির্ভূত আর কিছু চাপাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের বোঝা যতই ভারী বোধ হইতেছে ততই আপনাকে ধনী মনে করিতেছি। ইহা দেখিতেছি না কত লোক জগতের বোঝা অবলীলাক্রমে বহন করিতেছেন।

প্রকৃতি পুরুষ

জগৎসৃষ্টির যে নিয়ম, আমাদের ভাবসৃষ্টিরও সেই নিয়ম। মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখা যায় আমাদের মাথার মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ দুই জনে বাস করেন। এক জন ভাবের বীজ নিক্ষেপ করেন, আর এক জন তাহাই বহন করিয়া, পালন করিয়া, পোষণ করিয়া তাহাকে গঠিত করিয়া তুলেন। এক জন সহসা একটা সুর গাহিয়া উঠেন, আর এক জন সেই সুরটিকে গ্রহণ করিয়া, সেই সুরকে গ্রাম করিয়া, সেই সুরের ঠাটে তাঁহার রাগিণী বাঁধিতে থাকেন। এক জন সহসা একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র নিক্ষেপ করেন, আর এক জন সেই স্ফুলিঙ্গটিকে লইয়া ইন্ধনের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া তাহাকে আগুন করিয়া তোলেন।

এমন অনেক সময় হয়, যখন আমাদের হৃদয়ে একটি ভাবের আদিম অস্ফুট মূর্তি দেখা দেয়, মুহূর্তের মধ্যেই তাহাকে হয়ত বিসর্জন দিয়াছি, তাহাকে হয়ত বিস্মৃত হইয়াছি, আমাদের চেতনার রাজ্য হইতে হয়ত সে একেবারে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে— অবশেষে বহুদিন পরে এক দিন সহসা সেই বিস্মৃতি পরিত্যক্ত অস্ফুট ভাব, পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া, সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া আমাদের চিত্তে বিকশিত হইয়া উঠে। সেই উপেক্ষিত ভাবকে এতদিন আমাদের ভাবরাজ্যের প্রকৃতি যত্নের সহিত বহন করিতেছিলেন, পোষণ করিতেছিলেন, বুকে তুলিয়া লইয়া স্তন দান করিতেছিলেন, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতেও পাই নাই, জানিতেও পারি নাই। তেমনি আবার এমন অনেক সময় হয় যখন আমাদের মনে হয় একটি ভাববিশেষ এই মাত্র বুঝি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইল, আমাদের হৃদয়রাজ্যে এই বুঝি তার প্রথম পদার্পণ, কিন্তু আসলে হয়ত আমরা ভুলিয়া গেছি, কিংবা হয়ত জানিতেও পারি নাই, কখন্ সেই ভাবের প্রথম অদৃশ্য বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপিত হয়— কিছু কাল পরিপুষ্ট হইলে তবে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরা জগৎ হইতে

আরম্ভ করিয়া আমাদের নিজ-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম বৃত্তিটি পর্যন্ত, কোনো পদার্থের আদি মুহূর্ত জানিতে পারি না, আমাদের নিজের ভাবের আরম্ভও আমরা জানিতে পারি না— আমাদের চক্ষে যখন কোনো পদার্থের আরম্ভ প্রতিভাত হইল তাহার পূর্বেও তাহার আরম্ভ হইয়াছিল। এই জন্যই বুঝি আমাদের মর্ত্য-হৃদয়ের স্বভাব আলোচনা করিয়া আমাদের পুরাতন ঋষিগণ সন্দেহ-আকুল হইয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"অথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।"

কে জানে কি হইতে ইহা হইল। এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি, করে নাই। যিনি ইহার অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে আছেন তিনি ইহা জানেন, অথবা জানেন না!

ঋষিদের সন্দেহ হইতেছে যে, যিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও হয়ত জানেন না কোথায় এই সৃষ্টির আরম্ভ। কেননা, ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্তা মানবেরাও জানে না তাহাদের নিজের ভাবের আরম্ভ কোথায়, আদি কারণ কি।

এইরূপে সংসারের কোলাহলের মধ্যে, কাজকর্মের মধ্যে, কত শত ভাব আমরা অদৃশ্য অলক্ষিত ভাবে নিঃশব্দে বহন করিয়া পোষণ করিয়া বেড়াইতেছি, আমরা তাহার অস্তিত্বও জানি না। হয়ত এই মুহূর্তেই আমার হৃদয়ে এমন একটি ভাবের বীজ নিক্ষিপ্ত হইল যাহা অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট হইয়া নদীতীরস্থ দৃঢ়বদ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় নিজের অবস্থানভূমিকে প্রখর কালস্রোতের হস্ত হইতে বহু সহস্র বৎসর রক্ষা করিবে, যাহা তাহার ঘনপল্লব শাখার অমরচ্ছায়ায় আমার নামকে বহু সহস্র বৎসর জীবিত করিয়া রাখিবে, অথচ আমি তাহার জন্মদিন লিখিয়া রাখিলাম না, তাহার জন্মমুহূর্ত জানিতেও পারিলাম না, তাহার জন্মকালে শঙ্খও বাজিল না, হুলুধ্বনিও উঠিল না আমরা যখন আহার করি তখন আমরা জানিতে পারি না, আমাদের সেই খাদ্যগুলি জীর্ণ হইয়া রক্তরূপে কত শত শিরা উপশিরায় প্রধাবিত হইতেছে। তেমনি একজন ভাবুক যখন তাঁহার শত শত ভাব মস্তকে বহন করিয়া বিহঙ্গকূজিত ফুল্লপুষ্প শ্যামশ্রী বনের মধ্যে সূর্যালোকে বিচরণ করিতেছেন ও স্বভাবের শোভা উপভোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাবরাজ্যের প্রকৃতিমাতা সেই সূর্যালোকে সেই বনের শোভাকে রক্তরূপে পরিণত করিয়া অলক্ষিতভাবে তাঁহার শত সহস্র ভাবের শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত করাইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন না। যখন আমি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখি তখন আমি ভাবি যে, হয়ত ইনি এই মুহূর্তে ভবিষ্যৎ শতাব্দীকে মস্তকে পোষণ করিয়া বেড়াইতেছেন অথচ তিনি নিজেও তাহা জানেন না।

জগৎ-পীড়া

জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অস্বাস্থ্যকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগৎও তাহাই। জগৎও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য স্বাস্থ্যের উদ্যম। অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ। সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝাযুঝি। জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রযত্ন। অভিব্যক্তিবাদ (Evolution Theory) আর কি বলে? জগতের নিকৃষ্টতম প্রাণ ক্রমশ মানুষে আসিয়া পরিণত হয়। জগতের নিকৃষ্টতম প্রাণীর মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রাণীতে-পরিণত-হইবার চেষ্টা কার্য করিতেছে। অভিব্যক্তিবাদকে প্রাণীজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? অভিব্যক্তিবাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? না, কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই। তাহা যদি হয় তাহা হইলে মানিতে হয় যে, আমরা যাহাকে প্রাণ বলি তাহারও হঠাৎ আরম্ভ নাই। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহা হইতেই সে অভিব্যক্তি হইয়াছে। এ

কথা যদি না মান তবে "ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী হউক অমনি পৃথিবী হইল" এ কথা মানিতেও আপত্তি করা উচিত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক জড় পরমাণু প্রাণ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম প্রাণ পূর্ণতর জীব হইতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক পূর্ণতর জীব (যেমন মনুষ্য) অপূর্ণতার হাত এড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বিশাল জগতের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অভিব্যক্তির চেষ্টা অনবরত কার্য করিতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রোগের অর্থ অস্বাস্থ্য, কিন্তু সেই অস্বাস্থ্যের মধ্যে স্বাস্থ্যের ভাব কার্য করিতেছে। জগতের প্রত্যেক পরমাণু পীড়া, কিন্তু সেই প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সঞ্চারিত হইতেছে। এই নিয়ম বর্তমান না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব এই জগতের যে চেতনা তাহা পীড়ার চেতনা। আমাদের যে অঙ্গে পীড়া হয় সেই অঙ্গ যেমন একটি বিশেষ চেতনা অনুভব করে, তেমনি জগতের যে চেতনা তাহা পীড়ার চেতনা। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেক পরমাণু অনবরত অভাববোধ অনুভব করিতেছে। আমরা যে পীড়ার বেদনা অনুভব করি তাহা আসলে খারাপ নহে, তাহার অর্থই এই, যে, এখনো আমাদের স্বাস্থ্য আছে, এখনো সে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে নাই। সেইরূপ সমস্ত জগতের যে একটি বেদনা বোধ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক পরমাণুতে যে অভাব অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থই এই যে, অভিব্যক্ত হইবার ক্ষমতা তাহার সর্ব শরীরে কাজ করিতেছে। সুস্থ হইবার শক্তি জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনাকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগই পীড়ার জীবন। সেই আত্মহত্যাপরায়ণতাই পীড়া। জগৎও সেইরূপ। জগৎ, জগৎ হইতে চায় না। তাহার উন্নতির শেষ সীমা আত্মহত্যা। তাহার চেষ্টারও শেষ লক্ষ্য তাহাই। জগৎ সম্পূর্ণ হইতে চায়, আর এক কথায় জগৎ আরোগ্য হইতে চায়— অর্থাৎ জগৎ, জগৎ হইয়া থাকিতে চায় না। এই নিমিত্ত সমস্ত জগতের মধ্যে এবং জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সমস্ত জগৎ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় এবং জগতের একটি পরমাণুও নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। এই অসন্তোষই বিশাল জগতের প্রাণ। বিজ্ঞানশাস্ত্র কাহাকে বলে? না, যে শাস্ত্র জগৎরূপ একটি মহাপীড়ার সমস্ত লক্ষণ সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্যদেহের একটি পীড়ার সমস্ত তথ্য জানিতে পারি না, আমরা জগৎ-পীড়ার সমস্ত লক্ষণ জানিতে চাই! আমাদের কি আশা! আমাদের নিজদেহের একটি পীড়াকে আমরা যদি সর্বতোভাবে জানিতে পারি তাহা হইলে আমরা সমস্ত জগৎপীড়ার নিয়ম অবগত হইতে পারি। কারণ এই নিয়ম সমস্ত জগৎ-সমষ্টিতে ও জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে কার্য করিতেছে! এই নিমিত্তই কবি টেনিসন্ কহিয়াছেন--

> "Flower in the crannied wall
> I pluck you out of the crannies ,—
> Hold you here, root and all, in my hand
> Little flower— but if I could understand,
> What you are, root and all, and all in all,
> I should know what God and man is."

ইহার অর্থ এই যে, জগৎকে জানাও যা একটি তৃণকে জানাও তাই, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জগৎ।

সমাপন

লিখিলে লেখা শেষ হয় না। পুঁথি যে ক্রমেই বাড়িতে চলিল। আর, সকল কথা লিখিলেই বা পড়িবে কে ? কাজেই এইখানেই লেখা সাঙ্গ করিলাম।

আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে বসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন। পাছে কেহ ইহাদের সত্য-অসত্য আবশ্যক-অনাবশ্যক উপকার-অপকার লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন। কারণ, এ বইখানি সে ভাবে লেখাই হয় নাই।

ইহা, একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সকলগুলি কি আমি মানি, না, বিশ্বাস করি ? সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এইমাত্র। তাহারা সকলগুলিই সত্য, অর্থাৎ ইতিহাসের হিসাবে সত্য, যুক্তিতে মেলে কি না মেলে সে কথা আমি জানি না ! যুক্তির সহিত না মিলিলে যে একেবারে কোনো কথাই বলিব না এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে কি জানি পাছে এমন অনেক কথা না বলা হয় যেগুলি আসলে সত্য ! কি জানি এমন হয়ত সূক্ষ্ম যুক্তি থাকিতে পারে, এমন অলিখিত তর্কশাস্ত্র থাকিতে পারে, যাহার সহিত আমার কথাগুলি কোনো না কোনো পাঠক মিলাইয়া লইতে পারেন ! আর, যদি নাই পারেন তো সেগুলা চুলায় যাক। তাই বলিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি ?

আর চুলাতেই বা যাইবে কেন ? মিথ্যাকে ব্যবচ্ছদ করিয়া দেখ না, ভ্রমের বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্ব শিক্ষা কর না। জীবিত দেহের নিয়ম জানিবার জন্য অনেক সময় মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়। তেমনি অনেক সময়ে এমন হয় না কি, পবিত্র জীবন্ত সত্যের গায়ে অস্ত্র চালাইতে কোনোমতে মন উঠে না, হৃদয়ের প্রিয় সত্যগুলিকে অসংকোচে কাটাকাটি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতে প্রাণে আঘাত লাগে ও সেই জন্য মৃত ভ্রম মৃত মিথ্যাগুলিকে কাটিয়া কুটিয়া সত্যের জীবন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হয় !

আর, পূর্বেই বলিয়াছি এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতি মুহূর্তে মনের গঠনকার্য চলিতেছে। এই মহা শিল্পশালা এক নিমেষ কালও বন্ধ থাকে না। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের অদৃশ্য অভ্যন্তরে অনবরত কি নির্মাণকার্যই চলিতেছে ! অবিশ্রাম কত কি আসিতেছে যাইতেছে, ভাঙিতেছে গড়িতেছে, বর্ধিত হইতেছে, পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্যশীল পরিবর্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য, সমতা ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ। এই জন্যই মৃত বস্তুকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সহজ। চলন্ত স্বাধীন ক্রীড়াশীল জীবনকে আয়ত্ত করা সহজ নহে, সে কিছু দুরন্ত। জীবন্ত উদ্ভিদে আজ যেখানে অঙ্কুর, কাল সেখানে চারা ; আজ দেখিলাম সবুজ কিশলয়, কাল দেখিলাম সে পীতবর্ণ পাতা হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে ; আজ দেখিলাম কুঁড়ি, কাল দেখিলাম ফুল, পরশু দেখিলাম ফল। আমার লেখাগুলিকেও সেই ভাবে দেখ। এই গ্রন্থে যে মতগুলি সবুজ দেখিতেছ, আজ হয়ত সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ভাবের ফুলটি দেখিতেছ, আজ হয়ত সে ফল হইয়া গিয়াছে, দেখিলে চিনিতে পারিবে না। আমাদের হৃদয়বৃক্ষে প্রত্যহ কত শত পাতা জন্মিতেছে ঝরিতেছে, ফুল ফুটিতেছে শুকাইতেছে— কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের শোভা দেখিবে না ? আজ যাহা আছে আজই তাহা দেখ, কাল থাকিবে না বলিয়া চোখ বুজিব কেন ? আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মতো, ফুলের মতো তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পোষণকার্যের সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়ত কাজে লাগিতে পারে।

আমি যখন লিখি তখন আমি মনে করি যাঁহারা আমাকে ভালোবাসেন তাঁহারাই আমার বই পড়িতেছেন। আমি যেন এককালে শত শত পাঠকের ঘরের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছি। আমি এই বঙ্গদেশের কত স্থানের কত শত পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি।

আমি যাঁহাদের চিনি না তাঁহারা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা আমার পাশে বসিয়া আছেন, আমার মনের ভিতরে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ঘরকন্নার মধ্যে আমি আছি, তাঁহাদের কত শত সুখ দুঃখের মধ্যে আমি জড়িত হইয়া গেছি! ইঁহাদের মধ্যে কেহই কি আমাকে ভালোবাসেন নাই? কোনো জননী কি তাঁহার স্নেহের শিশুকে স্তনদান করিতে করিতে আমার লেখা পড়েন নাই ও সেই সঙ্গে সেই অসীম স্নেহের কিছু ভাগ আমাকে দেন নাই? সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় আমার মমতা, আমার স্নেহ, সহসা কি সান্ত্বনার মতো কাহারও কাহারও প্রাণে গিয়া প্রবেশ করে নাই ও সেই সময়ে কি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে দূর হইতে আমাকে বন্ধু বলিয়া তাঁহারা ডাকেন নাই? কেহ যেন না মনে করেন আমি গর্ব করিতেছি। আমার যাহা বাসনা তাহাই ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। মনে মনে মিলন হয় এমন লোক সচরাচর কই দেখিতে পাই? এই জন্য মনের ভাবগুলিকে যথাসাধ্য সাজাইয়া চারি দিকে পাঠাইয়া দিতেছি যদি কাহারও ভালো লাগে! যাঁহারা আমার যথার্থ বন্ধু, আমার প্রাণের লোক, কেবলমাত্র দৈববশতই যাঁহাদের সহিত আমার কোনো কালে দেখা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত যদি মিলন হয়! সেই সকল পরমাত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া আমার এই প্রাণের ফুলগুলি উৎসর্গ করি।

আমি কল্পনা করিতেছি, পাঠকদের মধ্যে এইরূপ আমার কতকগুলি অপরিচিত বন্ধু আছেন, আমার হৃদয়ের ইতিহাস পড়িতে তাঁহাদের ভালো লাগিতেও পারে। তাঁহারা আমার লেখা লইয়া অকারণ তর্ক-বিতর্ক অনর্থক সমালোচনা করিবেন না, তাঁহারা কেবল আমাকে চিনিবেন ও পড়িবেন। যদি এ কল্পনা মিথ্যা হয় তো হৌক, কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া আমার লেখা প্রকাশ করি। নহিলে কেবলমাত্র শকুনি গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নির্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে নিজের হৃদয়খানা কে ফেলিয়া রাখিতে পারে?

আর, আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি।— এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরো কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুই জনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! এক দিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক-একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল— এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।

সংযোজনী

১৮০৫ শকের ভাদ্র মাসে (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গগুলি ১২৮৮ ও ১২৮৯ সালের 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। কেবল শেষ প্রবন্ধ "সমাপন" নূতন সংযোজন। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় 'ভারতী'র কোনো কোনো অংশ পরিত্যক্ত হয়; সেগুলি নিম্নে নির্দিষ্ট ও সংযোজিত হইল। একেবারে প্রারম্ভে একটু ভূমিকার মতো ছিল।—

স্মরণ হইতেছে, ফরাসীস পণ্ডিত প্যাস্কাল একজনকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবশেষে উপসংহারে লিখিয়াছেন,— "মার্জনা করিবেন, সময় অল্প থাকাতে বড়ো চিঠি লিখিতে হইল, ছোটো চিঠি লিখিবার সময় নাই।" আমাদের হাতে যখন বিশেষ সময় থাকিবে তখন মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিব।

—ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ· ১৯০

"অনধিকার" ও "অধিকার" প্রসঙ্গের পরে "উপভোগ" শীর্ষক একটি প্রসঙ্গ ছিল। তাহা এই—

উপভোগ

মনুষ্যের যতদূর উপভোগ করিবার, অধিকার করিবার ক্ষমতা আছে, স্পর্শেই তাহাব চূড়ান্ত। যাহাকে সে স্পর্শ করিতে পারে তাহাকেই সে সর্বাপেক্ষা আয়ত্ত মনে করে। এই নিমিত্ত ঋষিরা আয়ত্ত পদার্থকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিতেন। এই জন্য মানুষেরা ভোগ্য পদার্থকে প্রাণপণে স্পর্শ করিতে চায়। স্পর্শ করিতে পারাই তাহাদের অভিলাষের উপসংহার। আমাদের হৃদয়ে স্পর্শের ক্ষুধা চির জাগ্রত, এই জন্য যাহা আমরা স্পর্শ করিতে পারি তাহার ক্ষুধা আমাদের শীঘ্র মিটিয়া যায়, যাহা স্পর্শ করিতে পারি না তাহার ক্ষুধা আর শীঘ্র মেটে না। কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার দ্বাদশসংখ্যক দপ্তরে একটি গীতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই গীতের একস্থলে আছে—

"মণি নও মাণিক নও যে হার কর্যে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।"

ইহা মনুষ্যহৃদয়ের কাতর ক্রন্দন। তোমার ঐ রূপ যাহা দেখিতে পাইতেছি, তোমার ঐ হৃদয় যাহা অনুভব করিতে পারিতেছি, উহা যদি মণির মতো মাণিকের মতো হইত, উহা যদি হার করিয়া গলায় পরিতে পারিতাম, বুকের কাছে উহার স্পর্শ অনুভব করিতে পারিতাম, আহা, তাহা হইলে কি হইত! উহার অর্থ এমন নহে যে "বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড় পদার্থ কেন?" আমরা যখন বঁধুকে স্পর্শ করি, তখন তাহার দেহ স্পর্শ করি মাত্র। তাহার দেহের কোমলতা, শীতোষ্ণতা অনুভব করিতে পারি মাত্র, কিন্তু তাহার রূপ স্পর্শ করিতে পারি না তো, তাহার রূপ অনুভব করিতে পারি না তো। রূপ দৃশ্য হইল কেন, রূপ মণি মাণিক্যের মতো স্পৃশ্য হইল না কেন? তাহা হইলে আমি রূপের হার করিতাম, রূপ দিয়া কেশের বেশ করিতাম। যখন কবিরা অশরীরী পদার্থকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমরা এত আনন্দ লাভ করি কেন? কবির কল্পনা-বলে মুহূর্তে আমাদের মনে হয় যেন তাহার শরীর আছে, যেন তাহাকে আমরা স্পর্শ করিতেছি। আমাদের বহুদিনের আকুল তৃষা যেন আজ মিটিল। যখন রাধিকা শ্যামের মুখ বর্ণনা করিয়া কহিল "হাসিখানি তাহে ভায়" তখন হাসিকে "হাসিখানি" কহিল কেন? যেন হাসি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যেন হাসিকে ছুঁইতে পারি, যেন হাসিখানিকে লইয়া গলার হার করিয়া রাখিতে পারি! তাহার প্রাণের বাসনা তাহাই! যদি হাসি

"হাসিখানি" হইত, শ্যাম যখন চলিয়া যাইত, তখন হাসিখানিকে লইয়া বসিয়া থাকিতাম ! আমাদের অপেক্ষা কবিদের একটি সুখ অধিক আছে। আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, কল্পনায় তাঁহারা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেন। উষাকে তাঁহারা বালিকা মনে করেন, সংগীতকে তাঁহারা নির্ঝর মনে করেন, নবমালিকা ফুলকে তাঁহারা যেরূপ স্পর্শ করিতে পারেন জ্যোৎস্নাকে তাঁহারা সেইরূপ স্পর্শ করিতে পারেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা সাহস করিয়া নবমালিকা লতার "বনজ্যোৎস্না" নামকরণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পাইয়াছি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে চাই না, যাহাকে স্পর্শ করিতে পাই না তাহাকে স্পর্শ করিতে চাই ! এ কি বিড়ম্বনা !

—ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ· ২৭-২৮

"ফল ফুল" প্রসঙ্গের পূর্বে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি ছিল—

অদূরদর্শীরা আক্ষেপ করেন আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ দরিদ্র। দূরদর্শীরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ দরিদ্র হইতে শিখিল না। সে দিন আমার বন্ধু ক দুঃখ করিতেছিলেন যে, আমাদের দেশে যথাসংখ্যক উপযুক্ত মাসিক পত্রিকার নিতান্ত অভাব। পণ্ডিত খ কহিলেন, "আহা, আমাদের দেশে এমন দিন কবে আসিবে যেদিন উপযুক্ত মাসিক পত্রিকার যথার্থ অভাব উপস্থিত হইবে !" আসল কথা এই যে, দরিদ্র না হইলে বড়োমানুষ হওয়া যায় না। নীচে না থাকিলে উপরে উঠা যায় না। বড়োমানুষ নই বলিয়া দুঃখ করিবার আগে, দরিদ্র নই বলিয়া দুঃখ কর। যাহার অভাব নাই তাহার 'অভাব মোচন হইল না' বলিয়া বিলাপ করা বৃথা। এখন আমাদের সমাজকে এমন একটা ঔষধ দিতে হইবে যাহা প্রথমে ঔষধরূপে ক্ষুধা জন্মাইয়া পরে পথ্যরূপে সেই ক্ষুধা মোচন করিবে। একেবারেই খাদ্য দেওয়ার ফল নাই। আমাদের দেশে যাহারা খাবারের দোকান খোলে তাহারা ফেল হয় কেন ? আমাদের সমাজে যখনি একখানি মাসিক পত্রের জন্ম হয় তখনি সমাজ রাজপুত পিতার ন্যায় ভূমিষ্ঠশয্যাতেই তাহাকে বিনাশ করে কেন ? যাহার আবশ্যক কেহ বোধ করে না সে টেকিয়া থাকিতে পারে না, অতএব আবশ্যকবোধ জন্মে নাই বলিয়াই দুঃখ, দ্রব্যটি নাই বলিয়া নহে।

—ভারতী, আশ্বিন ১২৮৮, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ· ২৮৪-৮৫

"দ্রুত বুদ্ধি" প্রসঙ্গের নিম্নোদ্ধৃত শেষাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে—

কবিরা এইরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমান। তাঁহারা বুঝেন, কিন্তু এত বিদ্যুৎ-বেগে যুক্তির রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসেন যে, রাস্তা মনে থাকে না, কেবল বুঝেন মাত্র। কাজেই অনেক সমালোচককে রাস্তা বাহির করিবার জন্য জাহাজ পাঠাইতে হয় ! বিষম হাঙ্গামা করিতে হয়। কবি উপস্থিত আছেন, অথচ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতে পারেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া শুনিতেছেন— কেহ বলিতেছে উত্তরে পথ, কেহ বলিতেছে দক্ষিণে পথ। দ্রুতগামী কবি সহসা এমন একটা দূর ভবিষ্যতের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন যে, বর্তমান কাল তাঁহার ভাবভঙ্গি বুঝিতে পারে না। কি করিয়া বুঝিবে ? বর্তমান কালকে এক এক পা করিয়া রাস্তা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেইখানে যাইতে হইবে ; কাজেই সে হঠাৎ মনে করে কবিটা বুঝি পথ হারাইয়া কোনো অজায়গায় গিয়া উপস্থিত হইল। কবিরা মহা দার্শনিক। কেবল দার্শনিকদের ন্যায় তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নির্বোধ হইতে পারেন না। কিয়ৎ-পরিমাণে নির্বোধ না হইলে এ সংসারে বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি হয় না।

—ভারতী, আশ্বিন ১২৮৮, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ· ২৯২

নলিনী

নলিনী।

(নাট্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

নলিনী

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ন

কানন

নীরদ

গান

পিলু—কাওয়ালি

হা কে ব'লে দেবে
সে ভালোবাসে কি মোরে !
কভু-বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু-বা সে লাজে সারা, কভু-বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধ'রে !

নলিনী ও বালিকা ফুলির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত) এ রকম সংশয়ে তো আর থাকা যায় না! এমন ক'রে আর কত দিন কাটবে! এত দিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি— ওগো, একবার হৃদয়ের দুয়ার খোল, আমাকে এক পাশে একটু আশ্রয় দাও— যে লোক এত দিন ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে চেয়ে আছে তাকে কি একটিবার প্রাণের মধ্যে আহ্বান করবে না ? আজকের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব ! যদি একেবারে বলে— না ! আচ্ছা, তাই বলুক— আমার এ সুখ দুঃখের যা হয় একটা শেষ হয়ে যাক্ ! (কাছে গিয়া) নলিনী !—

নলিনী। ফুলি, ফুলি, তুই ওখেনে ব'সে ব'সে কি করচিস, ফুল তুলতে হবে মনে নেই ! আয়, শীগগির ক'রে আয় ! ও কি করেচিস, কুঁড়িগুলো তুলেচিস কেন— আহা ওগুলি কাল কেমন ফুটত ? চল্ ঐদিকে গোলাপ ফুটেচে যাই। আজ এখনো নবীন এল না কেন ?

ফুলি। তিনি এখনি আসবেন।

নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না ? আমি মনে করতুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। নলিনীর কি এতটুকুও হৃদয় নেই যে আমার অতখানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারলে ? নাঃ— হয়ত ফুল তুলতে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতেও পায় নি ! আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। নলিনী !—

নলিনী। ফুলি, কাল এই বেলফুলের গাছগুলোতে মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলেম, আজ তো আর একটিও দেখচি নে! চল দেখি, ঐদিকে যদি ফুল পাই তো তুলে নিয়ে আসি! (অন্তরালে) দেখ ফুলি,

নীরদ আজ কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে আছেন তুই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আয় না ! তুই ওঁর কাছে গিয়ে একটু গান-টান গেয়ে শোনালে উনি ভালো থাকেন। তাই তুই যা, আমি ফুল তুলে নিয়ে যাচ্চি।

ফুলি। কাকা, তোমার কী হয়েছে !

নীরদ। কী আর হবে ফুলি !

ফুলি। তবে তুমি অমন ক'রে আছ কেন কাকা ?

নীরদ। (কোলে টানিয়া লইয়া) কিছুই হয় নি বাছা !

ফুলি। কাকা, তুমি গান শুনবে ?

নীরদ। না রে, এখন গান শুনতে বড়ো ইচ্ছে করচে না !

ফুলি। তবে তুমি ফুল নেবে ?

নীরদ। আমাকে ফুল কে দেবে ফুলি ?

ফুলি। কেন, নলিনী ঐখেনে ফুল তুলচে, ঐদিকে ঢের ফুটেচে— ঐখেনে চল না কেন ? (নলিনীর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া) কাকাকে কতকগুলি ফুল দাও না ভাই, উনি ফুল চাচ্চেন !

নলিনী। তুই কি চোকে দেখতে পাস নে ? দেখ্ দেখি গাছের তলায় কি ক'রে দিলি ? অমন সুন্দর বকুলগুলি সব মাড়িয়ে দিয়েচিস ! হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুলি, আমরা যে সে দিন সেই ঝোপের মধ্যে পাখির বাসায় সেই পাখির ছানাগুলিকে দেখেছিলুম, আজ তাদের চোক ফুটেচে, তারা কেমন পিট্‌পিট্ ক'রে চাচ্চে ! তাদের মা খাবার আনতে গেছে, এই বেলা আয়, আমরা তাদের একটি একটি ক'রে ঘাসের ধান খাওয়াই গে !

ফুলি। কোথায় সে, কোথায় সে, চল না। (উভয়ের দ্রুত গমন)

নলিনী। (কিছু দূর গিয়া ফুলির প্রতি) ঐ যা, তোর কাকাকে ফুল দিয়ে আসতে ভুলে গেচি ! তুই ছুটে যা, এই ফুল দুটি তাঁকে দিয়ে আয় গে। আমার নাম করিস নে যেন !

ফুলি। (নীরদের কাছে আসিয়া) এই নাও কাকা, ফুল এনেছি।

নীরদ। (চুম্বন করিয়া) আমি ভেবেছিলেম আমাকে কেউ ফুল দেবে না। শেষ কালে তোর কাছ থেকে পেলেম !

নলিনী। (দূর হইতে) ফুলি, তুই আবার গেলি কোথায় ? ঝট্ ক'রে আয় না, বেলা ব'য়ে যায়।

ফুলি। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

নীরদ। (স্বগত) এ যেন রূপের ঝড়ের মতো, যেখেন দিয়ে বয়ে যায় সেখেনে তোলপাড় ক'রে দেয়। এতটা আমি ভালোবাসি নে ! আমার প্রাণ শ্রান্ত পাখিটির মতো একটি গাছের ছায়া চায়, প্রচ্ছন্ন সুখের কুলায় চায়। আমি তো এত অধীরতা সইতে পারি নে। একটুখানি বিরাম, একটুখানি শান্তি কোথায় পাব ? (নলিনীর কাছে গিয়া) নলিনী, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে না ?

নতশিরা নলিনীর স্তব্ধভাবে আঁচলের ফুল-গণনা

কখন তুমি আমার সঙ্গে একটি কথা কও নি— আজ তোমাকে বেশী কিছু বলতে হবে না, একবার কেবল আমার নামটি ধ'রে ডাক, তোমার মুখে একবার কেবল আমার নামটি শোনবার সাধ হয়েছে। আমার এইটুকু সাধও কি মিটবে না? না হয় একবার বলো যে, নী! বলো যে, মিটবে না! বলো যে, তোমাকে আমার ভালো লাগে না, তুমি কেন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াও ! আমার এই দুর্বল ক্ষীণ আশাটুকুকে আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখব ? তোমার একটি কঠিন কথায় তাকে একেবারে বধ ক'রে ফেল, আমার যা হবার হোক।

(নলিনীর আঁচল শিথিল হইয়া ফুলগুলি সব পড়িয়া গেল ও নলিনী মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে একে একে কুড়াইতে লাগিল।)

নীরদ। তাও বলবে না ! (নিশ্বাস ফেলিয়া দূরে গমন)

ফুলি। (ছুটিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া) দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মৌচাক দেখতে পেয়েছি !— ও

কি ভাই, তুমি মুখ ঢেকে অমন ক'রে ব'সে আছ কেন? ও কি তুমি কাঁদচ কেন ভাই?

নলিনী। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কই, কাঁদচি কই?

ফুলি। আমি মনে করেছিলুম, তুমি কাঁদচ!

নবীনের প্রবেশ

নলিনী। ঐ যে নবীন এয়েচে, চল্ ওর কাছে যাই! (কাছে আসিয়া) আজ যে তুমি এত দেরি ক'রে এলে?

নবীন। (হাসিয়া) একটুখানি তিরস্কার পাবার ইচ্ছা হয়েছিল। আমি দেরি ক'রে এলে তোমারও যে দেরি মনে হয় এটা মাঝে মাঝে শুনতে ভালো লাগে

নলিনী। বটে! তিরস্কারের সুখটা একবার দেখিয়ে দেব। দে তো ফুলি, ওর গায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দে তো।

নবীন। ও যন্ত্রণাটা ভাই এক রকম সওয়া আছে। ওতে আর বেশী কি হ'ল? ওটা তো আমার দৈনিক পাওনা! যতগুলি কাঁটা এইখেনে ফুটিয়েছ, সবগুলি যত্ন ক'রে প্রাণের ভিতর বিঁধিয়ে রেখেচি— তার একটিও ওপ্‌ড়ায় নি, আর যায়গা কোথায়?

নলিনী। ও বড্ড কথা কচ্চে ফুলি— দে তো ওকে সেই গানটা শুনিয়ে।

ফুলির গান

পিলু

ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি!
হাসি খেলি রে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধারমুখে
দিন রজনী!

নবীন। আমারও ভাই একটা গান আছে, কিন্তু গলা নেই। কি দুঃখ! প্রাণের মধ্যে গান আকুল হয়ে উঠেচে, কেবল গলা নেই ব'লে কেউ একদণ্ড মন দিয়ে শুনবে না! কিন্তু গলাটাই কি সব হ'ল! গানটা কি কিছুই নয়? গানটা শুনতেই হবে।

কালাংড়া

ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে
কেন সে দেখা দিল!
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে—
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল!

নলিনী। আর ভালো লাগচে না। (স্বগত) মিছিমিছি কথা কাটাকাটি ক'রে আর পারি নে। একটু একলা হ'লে বাঁচি। (ফুলির প্রতি) আয় ফুলি, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি গে।

[প্রস্থান

নীরদ। এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অমনতর চপলতা কি কিছুমাত্র শোভা পায়! সন্ধ্যার এমন শান্তিময় স্তব্ধতার সঙ্গে ঐ গান বাজনা হাসি তামাসা কি কিছুমাত্র মিশ খায়? একটু হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চপলতা প্রকাশ করতে পারত? আমোদ প্রমোদের কি একটুও বিরাম নেই?

দিনের আলো যখন নিবে এসেচে, পাখিগুলি তাদের নীড়ে তাদের একমাত্র সঙ্গিনীদের কাছে ফিরে এসেছে, দূরে কুঁড়েঘরগুলিতে সন্ধের প্রদীপ জ্বলেচে— তখন কি ঐ চপলার এক মুহূর্তের তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্যে প্রাণ কাঁদে না ? এক মুহূর্তের জন্যও কি ইচ্ছে যায় না— এই কোলাহলশূন্য জগতের মধ্যে আর একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দুজনের পানে চেয়ে থাকি। গভীর শান্তিপূর্ণ সেই সন্ধ্যা-আকাশে দুটিমাত্র স্তব্ধ হৃদয় স্তব্ধ আনন্দে বিরাজ করি। দুটি সন্ধ্যাতারার মতো আলোয় আলোয় কথা হয় ! হায় এ কি কল্পনা ! এ কি দুরাশা !

নবীনের প্রবেশ

নবীন। এ কি ভাই, তুমি যে একলা এখানে ব'সে আছ ? আমাদের সঙ্গে যে যোগ দাও নি ?

নীরদ। এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মূর্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই ব'সে ভাবছিলুম। সন্ধের কি একটা পবিত্রতা নেই ? ঐ সময়ে হৃদয়হীন চটুলতা দেখলে কি তার সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছে করে ?

নবীন। তোমরা কবি মানুষ, তোমাদের কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। আমার তো খুব ভালো লাগছিল। আর তোমাদের কবিত্বের চোখেই বা ভালো লাগবে না কেন তাও আমি ঠিক বুঝতে পারি নে! সরলা বালিকা, মনে কোনো চিন্তা নেই, প্রাণের স্ফূর্তিতে সন্ধ্যার কোলে খেলিয়ে বেড়াচ্চে এই বা দেখতে খারাপ লাগবে কেন?

নীরদ। তা ঠিক বলেচ ! (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু যার কোনো চিন্তা নেই, সে মন কি মন ? যে হৃদয় আর কোনো হৃদয়ের জন্যে ভাবে না, আপনাকে নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট আছে, তাকে কি স্বার্থপর বলব না !

নবীন। তুমি নিজে স্বার্থপর ব'লেই তাকে স্বার্থপর বলচ ! যে হৃদয় তোমার হৃদয়ের জন্যে ভাবে না তার আনন্দ তার হাসি তোমার ভালো লাগে না, এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কি আছে ! আমি তো, ভাই, সে ধাতের লোক নই। সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে যায় ? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ করব না কেন ? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে !

নীরদ। স্বার্থপরতা ? ঠিক কথাই বটে। এত দিনে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পারলুম। ঐ সরলা বালা আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে তাতে আমার মনে মনে তিরস্কার করবার কি অধিকার আছে। আমি কোথাকার কে ! আমি অনবরত তাকে অপরাধী করি কেন !

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। আমাকে মার্জনা কর।

নবীন। (তাড়াতাড়ি) আবার ও সব কথা কেন? বড়ো বড়ো হৃদয়ের কথা ব'লে বালিকার সরল মনকে ভারগ্রস্ত করবার দরকার কি ? (হাসিয়া নলিনীর প্রতি) নলিনী, আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই !

নলিনী। বাগানে তো অনেক ফুল ফুটেচে, যত খুশি তুলে নাও না ?

নবীন। ফুলগুলিকে আগে তোমার হাসি দিয়ে হাসিয়ে দাও, তোমার স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে দাও ! ফুলের মধ্যে আগে তোমার রূপের ছায়া পড়ুক, তোমার স্মৃতি জড়িয়ে যাক— তার পরে তাকে ঘরে নিয়ে যাব।

নলিনী। (হাসিয়া) বড্ড তোমার মুখ ফুটেচে দেখচি ! দিনে দুপুরে কবিতা বলতে আরম্ভ করেচ !

নবীন। আমি কি সাধে বলচি ! তুমি যে জোর ক'রে আমাকে কবিতা বলাচ্চ। তোমার ঐ দৃষ্টির পরেশ-পাথরে আমার ভাবগুলি একেবারে সোনাবাঁধানো হয়ে বেরিয়ে আসচে।

নলিনী। তুমি ও কি হেঁয়ালি বলচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে।

নীরদ। আমি তো নবীনের মতো এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে ! আর মিছিমিছি এ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রে যে কি সুখ আমি কিছুই তো বুঝতে পারি নে ! কিন্তু আমার সুখ হয় না ব'লে কি আর কারও সুখ হবে না ? আমি কি কেবল একলা ব'সে ব'সে পরের সুখ দেখে তাদের তিরস্কার করতে থাকব, এই আমার কাজ হয়েচে ? যে যাতে সুখী হয় হোক না, আমার তাতে কি ? আমার যদি তাতে সুখ না হয়, আমি অন্যত্র চ'লে যাই।

নবীন। (নলিনীর প্রতি) দেখতে দেখতে তোমার হাসিটি মিলিয়ে এল কেন ভাই ? কি যেন একটা কালো জিনিষ প্রাণের ভিতর নুকিয়ে রেখেচ, সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেচ, কিন্তু হাসি যে আর থাকে না ! আমি তো বলি প্রকাশ করা ভালো ! (কোন উত্তর না পাইয়া) তুমি বিরক্ত হয়েচ ! না ? মনের ভিতর একজন লোক হঠাৎ উঁকি মারতে এল বড়ো ভালো লাগে না বটে! কিন্তু একটু বিরক্ত হ'লে তোমাকে বড়ো সুন্দর দেখায়! সেই জন্যে তোমাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে!

নলিনী। (হাসিয়া) বটে ! তোমার যে বড্ড জাঁক হয়েচে দেখচি ! তুমি কি মনে কর তুমিও আমাকে বিরক্ত করতে, কষ্ট দিতে পার ! সেও অনেক ভাগ্যের কথা ! কিন্তু সে ক্ষমতাটুকুও তোমার নেই।

নবীন। (সহাস্যে) আমার ভুল হয়েছিল।

নীরদ। নবীনের সঙ্গেই নলিনীর ঠিক মিলেচে ! এ আমার জন্যে হয় নি ! আমি এদের কিছুই বুঝতে পারি নে ! এদের হাসি এদের কথা আমার প্রাণের সঙ্গে কিছুই মেলে না ! তবে কেন আমি এদের মধ্যে একজন বেগানা লোকের মতো ব'সে থাকি ! আমি পর, আমার এখেনে কোনো অধিকার নেই ! এদের অন্তঃপুরের মধ্যে আমি কেন ? আমার এখান থেকে যাওয়াই ভালো ! আমি চ'লে গেলে কি এদের একটুও কষ্ট হবে না ? একবারও কি মনে করবে না, আহা, সে কোথায় গেল ? না— না— আমি গেলে হয়ত এরা আরাম বোধ করবে ! এখানে আর থাকব না। আজই বিদেশে যাব ! এত দিনের পরে আমি ঠিক বুঝতে পেরেচি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।

ফুলি। (আসিয়া) (নলিনীর প্রতি) মা তোমাদের ডাকতে পাঠালেন।

নলিনী। তবে যাই।

[প্রস্থান

নবীন। আমিও তবে বিদায় হই।

[প্রস্থান

নীরদ। (ফুলিকে ধরিয়া) আয় ফুলি, একবার আমার কোলে আয় ! আমার বুকে আয় !

ফুলি। ও কি কাকা, তোমার চোখে জল কেন ?

নীরদ। ও থাক্। জল একটু পড়ুক। (কিছুক্ষণ পরে) অন্ধকার হয়ে এল, এখন তবে বাড়ি যা।

ফুলি। তুমি বাড়ি যাবে না কাকা ?

নীরদ। না বাছা !

ফুলি। তুমি তবে কোথায় যাবে ?

নীরদ। আমি আর এক জায়গায় চল্লেম। নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা !

[প্রস্থান

নলিনী। (আসিয়া) তোর কাকা তোকে কি বলছিলেন ফুলি ?

ফুলি। কিছুই না !

নলিনী। আমার কথা কি কিছু বলছিলেন ?

ফুলি। না।

নলিনী। আয় বাড়ি আয়।

ফুলি। কিন্তু কাকা কাঁদছিলেন কেন ?

নলিনী। কি, তিনি কাঁদছিলেন ?
ফুলি। হাঁ।
নলিনী। কেন কাঁদছিলেন ফুলি ?
ফুলি। আমি তো জানি নে !
নলিনী। তোকে কিছুই বলেন নি ?
ফুলি। না।
নলিনী। কিছুই বলেন নি ?
ফুলি। না।
নলিনী। তবে সেই গানটা গা !

বেহাগড়া— কাওয়ালি

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা !
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে মরি যে তাহে—
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা !
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল—
ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা !

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

নবীন। নীরদ বিদেশে যাবার পর থেকে নলিনীর এ কি হ'ল ? সে উল্লাস নেই, সে হাসি নেই। বাগানে তার আর দেখা পাই নে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই একলা ব'সে থাকে। নলিনী নীরদকেই বাস্তবিক ভালোবাসত ! এইটে আর আগে বুঝতে পারি নি ! এমনি অন্ধ হয়েছিলেম। নীরদের সমুখে সে যেন নিজের প্রেমের ভারে নিজে ঢাকা পড়ে যেত ! তাকে ঠিক দেখা যেত না। নীরদের সমুখে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ত যে আমাদের কাছে পেলে সে যেন আশ্রয় পেত, সে যেন আমাদের পাশে আপনাকে আড়াল ক'রে তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা করত। নীরদের পূর্ণদৃষ্টির সূর্যালোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায় এই ভয়ে সে নীরদের সমুখে অস্থির হয়ে পড়ত ; কি ভুলই করেছি! যাই, তাকে একবার খুঁজে আসি গে! আজ তার সে করুণ মুখখানি দেখলে বড়ো মায়া করে। তার মুখের সেই সরল হাসিখানি যেন নিরাশ্রয় হয়ে আমার চোখের সমুখে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে ! আবার কবে সে হাসবে !

[প্রস্থান

নলিনীর গৃহে প্রবেশ ও জানালার কাছে উপবেশন

নলিনী। (স্বগত) আমাকে একবার ব'লেও গেলেন না ? আমি তাঁর কি করেছিলেম ? আমাকে যদি তিনি ভালোবাসতেন তবে কি একবার ব'লে যেতেন না ?

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। বাগানে বেড়াতে যাবে না?

নলিনী। আজকের থাক্ ফুলি, আর এক দিন যাব।

ফুলি। তোর কী হয়েচে দিদি, তুই অমন ক'রে থাকিস কেন?

নলিনী। কিছু হয় নি বোন, আমার এই রকমই স্বভাব।

ফুলি। আগে তো তুই অমন ছিলি নে!

নলিনী। কি জানি আমার কি বদল হয়েছে!

ফুলি। আচ্ছা দিদি, কাকাকে আর দেখতে পাই নে কেন? কাকা কোথায় চ'লে গেছেন?

নলিনী। (ফুলিকে কোলে লইয়া, কাঁদিয়া উঠিয়া) তুই বল্ না তিনি কোথায় গেছেন! যাবার সময় তিনি তো কেবল তোকে তো ব'লে গেছেন! আমাদের কাউকে কিছু ব'লে যান নি!

ফুলি। (অবাক্ হইয়া) কই, আমাকে তো কিছু বলেন নি!

নলিনী। তোকে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। না ফুলি? আমাদের সকলের চেয়ে তোকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন!

ফুলি। তুমি কাঁদচ কেন দিদি? কাকা হয়ত শীগগির ফিরে আসবেন।

নলিনী। শীগগির কি আসবেন? তুই কি ক'রে জানলি?

ফুলি। কেনই বা আসবেন না?

নলিনী। ফুলি, তুই আমার জন্য এক ছড়া মালা গেঁথে নিয়ে আয়গে! আমি একটু একলা ব'সে থাকি।

ফুলি। আচ্ছা।

[প্রস্থান

নবীনের প্রবেশ

নবীন। নলিনী, তুমি কি সমস্ত দিন এই রকম জানালার কাছে ব'সে ব'সেই কাটাবে?

নলিনী। আমার আর কাজ কি আছে? এইখানটিতে ব'সে থাকতে আমার ভালো লাগে।

নবীন। আগেকার মতো আজ একবার বাগানে বেড়াই গে চল না।

নলিনী। না, বাগানে আর বেড়াব না!

নবীন। নলিনী, কি করলে তোমার মন ভালো থাকে আমাকে বলো। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

নলিনী। এইখেনে আমি একটুখানি একলা ব'সে থাকতে চাই। তা হ'লেই আমি ভালো থাকব।

নবীন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

এক প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্র। তোর কি হ'ল বল্ দেখি বোন্‌ঝি, আর যে বড়ো আমাদের ও দিকে যাস নে।

নলিনী। কি বলব মাসী, শরীরটা বড়ো ভালো নেই।

প্র। আহা, তাই তো লো, তোর মুখখানি বড়ো শুকিয়ে গেছে! চোখের গোড়ায় কালী পড়ে গেছে! মুখে হাসিটি নেই! তা, এমন ক'রে ব'সে আছিস কেন লো! আমার সঙ্গে আয়, দুজনে একবার পাড়ায় বেড়িয়ে আসি গে।

নলিনী। আজকের থাক্ মাসী!

প্র। কেনে লা! আমার দিদির বাড়ি নতুন বৌ এসেচে, তাকে একবার দেখবি চ।

নলিনী। আর এক দিন দেখব এখন মাসী, আজকের থাক্। আজ আমি বড়ো ভালো নেই।

প্র। আহা, থাক্ তবে। যে শরীর হয়ে গেছে, বাতাসের ভর সয় কি না সয়! আজ তবে আসি মা, ঘরকন্নার কাজ পড়ে রয়েচে।

[প্রস্থান

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। মা বলেচেন, সারাদিন তুমি ঘরে ব'সে আছ, আজ একটিবার আমাদের বাড়িতে চল।

নলিনী। না বোন, আজকের আমি পারব না!

ফুলি। তবে তুমি বাগানে চল। একলা মালা গাঁথতে আমার ভালো লাগচে না। একবারটি চল না বাগানে!

নলিনী। তোর পায়ে পড়ি ফুলি, আমাকে আর বাগানে যেতে বলিস নে, আমাকে একটু একলা থাকতে দে!

ফুলি। আমাদের সেই মাধবীলতাটি শুকিয়ে এসেচে, তাতে একটু জল দিবি নে?

নলিনী। না।

ফুলি। আমাদের সেই পোষ-মানা পাখির ছানাটি আজকের একটু একটু উড়ে বেড়াচ্চে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করচে না?

নলিনী। না ফুলি!

ফুলি। তবে আমি যাই, মালা গাঁথি গে, কিন্তু তোকে মালা দেব না!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিদেশ

নীরদ নীরজা

উদ্যান

নীরদ। (স্বগত) এত দিন এলুম, মনে করেছিলুম একখানা চিঠিও পাওয়া যাবে। "কেমন আছ" একবার জিগেস করতেও কি নেই? স্ত্রীলোকের কঠোর হৃদয় কি ভয়ানক দৃশ্য!

নীরজা। (কাজে আসিয়া) এমন ক'রে চুপ ক'রে আছ কেন নীরদ?

নীরদ। আহা, কি সুধাময় স্বর! কে বলে স্ত্রীলোকের প্রাণ কঠিন? মমতাময়ি, এত সুধা তোমাদের প্রাণে কোথায় থাকে? আমি কি চুপ ক'রে আছি! আর থাকব না। বলো কি করতে হবে। এসো, আমরা দুজনে মিলে গান গাই।

নীরজা। না নীরদ, আমার জন্যে তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমাকে বিমর্ষ দেখলে আমার কষ্ট হয় ব'লে যে তুমি প্রফুল্লতার ভান করবে সে আমার পক্ষে দ্বিগুণ কষ্টকর! একবার তোমার দুঃখে আমাকে দুঃখ করতে দাও, মিছে হাসির চেয়ে সে ভালো।

নীরদ। ঠিক বলেছ নীরজা! দিনরাত্রি কি প্রমোদের চপলতা ভালো লাগে? এমন সময় কি আসে না যখন স্তব্ধ হয়ে ব'সে দুটিতে মিলে সন্ধেবেলায় নিরিবিলি দুজনের দুঃখে দুঃখে কোলাকুলি হয়? দুজনের বিষণ্ণ মুখে দুজনে চেয়ে থাকে? দুজনের চোখের জলের মিলন হয়ে হৃদয়ের পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হয়? এই লও নীরজা, আমার এই বিষণ্ণ প্রাণ তোমার হাতে দিলেম, একে তোমার ওই অতি কোমল মমতার মধ্যে ঢেকে রাখ, দাও এর চোখের জল মুছিয়ে দাও। তুমি মমতা ক'রেই ভালো থাক, তুমি স্নেহ দিতেই ভালোবাস— দাও, আরো স্নেহ দাও, আরো মমতা কর। আমি চুপ ক'রে তোমার ঐ মধুর করুণা উপভোগ করি।

নীরজা। আমাকে অমন ক'রে তুমি ব'লো না— তোমার কথা শুনে আমার চোখে আরো জল আসে! আমি তোমার কি করতে পারি? আমি কি করলে তোমার একটুও শান্তি হয়? আমার কাছে অমন ক'রে চেয়ো না! আমার কি আছে, কি দেব, কিছু যেন ভেবে পাই নে।

এইখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক। তুমি এক দিকে যাও, আমি এক দিকে যাই। আমাদের সমুখে সংশয়ের সমুদ্র, কি হ'তে পারে কে জানে! আমরা দুজনে মিলে এই সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত এসেছি, আর এক পা এগিয়ে কাজ নেই। এইখানেই এসো আমরা ফিরে যাই, যে যার দেশে চ'লে যাই। দুদিনের জন্যে দেখা হয়েছে, তোমাকে আমি ভালোবেসেছি— কিন্তু তাই ব'লে এই আঁধার সমুদ্রে আমার ভারে তোমাকে ডোবাই কেন?

নীরদ। এ কি অশুভ কথা নীরজা? এ কি অমঙ্গল! কেঁদ না নীরজা! তোমার এ অশ্রুজল আজকের শোভা পায় না নীরজা!

নীরজা। কে জানে ভাই! আমার মনে আজ কেন এমন আশঙ্কা হচ্ছে? আমার প্রাণের ভিতর থেকে যেন কেঁদে উঠছে! আমাকে মাপ কর। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্যে কিছুই ভাবছি নে। আমার মনে হচ্ছে এ বিবাহে তুমি সুখী হ'তে পারবে না।

নীরদ। নীরজা, তবে তুমি আজ আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি ছাড়া আর কোথাও আমার আশ্রয় নেই— কেউ আমাকে মমতা করে না, কেউ আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে একটুখানি স্থান দেয় না— কেউ আমার মনের ব্যথা শোনে না, আমার প্রাণের কথা বোঝে না, তুমিও আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে? তা হ'লে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

নীরজা। না না— আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি? যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী রইলেম— ডুবি তো দুজনে মিলে ডুবব। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভালোবাসতে না পার, তোমার সঙ্গে আমার যদি বিচ্ছেদ হয় তো—

নীরদ। ও কি কথা নীরজা? ও কথা মনেও আনতে নেই! দুঃখ এসে যাদের মিলন ক'রে দেয়, চোখের জলের মুক্ত'র মালা যারা বদল করেছে, তাদের সে মিলন পবিত্র— জন্মে জন্মে তাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি, আমাদের ভয় কিসের?

নীরজা। নীরদ, দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ ক'রে দেখি, ভালো ক'রে ধ'রে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়!

নীরদ। এই নাও আমার হাত। আজ থেকে তবে আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না? আজ থেকে তবে সুদীর্ঘ জীবনের পথে আমরা দুজনে মিলে যাত্রা করলেম?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের সঙ্গিনী হ'লে, অশ্রুজলের সাথী হ'লে?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আমার বিষাদের গোধূলির মধ্যে তুমি সন্ধের তারাটির মতো ফুটে থাকবে। তোমাকে আমি কখনো হারাব না— চোখে চোখে রেখে দেব!

চতুর্থ দৃশ্য

দেশ

নীরদ নীরজা

নীরদ। এই তো আবার সেই দেশে ফিরে এলুম। মনে করি নি আর কখনো ফিরব। তোমাকে যদি না পেতুম তবে আর দেশে ফিরতুম না।

নীরজা। এমন সুন্দর দেশ আমি কোথাও দেখি নি। এ যেন আমার সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এত পাখি, এত শোভা আর কোথায় আছে।

নীরদ। (স্বগত) এই মমতার কিছু অংশও যদি তার থাকত ! এত কাল যে আমি ছায়ার মতো তার কাছে কাছে ছিলুম, আমাকে ভালো নাই বাসুক, একটুকু মায়াও কি আমার উপর জড়ায় নি, যে একখানি চিঠি লিখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন আছ ? আজও সে তার বাগানে তেমনি ক'রে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে ? আমি চ'লে এসেচি ব'লে তার জগতের একটি তিলও শূন্য হয় নি ? কেনই বা হবে? নিষ্ঠুর মমতাহীন জড়প্রকৃতির এই রকমই তো নিয়ম! আমি চ'লে এসেচি ব'লে কি তার বাগানে একটি বেল ফুলও কম ফুটবে ? একটি পাখিও কম ক'রে গাবে ? কিন্তু তাই ব'লে কি রমণীর প্রাণও সেই রকম ?

নীরজা। নীরদ, তোমার মনের দুঃখ আমার কাছে প্রকাশ ক'রে কি তোমার একটুও শান্তি হয় না। আমাকে কি তুমি ততটুকুও ভালোবাস না ? তবে আজ কেন তুমি আমাকে কিছু বলছ না ? কেন আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি ব'সে আছ ?

নীরদ। নীরজা, তুমি কি মনে করচ, আমি নলিনীকে ভালোবেসে কষ্ট পাচ্ছি ? তা মনেও ক'রো না। তাকে আমি ভালোবাসব কি ক'রে ? তাতে আমাতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

নীরজা। কিন্তু, কেনই বা তাকে না ভালোবাসবে ? হয়ত সে ভালোবাসবার যোগ্য।

নীরদ। না নীরজা, আমি তাকে ভালোবাসি নে। আমি তোমাকে বার বার ক'রে বলছি, আমি তাকে ভালোবাসি নে। এক কালে ভালোবাসি ব'লে ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু সে ভ্রম একেবারে গিয়েছে। কেনই বা আমি তাকে ভালোবাসব ? সে কি আমাকে মমতা করতে পারে ? সে কি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারে ? তার কি হৃদয় আছে ? সে কেবল হাসতেই জানে, সে কি পরের জন্যে কখনো কেঁদেছে ?

নীরজা। কিন্তু সত্যি কথা বলি নীরদ, তোমরা পুরুষ মানুষেরা আমাদের ঠিক বুঝতে পার না। তুমি হয়ত জান না তার প্রাণের মধ্যে কি আছে ! হয়ত সে তোমাকে ভালোবাসে।

নীরদ। তা হবে ! হয়ত তার প্রাণের কথা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু এ প্রতারণায় তার আবশ্যক কি ছিল ? যখন তার মুখে কেবলমাত্র একটি কথা শোনবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণের আশা একেবারে উন্মুখ হয়েছিল, তখন সে কেন মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কের মতো ফুল কুড়োতে লাগল ? আমার কথার কি একটি উত্তরও সে দিতে পারত না ?

নীরজা। কেমন ক'রে দেবে বলো? ক্ষুদ্র বালিকা সে, সে কি ভাষা জানে যে তার প্রাণের সব কথা বলতে পারে ? সে হয়ত ভাবলে, আমার মনের কথা আমি কিছুই ভালো ক'রে বলতে পারব না, সেই জন্যেই তুমি যদি আমার কথা ঠিক না বুঝতে পার, যদি দৈবাৎ আমার একটি কথাও অবিশ্বাস কর, তা হ'লে সে কি যন্ত্রণা ! কি লজ্জা !

নীরদ। কিন্তু আমি কি তার ভাবেও কিছু বুঝতে পারতুম না !

নীরজা। তোমরা পুরুষরা যখন একবার নিজের হৃদয়ের কথা ভাব, তখন পরের হৃদয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখতেও পার না। নিজের সুখ দুঃখের সঙ্গে যতটুকু যোগ সেইটুকুই দেখতে পাও, তার সুখ দুঃখ চোখে পড়েও না। সে যে কি ভাবে কথা কয় না, সে যে কি দুঃখে চ'লে যায়, তা তোমরা দেখ না— তোমরা কেবল ভাব আমার সঙ্গে কথা কইলে না, আমার কাছ থেকে চ'লে গেল।

নীরদ। তা হবে ! আমরা স্বার্থপর, সেই জন্যেই আমরা অন্ধ। কিন্তু ও কথা আর কেন ? ও-সব কথা আমি মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর তো আমি তাকে ভালোবাসি নে ; ভালোবাসতে পারিও না ! তবে ও কথা থাক্‌। আর একটা কথা বলা যাক। দেখ নীরজা, যদিও আমাদের বিবাহের দিন কাছে এসেছে, তবু মনে হচ্ছে যেন এখনো কত দিন বাকি আছে ! সময় যেন আর কাটছে না !

নীরজা। (নীরদের হাত ধরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া) নীরদ, আমার চোখে জল আসছে, কিছু মনে ক'রো না। বিবাহের দিন তো কাছে আসছে, এই সময় একবার মনে ক'রে দেখ আমরা কি করছি— কোথায় যাচ্ছি। দেখো ভাই, আমাদের এ বাসরঘর শ্মশানের উপর গড়া নয়ত! তার চেয়ে এসো,

'নলিনী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

নীরদ। কিন্তু নীরজা, এদেশে কেবল শোভাই আছে, এদেশে হৃদয় নেই।

নীরজা। তা হতেই পারে না। এত সৌন্দর্যের মধ্যে হৃদয় নেই এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

নীরদ। সৌন্দর্যকে দেখবামাত্রই লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে ফেলে এই জন্যেই তো পৃথিবীতে এত দুঃখ-যন্ত্রণা! সে কথা যাক— নলিনীদের বাড়িতে আজ বসন্ত-উৎসব— আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির যেতে হবে।

নীরজা। আমার একটি কথা রাখবে? আমি বলি ভাই, সেখানে আমাদের না যাওয়াই ভালো।

নীরদ। কেন?

নীরজা। কেন, তা জানি নে, কিন্তু কে জানে, আমার মনে হচ্ছে সেখানে আজ না গেলেই ভালো!

নীরদ। নীরজা, তুমি কি আমার ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ কর?

নীরজা। প্রিয়তম, এ প্রশ্ন যদি তোমার মনে এসে থাকে— তবে থাক্— তবে আর আমি অধিক কিছু বলব না— তুমি চল!

নীরদ। আমি তো যাওয়াই ভালো বিবেচনা করি! আজ আমার কি গর্বের দিন! তোমাকে সঙ্গে ক'রে যখন নিয়ে যাব, নলিনী দেখবে আমাকে ভালোবাসবারও একজন লোক আছে।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসব

নীরদ নীরজা

নীরদ। আমরা বড়ো সকাল সকাল এসেছি। এখনো একজনও লোক আসে নি। (স্বগত) সেই তো সব তেমনিই রয়েছে! সেই-সব মনে পড়ছে! এই বকুলের তলায় ফুলগুলির উপর সে খেলা ক'রে বেড়াত! সূর্যের আলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করত! তার হাসিতে গানেতে, তার সেই সরল প্রাণের আনন্দ-হিল্লোলে গাছের কুঁড়িগুলি যেন ফুটে উঠত। আমি কি ঘোর স্বার্থপর! সে হাসি, সে গান আমার কেন ভালো লাগত না! সেই জীবন্ত সৌন্দর্যরাশি আমি কেন উপভোগ করতে পারতুম না। এক দিন মনে আছে সকাল বেলায় ঐ কামিনী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সুকুমার হাতটি বাড়িয়ে সে অন্যমনস্কে কামিনী ফুল তুলছিল, আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চমকে উঠে তার আঁচল থেকে ফুলগুলি প'ড়ে গেল, তার সেই চকিত নেত্র তার সেই লজ্জাবনত মুখখানি আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আহা, তাকে আর একবার তেমনি ক'রে দেখতে ইচ্ছে করছে! এই পরিচিত গাছপালাগুলির মধ্যে সূর্যালোকে সে তেমনি ক'রে বেড়াক, আমি এইখানে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তাই দেখি! আমি তাকে আর ভালোবাসি নে বটে, কিন্তু তাই ব'লে তার যতটুকু সুন্দর তা আমার ভালো না লাগবে কেন? আহা, সে পুরনো দিনগুলি কোথায় গেল?

নীরজা। এ বাগানটি কি সুন্দর!

নীরদ। তুমি কেবল এর সৌন্দর্য দেখছ— আমি আরো অনেক দেখতে পাচ্ছি। এই বাগানের প্রত্যেক গাছের ছায়ায় প্রত্যেক লতাকুঞ্জে আমার জীবনের এক একটি দিন, এক একটি মুহূর্ত ব'সে রয়েছে! বাগানের চার দিকে তারা সব ঘিরে রয়েছে! তারা কি আমাকে দেখে আজ চিনতে পারছে? অপরিচিত লোকের মতো আমাকে তারা কি আজ কৌতূহলদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে! এমন এক কাল গিয়েছে, যখন প্রতিদিন আমি এই বাগানে আসতুম, গাছপালাগুলি প্রতিদিন আমার জন্যে যেন অপেক্ষা ক'রে থাকত, আমি এলে আমাকে যেন এসো এসো ব'লে ডাকত। আজ কি তারা আর আমাকে সে রকম ক'রে ডাকছে? তারা হয়ত বলছে, তুমি কে এখেনে এলে?

ও কি নীরজা, তোমার মুখখানি অমন মলিন হয়ে এল কেন ?

নীরজা। প্রিয়তম, তোমার সেই পুরনো দিনগুলির মধ্যে আমি তো একেবারেই ছিলুম না ! এমন এক দিন ছিল যখন তুমি আমাকে একেবারেই জানতে না, একেবারেই আমি তোমার পর ছিলুম— তখন যদি কেউ গল্পচ্ছলে আমার কথা তোমার কাছে বলত তুমি হয়ত একটিবার মন দিয়ে শুনতে না, যদি কেউ বলত আমি ম'রে গেছি, তোমার চোখে একটি ফোঁটা জল পড়ত না ! এককালে-যে আমি তোমার কেউই ছিলুম না এ মনে করলে কেমন প্রাণে ব্যথা বাজে ! অনন্তকাল হ'তে আমাদের মিলন হয় নি কেন ?

নীরদ। কেন হয় নি নীরজা ? এই মধুর গাছপালাগুলি তোমার স্মৃতির সঙ্গে কেন জড়িয়ে যায় নি ? আর একজনের কথা কেন মনে পড়ে ? আহা, যদি সেই জীবনের প্রভাতকালে তোমার ঐ প্রশান্ত মুখখানি দেখতে পেতেম ! তোমার এই উদার মমতা, গভীর প্রেম, অতলস্পর্শ হৃদয়—

নীরজা। থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্— ঐ বুঝি সব গ্রামের লোকেরা আসছে! ঐ শোন বাঁশি বেজে উঠেছে ! তবে বুঝি উৎসব আরম্ভ হ'ল ! এখন আর আমাদের এ মলিন মুখ শোভা পায় না ; এসো আমরাও এ উৎসবে যোগ দিই।

নীরদ। হাঁ চল। একটা গান গাই।

আমার বড়ো ইচ্ছে এখনি একবার নলিনী এসে তোমাকে দেখে! তোমার সঙ্গে তার কতখানি প্রভেদ ! সে গাছের ফুল, আর তুমি গাছের ছায়া ! সে দু দণ্ডের শোভা, আর তুমি চিরকালের আশ্রয়।

নীরজা। দেখ দেখ, ছায়ার মতো শীর্ণ মলিন ও রমণী কে ?

নীরদ। (চমকিয়া) তাই তো, ও কে ?

দূরে নলিনীর প্রবেশ

নীরদ। এ কি নলিনী, না নলিনীর স্বপ্ন ?

নীরজা। (নলিনীর কাছে গিয়া) তুমি কাদের বাছা গা ? আজ এ উৎসবের দিনে তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন ?

নলিনী। আমি নলিনী।

নীরজা। (সচকিতে) তোমার নাম নলিনী ?

নলিনী। হাঁ।

নীরজা। (স্বগত) আহা, এর মুখখানি কী হয়ে গেছে ! নলিনী, আমি তোর মনের দুঃখ বুঝেছি ! তাঁকে একবার এর কাছে ডেকে নিয়ে আসি !

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। (দ্রুতবেগে আসিয়া) কাকা, কাকা !

নীরদ। (বুকে টানিয়া লইয়া) মা আমার, বাছা আমার !

ফুলি। এত দিন কোথায় ছিলে কাকা ?

নীরদ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে ফুলি ! আবার আমি তোদের কাছে এসেছি, আর আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না !

ফুলি। কাকা, একবার দিদির কাছে চল !

নীরদ। কেন ফুলি ?

ফুলি। একবার দেখ'সে দিদি কী হয়ে গেছে !

নবীনের প্রবেশ

নবীন। এই যে নীরদ, এসেছ ? আমরা সব স্বার্থপর কি অন্ধ হয়েই ছিলেম নীরদ ! একবার নলিনীর কাছে চল।

নীরদ। কেন নবীন!

নবীন। একবার তার সঙ্গে একটি কথা কও'সে! তোমার একটি কথা শোনবার জন্য সে আজ কত দিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে! কত দিন কত মাস ধ'রে জানলার কাছে ব'সে সে পথের পানে চেয়ে আছে, তোমার দেখা পায় নি! তার সে খেলাধুলা কিছুই নেই, একেবারে ছায়ার মতো হয়ে গেছে! কত দিন পরে আজ আবার সে এই বাগানে এয়েছে, কিন্তু তার সেই হাসিটি কোথায় রেখে এল? এ বাগানের মধ্যে তার অমন করুণ ম্লান মুখ কি চোখে দেখা যায়! এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এই বাগানেই বুঝি শেষ দেখা হবে!

তাড়াতাড়ি নলিনীর কাছে আসিয়া

নীরদ। নলিনী!

নলিনী অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল

নীরদ। নলিনী!

নলিনী। (ধীরে) কি নীরদ!

নীরদ। (নলিনীর হাত ধরিয়া) আর কিছু দিন আগে কেন আমার সঙ্গে কথা কইলে না নলিনী! আর কিছু দিন আগে কেন ঐ সুধামাখা স্বরে আমার নাম ধ'রে ডাক নি! আজ— আজ এই অসময়ে কেন ডাকলে? নলিনী নলিনী—

নলিনীর মূর্ছিত হইয়া পতন

নীরজা। এ কি হ'ল, এ কি হ'ল!

ফুলি। (তাড়াতাড়ি) দিদি— দিদি!— কাকা, দিদির কি হ'ল?

নীরজা: নলিনীর মাথা কোলে রাখিয়া বাতাস-করণ নলিনীর মূর্ছাভঙ্গ

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন— আর বেশি দিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।

নলিনী। (নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কে গা, তুমি কাঁদছ কেন?

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন!

ষষ্ঠ দৃশ্য

মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্বে নীরদ

নবীন

নীরজা। একবার নলিনীকে ডেকে দাও। বুঝি সময় চ'লে গেল।

[নবীনের প্রস্থান

আমি চল্লেম ভাই— আমার সঙ্গে কেন তোমার দেখা হ'ল? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মতো জেগে না থাকি! আমাকে ভুলে যেয়ো।

নলিনীকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

নলিনী, বোন আমার, তোদের আজ মিলন হোক, আমি দেখে যাই। (পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ) (নলিনীকে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া) তবে আমি চল্লেম বোন!

নলিনী। (নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি তুই আমার আগে চ'লে গেলি? আমিও আর বেশি দিন থাকব না, আমিও শীগ্‌গির তোর কাছে যাচ্ছি!

শৈশবসঙ্গীত

শৈশব সঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশি কিছু আসে যায় না। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার— বিশেষত বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।

গ্রন্থকার

উপহার

এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

শৈশবসঙ্গীত

ফুলবালা

গাথা

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভিডালি।
যমুনা বহিছে নাচিয়া নাচিয়া
গাহিয়া গাহিয়া অফুট গান—
থাকিয়া থাকিয়া বিজনে পাপিয়া
কানন ছাপিয়া তুলিছে তান।
পাতায় পাতায় লুকায়ে কুসুম,
কুসুমে কুসুমে শিশির দুলে—
শিশিরে শিশিরে জোছনা পড়েছে
মুকুতা-গুলিন সাজায়ে ফুলে।
তটের চরণে তটিনী ছুটিছে,
ভ্রমর লুটিছে ফুলের বাস—
সেঁউতি ফুটিছে, বকুল ফুটিছে
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সুরভিশ্বাস।
কুহরি উঠিছে কাননে কোকিল,
শিহরি উঠিছে দিকের বালা—
তরল লহরী গাঁথিছে আঁচলে
ভাঙা ভাঙা যত চাঁদের মালা।
ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার,
হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি—
সুধীরে আঁধার-ঘোমটা হইতে
কুসুমের খোলো হাসে মুচুকি।
এসো কলপনে!   এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পূরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।
হাসি কহে বালা, "ফুলের জগতে
যাইবে আজিকে কবি ?

দেখিবে কত কি অদ্ভূত ঘটনা,
　　কত কি অদ্ভূত ছবি !
চারি দিকে যেথা ফুলে ফুলে আলা
　　উড়িছে মধুপকুল ।
ফুলদলে-দলে ভ্রমি ফুলবালা
　　ফুঁ দিয়া ফুটায় ফুল ।
দেখিবে কেমনে শিশিরসলিলে
　　মুখ মাজি ফুলবালা
কুসুমরেণুর সিঁদুর পরিয়া
　　ফুলে ফুলে করে খেলা ।
দেহখানি ঢাকি ফুলের বসনে
　　প্রজাপতি-'পরে চড়ি
কমলকাননে কুসুমকামিনী
　　ধীরে ধীরে যায় উড়ি ।
কমলে বসিয়া মুচুকি হাসিয়া
　　দুলিছে লহরীভরে,
হাসিমুখখানি দেখিছে নীরবে
　　সরসী-আরসি-'পরে ।
ফুলকোল হ'তে পাপড়ি খসায়ে
　　সলিলে ভাসায়ে দিয়া
চড়ি সে পাতায় ভেসে ভেসে যায়
　　ভ্রমরে ডাকিয়া নিয়া ।
কোলে ক'রে লয়ে ভ্রমরে তখন
　　গাহিবারে কহে গান ।
গান গাওয়া হলে হরষে মোহিনী
　　ফুলমধু করে দান ।
দুই চারি বালা হাত ধরি ধরি
　　কামিনী-পাতায় বসি
চুপি চুপি চুপি ফুলে দেয় দোল,
　　পাপড়ি পড়য়ে খসি ।
দুই ফুলবালা মিলি বা কোথায়
　　গলা-ধরাধরি করি
ঘাসে ঘাসে ঘাসে ছুটিয়া বেড়ায়
　　প্রজাপতি ধরি ধরি ।
কুসুমের 'পরে দেখিয়া ভ্রমরে
　　আবরি পাতার দ্বার
ফুলফাঁদে ফেলি পাখায় মাথায়
　　কুসুমরেণুর ভার ।
ফাঁফরে পড়িয়া ভ্রমর উড়িয়া
　　বাহির হইতে চায়,
কুসুমরমণী হাসিয়া অমনি

ছুটিয়ে পালিয়ে যায় ।
ডাকিয়া আনিয়া সবারে তখনি
প্রমোদে হইয়া ভোর
কহে হাসি হাসি করতালি দিয়া
'কেমন পরাগচোর !'"
এত বলি ধীরে কলপনা-রানী
বীণায় আভানি তান
বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া
অবশ করিয়া প্রাণ !
গভীর নিশীথে সুদূর আকাশে
মিশিল বীণার রব,
ঘুমঘোরে আঁখি মুদিয়া রহিল
দিকের বালিকা সব ।
ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল,
ঘুমায়ে পড়িল স্বরগবালা,
দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
জোছনা-মাখানো জলদমালা ।
একি একি ওগো কলপনা সখি !
কোথায় আনিলে মোরে !
ফুলের পৃথিবী— ফুলের জগৎ—
স্বপন কি ঘুমঘোরে ?
হাসি কলপনা কহিল শোভনা,
"মোর সাথে এসো কবি !
দেখিবে কত কি অভূত ঘটনা
কত কি অভূত ছবি !
ওই দেখ ওই ফুলবালাগুলি
ফুলের সুরভি মাখিয়া গায়
সাদা সাদা ছোটো পাখাগুলি তুলি
এ ফুলে ও ফুলে উড়িয়া যায় !
এ ফুলে লুকায়, ও ফুলে লুকায়—
এ ফুলে ও ফুলে মারিছে উঁকি,
গোলাপের কোলে উঠিয়া দাঁড়ায়—
ফুল টলমল পড়িছে ঝুঁকি ।
ওই হোথা ওই ফুলশিশু-সাথে
বসি ফুলবালা অশোক ফুলে
দুজনে বিজনে প্রেমের আলাপ
কহে চুপিচুপি হৃদয় খুলে ।"
কহিল হাসিয়া কলপনাবালা
দেখায়ে কত কি ছবি,
"ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
শুনিবে এখন কবি ?"

এতেক শুনিয়া আমরা দুজনে
বসিনু চাঁপার তলে,
সুমুখে মোদের কমলকানন
নাচে সরসীর জলে।
এ কি কলপনা, এ কি লো তরুণী,
দুরন্ত কুসুমশিশু
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
হানিছে ফুলের ইষু।
চারি দিক হতে ছুটিয়া আসিয়া
হেরিয়া নূতন প্রাণী
চারি ধার ঘিরি রহিল দাঁড়ায়ে
যতেক কুসুমরানী!
গোলাপ মালতী, শিউলি সেঁউতি,
পারিজাত নরগেশ,
সব ফুলবাস মিলি এক ঠাঁই
ভরিল কাননদেশ।
চুপি চুপি আসি কোন ফুলশিশু
ঘা মারে বীণার 'পরে,
ঝন্ করি যেই বাজি উঠে তার
চমকি পলায় ডরে।
অমনি হাসিয়া কলপনাসখী
বীণাটি লইয়া করে
ধীরি ধীরি ধীরি মৃদুল মৃদুল
বাজায় মধুর স্বরে।
অবাক্ হইয়া ফুলবালাগণ
মোহিত হইয়া তানে
নীরব হইয়া চাহিয়া রহিল
শোভনার মুখপানে।
ধীরি ধীরি সবে বসিয়া পড়িল
হাতখানি দিয়া গালে,
ফুলে বসি বসি ফুলশিশুগণ
দুলিতেছে তালে তালে।
হেন কালে এক আসিয়া ভ্রমর
কহিল তাদের কানে,
"এখনো রয়েছে বাকি কত কাজ,
ব'সে আছ এইখানে?
রঙ দিতে হবে কুসুমের দলে,
ফুটাতে হইবে কুঁড়ি—
মধুহীন কত গোলাপকলিকা
রয়েছে কানন জুড়ি!"
অমনি যেন রে চেতন পাইয়া

যতেক কুসুমবালা,
পাখাটি নাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া
পশিল কুসুমশালা।
মুখ ভারী করি ফুলশিশুদল
তুলিকা লইয়া হাতে
মাখাইয়া দিল কত কি বরণ
কুসুমের পাতে পাতে।
চারি দিকে দিকে ফুলশিশুদল
ফুলের বালিকা রুত
নীরব হইয়া রয়েছে বসিয়া,
সবাই কাজেতে রত।
চারি দিক এবে হইল বিজন,
কানন নীরব ছবি—
ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
কহে কলপনাদেবী।

—

আজি পূরণিমানিশি,
তারকাকাননে বসি
অলসনয়নে শশী
মৃদুহাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাষিছে!
কাননে নিঝর ঝরে
মৃদু কলকল স্বরে,
অলি ছুটাছুটি করে
গুন্ গুন্ গাহিয়া!
সমীর অধীরপ্রাণ
গাহিয়া উঠিছে গান,
তটিনী ধরেছে তান,
ডাকি উঠে পাপিয়া।
সুখের স্বপন-মত
পশিছে সে গান যত
ঘুমঘোরে জ্ঞানহত
দিক্‌বধূ-শ্রবণে—
সমীর সভয়হিয়া
মৃদু মৃদু পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
লতাবধূ-ভবনে!

কুসুম-উৎসবে আজি
ফুলবালা ফুলে সাজি,
কত না মধুপরাজি
এক ঠাঁই কাননে !
ফুলের বিছানা পাতি
হরষে প্রমোদে মাতি
কাটাইছে সুখরাতি
নৃত্যগীতবাদনে !
ফুলবাস পরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া
নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী ।
চুলগুলি এলিয়ে
উড়িতেছে খেলিয়ে,
ফুলরেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী ।
ফুলবাঁশী ধরিয়ে
মৃদু তান ভরিয়ে
বাজাইছে ফুলশিশু বসি ফুল-আসনে ।
ধীরে ধীরে হাসিয়া
নাচি নাচি আসিয়া
তালে তালে করতালি দেয় কেহ সঘনে
কোনো ফুলরমণী
চুপি চুপি অমনি
ফুলবালকের কানে কথা যায় বলিয়ে ।
কোথাও বা বিজনে
বসি আছে দুজনে,
পৃথিবীর আর সব গেছে যেন ভুলিয়ে !
কোনো ফুলবালিকা
গাঁথি ফুলমালিকা
ফুলবালকের কথা একমনে শুনিছে,
বিব্রত শরমে
হরষিত-মরমে
আনত আননে বালা ফুলদল গুণিছে !

দেখেছ হোথায় অশোকবালক
মালতীর পাশে গিয়া
কহিছে কত কি মরমকাহিনী,
খুলিয়া দিয়াছে হিয়া ।
ভ্রূকুটি করিয়া নিদয়া মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি,
মৃদু-উপহাসে সরল প্রেমের
কোমলহৃদয় দলি ।

অধীর অশোক যদি বা কখনো
মালতীর কাছে আসে,
ছুটিয়া অমনি পলায় মালতী
বসে বকুলের পাশে।
থাকিয়া থাকিয়া সরোষ ভ্রূকুটি
অশোকের পানে হানে—
ভ্রূকুটি সেগুলি বাণের মতন
বিঁধিল অশোকপ্রাণে।
হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা,
মলিন অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে বহিয়া ব্যথা।
দেখ দেখি চেয়ে মালতীহৃদয়ে
কাহারে সে ভালোবাসে!
বলো দেখি মোরে হৃদয় তাহার
রয়েছে কাহার পাশে?
ওই দেখ তার হৃদয়ের পটে
অশোকেরই নাম লিখা!
অশোকেরই তরে জ্বলিছে তাহার
প্রণয়-অনলশিখা!
এই যে নিদয় চাতুরী সতত
দলিছে অশোকপ্রাণ—
অশোকের চেয়ে মালতীহৃদয়ে
বিঁধিছে তাহার বাণ।
মনে মনে করে কত বার বালা
অশোকের কাছে গিয়া
কহিবে তাহারে মরমকাহিনী
হৃদয় খুলিয়া দিয়া।
ক্ষমা চাবে গিয়া পায়ে ধরে তার,
খাইয়া লাজের মাথা
পরান ভরিয়া লইবে কাঁদিয়া,
কহিবে মনের ব্যথা।
তবুও কি যেন আটকে চরণ,
সরমে সরে না বাণী,
বলি বলি করি বলিতে পারে না
মনোকথা ফুলরানী।
মন চাহে এক ভিতরে ভিতরে,
প্রকাশ পায় যে আর—
সামালিতে গিয়া নারে সামালিতে
এমন জ্বালা সে তার!
মলিন অশোক ম্রিয়মাণ মুখে

একেলা রহিল সেথা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
হৃদয়ে হৃদয়ব্যথা।
দেখে নি কিছুই, শোনে নি কিছুই
কে গায় কিসের গান,
রহিয়াছে বসি বহি আপনার
হৃদয়ে-বিঁধানো বাণ।
কিছুই নাহি রে পৃথিবীতে যেন,
সব সে গিয়েছে ভুলি,
নাহি রে আপনি— নাহি রে হৃদয়—
রয়েছে ভাবনাগুলি।
ফুলবালা এক দেখিয়া অশোকে
আদরে কহিল তারে,
"কেন গো অশোক, মলিন হইয়া
ভাবিছ বসিয়া কারে ?"
এত বলি তার ধরি হাতখানি
আনিল সভার 'পরে—
"গাও না অশোক— গাও" বলি তারে
কত সাধাসাধি করে।
নাচিতে লাগিল ফুলবালা-দল—
ভ্রমর ধরিল তান—
মৃদু মৃদু মৃদু বিষাদের স্বরে
অশোক গাহিল গান।

গান

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে,
মধুপ হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্ নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্ রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে, "হোথায় বেলা,
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলি নি ?
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!"

বিষাদের গান কেন গো আজিকে ?
আজিকে প্রমোদরাতি !
হরষের গান গাও গো অশোক
হরষে প্রমোদে মাতি !
সবাই কহিল, "গাও গো অশোক,
গাও গো প্রমোদগান,
নাচিয়া উঠুক কুসুমকানন
নাচিয়া উঠুক প্রাণ !"
কহিল অশোক, "হরষের গান
গাহিতে বোলো না আর—
কেমনে গাহিব ? হৃদয়বীণায়
বাজিছে বিষাদ-তার ।"
এতেক বলিয়া অশোক বালক
বসিল ভূমির 'পরে—
কে কোথায় সব গেল সে ভুলিয়া
আপন ভাবনা-ভরে !
কিছু দিন আগে কি ছিল অশোক !
তখন আরেক ধারা,
নাচিয়া ছুটিয়া এখানে সেখানে
বেড়াত অধীর-পারা !
নবীন যুবক, শোহনগঠন,
সবাই বাসিত ভালো—
যেখানে যাইত অশোক যুবক
সেখান করিত আলো !
কিছু দিন হতে এ কেমন ভাব—
কোথাও না যায় আর ।
একলাটি থাকে বিরলে বসিয়া
হৃদয়ে পাষাণভার !
অরুণকিরণ হইতে এখন
বরণ বাহির করি
রাঙায় না আর ললিত বসন
মোহিনী তূলিটি ধরি ।
পূরণিমা-রেতে জোছনা হইতে
অমিয় করিয়া চুরি
মধু নিরমিয়া নাহি রাখে আর
কুসুমপাতায় পূরি !

ক্রমশ নিভিল চাঁদের জোছনা,
নিভিল জোনাক-পাঁতি—
পূরবের দ্বারে উষা উঁকি মারে,
আলোকে মিশাল রাতি !

প্রভাত-পাখিরা উঠিল গাহিয়া,
ফুটিল প্রভাতকুসুমকলি—
প্রভাতশিশিরে নাহিবে বলিয়া
চলে ফুলবালা পথ উজলি।
তার পরদিন রটিল প্রবাদ
অশোক নাইক ঘরে!
কোথায় অবোধ কুসুমবালক
গিয়েছে বিষাদভরে!
কুসুমে কুসুমে পাতায় পাতায়
খুঁজিয়া বেড়ায় সকলে মিলি—
কি হবে— কোথাও নাহিক অশোক!
কোথায় বালক গেল রে চলি!

কহে কলপনা, "খুঁজি চল গিয়া
অশোক গিয়াছে কোথা—
সুমুখে শোভিছে কুসুমকানন
দেখ দেখি, কবি, হোথা!
ঘাড় উঁচু করি হোথা গরবিনী
ফুটেছে ম্যাগ্‌নোলিয়া—
কাননের যেন চোখের সামনে
রূপরাশি খুলি দিয়া!
সাধাসাধি করে কত শত ফুল
চারি দিকে হেথা হোথা—
মুচকিয়া হাসে গরবের হাসি
ফিরিয়া না কয় কথা!
হ্যাদে দেখ, কবি, সরসীভিতরে
কমল কেমন ফুটেছে!
এ পাশে ও পাশে পড়িছে হেলিয়া—
প্রভাতসমীর উঠেছে!
ঘোমটা-ভিতরে লোহিত অধরে
বিমল কোমল হাসি
সরসী-আলয় মধুর করেছে
সৌরভ রাশি রাশি!
নিরমল জলে নিরমল রূপে
পৃথিবী করিছে আলো—
পৃথিবীর প্রেমে তবু নাহি মন,
রবিরেই বাসে ভালো!
কাননবিপিনে কত ফুল ফুটে
কিছুই বালা না জানে,
হৃদয়ের কথা কহে সুবদনী,
সখীদের কানে কানে।

হোথায় দেখেছ লজ্জাবতী লতা
লুটায়ে ধরণী-'পরে,
ঘাড় হেঁট করি কেমন রয়েছে
মরমসরম-ভরে ।
দূর হতে তার দেখিয়া আকার
ভ্রমর যদিবা আসে
সরমে সভয়ে মলিন হইয়া
স'রে যায় এক পাশে !
গুন গুন করি যদি-বা ভ্রমর
শুধায় প্রেমের কথা—
কাঁপে থর থর, না দেয় উতর,
হেঁট করি থাকে মাথা !
ওই দেখ হোথা রজনীগন্ধা
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা !"

চমকিয়া কহে কল্পনাবালা,—
"দেখিয়া কাননছবি
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি !
ওই যে মালতী বিরলে বসিয়া
সুবাস দিয়াছে এলি,
মাথার উপরে আটকে তপন
প্রজাপতি পাখা মেলি ।
এসো দেখি, কবি, ওইখানটিতে
দাঁড়াই গাছের তলে,
শুনি চুপি চুপি মালতীবালারে
ভ্রমর কি কথা বলে ।"
কহিছে ভ্রমর, "কুসুমকুমারি—
বকুল পাঠালে মোরে,
তাই ত্বরা ক'রে এসেছি হেথায়
বারতা শুনাতে তোরে !
অশোকবালক কি যে হয়ে গেছে
সে কথা বলিব কারে ।
তোর মতো হেন মোহিনীবালারে
ভুলিতে কি কভু পারে ?
তবু তারে আহা উপেখিয়া তুই
রবি কি হেথায় বোন ?
পরান সঁপিয়া অশোক তবু কি
পাবে নাকো তোর মন ?

মনের হুতাশে আশারে পুড়ায়ে
উদাস হইয়া গেছে,
কাননে কাননে খুঁজিয়া বেড়াই
কে জানে কোথায় আছে ।”
চমকি উঠিল মালতীবালিকা
ঘুম হ'তে যেন জাগি,
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
কি জানি কিসের লাগি !
“চলিয়া গিয়াছে অশোককুমার ?”
কহিল ক্ষণেক-পর,
“চলিয়া গিয়াছে অশোক আমার
ছাড়িয়া আপন ঘর ?
তবে আর আমি বিষাদকাননে
থাকিব কিসের আশে ?
যাইব অশোক গিয়েছে যেখানে,
যাইব তাহার পাশে ।
বনে বনে ফিরি বেড়াব খুঁজিয়া
শুধাব লতার কাছে,
খুঁজিব কুসুমে খুঁজিব পাতায়
অশোক কোথায় আছে !
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অশোকে আমার
যায় যদি যাবে প্রাণ—
আমা হতে তবু হবে না কখনো
প্রণয়ের অপমান !”

ছাড়ি নিজবন চলিল মালতী
চলিল আপন মনে,
অশোকবালকে খুঁজিবার তরে
ফিরে কত বনে বনে ।
“অশোক” “অশোক” ডাকিয়া ডাকিয়া
লতায় পাতায় ফিরে,
ভ্রমরে শুধায়, ফুলেরে শুধায়,—
“অশোক এখানে কি রে ?”
হোথায় নাচিছে অমল সরসী
চল দেখি হোথা কবি—
নিরমল জলে নাচিছে কমল
মুখ দেখিতেছে রবি !
রাজহাঁস দেখ সাঁতারিছে জলে
শাদা শাদা পাখা তুলি,
পিঠের উপরে পাখার উপরে
বসি ফুলবালাগুলি !

এখানেও নাই, চল যাই তবে—
ওই নিঝরের ধারে
মাধবী ফুটেছে, শুধাই উহারে
বলিতে যদি সে পারে।
বেগে উথলিয়া পড়িছে নিঝর—
ফেনগুলি ধরি ধরি
ফুলশিশুগণ করিতেছে খেলা
রাশ রাশ করি-করি!
আপনার ছায়া ধরিবারে গিয়া
না পেয়ে হাসিয়া উঠে—
হাসিয়া হাসিয়া হেথায় হোথায়
নাচিয়া খেলিয়া ছুটে!
ওগো ফুলশিশু! খেলিছ হোথায়
শুধাই তোমার কাছে,
অশোকবালকে দেখেছ কোথাও,
অশোক হেথা কি আছে?
এখানেও নাই, এসো তবে, কবি,
কুসুমে খুঁজিয়া দেখি—
ওই যে ওখানে গোলাপ ফুটিয়া
হোথায় রয়েছে— এ কী?
এ কে গো ঘুমায়— হেথায়— হেথায়—
মুদিয়া দুইটি আঁখি,
গোলাপের কোলে মাথাটি সঁপিয়া
পাতায় দেহটি রাখি!
এই আমাদের অশোকবালক
ঘুমায়ে রয়েছে হেথা!
দুখিনী ব্যাকুলা মালতীবালিকা
খুঁজিয়া বেড়ায় কোথা?
চল চল, কবি, চল দুই জনে
মালতীরে ডেকে আনি,
হরষে এখনি উঠিবে নাচিয়া
কাতরা কুসুমরাণী!

...

কোথাও তাহারে পেনু না খুঁজিয়া
এখন কি করি তবে!
অশোকবালক না যায় কোথাও,
বুঝায়ে রাখিতে হবে?
গোলাপশয়নে ঘুমায় অশোক
দুখতাপ সব ভুলি,

চল দেখি সেথা কহিব আমরা
সব কথা তারে খুলি !
দেখ দেখ, কবি, অশোকশিয়রে
ওই না মালতী হোথা ?
গোলাপ হইতে লয়েছে তুলিয়া
কোলে অশোকের মাথা ।
কত যে বেড়ানু খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কাননে কাননে পশি !
কখন্ হেথায় এসেছে বালিকা ?
রয়েছে হোথায় বসি !
ঘুমায়ে রয়েছে অশোকবালক
শ্রমেতে কাতর হয়ে,
মুখের পানেতে চাহিয়া মালতী
কোলেতে মাথাটি লয়ে !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকবালক
সুখের স্বপন হেরে,
গাছের পাতাটি লইয়া মালতী
বীজন করিছে তারে ।
নত করি মুখ দেখিছে বালিকা
দুখানি নয়ন ভরি,
নয়ন হইতে শিশিরের মতো
সলিল পড়িছে ঝরি !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকের যেন
অধর উঠিল কাঁপি !
"মালতী" "মালতী" বলিয়া বালার
হাতটি ধরিল চাপি !
হরষে ভাসিয়া কহিল মালতী
হেঁট করি আহা মাথা,
"অশোক— অশোক— মালতী তোমার
এই যে রয়েছে হেথা !"
ঘুমের ঘোরেতে পশিল শ্রবণে
"এই-যে, রয়েছে হেথা !"
নয়নের জলে ভিজায়ে পলক
অশোক তুলিল মাথা !
একি রে স্বপন ? এখনো একি রে
স্বপন দেখিছে নাকি ?
আবার চাহিল অশোকবালক,
আবার মাজিল আঁখি !
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া,
বচন নাহিক সরে—
থাকিয়া থাকিয়া পাগলের মতো

কহিল অধীর স্বরে,
"মালতী— মালতী— আমার মালতী !"
মালতী কহিল কাঁদি
"তোমারি মালতী ! তোমারি মালতী !"
অশোকে হৃদয়ে বাঁধি !—
"ক্ষমা কর মোরে অশোক আমার,
কত না দিয়েছি জ্বালা !
ভালোবাসি ব'লে ক্ষমা কর মোরে
আমি যে অবোধ বালা !
তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কখন
আর না যাইব চলি,
দিবস রজনী দুখিব হেথায়
বিষাদ ভাবনা ভুলি !
ও হৃদয় ছাড়ি মালতীর আর
কোথায় আরাম আছে ?
তোমারে ছাড়িয়া দুখিনী মালতী
যাবে আর কার কাছে ?"
অশোকের হাতে দিয়া দুটি হাত
কত যে কাঁদিল বালা !
কাঁদিছে দুজনে বসিয়া বিজনে
ভুলিয়া সকল জ্বালা !
উড়িল দুজনে পাশাপাশি হয়ে
হাত ধরাধরি করি—
সাজিল তখন পৃথিবী জগৎ
হাসিতে আনন ভরি !
গাহিয়া উঠিল হরষে ভ্রমর,
নির্ঝর বহিল হাসি—
দুলিয়া দুলিয়া নাচিল কুসুম
ঢালিয়া সুরভিরাশি !
ফিরিল আবার অশোকের ভাব
প্রমোদে পূরিল প্রাণ—
এখানে সেখানে বেড়ায় খেলিয়া
হরষে গাহিয়া গান ।
অশোক মালতী মিলিয়া দুজনে
জোনাকের আলো জ্বালি
একই কুসুমে মাখায় বরণ,
মধু দেয় ঢালি ঢালি !

বরষের পরে এল হরষের যামিনী
আবার মিলিল যত কুসুমের কামিনী !
জোছনা পড়িছে ঝরি সুমুখের সরসে—

টলমল ফুলদলে
ধরি ধরি গলে দলে
নাচে ফুলবালা-দলে,
মালা দুলে উরসে—
তখন সুখের তানে মরমের হরষে
অশোক মনের সাধে গীতধারা বরষে।

গান

দেখে যা— দেখে যা— দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
হেথা জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি, আয় লো, হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
সুখে গাঁথিব মালা, গনিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
এ কাননে বসি গাহিব গান,
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে—
প্রাণে রহিবে মিশি দিবস নিশি
আধো আধো ঘুমঘোর!

অতীত ও ভবিষ্যৎ

কেমন গো আমাদের ছোটো সে কুটীরখানি—
সমুখে নদীটি যায় চলি,
মাথার উপরে তার বট অশথের ছায়া,
সামনে বকুল গাছগুলি।
সারাদিন হু হু করি বহিছে নদীর বায়ু,
ঝর ঝর দুলে গাছপালা,
ভাঙাচোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
ও দিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দু-চারিটি গাভী
চিবায় নবীন তৃণদল—
কেহ-বা গাছের ছায়ে কেহ-বা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল।

জান তো কল্পনাবালা, কত সুখে ছেলেবেলা
সেইখানে করেছি যাপন—
সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে,
হুহু ক'রে ওঠে যেন মন।
নিশীথে নদীর 'পরে ঘুমিয়েছে ছায়া-চাঁদ,
সাড়াশব্দ নাই চারি পাশে,
একটি দুরন্ত ঢেউ জাগে নি নদীর কোলে,
পাতাটিও নড়ে নি বাতাসে,
তখন যেমন ধীরে দূর হ'তে দূর প্রান্তে
নাবিকের বাঁশরীর গান—
ধরি ধরি করি সুর ধরিতে না পারে মন,
উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ!
কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়াছি যেন ভুলে,
বিস্মৃতি স্বপনবেশে পরানের কাছে এসে
আধস্মৃতি জাগাইয়া তুলে।
তেমনি হে কলপনা, তুমি ও বীণায় যবে
বাজাও সেদিনকার গান,
আঁধার মরমমাঝে জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি,
কেঁদে ওঠে আকুল পরান!
হা দেবি, তেমনি যদি থাকিতাম চিরকাল!
না ফুরাত সেই ছেলেবেলা,
হৃদয় তেমনি ভাবে করিত গো থল থল,
মরমেতে তরঙ্গের খেলা!
ঘুমভাঙা আঁখি মেলি যখন প্রফুল্ল উষা
ফেলে ধীরে সুরভিনিশ্বাস,
ঢেউগুলি জেগে ওঠে পুলিনের কানে কানে
কহে তার মরমের আশ।
তেমনি উঠিত হৃদে প্রশান্ত সুখের উর্ম্মি
অতি-মৃদু অতি-সুশীতল—
বহিত সুখের শ্বাস, নাহিয়া শিশিরজলে
ফেলে যথা কুসুমসকল।
অথবা যেমন যবে প্রশান্ত সায়াহ্নকালে
ডুবে সূর্য্য সমুদ্রের কোলে,
বিষণ্ণ কিরণ তার শ্রান্ত বালকের মতো
প'ড়ে থাকে সুনীল সলিলে।
নিস্তব্ধ সকল দিক, একটি ডাকে না পাখি,
একটুও বহে না বাতাস,
তেমনি কেমন এক গম্ভীর বিষণ্ণ সুখ
হৃদয়ে তুলিত দীর্ঘশ্বাস।
এইরূপ কত কি যে হৃদয়ের ঢেউ-খেলা

দেখিতাম বসিয়া বসিয়া,
মরমের ঘুমঘোরে কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া-খুসিয়া।
বনের পাখির মতো অনন্ত আকাশতলে
গাহিতাম অরণ্যের গান—
আর কেহ শুনিত না, প্রতিধ্বনি জাগিত না,
শূন্যে মিলাইয়া যেত তান।
প্রভাত এখনো আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
আমার এমন দুরদশা—
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে এ কি রে কুয়াশা!
যেন এই জীবনের আঁধারসমুদ্র-মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরী,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীলতট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!
সেদিকে ফিরায়ে আঁখি এখনো দেখিতে পাই
ছায়া-ছায়া কাননের রেখা,
নানা বরণের মেঘ মিশেছে বনের শিরে
এখনো বুঝি রে যায় দেখা!
যেতেছি যেখানে ভাসি সেদিকে চাহিয়া দেখি
কিছুই তো না পাই উদ্দেশ—
আঁধার সলিলরাশি সুদূর দিগন্তে মিশে,
কোথাও না দেখি তার শেষ!
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি একাকী যাইবে ভাসি
যত দিনে ডুবিয়া না যায়,
সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুতশিখায়!

দিকবালা

দূর আকাশের পথ উঠিছে জলদরথ,
নিম্নে চাহি দেখে কবি ধরণী নিদ্রিত।
অস্ফুট চিত্রের মতো নদ নদী পরবত,
পৃথিবীর পটে যেন রয়েছে চিত্রিত!
সমস্ত পৃথিবী ধরি একটি মুঠায়
অনন্ত সুনীল সিন্ধু সুধীরে লুটায়।
হাত ধরাধরি করি দিক্‌বালাগণ
দাঁড়ায়ে সাগরতীরে ছবির মতন।

কেহ-বা জলদময় মাখায়ে জোছানা
নীল দিগন্তের কোলে পাতিছে বিছানা।
মেঘের শয্যায় কেহ ছড়ায়ে কুন্তল
নীরবে ঘুমাইতেছে নিদ্রায় বিহ্বল।
সাগরতরঙ্গ তার চরণে মিলায়,
লইয়া শিথিল কেশ পবন খেলায়।
কোনো কোনো দিক্‌বালা বসি কুতূহলে
আকাশের চিত্র আঁকে সাগরের জলে।
আঁকিল জলদমালা চন্দ্রগ্রহ তারা,
রঞ্জিল সাগর দিয়া জোছনার ধারা।
পাপিয়ার ধ্বনি শুনি কেহ হাসিমুখে
প্রতিধ্বনিরমণীরে জাগায় কৌতুকে!
শুকতারা প্রভাতের ললাটে ফুটিল,
পূরবের দিক্‌দেবী জাগিয়া উঠিল।
লোহিত কমলকরে পূরবের দ্বার
খুলিয়া সিন্দূর দিল সীমন্তে উষার।
মার্জি দিয়া উদয়ের কনকসোপান,
তপনের সারথিরে করিল আহ্বান।
সাগর-ঊর্মির শিরে সোনার চরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেচে গেল দিক্‌বালাগণ।
পূরবদিগন্ত-কোলে জলদ গুছায়ে
ধরণীর মুখ হতে আঁধার মুছায়ে,
বিমল শিশিরজলে ধুইয়া চরণ,
নিবিড় কুন্তলে মাখি কনককিরণ,
সোনার মেঘের মতো আকাশের তলে,
কনককমলসম মানসের জলে
ভাসিতে লাগিল যত দিক্-বালাগণে—
উলসিত তনুখানি প্রভাতপবনে।
ওই হিমগিরি-'পরে কোনো দিক্‌বালা
রঞ্জিছে কনককরে নীহারিকামালা!
নিভৃতে সরসীজলে করিতেছে স্নান,
ভাসিছে কমলবনে কমলবয়ান।
তীরে উঠি মালা গাঁথি শিশিরের জলে
পরিছে তুষারশুভ্র সুকুমার গলে।
ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা-প্রান্তরে,
মধ্যে দিক্‌দেবী শুভ্র বালুকার 'পরে।
অঙ্গ হতে ছুটিতেছে জ্বলন্ত কিরণ,
চাহিতে মুখের পানে ঝলসে নয়ন।
আঁকিছে বালুকাপুঞ্জে শত শত রবি,
আঁকিছে দিগন্তপটে মরীচিকা-ছবি।
অন্য দিকে কাশ্মীরের উপত্যকা-তলে

পরি শত বরণের ফুলমালা গলে,
শত বিহঙ্গের গান শুনিতে শুনিতে,
সরসীলহরীমালা গুনিতে গুনিতে,
এলায়ে কোমল তনু কমলকাননে
আলসে দিকের বালা মগন স্বপনে।
ওই হোথা দিক্‌দেবী বসিয়া হরষে
ঘুরায় ঋতুর চক্র মৃদুল পরশে।
ফুরায়ে গিয়েছে এবে শীতসমীরণ,
বসন্ত পৃথিবীতলে অর্পিবে চরণ।
পাখিরে গাহিতে কহি অরণ্যের গান
মলয়ের সমীরণে করিয়া আহ্বান
বনদেবীদের কাছে কাননে কাননে
কহিল ফুটাতে ফুল দিক্‌দেবীগণে—
বহিল মলয়বায়ু কাননে ফিরিয়া,
পাখিরা গাহিল গান কানন ভরিয়া।
ফুলবালা-সাথে আসি বনদেবীগণ
ধীরে দিক্‌দেবীদের বন্দিল চরণ।

প্রতিশোধ

গাথা

গভীর রজনী নীরব ধরণী,
মুমূর্ষু পিতার কাছে
বিজন আলয়ে আঁধার হৃদয়ে
বালক দাঁড়ায়ে আছে।
বীরের হৃদয়ে ছুরিকা বিধানো,
শোণিত বহিয়ে যায়,
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে
রোষের অনল ভায়!
পড়েছে দীপের অফুট আলোক
আঁধার মুখের 'পরে,
সে মুখের পানে চাহিয়া বালক
দাঁড়ায়ে ভাবনা-ভরে।
দেখিছে পিতার অসাড় অধরে
যেন অভিশাপলিখা,
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে
রোষের অনলশিখা—

ঘুম হতে যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর,
মুমূর্ষু কহিলা বালকে চাহিয়া,
সুধীর গভীর স্বর—
"শোনো বৎস, শোনো, অধিক কি কব,
আসিছে মরণবেলা—
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবে অবহেলা।"
এতেক বলিয়া টানি উপাড়িলা
ছুরিকা হৃদয় হতে,
ঝলকে ঝলকে উছসি অমনি
শোণিত বহিল স্রোতে।
কহিল, "এই নে, এই নে ছুরিকা—
তাহার উরস-'পরে
যত দিন ইহা ঠাঁই নাহি পায়
থাকে যেন তোর করে!
হা হা ক্ষত্রদেব, কি পাপ করেছি—
এ তাপ সহিতে হল,
ঘুমাতে ঘুমাতে বিছানায় পড়ি
জীবন ফুরায়ে এল।"
নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুন,
কথা হয়ে গেল রোধ,
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে—
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"
পিতার চরণ পরশ করিয়া
ছুঁইয়া কৃপাণখানি
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল শপথবাণী—
"ছুঁইনু কৃপাণ, শপথ করিনু
শুন ক্ষত্রকুলপ্রভু,
এর প্রতিশোধ তুলিব তুলিব,
অন্যথা নহিবে কভু!
সেই বুক ছাড়া এ ছুরিকা আর
কোথা না বিরাম পাবে,
তার রক্ত ছাড়া এই ছুরিকার
তৃষা কভু নাহি যাবে।"
রাখিলা শোণিত-মাখা সে ছুরিকা
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ,
মুদিয়া পড়িল আঁখি।

ভ্রমিছে কুমার কত দেশে দেশে,
ঘুচাতে শপথভার।
দেশে দেশে ভ্রমি তবুও তো আজি
পেলে না সন্ধান তার।
এখনো সে বুকে ছুরিকা লুকানো,
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে—
এখনো পিতার শেষ কথাগুলি
বাজিছে যেন সে কানে।
"কোথা যাও যুবা! যেও না, যেও না—
গহন কানন ঘোর,
সাঁঝের আঁধার ঢাকিছে ধরণী,
এসো গো কুটীরে মোর!"
"ক্ষম গো আমায়, কুটীরস্বামী!
বিরাম আলয় চাহি না আমি,
যে কাজের তরে ছেড়েছি আলয়
সে কাজ পালিব আগে।"
"শুন গো পথিক, যেও নাকো আর,
অতিথির তরে মুক্ত এ দুয়ার!
দেখেছ চাহিয়া ছেয়েছে জলদ
পশ্চিম গগনভাগে।"
কত না ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে
মাথার উপর দিয়া,
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও
যুবক নির্ভীকহিয়া।
চলেছে-গহন গিরি নদী মরু
কোনো বাধা নাহি মানি।
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে শপথবাণী!
"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ,
শুন গো কুটীরস্বামী—
খুলে দাও দ্বার আজিকার মতো
এসেছি অতিথি আমি।"
অতি ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার,
পথিক দেখিল চেয়ে—
করুণার যেন প্রতিমার মতো
একটি রূপসী মেয়ে।
এলোথেলো চুলে বনফুলমালা,
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে মমতা, অধরে মাখানো
কোমল সরল হাস।
বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া

কুশের আসন-'পরি—
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কাননকুটীরে
পথিক করিছে বাস?
কী কর, যুবক, ছাড় এ কুটীর—
সময় যেতেছে চলি,
যে কাজের তরে ছেড়েছ আলয়,
সে কাজ যেও না ভুলি!
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস,
যুবার হৃদয়ে পড়িছে জড়ায়ে
ক্রমেই প্রণয়পাশ!
শোণিতে লিখিত শপথ-আখর
মন হতে গেল মুছি।
ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
কেন রে গেল না ঘুচি!

মালতীবালার সাথে কুমারের
আজিকে বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষরবে!
মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত
গাহিছে নাচিছে হরষে সকলে
যুবক রমণী শত।
কেহ-বা গাঁথিছে ফুলের মালিকা,
গাহিছে বনের গান,
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
হরষে করিছে দান।
ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতী
এলায়ে চিকুরপাশ—
সুখের আভায় উজলে নয়ন,
অধরে সুখের হাস।
আইল কুমার বিবাহসভায়
মালতীরে লয়ে সাথে,
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।
ওকিও— ওকিও— সহসা প্রতাপ

বসনে নয়ন চাপি,
মূরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর থর কাঁপি।
মালতীবালিকা পড়িল সহসা
মূরছি কাতররবে!
বিবাহসভায় ছিল যারা যারা
ভয়ে পলাইল সবে।
সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মতো জ্বলে দুনয়ন,
শোণিতে মাখানো কায়া—
কি কথা বলিতে চাহিল কুমার,
ভয়ে হ'ল কথারোধ,
জলদগভীর স্বরে কে কহিল,
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!
হা রে কুলাঙ্গার, অক্ষত্রসন্তান,
এই কি রে তোর কাজ?
শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
বিবাহ করিলি আজ!
ক্ষত্রধর্ম যদি প্রতিজ্ঞাপালন,
ওরে কুলাঙ্গার, তবে
এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিবি কবে!
নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এ মোর ক্রোধ।"
নীরব সে গৃহ ধ্বনিল আবার—
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"
বুকের বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি,
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি।
অধীর হৃদয় পাগলের মতো,
থর থর কাঁপে পাণি—
কত বার ছুরি ধরিল সে বুকে
কত বার নিল টানি।
মাথার ভিতরে ঘুরিতে লাগিল,
আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"
ক্রমশ চেতন পাইল প্রতাপ,
মালতী উঠিল জাগি,

চারি দিক চেয়ে বুঝিতে নারিল
এ-সব কিসের লাগি।
কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে,
প্রতি কথা তার অনলের মতো
লাগিল তাহার বুকে—
"একদা গভীর বরষানিশীথে
নাই জাগি জন প্রাণী,
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী।
চাহি চারি দিকে দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হতে—
শোণিত বহিছে, শয়ন তাঁহার
ভাসিছে শোণিতস্রোতে।
কহিলেন পিতা— 'অধিক কি কব
আসিছে মরণবেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবি অবহেলা।'
হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে,
সে অবধি এই বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে।
করিনু শপথ ছুঁইয়া কৃপাণ
'শুন ক্ষত্রকুলপ্রভু,
এর প্রতিশোধ তুলিব— তুলিব—
না হবে অন্যথা কভু।'
নাম কি তাহার জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম—"
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া,
"প্রতাপ তাহার নাম!
এখনি এখনি ওই ছুরি তব
বসাইয়া দেও বুকে,
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে কেমনে
কব তাহা এক মুখে?
নিভাও সে জ্বালা, নিভাও সে জ্বালা
দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোনো জল!"
কাঁদিয়া উঠিল মালতী কহিল
পিতার চরণ ধ'রে,
"ও কথা ব'লো না— ব'লো না গো পিতা,

যেও না ছাড়িয়ে মোরে!
কুমার— কুমার— শুন মোর কথা
এক ভিক্ষা শুধু মাগি—
রাখ মোর কথা, ক্ষম গো পিতারে,
দুখিনী আমার লাগি!—
শোণিত নহিলে ও ছুরির তব
পিপাসা না মিটে যদি,
তবে এই বুকে দেহ গো বিঁধিয়া
এই পেতে দিনু হৃদি!"
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল কাতর স্বরে,
"ক্ষমা কর পিতা, পারিব না আমি,
কহিতেছি সকাতরে!
অতি নিদারুণ অনুতাপশিখা
দহিছে যে হৃদিতল,
সে হৃদয়মাঝে ছুরিকা বসায়ে
বলো গো কি হবে ফল?
অনুতাপী জনে ক্ষমা কর পিতা!
রাখ এই অনুরোধ!"
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার,
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"—
হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার,
পাগলের মতো যেন।
প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইল বলে।
মালতী বালিকা মূর্ছিয়া পড়িল
কুমারের পদতলে।
উন্মত্ত হৃদয়ে, জ্বলন্ত নয়নে,
বদ্ধ করি হস্তমুঠি—
কুটীর হইতে পাগল কুমার
বাহিরেতে গেল ছুটি।
এখনো কুমার সেই বনমাঝে
পাগল হইয়া ভ্রমে—
মালতীবালার চিরমূর্ছা আর
ঘুচিল না এ জনমে!

ছিন্ন লতিকা

সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখি, অতিশয় যতনে—
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল[১]
ফুটিয়াছে শত শত হাসি-হাসি-আননে।
প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল,
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা।
সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে[২]
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তায়,[৩]
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এত দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলঢল মুখ,[৪]
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।[৫]
ছিন্ন-অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে—
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

ভারতীবন্দনা

আজিকে তোমার মানসসরসে
কি শোভা হয়েছে মা!
অরুণবরন চরণপরশে
কমলকানন হরষে কেমন
ফুটিয়ে রয়েছে মা!
নীরবে চরণে উথলে সরসী,
নীরবে কমল করে টলমল,
নীরবে বহিছে বায়।
মিলি কত রাগ মিলিয়ে রাগিণী
আকাশ হইতে করে গীতধ্বনি,
শুনিয়ে সে গীত আকাশ-পাতাল
হয়েছে অবশপ্রায়।
শুনিয়ে সে গীত হয়েছে মোহিত
শিলাময় হিমগিরি—
পাখিরা গিয়েছে গাহিতে ভুলিয়া,

পাঠান্তর: ১ নানাবরনের ফুল ২ ছিল সে মনের সুখে
৩ রেখেছিল স্নিগ্ধ করি ৪ ছিল হাসি-হাসি মুখ
৫ শুকায়ে লুটায় ভূমে আহা সেই লতিকা,

সরসীর বুক উঠিছে ফুলিয়া,
ক্রমশ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে
তানলয় ধীরি ধীরি।
তুমি গো জননি, রয়েছ দাঁড়ায়ে
সে গীতধারার মাঝে,
বিমল জোছনা-ধারার মাঝারে
চাঁদটি যেমন সাজে।
দশ দিশে দিশে ফুটিয়া পড়েছে
বিমল দেহের জ্যোতি,
মালতীফুলের পরিমল-সম
শীতল মৃদুল অতি।
আলুলিত চুলে কুসুমের মালা,
সুকুমার করে মৃণালের বালা,
লীলাশতদল ধরি,
ফুলছাঁচে ঢালা কোমল শরীরে
ফুলের ভূষণ পরি।
দশ দিশি দিশি উঠে গীতধ্বনি,
দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি।
দশ দিশি ছুটে ফুলপরিমল
মধুর মৃদুল শীতল অতি।
নবদিবাকর ম্লানসুধাকর
চাহিয়া মুখের পানে,
জলদ-আসনে দেববালাগণ
মোহিত বীণার তানে।
আজিকে তোমার মানসসরসে
কি শোভা হয়েছে মা!
রূপের ছটায় আকাশ পাতাল
পূরিয়া রয়েছে মা!
যেদিকে তোমার পড়েছে জননি
সুহাস্য কমলনয়ন দুটি,
উঠেছে উজলি সেদিক অমনি,
সেদিকে পাপিয়া উঠিছে গাহিয়া,
সেদিকে কুসুম উঠিছে ফুটি!
এসো মা আজিকে ভারতে তোমার,
পূজিব তোমার চরণ দুটি!
বহুদিন পরে ভারত-অধরে
সুখময় হাসি উঠুক ফুটি!
আজি কবিদের মানসে মানসে
পড়ুক তোমার হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক ফুটিয়া
ভকতিকমলরাশি!

নমিয়া ভারতীজননী-চরণে
সঁপিয়া ভকতিকুসুমমালা,
দশ দিশি দিশি প্রতিধ্বনি তুলি
হুলুধ্বনি দিক দিকের বালা!
চরণকমলে অমল কমল
আঁচল ভরিয়া ঢালিয়া দিক!
শত শত হৃদে তব বীণাধ্বনি
জাগায়ে তুলুক শত প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিয়ে কবির হৃদয়ে
ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম
গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক!

লীলা

গাথা

"সাধিনু— কাঁদিনু— কত না করিনু—
ধন মান যশ সকলি ধরিনু
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেম না মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার!
না যদি পেলেম নাইবা পাইনু—
চাই না— চাই না তারে!
কি ছার সে বালা! তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষহৃদি,
তা হ'লে পাষাণো ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে!
এ কুমতি কেন হয়েছিল বিধি,
তারে সঁপিবারে গিয়েছিনু হৃদি!
এ নয়নজল ফেলিতে হইল
তাহার চরণতলে?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু, মজিয়া
তাহার কুহকবলে?
এত আঁখিজল হইল বিফল,
বালিকাহৃদয় করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ?
হীন রণধীরে ভালোবাসে বালা,
তার গলে দিবে পরিণয়মালা!
এ কি লাজ নিদারুণ!

হেন অপমান নারিব সহিতে,
ঈর্ষার অনল নারিব বহিতে,
ঈর্ষা? কারে ঈর্ষা? হীন রণধীরে?
ঈর্ষার ভাজন সেও হ'ল কি রে?
ঈর্ষাযোগ্য সে কি মোর?
তবে শুন আজি শ্মশানকালিকা!
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর!
আজ হ'তে মোর রণধীর অরি—
শতনৃকপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান,
এ বিবাহ কভু দিব না ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ!
তবে নমি তোমা শ্মশানকালিকা!
শোণিতলুলিতা কপালমালিকা!
কর এই বর দান—
তাহারি শোণিতে মিটায় পিপাসা
যেন মোর এ কৃপাণ!"
কহিতে কহিতে বিজন নিশীথে
শুনিল বিজয় সুদূর হইতে
শত শত অট্টহাসি—
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশানশান্তিরে নাশি!
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে
চমকি উঠিল জাগি!
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া—
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া,
আবার যাইল মিশি!
সহসা থামিল অট্টহাসিধ্বনি,
শিবার রোদন থামিল অমনি,
আবার ভীষণ সুগভীরতর
নীরব হইল নিশি!
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর।
মুখ নিদারুণ আঁখি রোষারুণ—
হৃদয়ে জ্বলিছে রোষের আগুন,
করে অসি খরধার!
গিরি-অধিপতি রণধীরগৃহে
লীলা আসিতেছে আজি—
গিরিবাসীগণ হরষে মেতেছে,

বাজানা উঠেছে বাজি।
অস্তে গেল রবি পশ্চিমশিখরে,
আইল গোধূলিকাল—
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
সঘন আঁধারজাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতিভবনপানে—
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষগানে।
জ্বলিছে আলোক, বাজিছে বাজনা,
ধ্বনিতেছে দশ দিশি—
ক্রমশ আঁধার হইল নিবিড়
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়—
বনমাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ,
বড়ো সে সুগম নয়।
অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষগীত—
সে হরষধ্বনি জনকোলাহল
ধ্বনিতেছে চারি ভিত।
থামিল শিবিকা, পথের মাঝারে
থামে অনুচরদল—
সহসা সভয়ে "দস্যু দস্যু" বলি
উঠিল রে কোলাহল।
শত বীরহৃদি উঠিল নাচিয়া,
বাহিরিল শত অসি—
শত শত,শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি।
আঁধার ক্রমশ নিবিড় হইল,
বাধিল বিষম রণ—
লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ।

. . .

কারাগারমাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আঁখিজল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল।
"হে মা ভগবতী, শুন এ মিনতি—
বিপদে ডাকিব কারে!

পতি ব'লে যাঁরে করেছি বরণ
বাঁচাও বাঁচাও তাঁরে!
মোর তরে কেন এ শোণিতপাত!
আমি, মা, অবোধ বালা,
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন—
ঘুচিত সকল জ্বালা!"
কহিতে কহিতে উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমরধ্বনি—
জয়জয়রব, আহতের স্বর,
কৃপাণের ঝনঝনি!
সাঁজের জলদে ডুবে গেল রবি,
আকাশে উঠিল তারা—
একেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হতেছে সারা!
সহসা খুলিল কারাগারদ্বার,
বালিকা সভয় অতি—
কঠোর কটাক্ষ হানিতে হানিতে
বিজয় পশিল তথি।
অসি হতে ঝরে শোণিতের ফোঁটা,
শোণিতে মাখানো বাস,
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
ফুটে নিদারুণ হাস!
অবাক্ বালিকা— বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে,
"সমরবারতা শুনেছ কুমারী?
সে কথা শুনিবে তবে?"
"বুঝেছি— বুঝেছি, জেনেছি— জেনেছি!
বলিতে হবে না আর—
না— না, বলো বলো— শুনিব সকলি
যাহা আছে শুনিবার।
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়,
বলো কি বলিতে আছে!
যত ভয়ানক হোক না সে কথা
লুকায়ো না মোর কাছে!"
"শুন তবে বলি" কহিল বিজয়
তুলি অসি খরধার,
"এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার!"
"পামর, নিদয়, পাষাণ, পিশাচ!"—
মূরছি পড়িল লীলা!
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়

কারা হ'তে বাহিরিলা।
সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশ ,
নিশা হ'ল সুগভীর।
বিজয়ের সেনা পলাইল রণে—
জয়ী হ'ল রণধীর।
কারাগারমাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে,
"লীলা!— রণধীর এসেছে তোমার
এসো এ বুকের পরে!"
ভূমিতল হ'তে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি,
হরষ-আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি।
"এসো, নাথ, এসো অভাগীর পাশে
বস একবার হেথা!
জনমের মতো দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক', নাথ, সেই আদরের নামে
ডাক' মোরে স্নেহভরে—
এ অবশ মাথা তুলে লও, সখা,
তোমার বুকের পরে!"
লীলার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো,
বহিছে শোণিতধারা—
রহে রণধীর পলকবিহীন
যেন পাগলের পারা।
রণধীর বুকে মুখ লুকাইয়া
গলে বাঁধি বাহুপাশ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা,
"পূরিল না কোনো আশ!
মরিবার সাধ ছিল না আমার,
কত ছিল সুখ-আশা!
পারিনু না, সখা, করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালোবাসা!
হা রে হা পামর, কি করিলি তুই?
নিদারুণ প্রতারণা!
এত দিনকার সুখসাধ মোর
পূরিল না, পূরিল না!"
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি
রণধীর-মুখে রহিল চাহিয়া
মেলি অনিমেষ আঁখি!

রণধীর যবে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা,
বীরের নয়নে জ্বলিয়া উঠিল
রোষের অনলকণা।
"পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার,
বাঁচিবার সাধ নাই।
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে,
বাঁচিয়া রহিব তাই।"
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি,
শোকে রোষানলে জ্বলি রণধীর
রণভূমে এল ছুটি।
দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমরভূমে।
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণঘুমে!

ফুলের ধ্যান

মুদিয়া আঁখির পাতা
কিশলয়ে ঢাকি মাথা
উষার ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি,
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী !
দেখিতেছি শুধু উষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ
জাগিছে হৃদয়-'পরি !
তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী ।

আকাশে যখন শতেক তারা
রবির কিরণে হইবে হারা,
ধরায় ঝরিয়া শিশিরধারা
ফুটিবে তারার মতো,
ফুটিবে কুসুম শত,
ফুটিবে দিবার আঁখি,
ফুটিবে পাখির গান,

তখন আমারে চুমিবে তপন,
তখন আমার ভাঙিবে স্বপন,
তখন ভাঙিবে ধ্যান।

তখন সুধীরে খুলিব নয়ান,
তখন সুধীরে তুলিব বয়ান,
পূরব আকাশে চাহিয়া চাহিয়া
কথা কব ভাঙা ভাঙা।
উষারূপসীর কপোলের চেয়ে
কপোল হইবে রাঙা।
তখন আসিবে বায়,
ফিরিতে হবে না তায়,
হৃদয় ঢালিয়া দিব বিলাইয়া
যত পরিমল চায়।
ভ্রমর আসিবে দ্বারে,
কাঁদিতে হবে না তারে,
পাশে বসাইয়া আশা পূরাইয়া
মধু দিব ভারে ভারে।
আজিকে ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি—
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।

অপ্সরাপ্রেম

গাথা

নায়িকার উক্তি

রজনীর পরে আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ ছিল হ'ল পূরণিমা,
প্রতি নিশি নিশি বাড়িল চাঁদিমা,
প্রতি নিশি নিশি ক্ষীণ হয়ে এল
ফুরালো জোছনাভাতি।
উদিছে তপন উদয়শিখরে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সারা দিন ধ'রে
ধীর পদক্ষেপে অবসন্ন দেহে
যেতেছে চলিয়া বিশ্রামের গেহে
মলিন বিষণ্ণ অতি।

উদিছে তারকা আকাশের তলে,
আসিছে নিশীথ প্রতি পলে পলে,
পল পল করি যায় বিভাবরী,
নিভিছে তারকা এক এক করি,
হাসিতেছে উষা সতী।
এসো গো, সখা, এসো গো—
কত দিন ধ'রে বাতায়নপাশে
একেলা বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
এসো গো, সখা, এসো, গো!—
সুমুখে তটিনী যেতেছে বহিয়া,
নিশ্বসিছে বায়ু রহিয়া রহিয়া,
লহরীর পর উঠিছে লহরী,
গনিতেছি বসি এক এক করি—
নাই রাতি নাই দিন।
ওই তৃণগুলি হরিত প্রান্তরে
নোয়াইছে মাথা মৃদুবায়ুভরে,
সারা দিন যায়— সারা রাত যায়—
শূন্য আঁখি মেলি চেয়ে আছি হায়—
নয়ন পলকহীন।
বরষে বাদল, গরজে অশনি,
পলকে পলকে চমকে দামিনী,
পাগলের মতো হেথায় হোথায়
আঁধার আকাশে বহিতেছে বায়
অবিশ্রাম সারারাতি।
বহিতেছে বায়ু পাদপের 'পরে,
বহিছে আঁধার-প্রাসাদ-শিখরে,
ভগ্ন দেবালয়ে বহে হুহু করি,
জাগিয়া উঠিছে তটিনীলহরী
তটিনী উঠিছে মাতি।
কোথায় গো, সখা, কোথা গো!
একাকী হেথায় বাতায়নপাশে
রয়েছি বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
কোথায় গো, সখা, কোথা গো!
যাহারা যাহারা গিয়েছিল রণে,
সবাই ফিরিয়া এসেছে ভবনে,
প্রিয়-আলিঙ্গনে প্রণয়িনীগণ
কাঁদিয়া হাসিয়া মুছিছে নয়ন

কোনো জ্বালা নাহি জানে।
আমিই কেবল একা আছি প'ড়ে
পরিশ্রান্ত অতি— আশা ক'রে ক'রে—
নিরাশ পরান আর তো রহে না,
আর তো পারি না, আর তো সহে না,
আর তো সহে না প্রাণে।
এসো গো, সখা, এসো গো!
একাকী হেথায় বাতায়নপাশে
একেলা বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই,
এসো গো, সখা, এসো গো!—
আসে সন্ধ্যা হয়ে আঁধার আলয়ে—
একেলা রয়েছি বসি,
যে যাহার ঘরে আসিতেছে ফিরে,
জ্বলিছে প্রদীপ কুটীরে কুটীরে,
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়নদ্বারে
আঁধার প্রান্তরে চেয়ে আছি হা রে—
আকাশে উঠিছে শশী
কত দিন আর রহিব এমন,
মরণ হইলে বাঁচি রে এখন!
অবশ হৃদয়, দেহ দুরবল,
শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল,
যেতেছে দিবস নিশি!
কোথায় গো, সখা, কোথা গো!
কত দিন ধ'রে, সখা, তব আশে
একেলা বসিয়া বাতায়নপাশে
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
কোথায় গো, সখা, কোথা গো!

অপ্সরার উক্তি

অদিতিভবন হইতে যখন
আসিতেছিলাম অলকাপুরে—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন,
শারদ তটিনী বহিছে দূরে!
সাঁঝের কনকবরন সাগর
অলস ভাবে সে ঘুমায়ে আছে,
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ
গউরীশিখর গিরির কাছে।

দেখিনু সহসা বীর একজন
সমরসাগরে গিরির মতন—
পদতলে আসি আঘাতে লহরী,
তবুও অটল-পারা।
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গিটি নাই,
শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই—
উরস-বরমে বরষার মতো
বরিষে বাণের ধারা।
অশনিধ্বনিত ঝটিকার মেঘে
দেখেছি ত্রিদশপতি—
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙিছে,
তিনি সে মহান্ অতি!
এমন উদার শান্ত ভাব বুঝি
দেখি নি তাঁহারো কভু।
পৃথ্বী নত হয় যাঁহার অসিতে,
স্বরগ যে জন পারেন শাসিতে,
দুরবল এই নারীহৃদয়ের
তাঁহারে করিনু প্রভু।
দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখাছায়া
মাথার উপরে তাঁর,
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি
নাশিতে বাণের ধার।
প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে,
দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিল
আকুল হৃদয় মোর।
থামিল সমর, জয়ী বীর মোর
উঠিলা তরণী-'পরে,
বহিল মৃদুল পবন, তরণী
চলিল গরবভরে।
গেল কত দিন— পূরব গগনে
উঠিল জলদরেখা,
মুহু ঝলকিয়া ক্ষীণ সৌদামিনী
দূর হ'তে দিল দেখা।
ক্রমশ জলদ ছাইল আকাশ,
অশনি সরোষে জ্বলি
মাথার উপর দিয়া তরণীর
অভিশাপ গেল বলি।
সহসা ভ্রূকুটি' উঠিল সাগর,
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল

সহসা কিসের লাগি ।
দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর
অধীর হইল হেন—
ভাঙে-বিভোলা মহেশের মতো
নাচিতে লাগিল যেন ।
তরণীর 'পরে একেলা অটল
দাঁড়ায়ে বীর আমার,
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত
বাজিছে হৃদয় তাঁর ।
দেখিতে দেখিতে ডুবিল তরণী,
ডুবিল নাবিক যত—
যুঝি যুঝি বীর সাগরের সাথে
হইল চেতনহত ।
আকাশ হইতে নামিয়া ছুঁইনু
অধীর জলধিজল,
পদতলে আসি করিতে লাগিল
উরমিয়া কোলাহল ।
অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
কেশপাশ চারি ধার—
সাগরের কানে ঢালিতে লাগিনু
সুধীরে গীতের ধার !

গীত

কেন গো সাগর এমন চপল
এমন অধীরপ্রাণ,
শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান !
পূরণিমানিশি আসিবে যখন
আসিবে যখন ফিরে—
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
খুলিয়ে দিব গো ধীরে !
যত হাসি তার পড়িবে তোমার
বিশাল হৃদয়-'পরে,
কত আনন্দে উরমি জাগিবে তখন
নাচিবে পুলকভরে !
তবে থাম গো সাগর, থাম গো,
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ ?
আমি লহরীশিশুরে করিব তোমার
তারার খেলেনা দান ।

দিক্‌বালাদের বলিয়া দিব,
আঁকিবে তাহারা বসি
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়
একটি একটি শশী।
তটিনীরে আমি দিব গো শিখায়ে
না হবে তাহার আন,
তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে আনিবে কুসুম
করিবে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেমধারা
করাবে তোমারে পান!
তবে থাম গো সাগর, থাম গো,
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ?
যদি উরমিশিশুরা নীরব নিশীথে
ঘুমাতে নাহিক চায়,
তবে জানিও সাগর ব'লে দিব আমি
আসিবে মৃদুল বায়—
কানন হইতে করিয়া তাহারা
ফুলের সুরভি পান
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে
ঘুম পাড়াবার গান!
অমনি তাহারা ঘুমায়ে পড়িবে
তোমার বিশাল বুকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে দেখিবে তখন
চাঁদের স্বপন সুখে!
যদি কভু হয় খেলাবার সাধ
আমারে কহিও তবে—
শতেক পবন আসিবে অমনি
হরষ-আকুল রবে—
সাগর-অচলে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
হাসিয়া সফেন হাসি
মাথার উপরে ঢালিও তাহার
প্রবালমুকতারাশি!
তবে রাখ গো আমার কথা,
তবে শুন গো আমার গান,
তবে থাম গো সাগর, থাম গো,
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ?
দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগরবালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতামালা,
গাহিতেছিল গো গান,
আঁধার-অলক কপোলের শোভা

করিতেছিল গো পান !
কেহ-বা হরষে নাচিতেছিল
হরষে পাগল-পারা,
কেশপাশ হ'তে ঝরিতেছিল
নিটোল মুকুতাধারা !
কেহ মণিময় গুহায় বসিয়া
মৃদু অভিমানভরে
সাধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।
এমন সময়ে শতেক উরমি
সহসা মাতিয়ে উঠেছে সুখে,
সহসা এমন লেগেছে আঘাত
আহা সে বালার কোমল বুকে !
ওই দেখ দেখ— আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতারাশি !
ওই দেখ দেখ— হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি !
ওই দেখ দেখ— নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিনমুখে,
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ীবুকে !
থাম গো সাগর, থাম গো— থাম গো
হোয়ো না অমন পাগল-পারা—
আহা, দেখ দেখি সাগরললনা
ভয়ে একেবারে হয়েছে সারা !
বিবরন হয়ে গিয়েছে কপোল,
মলিন হইয়ে গিয়েছে মুখ,
সভয়ে মুদিয়া আসিছে নয়ন
থরথর করি কাঁপিছে বুক !
আহা, থাম তুমি থাম গো—
হোয়ো না অধীরপ্রাণ,
রাখ গো আমার কথা,
ওগো শোন গো আমার গান !
যদি না রাখ আমার কথা,
যদি না থামে প্রমোদ তব,
তবে জানিও সাগর জানিও
আমি সাগরবালারে কব।
তারা জোছনা-নিশীথে ত্যজিয়া আলয়
সাজিয়া মুকুতাবেশে
হাসি হাসি আর গাহিবে না গান
তোমার উপরে এসে।

যে রূপ হেরিয়া লহরীরা তব
হইত পাগল-মতো,
যে গানে মজিয়া কানন ত্যজিয়া
আসিত বায়ুরা যত ।
আধখানি তনু সলিলে লুকান',
সুনিবিড় কেশরাশি
লহরীর সাথে নাচিয়া নাচিয়া
সলিলে পড়িত আসি,
অধীর উরমি মুখ চুমিবারে
যতন করিত কত,
নিরাশ হইয়া পড়িত ঢলিয়া
মরমে মিশায়ে যেত ।
সে বালারা আর আসিবে না,
সে মধুর হাসি হাসিবে না,
জোছনায় মিশি সে রূপের ছায়া
সলিলে তোমার ভাসিবে না,
তবে থাম গো সাগর, থাম গো—
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ,
তুমি রাখ এ আমার কথা,
তুমি শোন এ আমার গান ।

—

দেখিতে দেখিতে শতেক উরমি
সাগর-উরসে ঘুমায়ে এল,
দেখিতে দেখিতে মেঘেরা মিলিয়া
সুদূর শিখরে খেলাতে গেল ।
যে মহাপবন সাগরহৃদয়ে
প্রলয়খেলায় আছিল রত,
অতি ধীরে ধীরে কপোল আমার
চুমিতে লাগিল প্রণয়ী-মতো ।
গীতরব মোর দ্বীপের কাননে
বহিয়া লইয়া গেল সে ধীরে—
"কে গায়" বলিয়া কাননবালারা
থামিতে কহিল পাপিয়াটিরে ।
বীরেরে তখন লইয়া এলাম
অমরদ্বীপের কাননতীরে,
কুসুমশয়নে অচেতন দেহ
যতন করিয়া রাখিনু ধীরে ।
চেতন পাইয়া উঠিল জাগিয়া,
অবাক্ রহিল চাহি,

পৃথিবীর স্মৃতি ঢাকিয়া ফেলিনু
মায়াময় গীত গাহি ।
নূতন জীবন পাইয়া তখন
উঠিল সে বীর ধীরে,
সহসা আমারে দেখিতে পাইল
দাঁড়ায়ে সাগরতীরে ।
নিমেষ হারায়ে চাহিয়া রহিল
অবাক্ নয়ন তার,
দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন
দেখা ফুরায় না আর !
যেন আঁখি তার করিয়াছে পণ
এইরূপ এক ভাবে
নিমেষ না ফেলি চাহিয়া চাহিয়া
পাষাণ হইয়া যাবে ।
রূপে রূপে যেন ডুবিয়া গিয়াছে
তাহার হৃদয়তল,
অবশ আঁখির পলক ফেলিতে
যেন রে নাইক বল !
কাছে গিয়া তার পরশিনু বাহু,
চমকি উঠিল হেন—
তিখিনী তিখিনী অশনি-সমান
বিঁধেছে যে দেহে শত শত বাণ,
নারীর কোমল পরশটুকুও
তার সহিল না যেন !
কাছে গেলে যেন পারে না সহিতে,
অভিভূত যেন পড়ে সে মহীতে,
রূপের কিরণে মন যেন তার
মুদিয়া ফেলে গো আঁখি,
সাধ যেন তার দেখিতে কেবল
অতিশয় দূরে থাকি !

নায়কের উক্তি

কি হ'ল গো, কি হ'ল আমার !
বনে বনে সিন্ধুতীরে, বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
কি যেন হারান' ধন খুঁজি অনিবার ।
সহসা ভুলিয়ে যেন গিয়েছি কি কথা !
এই মনে আসে-আসে, আর যেন আসে না সে,
অধীর হৃদয়ে শেষে ভ্রমি হেথা হোথা !
এ কি হ'ল এ কি হ'ল ব্যথা !
সম্মুখে অপার সিন্ধু দিবস যামিনী

অবিশ্রাম কলতানে কি কথা বলে কে জানে,
লুকান' আঁধার প্রাণে কি এক কাহিনী।
সাধ যায় ডুব দিই, ভেদি গভীরতা
তল হ'তে তুলে আনি সে রহস্য কথা।
বায়ু এসে কি যে বলে পারি নে বুঝিতে,
প্রাণ শুধু রহে গো যুঝিতে!
পাপিয়া একাকী কুঞ্জে কাঁপায় আকাশ,
শুনে কেন উঠে রে নিশ্বাস!
ওগো, দেবি, ওগো বনদেবি,
বলো মোরে কি হয়েছে মোর!
কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি,
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুমঘোর।
এ যে সব লতাপাতা হেরি চারি পাশে
এরা সব জানে যেন তবুও বলে না কেন!
আধখানি বলে, আর দুলে দুলে হাসে!
নিশীথে ঘুমাই যবে কি যেন স্বপন হেরি,
প্রভাতে আসে না তাহা মনে,
কে পারে গো ছিঁড়ে দিতে এ প্রাণের আবরণ—
কী কথা সে রেখেছে গোপনে।
কী কথা সে!
এ হৃদয় অগ্নিগিরি দহিতেছে ধীরি ধীরি
কোন্ খানে কিসের হুতাশে!

অপ্সরার উক্তি

হ'ল না গো হ'ল না!
প্রেমসাধ বুঝি পূরিল না।
বলো সখা, বলো, কি-করিব বলো,
কী দিলে জুড়াবে হিয়া!
বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়াছি ফুল,
তুলেছি গোলাপ, তুলেছি বকুল,
নিজ হাতে আমি রচেছি শয়ন
কমলকুসুম দিয়া।
কাঁটাগুলি সব ফেলেছি বাছিয়া,
রেণুগুলি ধীরে দিয়েছি মুছিয়া,
ফুলের উপরে গুছায়েছি ফুল
মনের মতন করি—
শীতল শিশির দিয়েছি ছিটায়ে
অনেক যতন করি।

হ'ল না গো হ'ল না,
প্রেমসাধ বুঝি পূরিল না!

শুন ওগো সখা, বনবালারে
দিয়েছি যে আমি বলি,
প্রতি শাখে শাখে গাইবে পাখি
প্রতি ফুলে ফুলে অলি।
দেখ চেয়ে দেখ বহিছে তটিনী,
বিমল তটিনী গো।
এত কথা তার রয়েছে প্রাণে,
বলিবারে চায় তটের কানে,
তবুও গভীর প্রাণের কথা
ভাষায় ফুটে নি গো!
দেখ হোথা ওই সাগর আসি
চুমিছে রজত বালুকারাশি,
দেখ হেথা চেয়ে চপল চরণে
চলেছে নির্ঝরধারা।
তীরে তীরে তার রাশি রাশি ফুল
হাসি হাসি তারা হতেছে আকুল,
লহরে লহরে ঢলিয়া ঢলিয়া
খেলায়ে খেলায়ে হতেছে সারা।

হ'ল না গো হ'ল না,
প্রেম সাধ বুঝি পূরিল না।
তবে শুনিবে কি সখা গান?
তবে খুলিয়া দিব কি প্রাণ
তবে চাঁদের হাসিতে নীরব নিশীথে
মিশাব ললিততান?
আমি গাব হৃদয়ের গান।
আমি গাব প্রণয়ের গান।
কভু হাসি কভু সজল নয়ন,
কভু বা বিরহ কভু বা মিলন,
কভু সোহাগেতে ঢলঢল তনু
কভু মধু অভিমান।
কভু বা হৃদয় যেতেছে ফেটে,
সরমে তবুও কথা না ফুটে,
কভু বা পাষাণে বাঁধিয়া মরম
ফাটিয়া যেতেছে প্রাণ!

হ'ল না গো হ'ল না,
মনোসাধ আর পূরিল না।
এসো তবে এসো মায়ার বাঁধন
খুলে দিই ধীরে ধীরে—
যেথা সাধ যাও, আমি একাকিনী
ব'সে থাকি সিন্ধুতীরে।

গান

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখিটি উড়িয়ে যাক্ !
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখিটি উড়িয়ে যাক্ !
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায় !
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায় !
সাধের স্বপন যায় রে যায় !
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা ।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে—
রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে—
আকাশে তাহার বাসা ।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ !
কি জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তার
তবে থাক্ তবে থাক্ !

প্রভাতী

শুন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি !
দেখ্ তোমারি দুয়ার-'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি ।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি ।

তবে তুমি গো সজনি জাগিবে না কি,
আমি যে তোমারি কবি ।
শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান ।
প্রভাতজলদ, প্রভাতসমীর,
প্রভাতবিহগ, প্রভাতশিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলি
মিশাবে মধুর তান !
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি—
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠো চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর তো রজনী নাহি !
শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী-আরসীর 'পরে
অপরূপ রূপরাশি ।
তবে থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি ।

কামিনী ফুল

ছি ছি সখা কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে
কামিনীকুসুম ছিল বন আলো করিয়া—
মানুষপরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া ।
জান তো কামিনী সতী কোমল কুসুম অতি
দূর হ'তে দেখিবারে, ছুঁইবারে নহে সে—
দূর হ'তে মৃদু বায় গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে ।
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে !
পরশিতে রবিকর শুকায়েছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে ।

হেন কোমলতাময় ফুল কি না-ছুঁলে নয় !
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া !
মানুষপরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া !

লাজময়ী

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে, ফুটে না।
কখন-বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠে না।
অভিমানে যাই দূরে, কথা তার নাহি ফুরে,
চরণ বারণ-তরে উঠে উঠে, উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি
চেয়ে থাকে, লাজবাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি দেখে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি তখন কিসের লাগি
মরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না !
লাজময়ি তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবরিষার স্রোতে লাজ তবু ছুটে না !

প্রেমমরীচিকা

রাগিণী ঝিঝিট-খাম্বাজ

ও কথা বোল' না তারে— কভু সে কপট না রে,
আমার কপালদোষে চপল সে জন !
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মতো করে অন্বেষণ !
ভালো সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালোবাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবনকল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয় ?— সে যদি কপট হয়
তবে সত্য ব'লে কিছু নাহি এ ধরায় !
স্বচ্ছ দর্পণের মতো বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।

তাহা কপটতাময় ?— কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস ।
ও কথা বোল' না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন—
প্রেমমরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন ।

গোলাপবালা

গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌

রাগিণী বেহাগ

বলি, ও আমার গোলাপবালা,
বলি, ও আমার গোলাপবালা,
তোল মুখানি, তোল মুখানি,
কুসুমকুঞ্জ কর আলা ।
বলি, কিসের সরম এত ?
সখি, কিসের সরম এত ?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত ?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত ।
সখি, বলিতে মনের কথা
বলো এমন সময় কোথা ?
প্রিয়ে, তোল মুখানি, আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !
আমি এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মতো সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে ।
আর কেহ শুনিবে না, কেহ জাগিবে না,
প্রেমকথা শুনি প্রতিধনিবালা
উপহাস সখি করিবে না,
পরিহাস সখি করিবে না ।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও !
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও !

সখি, একটি চুম্বন দাও !
গোপনে একটি চুম্বন দাও !
সখি, তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি সারারাত ধ'রে, প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারাদিন ধ'রে গাহিব সজনি
তোমারি প্রণয়গান !
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে-সব গান,
দূরে মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে মজিয়া সে প্রেমগানে,
সবে চাহিবে আকাশপানে,
তারা ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণগান।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও !
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও !
নীরবে একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন দাও !

হরহৃদে কালিকা

কে তুই লো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে ?
নাই হোথা সুখ-আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের— পৃথিবীর ভাবনা !
আছে শুধু ওই রূপে বুকখানি ভরিয়ে—
আছে শুধু ওই রূপে মনে মন মরিয়ে।
বুকের জ্বলন্ত শিরে রক্তরাশি নাচায়ে,
পাষাণ পরানখানি এখনো বাঁচায়ে,
নাচিছে হৃদয়মাঝে জ্যোতির্ময়ী কামিনী,
শোণিততরঙ্গে ছুটে প্রস্ফুরিত দামিনী।
ঘুমায়েছে মনখানা, ঘুমায়েছে প্রাণ গো,
এক স্বপ্নে ভরা শুধু হৃদয়ের স্থান গো !
জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপছলে পাগল ভিখারী বলে—
তাই আমি চাই হতে, আর কিবা চাহি রে !

ভিখারী করিব ভিক্ষা বাঘাম্বর পরিয়ে,
বিমোহন রূপখানি হৃদিমাঝে ধরিয়ে।

... ...

একদা প্রলয়শিঙা বাজিয়া রে উঠিবে !
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা,
অমনি এ জগতের রাশরজ্জু টুটিবে।
আলোকসর্বস্ব হারা অন্ধ যত গ্রহ তারা।
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহাশূন্যে ছুটিবে !
ঘুম হ'তে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয় জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে !
আঁধারকুন্তল তোর মহাশূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কালঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া ?
অন্ধকারে দিশাহারা কম্পমান গ্রহ তারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবি সেই বিশ্বচূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে !
এমনি রহিব স্তব্ধ ওই মুখে চাহিয়া—
দেখিব হৃদয়মাঝে কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী, প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া !
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে—
ঘোর স্তব্ধ, মহাস্তব্ধ, মহাশূন্য রহিবে
আঁধারের সিন্ধুরবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই ঊর্মি, নাই তীর—
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া !
তখনো র'বি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে ?

ভগ্নতরী

গাথা

প্রথম সর্গ

ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার,
দিবা হল অবসান—
ঘুমায় সাঁঝের সাগর, করিয়া
কনককিরণ পান।
অলস লহরী তটের চরণে
ঘুমে পড়িতেছে ঢুলি,

এ উহার গায়ে পড়েছে এলায়ে
ভাঙাচোরা মেঘগুলি ।
কনকসলিলে লহরী তুলিয়া
তরণী ভাসিয়া যায়—
উড়িয়াছ পাল, নাচিছে নিশান,
বহে অনুকূল বায় ।
শত কণ্ঠ হতে সাঁঝের আকাশে
উঠিছে সুখের গীত,
তালে তালে তার পড়িতেছে দাঁড়,
ধ্বনিতেছে চারি ভিত ।
বাজিতেছে বীণা, বাজিতেছে বাঁশি,
বাজিতেছে ভেরী কত—
কেহ দেয় তালি, কেহ ধরে তান,
কেহ নাচে জ্ঞানহত ।
তারকা উঠিছে ফুটিয়া ফুটিয়া,
আকাশে উঠিছে শশী,
উছলি উছলি উঠিছে সাগর
জোছনা পড়িছে খসি ।
অতি নিরিবিলি নিরালায় দেখ
না মিশিয়া কোলাহলে
ললিতা হোথায় পতি সাথে তার
বসি আছে গলে গলে ।
অজিতের গলে বাঁধি বাহুপাশ
বুকেতে মাথাটি রাখি
ঢলঢল তনু, গল'গল' করা
ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি ।
আধো-আধো হাসি অধরে জড়িত,
সুখের নাহি যে ওর,
প্রণয়বিভল প্রাণের মাঝারে
লেগেছে ঘুমের ঘোর ।
পরশিছে দেহ নিশীথের বায়ু
অতি ধীর মৃদুশ্বাসে,
লহরীরা আসি করে কলরব
তরণীর আশে-পাশে ।
মধুর মধুর সকলি মধুর,
মধুর আকাশ ধরা,
মধুরজনীর মধুর অধর
মধু জোছনায় ভরা ।
যেতেছে দিবস, চলেছে তরণী
অনুকূল বায়ুভরে ।
ছোটো ছোটো ঢেউ মাথাগুলি তুলি

টলমল করি পড়ে।
প্রণয়ীর কাল যেতেছে, তুলিয়া
শত বরণের পাখা,
মৃদুবায়ুভরে লঘু মেঘ যেন
সাঁঝের-কিরণ-মাখা।
আদরে ভাসিয়া গাহিছে অজিত
চাহি ললিতার পানে
মরণ-গলানো সোহাগের গীত
আবেশ-অবশ প্রাণে।—

গান

পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল্।
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল!
আদরের ধন তুমি আদরে রাখিব আমি,
আদরিণি, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি—
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব আঁখিজলে আঁখিজল।

হরষে কভু বা গাইছে ললিতা
অজিতের হাত ধরি,
মুখপানে তার চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমে আঁখি দুটি ভরি।—

গান

ওই কথা বলো সখা, বলো আর বার,
ভালোবাসো মোরে তাহা বলো বার-বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভালোবাসো মোরে তাহা বলো গো আবার!

. . .

সান্ধ্য দিক্‌বধূ স্তব্ধ ভয়ভারে,
একটি নিশ্বাস পড়ে না তার;
ঈশান-গগনে করিছে মন্ত্রণা
মিলিয়া অযুত জলদভার।
তড়িতছুরিতে বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ফেলিছে আঁধারে শতধা করি,
দূর ঝটিকার রথচক্ররব
ঘোষিছে অশনি ত্রিলোক ভরি।
সহসা উঠিল ঘোর গরজন,
প্রলয়ঝটিকা আসিছে ছুটে।

ছিন্ন মেঘজাল দিশ্বিদিকে ধায়,
ফেনিল তরঙ্গ আকুলি উঠে ।
পাগলের মতো তরীযাত্রী যত
হেথা হোথা ছুটে তরণী-'পরে—
ছিঁড়িতেছে কেশ, হানিতেছে বুক,
করে হাহাকার কাতর স্বরে ।
ছিন্নতার বীণা যায় গড়াগড়ি,
অধীরে ভাঙিয়া ফেলেছে বাঁশি—
ঝটিকার স্বর দিতেছে ডুবায়ে
শতেক কণ্ঠের বিলাপরাশি ।
তরণীর পাশে নীরব অজিত,
ললিতা অবাক্-হিয়া
মাথাটি রাখিয়া অজিতের কাঁধে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া ।
কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজনে মিলি ?
মুকুতাশয়নে সাগরের তলে
ঘুমাইবে নিরিবিলি ।
দুইটি প্রণয়ী বাঁধা গলে গলে
কাছাকাছি পাশাপাশি,
পশিবে না সেথা দ্বেষ কোলাহল,
কুটিল কঠোর হাসি ।
ঝটিকার মুখে হীনবল তরী
করিতেছে টলমল্—
উঠিছে, নামিছে, আছাড়ি পড়িছে,
ভিতরে পশিছে জল ।
বাঁধিল ললিতা অজিতের বাহু
দৃঢ়তর বাহুডোরে,
আদরে অজিত ললিতা-অধর
চুমিল হৃদয় ভ'রে ।
ললিতা-কপোলে বাহিয়া পড়িল
নয়নের জল দুটি—
নবীন সুখের স্বপন, হায় রে,
মাঝখানে গেল টুটি ।
"আয় সখি আয়" কহিল অজিত—
হাত ধরাধরি করি
দুজনে মিলিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল
আকুল সাগর-'পরি ।

দ্বিতীয় সর্গ

নবরবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া
নিশার আঁধাররাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।
ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী
মেঘকোলে ঘুমাইয়া পড়েছে দামিনী।
থেকে থেকে স্বপনেতে চমকিয়া চায়,
ক্ষীণ হাসিখানি হেসে আবার ঘুমায়।
শান্ত লহরীরা এবে শ্রান্ত পদক্ষেপে
তীর-উপলের 'পরে পড়ে কেঁপে কেঁপে।
দ্বীপের শৈলের শির প্লাবিত করিয়া।
অজস্র কনকধারা পড়িছে ঝরিয়া।
মেঘ, দ্বীপ, জল, শৈল, সব সুরঞ্জিত—
সমস্ত প্রকৃতি গায় স্বর্ণ-ঢালা গীত।
বহু দিন হতে এক ভগ্নতরী জন
করিছে বিজন দ্বীপে জীবনযাপন।
বিজনতাভারে তার অবসন্ন বুক,
কত দিন দেখে নাই মানুষের মুখ।
এত দিন মৌন আছে না পেয়ে দোসর,
শুনিলে চমকি উঠে আপনার স্বর।
সুরেশ প্রভাতে আজি ছাড়িয়া কুটির
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল সাগরের তীর।
বিমল প্রভাতে আজি শান্ত সমীরণ
ধীরে ধীরে করে তার দেহ আলিঙ্গন।
নীরবে ভ্রমিছে কত— একি রে— একি রে—
সুমুখে কি দেখিতেছি সাগরের তীরে ?
রূপসী ললনা এক রয়েছে শয়ান,
প্রভাতকিরণ তার চুমিছে বয়ান—
মুদিত নয়ন দুটি, শিথিলিত কায়,
সিক্ত কেশ এলোথেলো শুভ্র বালুকায়।
প্রতিক্ষণে লহরীরা ঢলিয়া বেলায়
এলানো কুন্তল ল'য়ে কত না খেলায় !
বহু দিন পরে যথা কারামুক্ত জন
হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন
বহু দিন পরে হেরি মানুষের মুখ
উচ্ছ্বসি উঠিল সুখে সুরেশের বুক।
দেখিল এখনো বহে নিশ্বাসসমীর,
এখনো তুষারহিম হয় নি শরীর।

যতনে লইল তারে বাহুতে তুলিয়া,
কেশপাশ চারি পাশে পড়িল খুলিয়া ।
সুকুমার মুখখানি রাখি স্কন্ধোপরে,
দ্রুত পদে প্রবেশিল কুটীরভিতরে।
কতক্ষণ-পরে তবে লভিয়া চেতন
ললিতা সুধীরে অতি মেলিল নয়ন ।
দেখিল যুবক এক রয়েছে আসীন,
বিশাল নয়ন তার নিমেষবিহীন—
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি গৌর গ্রীবা-'পরে
এলাইয়া পড়ি আছে অতি অনাদরে ।
চমকি উঠিল বালা বিস্ময়ে বিহ্বল,
সরমে সম্বরে তার শিথিল অঞ্চল ।
ভয়েতে অবশ দেহ, দুরু দুরু হিয়া—
আকুল হইয়া কিছু না পায় ভাবিয়া ।
সহসা তাহার মনে পড়িল সকলি—
সহসা উঠিল বসি নববলে বলী ।
সুরেশের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া
পাগলের মতো বালা উঠিল কহিয়া,
"কেন বাঁচাইলে মোরে কহ মোরে কহ—
দুই প্রণয়ীর কেন ঘটালে বিরহ ?
অনন্ত মিলন যবে হইল অদূর—
দ্বার হতে ফিরাইয়া আনিলে নিষ্ঠুর !
দয়া কর একটুকু দুখিনীর প্রতি,
দিও না তাপসবর বাধা এক রতি—
মরিব— নিভাব প্রাণ সাগরের জলে,
মিলিব সখার সাথে নীলসিন্ধুতলে,
উপরে উঠিবে ঝড়, ঊর্মি শৈলাকার,
নিম্নে কিছু পশিবে না কোলাহল তার !"

তৃতীয় সর্গ

মরমের ভার বহি দারুণ যাতনা সহি
ললিতা সে কাটাইছে দিন ।
নয়নে নাই সে জ্যোতি হৃদয় অবশ অতি,
শরীর হইয়া গেছে ক্ষীণ ।
আলুথালু কেশপাশ, বাঁধিতে নাহিক আশ,
উড়িয়া পড়িছে থাকি থাকি ।
কী করুণ মুখখানি, একটি নাইক বাণী,
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত দুটি আঁখি ।
যে দিকে চরণ ধায় সে দিকে চলেছে হায়,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই মনে ।

গাছের কাঁটার ধার ছিঁড়িছে আঁচল তার,
লতাপাশ বাধিছে চরণে।
একাকী আপনমনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
যাইত সে তটিনীর তীরে—
লতায় পাতায় গাছে আঁধার করিয়া আছে,
সেইখানে শুইত সুধীরে।
জলকলরবরাশি প্রাণের ভিতরে আসি
ঢালিত কি বিষাদের ধারা!
ফাটিয়া যাইত বুক, বাহুতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ'ত সারা।
কাননশৈলের পায়ে মধ্যাহ্নে গাছের ছায়ে
মলিন অঞ্চলে রাখি মাথা
কত কি ভাবিত হায়, উচ্ছ্বসি উঠিত বায়,
ঝরিয়া পড়িত শুষ্ক পাতা।
গভীর নীরব রাতে উঠিয়া শৈলের মাথে
বসিয়া রহিত একাকিনী—
তারা-পানে চেয়ে চেয়ে কত-কি ভাবিত মেয়ে,
পড়িত কি বিষাদকাহিনী!
কী করিলে ললিতার ঘুচিবে হৃদয়ভার
সুরেশ না পাইত ভাবিয়া—
কাতর হইয়া কত যুবা তারে শুধাইত,
আগ্রহে অধীর তার হিয়া—
"রাখ কথা, শুন সখি, একবার বলো দেখি
কি করিব তোমার লাগিয়া?
কি চাও, কি দিব বালা, বলো গো কিসের জ্বালা?
কি করিলে জুড়াবে ও হিয়া?"
করুণ মমতা পেয়ে সুরেশের মুখ চেয়ে
অশ্রু উচ্ছ্বসিত দরদরে—
ললিতা কাতর রবে রুদ্ধকণ্ঠে কহে তবে,
"সখা গো ভেব না মোর তরে!
আমারে দিও না দেখা, বিজনে রহিব একা
বিজনেই নিপাতিব দেহ।
এ দগ্ধ জীবন মোর কাঁদিয়া করিব ভোর,
জানিতেও পারিবে না কেহ!"
সুরেশ ব্যথিতহিয়া একেলা বিজনে গিয়া
ভাবিত, কাঁদিত আনমনে—
প্রাণপণ করি তার তবুও তো ললিতার
পারিল না অশ্রুবিমোচনে।
সুরেশ প্রভাতে উঠি সারাটি কানন লুটি
তুলিয়া আনিত ফুলভার,
ফুলগুলি বাছি বাছি গাঁথি লয়ে মালাগাছি

ললিতারে দিত উপহার।
নির্ঝরে লইত জল, তুলিয়া আনিত ফল
আহারের তরে বালিকার।
যতন করিয়া কত পর্ণশয্যা বিছাইত,
গুছাইত ঘরখানি তার।

... ...

শীতের তীব্রতা সহি তপনকিরণে দহি
করিয়া শতেক অত্যাচার,
মনের ভাবনা-ভরে অবসন্ন কলেবরে
পীড়া অতি হল ললিতার।
অনলে দহিছে বুক, শুকায়ে যেতেছে মুখ,
শুষ্ক অতি রসনা তৃষায়—
নিশ্বাস অনলময়, শয্যা অগ্নি মনে হয়,
ছটফট করে যাতনায়।
ত্যজিয়া আহার পান সারা-রাত্রি-দিনমান
সুরেশ করিছে তার সেবা,
তৃষার্ত অধরে তার ঢালিছে সলিলধার,
ব্যজন করিছে রাত্রি দিবা।
নিশীথে সে রুগ্নঘরে একটি শিলার-'পরে
দীপশিখা নিভ'নিভ' বায়ে—
জ্যোতি অতি ক্ষীণতর, দু-পা হয়ে অগ্রসর
অন্ধকারে যেতেছে হারায়ে।
আকুল নয়ন মেলি কাতর নিশ্বাস ফেলি
একটিও কথা না কহিয়া
শিয়রের সন্নিধানে সুরেশ সে মুখপানে
একদৃষ্টে রহিত চাহিয়া।
বিকারে ললিতা যত বকিত পাগল-মত,
ছটফট করিত শয়ানে—
ততই সুরেশ-হিয়া উঠিত গো ব্যাকুলিয়া,
অশ্রুধারা পুরিত নয়নে।
যখনি চেতনা পেয়ে ললিতা উঠিত চেয়ে
দেখিত সে শিয়রের কাছে
ম্লানমুখ করি নত নিস্তব্ধ ছবির মতো
সুরেশ নীরবে বসি আছে।
মনে তার হত তবে এ বুঝি দেবতা হবে,
অসহায়া অবলা বালারে
করুণাকোমল প্রাণে এ ঘোর বিজন স্থানে
রক্ষা করে নিশার আঁধারে।
অশ্রুধারা দরদরি কপোলে পড়িত ঝরি,
সুরেশের ধরি হাতখানি

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণে আঁখি তুলি মুখপানে
নীরবে কহিত কত বাণী !
রোগের অনলজ্বালা সহিতে না পারি বালা
করিত সে এ-পাশ ও-পাশ,
হেরিয়ে করুণাময় সুরেশের আঁখিদ্বয়
অনেক যাতনা হত হ্রাস ।
ফল-মূল-অন্বেষণে যুবা যবে যেত বনে
একেলা ঠেকিত ললিতার ।
চাহিত উৎসুকহিয়া প্রতি শব্দে চমকিয়া,
সমীরণে নড়িলে দুয়ার।
বনে বনে বিহরিয়া ফুল ফল আহরিয়া
সুরেশ আসিত যবে ফিরে—
আঁখি পাতা বিমুদিত অতি মৃদু উঠাইত,
হাসিটি উঠিত ফুটি ধীরে ।
দিন রাত্রি নাহি মানি বনৌষধি তুলি আনি
সুরেশ করিছে সেবা তার ।
রোগ চলি গেল ধীরে, বল ক্রমে পেলে ফিরে,
সুস্থ হল দেহ ললিতার ।
রোগশয্যা তেয়াগিয়া মুক্ত সমীরণে গিয়া
মনসুখে বনে বনে ফিরি
পাখির সংগীত শুনি সিন্ধুর তরঙ্গ শুনি
জীবনে জীবন এল ফিরি ।

চতুর্থ সর্গ

বসন্তসমীর আসি কাননের কানে কানে
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালে নব যৌবনের গানে ।
এক ঠাঁই পাশাপাশি ফুটে ফুল রাশি রাশি—
গলাগলি ফুলে ফুলে, গায়ে গায়ে ঢলাঢলি ।
খেলি প্রতি ফুল-'পরে সুরভিরাশির ভরে
শ্রান্ত সমীরণ পড়ে প্রতি পদে টলি টলি ।
কোথায় ডাকিছে পাখি খুঁজিয়া না পায় আঁখি—
বনে বনে চারি দিকে হাসিরাশি বাদ্যগান ।
দুরগম শৈল যত ঢাকা লতা গুল্মে শত
তাদের হরিত হৃদে তিল মাত্র নাই স্থান ।
ললিতার আঁখি হতে শুকায়েছে অশ্রুধার,
বসন্তগীতের সাথে বাজিছে হৃদয় তার
পুরানো পল্লব ত্যজি নবকিশলয়ে যথা
চারি দিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা,
তেমনি গো ললিতার হৃদয়লতাটি ঘিরে
নবীন হরিতপ্রেম বিকশিছে ধীরে ধীরে ।

ললিতা সে সুরেশের হাতে হাত জড়াইয়া
বসন্তহসিত বনে ভ্রমিত হরষমনে,
করুণ চরণক্ষেপে ফুলরাশি মাড়াইয়া।
একটি দুর্গম শৈল সাগরে পড়েছে ঝুঁকি—
অতি ক্লেশে সেথা উঠি বসিয়া রহিত দুটি,
সায়াহ্নকিরণ জলে করিত গো ঝিকিমিকি।
লহরীরা শৈল-'পরে শৈবালগুলির তরে
দিন রাত্রি খুদিতেছে নিকেতন শিলাসার।
ফুল-ভরা গুল্মগুলি সলিলে পড়েছে ঝুলি,
তরঙ্গের সাথে সাথে ওঠে পড়ে শতবার।
বিভলা মেদিনীবালা জোছনামদিরা-পানে,
হাসিছে সরসীখানি কাননের মাঝখানে,
সুরেশ যতনে অতি বাঁধি তরুশাখাগুলি
নৌকা নিরমিয়া এক সরসে দিয়াছে খুলি—
চড়ি সে নৌকার 'পরে জ্যোৎস্নাসুপ্ত সরোবরে
সুরেশ মনের সুখে ভ্রমিত গো ফিরি ফিরি,
ললিতা থাকিত শুয়ে কোলে তার মাথা থুয়ে,
কখন বা মধুমাখা গান গেয়ে ধীরি ধীরি।
কখন বা সায়াহ্নের বিষণ্ণ কিরণজালে,
অথবা জোছনা যবে কাঁপে বকুলের ডালে,
মৃদু মৃদু বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ লাগি,
সহসা ললিতাহৃদি আকুলি উঠিত যদি,
সহসা দুয়েক কথা স্মরণে উঠিত জাগি,
সহসা একটি শ্বাস বাহিরিত আনমনে,
দুইটি অশ্রুর রেখা দেখা দিত দু-নয়নে—
অমনি সুরেশ আসি ধরি তার মুখখানি
কহিত করুণ স্বরে কত আদরের বাণী।
মুছাইত আঁখিধারা যতন করিয়া অতি,
শরতমেঘের মতো হৃদয়-আঁধার যত
মুহূর্তে ছুটিত আর ফুটিত হাসির জ্যোতি।
অমনি সে সুরেশের কাঁধে মুখ লুকাইয়া
আধো কাঁদি আধো হাসি হৃদয়ের ভাররাশি
সোহাগের পারাবারে দিত সব বিসর্জিয়া।

পঞ্চম সর্গ

নারিকেল-তরুকুঞ্জে বসিয়া দোঁহায়
একদা সেবিতেছিল প্রভাতের বায়—
সহসা দেখিল চাহি প্রাণপণে দাঁড় বাহি
তরণী আসিছে এক সে দ্বীপের পানে,

দেখিয়া দোঁহার হিয়া উঠিল গো উথলিয়া
বিস্ময়হরষ আর নাহি ধরে প্রাণে !
হরষে ভাবিল দোঁহে দেশে যাবে ফিরে,
কুটীর বাঁধিবে এক বিপাশার তীরে ।
দুখ শোক ভুলি গিয়া একত্রে দুইটি হিয়া
সুখে জীবনের পথে করিবে ভ্রমণ,
একত্রে দেখিবে দোঁহে সুখের স্বপন ।

উঠিল তরণী-'পরে, অনুকূলবায়ুভরে
স্বদেশে করিল আগমন—
বাঁধিয়া পরণশালা না জানিয়া কোনোজ্বালা
করিতেছে জীবনযাপন ।
নির্ঝর কানন নদী দ্বীপের কুটীর যদি
তাহাদের পড়িত স্মরণে,
দুটিতে মগন হয়ে অতীতের কথা লয়ে
ফুরাতে নারিত সারাক্ষণে
আধ' ঘুমঘোরে প্রাতে পল্লবমর্মর-সাথে
শুনি বিপাশার কলস্বর—
স্বপনে হইত মনে দূর সে দ্বীপের বনে
শুনিতেছে নির্ঝরঝর্ঝর !
দ্বীপের কুটীরখানি কল্পনায় মনে আনি
ভাবিত সে শূন্য আছে পড়ি,
ভগ্ন ভিতে উঠে লতা, গৃহসজ্জা হেথা হোথা
প্রাঙ্গণে যেতেছে গড়াগড়ি,
হয়তো গো কাঁটাগাছে এত দিনে ঘিরিয়াছে
ললিতার সাধের কানন—
এত দিনে শাখা জুড়ি ফুটেছে মালতীকুঁড়ি
দেখিবার নাই কোনো জন ।
সেই যে শৈলেতে উঠি বসিয়া রহিত দুটি,
নারিকেলকুঞ্জটির কাছে—
চারি দিকে শিলারাশি ছড়াছড়ি পাশাপাশি
তাহারা তেমনি রহিয়াছে ।
মজিয়া কল্পনামোহে কত কি ভাবিত দোঁহে,
মাঝে মাঝে উঠিত নিশ্বাস,
অতীত আসিত ফিরে, গায়ে যেন ধীরে ধীরে
লাগিত সে দ্বীপের বাতাস ।
একদা চাঁদিনী রাতি দুজনে প্রমোদে মাতি
গেছে এক বিজন কাননে—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা কহিতে কহিতে কথা
কত দূরে গেল আনমনে ।
সহসা সে বিভাবরী আইল আঁধার করি—
গগনে উঠিল মেঘরাশি,

পথ নাহি দেখা যায়, ক্ষণে ক্ষণে ঝলকায়
বিদ্যুতের পরিহাসহাসি।
প্রতি বজ্রগরজনে, ললিতা শঙ্কিতমনে
সুরেশে জড়ায় দৃঢ়তর।
অবসন্ন পদ তায় প্রতি পদে বাধা পায়,
তরাসেতে তনু থর থর।
ঝলিল বিদ্যুৎ-শিখা, ভগ্ন এক অট্টালিকা
অদূরেতে প্রকাশিল তথা—
কক্ষ এক হতে তার মুমূর্ষু আলোকধার
কহে কি রহস্যময় কথা!
চলিল আলয়-পানে দোঁহে আশ্বাসিত প্রাণে,
সহসা জাগিল নীরবতা—
উঠিল সংগীতস্বর, বালার হৃদয়-'পর
প্রবেশিল দু-একটি কথা—
"পাগলিনী, তোর লাগি কি আমি করিব বল্।
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল।"
কাঁপিছে বালার বুক, নীল হয়ে গেছে মুখ,
কপোলে বহিছে ঘর্মজল—
ঘুরিছে মস্তক তার, চরণ চলে না আর,
শরীরে নাইক বিন্দুবল।
তবুও অবশমনে অলক্ষিত আকর্ষণে
চলিল সে ভীষণ আলয়ে—
অঙ্গন হইয়া পার খুলি এক জীর্ণ দ্বার
গৃহে পদার্পিল ভয়ে ভয়ে।
ভগ্ন ইষ্টকের 'পরে দীপ মিট্ মিট্ করে,
বিদ্যুৎ ঝলকে বাতায়নে—
ভেদি গৃহভিত্তি যত বটমূল শত শত
হেথা হোথা পড়িছে নয়নে।
বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা
পুরুষ একটি শ্রান্তকায়—
অতি শীর্ণ দেহ তার, এলোথেলো জটাভার,
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি ভায়।
জ্যোতিহীন নেত্র তাঁর, পাতাটিও তুলিবার
নাই যেন আঁখির শকতি—
দ্বারে শুনি পদধ্বনি হৃদয়ে বিস্ময় গনি
তুলে মুখ ধীরে ধীরে অতি।
সহসা নয়নে তার জ্বলিল অনল,
সহসা মুহূর্ততরে দেহে এল বল্।
"ললিতা" "ললিতা" বলি করিয়া চীৎকার—
দু-পা হয়ে অগ্রসর কম্পবান কলেবর
শ্রান্ত হয়ে ভূমিতলে পড়িল আবার।

করুণ নয়নে অতি ললিতা-মুখের প্রতি
অজিত রহিল স্তব্ধ একদৃষ্টে চাহি—
দীপশিখা অতি স্থির, স্তব্ধ গৃহ সুগভীর,
চারি দিকে একটুকু সাড়াশব্দ নাহি।
দুই হাতে আঁখি চাপি থর থর কাঁপি কাঁপি
মূর্ছিয়া ললিতা বালা পড়িল অমনি!
বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জিল অশনি—
জীর্ণ গৃহ কাঁপাইয়া ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ, গৃহ পূরিল আঁধারে।

পথিক

প্রভাতে

উঠ, জাগ তবে— উঠ, জাগ সবে—
হের ওই হের, প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরণ গো!
নিশার ভীষণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণচরণ গো!
মাথায় বিজয়কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয়কিরণমাল,
বিজয়বিভায় উজলি উঠেছে
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল!
উষা নববধূ দাঁড়াইয়া পাশে—
গরবে সরমে সোহাগে উলাসে
মৃদু মৃদু হেসে সারা হল বুঝি,
বুঝিবা সরম রহে না তার!
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,
অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
হাসি সে বারণ সহে না আর!
এসো এসো তবে— ছুটে যাই সবে,
কর কর তবে ত্বরা—
এমন বহিছে প্রভাতবাতাস,
এমন হাসিছে ধরা!
সারা দেহে যেন অধীর পরান
কাঁপিছে সঘনে গো,

অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
অধীর হৃদয় মম
প্রভাতবিহগসম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
উড়িবে গগনে গো!
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর— দূর যাব,
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
কত শত গান গাব!
কি গান গাইবে? কি গান গাইব!
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হৃদয়ের গান, জীবনের গান—
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর দূর যাব!
কোথায় যাইবে? কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়—
কুসুমকাননে, অচল শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণিমুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!
দেখ চেয়ে দেখ পথ ঢাকা আছে
কুসুমরাশিতে রে,
কুসুম দলিয়া যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে!
ফুলে কাঁটা আছে? কই! কাঁটা কই!
কাঁটা নাই— নাই— নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমনে থাকিবে ভাই!
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়!
ত্বরা ক'রে আয় ত্বরা ক'রে আয়,
যাই মোরা যাই চল্।
নিঝর যেমন বহিয়া চলিছে
হরষেতে টলমল—
নাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,

শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে,
হাসিতেছে খল খল্ !
তরুণ মনের উচ্ছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাতসমীর,
ছুটেছে কোথায় ?— কে জানে কোথায় !
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া, তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল্ ।
আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব অহরহ,
এক সাথে মোরা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমণ,
বহিছে এমন প্রভাতপবন,
হাসিছে এমন ধরা !
যে যাইবি আয়— যে থাকিবি থাক—
যে আসিবি কর্ ত্বরা !

—

আমি যাব গো !—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান
দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো !
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়,
শতবার আশা করি শতবার ভেঙে যায়—
আমি যাব গো !
সারারাত ব'সে আছি, আঁখি মোর অনিমেষ ।
প্রাণের ভিতর দিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,
চারি দিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ ।
ভগ্ন আশা ভগ্ন সুখ ধূলিমাখা জীর্ণ স্মৃতি ।
সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে,
একটি আধটি ইঁট খসিতেছে নিতি নিতি—
আমি যাব গো !
নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায় !—
এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে পশে সুর ভয়ে ভয়ে,
প্রতিধ্বনি মৃদুল জাগায়—

তারা ভগ্ন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি!
কত স্বপ্ন হায়!
কত দীপালোক— কত ফুল— কত পাখি!
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি!
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে!
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙা মুখ কপোলে কপোল রাখে!
কত স্বপ্ন হায়!
হৃদয় চমকি উঠি চারি দিকে চায়,
দেখে গো কঙ্কালরাশি হেথায় হোথায়!
সে দীপ নিভিয়া গেছে,
সে ফুল শুখায়ে গেছে,
সে পাখি মরিয়া গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চিরতরে নিমীলিত।—
আমি যাব গো!
দেখি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো!
এ ভগ্ন বীণার তন্ত্রী ছিঁড়েছে সকল আর—
দুটি বুঝি বাকি আছে তার!
এখনো প্রভাতে যদি হরষিতপ্রাণ
এ বীণা বাজাতে যাই চমকি শুনিতে পাই
সহসা গাহিয়া উঠে যৌবনেরি গান
সেই দুটি তার।
টুটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে বাকি যত আর।
যুগ-যুগান্তের এই শুষ্ক জীর্ণ গাছে
দুটি শাখা আছে—
এখনো যদি গো শুনে বসন্তপাখির গীত,
এখনো পরশে যদি বসন্তমলয়বায়,
দু-চারিটি কিশলয়
এখনো বাহির হয়,
এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত,
একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চায়,
ফুটো-ফুটো হয় যবে ঝরিয়া মরিয়া যায়।
এ ভগ্ন বীণার দুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ করেছে আজি গো—
নবযৌবনের গান ললিতরাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে
শ্মশানেতে হাসিমুখ শিশুটির প্রায়—

লইয়া মাথার খুলি   আধ-পোড়া অস্থিগুলি
প্রমোদে ভস্মের 'পরে ছুটিয়া বেড়ায়।
তোমরা তরুণ পাখি উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখি এ শুষ্ক শাখে   একেলা কেমনে থাকে !
সাধ—   তোমাদেরি, সাথে যায়,
সাধ—   তোমাদেরি গান গায়,
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরানো কণ্ঠ মোর
বাজিবে না সুরে ?
নাহয় নীরবে রব',   নাহয় কথা না কব—
শুনিব তোদেরি গান এ শ্রবণ পূরে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণপণে—
পথমাঝে শ্রান্ত যদি হই অতিশয়
তবে— দিস্ রে আশ্রয়।
পথে যে কণ্টক আছে কি ভাবিলি তার ?
কত শুষ্ক জলাশয়— কত মাঠ মরুময়—
পর্বতশিখরশায়ী বিস্তৃত তুষার !
কত শত বক্রগতি   নদী খরস্রোত অতি
ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্তের জল—
হা দুর্বল তুই তার কি ভাবিলি বল !
ভাবিয়া তো কাটায়েছি সারাটি জীবন,
ভাবিতে পারি না আর,   জীবন দুর্বহ ভার—
সহিব এ পোড়া ভালে যা আছে লিখন।
যদি প্রতি পদে পদে অদৃষ্টের কাঁটা বিঁধে,
প্রতি কাঁটা তুলে তুলে কত আর চলি !
নাহয় চরণে বিঁধি মরিব গো জ্বলি।
আমি যাব গো।

মধ্যাহ্ন

"আর কত দূর ?"   "যত দূর হোক্
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়ো
কণ্টক বিষম গো।"
"প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।"
"ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন কেন!

ছি ছি ছি সামান্য ব্যথায় অধীর
শিশুর মতন হেন!"
"যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।"
"তাহাই ব'লে কি আধ' পথ হ'তে
ফিরে যেতে সাধ হয়?"
"তবে চল যাই— যত দূর হোক্
ত্বরা চল সেই দেশ—
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"বলো দেখি তবে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে?
পাব কি আবার শ্যামল কানন
ঘন ছায়াময় গাছে?"
"হয়ত বা পাবে হয়ত পাবে না,
হয়ত বা আছে হয়ত নাই!"
"ওই যে সুদূরে দূরদিগন্তরে
শ্যামল কানন দেখিতে পাই।"
"শ্যামল কানন— শ্যামল কানন—
ওই যে গো হেরি শ্যামল কানন—
চল, সবে চল হসিত-আনন,
চল ত্বরা চল, চল গো যাই!"
"ও যে মরীচিকা"— "ও কি মরীচিকা?"
"মরীচিকা?" "তাই হবে!"
"বলো, বলো মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন্ খানে তবে?"

অবশ চরণ হেন উঠিতে চাহে না যেন—
পারি না বহিতে দেহভার।
এ পথের বাকি কত আর!
কেন চলিলাম?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম?
ছেলেবেলা এক দিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বলেছিনু—
"সারা পথ আমাদের হবে না বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অর্দ্ধপথে না যাইতে যত বাল্যসখা
কে কোথায় চ'লে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্তপদে দীর্ঘ পথ ভ্রমিলাম একা।

নিরাশাপুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ ?
ভগ্ন-আশাভিত্তি-'পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উনমাদ-হেন?
আঁধার কবরে সেথা মৃত ঘটনার
কঙ্কাল আছিল প'ড়ে, স্মৃতি নাম যার।
এক দিন ছিল যাহা তাই সেথা আছে,
আর কভু হবে না যা তাই সেথা আছে—
এক দিন ফুটেছিল যে ফুল-সকল
তারি শুষ্ক দল,
এক দিন যে পাদপ তুলেছিল মাথা
তারি শুষ্ক পাতা,
এক দিন যে সংগীত জাগাত রজনী
তারি প্রতিধ্বনি,
যে মঙ্গলঘট ছিল দুয়ারের পাশ
তারি ভগ্ন রাশ !
সে প্রেতভূমিতে আমি ছিনু রাত্রি দিন
প্রেতসহচর !
কেহ-বা সমুখে আসি দাঁড়ায়ে কাঁদিত
শীর্ণকলেবর।
কেহ-বা নীরবে আসি পাশেতে বসিয়া,
দিন নাই রাত্রি নাই, নয়নে পলক নাই,
শুধু ব'সে ছিল এই মুখেতে চাহিয়া।
সন্ধ্যা হ'লে শুইতাম, দীপহীন শূন্য ঘর—
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
কেহ পায়, কেহ পাশে,
কেহ-বা শিয়রে ব'সে শত প্রেতসহচর !
কেহ শত সঙ্গী ল'য়ে আকাশমাঝারে র'য়ে
ভাবশূন্য স্তব্ধমুখে করিত গো নেত্রপাত--
এমনি কাটিত দিন, এমনি কাটিত রাত !
কেন হেন দেশ ত্যজি আইলাম হা—রে—
ফুরাত জীবনদিন চিন্তাহীন ভয়হীন,
মরিয়া গো রহিতাম মৃত সে সংসারে—
মৃত আশা, মৃত সুখ, মৃতের মাঝারে !
আবার নূতন করি জীবনের খেলা
আরম্ভ করিতে কি গো সময় আমার ?
ফুরায়ে গিয়েছে যবে জীবনের বেলা
প্রভাতের অভিনয় সাজে কি গো আর ?
তবে কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
এখন ফিরিতে নারি অতি দূর— দূর পথ,

সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাকো আর—
শ্রান্ত হইয়াছি বড়ো, বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই—
অতি দূর— দূর পথ— বসি একবার।

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ?" "যেথা হোক্ নাক"
তবুও যাইতে হবে—
পথে কাঁটা আছে, শুধু ফুল নহে,
তাহাও জানিও সবে!
হয়ত যাইব কুসুমকাননে,
হয়ত যাইব না—
হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব,
হয়ত পাব না— ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব!
শুনিলে সকল, এখন তোমরা
কে যাইবে মোর সাথ?
যে থাকিবে থাক, যে যাইবে এসো—
ধর সবে মোর হাত।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই—
বহু দূর পথ রহিয়াছে বাকি,
চল ত্বরা ক'রে যাই।"
"ও পথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে যাইব।" "পশ্চিমে যাইব।"
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এসো,
চল ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই।"

যেয়ো না ফেলিয়া মোরে, যেয়ো নাকো আর—
মুহূর্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই,
যেয়ো না, বড়োই শ্রান্ত এ দেহ আমার।
"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে চলিনু।" "পশ্চিমে চলিনু।"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক, যে আসিবে এসো,
মোরা ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হল ব'লে,
অধিক সময় নাই।"

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল
দক্ষিণে কেহ-বা যায়, পশ্চিমে কেহ-বা যায়,
কেহ-বা উত্তরে চলি গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারি ধার—
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভূঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে,
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, মুদে আসে আঁখিপাতা,
অসাড় দুর্বল কলেবর।
কেন চলিলাম ?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম ?
দক্ষিনাবাতাস বহা ফুরায়েছে এ জীবনে.
হৃদয়ে উত্তরবায় করিতেছে হায় হায়—
আমি কেন আইলাম বসন্তের উপবনে ?
জানিস কি হৃদয় রে, শীতের সমাধি-'পরে
বসন্তের কুসুমশয়ন ?
অরুণকিরণময় নিশার চিতায় হয়
প্রভাতের নয়ন-মেলন ?
যৌবনবীণার মাঝে আমি কেন থাকি আর—
মলিন, কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরা তার !
কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ-মাঝে,
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে !
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীণ—
সেই ছন্দে এক গান বাজিতেছে নিশিদিন।

সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হয়েছে গাঁথা মরণকবির হাতে—
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের পাতে পাতে !
তবে কেন চলিলাম ?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম !
তবে যত দিন বাঁচি রহিব হেথায় পড়ি—
এক পদ উঠিব না, মরি তো হেথায় মরি—
প্রভাতে উঠিবে রবি, নিশীথে উঠিবে তারা,
পড়িবে মাথার 'পরে রবিকর বৃষ্টিধারা ।
হেথা হতে উঠিব না, মৌনব্রত টুটিব না—
চরণ অচল রবে অচল পাষাণ-পারা ।
দেখিস, প্রভাত কাল হইবে যখন,
তরুণ পথিক দল করি হর্ষকোলাহল
সমুখের পথ দিয়া করিবে গমন,
আবার নাচিয়া যেন উঠে না রে মন !
উল্লাসে অধীরহিয়া দুখশ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস না কভু করিতে ভ্রমণ ।
প্রভাতের মুখ দেখি উনমাদ-হেন
ভুলিস নে— ভুলিস নে— সায়াহ্নেরে যেন !

পরিশিষ্ট

বাল্মীকি প্রতিভা।

গীতি-নাট্য।

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে।

রচিত ও অভিনীত।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

ফাল্গুন ১৮০২ শক।

মূল্য ।০ চারি আনা।

বাল্মীকি প্রতিভা

গীতিনাট্য

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য। দস্যুগণ

কাফি

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুঠের ভাগ,
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ।
দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!
প্রথম। এত বড়ো আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে একি হাসি তামাসা?
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড— খবরদার রে খবরদার!
দ্বিতীয়। হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এম্‌নি যে আকার!
তৃতীয়। এম্‌নি যোদ্ধা উনি পিঠেতেই দাগ—
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।
প্রথম। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে, নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ, কোথা রে লাঠি কোথা রে ঢাল?
সকলে। হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এমনি যে আকার!

বাল্মীকির প্রবেশ

খাম্বাজ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা প্রজা, উঁচু নীচু, কিছু না গনি!
ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়!

পিলু

প্রথম দস্যু। এখন কর্ব কি বল্!
সকলে। (বাল্মীকির প্রতি এখন কর্ব কি বল!

প্রথম দস্যু। হো রাজা; হাজির রয়েছে দল !
সকলে। বল্ রাজা, কর্ব' কি বল্, এখন কর্ব' কি বল্ !
প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
ক'রে দিই রসাতল।
সকলে। ক'রে দিই রসাতল।
সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল—
বল্ রাজা, কর্ব' কি বল্, এখন কর্ব' কি বল্ !

ঝিঁঝিট

বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্ !
অমানিশা আজিকে পূজা দেব কালীকে—
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,
বলি নিয়ে আয়।

[বাল্মীকির প্রস্থান

রাগিণী বেলাবতী

সকলে মিলিয়া। তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ !
দয়া মায়া কোন্ ছার। ছারখার হোক্ !
কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল—
প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল—
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ !

জংলা ভূপালি

সকলে। (উঠিয়া) কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো—
নামের জোরে সাধিব কাজ—
হাহাহা হাহা হাহাহা হাহাহা !
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়—
জয়, জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়—
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয় !

গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ

দেশ-বেহাগ

বালিকা। এ কি এ ঘোর বন ! এনু কোথায় !—

পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না !
কি করি এ আঁধার রাতে !
কি হবে মোর, হায় !
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে—
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায় !

পিলু

প্রথম দস্যু । (বালিকার প্রতি) পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে ?
সিধে রাস্তা দেখতে চাস্ ?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, সুখে থাক্‌বি বার মাস !
সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ ! হাঃ হাঃ হাঃ !
দ্বিতীয় দস্যু । (প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই
কেমন সে ঠাঁই ?
প্রথম । মন্দ নহে বড়ো,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়—
সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ !
তৃতীয় । আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে !
সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ !

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা । বাল্মীকি স্তবে আসীন

কানাড়া

বাল্মীকি । নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে,
মহাসমরপ্রমত্ত মাতঙ্গিনী,
কম্পে রণাঙ্গন পদভারে একি !
থরহর মহী সমুদ্র, পর্বত ব্যোম,
সুরনর শঙ্কাকুল— কে এ অঙ্গনা !

বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

কাফি

দস্যুগণ । দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা ।
বড়ো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা জালে না পড়ে ধরা !
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেল' ত্বরা !

কানাড়া

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ, হয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা ত্বরায়!
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্ দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়!

গারা ভৈরবী

বালিকা। কি দশা হ'ল আমার, হায়!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্তের তরে, মা গো, দেখা দেও আমারে—
জনমের মত বিদায়!

সিন্ধু ভৈরবী

বাল্মীকি। এ কেমন হ'ল মন আমার!
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে!
পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো— সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

পরজ

প্রথম দস্যু। আরে, কি এত ভাবনা, কিছু তো বুঝি না—
দ্বিতীয় দস্যু। সময় ব'হে যায় যে!
তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হ'ল না—
চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব বাহ্ রে!
বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে যা রে যা!
প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?
দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও বাহ্ রে!

বাঙালী

বাল্মীকি। শোন্ তোরা শোন্, এ আদেশ—
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে!
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর' এখনি রে!

যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য । বাল্মীকি

খাম্বাজ

বাল্মীকি । ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে !
কে পুরাবে মোর শূন্য এ হিয়া,
জুড়াবে প্রাণ সুধাবরিষণে ! [প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

নটনারায়ণ

দস্যুগণ । আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই !
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই !
চল চল চল এখনি যাই !

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়,
রক্তপাতে পাস্ রে ভয়—
লাজে মোরা ম'রে যাই !
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই !

[দস্যুগণের প্রস্থান

হাম্বির

বাল্মীকি জীবনের কিছু হল না, হায় !
হল না গো হল না হায়, হায় !
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে ?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর ।
কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন— দিবস রজনী চলিয়া যায়—
দিবস রজনী চলিয়া যায়—
কত কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কি করিব জানি না গো !
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা— ধনুর্বাণ ত্যেজেছি—
কোন আর নাহি কাজ !
কি করি কি করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো,
কি করিব জানি না যে !

ব্যাধগণের প্রবেশ ও একটি ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি লক্ষ

সিন্ধু ভৈরবী

বাল্মীকি। থাম্ থাম্! কি করিবি বধি পাখিটির প্রাণ!
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উলাসে গাহিতেছে গান!

প্রথম ব্যাধ। রাখ' মিছে ও-সব কথা, কাছে মোদের এসো নাক হেথা,
চাই নে ও-সব শাস্তর-কথা, সময় ব'হে যায় যে।

বাল্মীকি। শোন শোন মিছে রোষ কোরো না!

ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ!

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

বাহার

কী বলিনু আমি!— একি সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা—
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পূরিল-মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে
একি!— হৃদয়ে একি এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার-মাঝে একি জ্যোতি রে!
অবাক্!— করুণা এ কার?

সরস্বতীর আবির্ভাব

ভূপালি

বাল্মীকি। একি এ, একি এ, স্থিরচপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে
আ মরি কমলপুতলা!

[ব্যাধগণের প্রস্থান

দেবীর অন্তর্ধান

টোড়ী

বাল্মীকি। কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল; দশদিশি অন্ধকার!
সব গেল চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে?

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

সিন্ধু

লক্ষ্মী। কেন গো আপনমনে ভ্রমিছে বনে বনে, সলিল দুনয়নে
কিসের দুখে?

কমলা দিতেছে আসি রতনে রাশি রাশি, ফুটুক্ তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায় বলো সে কি না পায়, দুখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে।
ত্যজিয়া কমলাসনে এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে
হের গো চোখে।

টোড়ী

বাল্মীকি। আমার কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!
তুমি তো নহো সে দেবী, কমলাসনা,
কোরো না আমারে ছলনা!
এনেছ কি ধন মান? তাহা যে চাহে না প্রাণ—
দেবি গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না
তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্, হয় হোক্—
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না, এসো না এ দীনজনকুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না!

লক্ষ্মীর অন্তর্ধান ও সরস্বতীর পুনরাবির্ভাব

বাহার

বাল্মীকি। এই যে হেরি গো দেবী আমারি!
এবে কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জাগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে—
এ কবিতার মাঝে তুমি কে গো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল বনে বনে একি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে—
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি!
তুমিই কি দেবী ভারতী কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে?
তুমি ধন্য গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমারি।

গৌড় মল্লার

হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার।
এসো, মা করুণারানী, ও বিধু-বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এসো আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃতরাশি—
আলোয় করেছ আলো, স্নেহের প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনবালা, অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার।
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে—
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
'হা দেবী' 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার—
হেরিব জগত শুধু আঁধার! আঁধার!

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
আইনু এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্ তাহা, শোন্!
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গ'লে যাবে সহস্র পাষাণপ্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্‌বধূ আকুল নয়নজলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত ব'বে!
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া,
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া।
শুনিতে শুনিতে, বৎস, তোর সে অমর গীত'
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত'।

যত দিন আছে শশী, যত দিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি মহাকবি !
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর ।
বসি তোর পদতলে কবিবালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত!
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার !
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার !

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপি ও সাময়িক পত্রে পাঠভেদ এবং রচনা-প্রসঙ্গে কবির প্রণিধেয় উক্তি সংকলিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তবিংশ ও অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল।

স্ফুলিঙ্গ

'স্ফুলিঙ্গ' ১৩৫২ সালের ২৫ বৈশাখ প্রকাশিত হয়। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬ সালে ইহার পুনর্মুদ্রণ এবং ১৩৬৭ সালের চৈত্র মাসে ইহার পরিবর্ধিত শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাগুলি প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই পরিবর্ধিত সংস্করণটিই অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৩৩৪ সালে লেখন প্রকাশিত হয়। লেখনের সগোত্র আরো বহু কবিতা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায় এবং তাঁহার স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। কেহ কেহ তাঁহাদের সংগ্রহের কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই কবিতাসমষ্টি হইতে সংকলন করিয়া 'স্ফুলিঙ্গ'র প্রকাশ।

লেখন প্রকাশের পূর্বে উহার নাম 'স্ফুলিঙ্গ' থাকিবে এইরূপ ভাবা হইয়াছিল। পরে আলোচ্য সংকলনটির নাম 'স্ফুলিঙ্গ' রাখা হয় এবং প্রবেশক-স্বরূপে 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল' লেখনের এই কবিতাটি গৃহীত হয়।

প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৩৫) লেখন গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন স্ফুলিঙ্গর সগোত্র বলিয়াই তাহার অংশ-বিশেষ নীচে মুদ্রিত হইল।

লেখন

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে এক দিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালি জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে ; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে— সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাল্পে সুখমস্তি— নাট্য-সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের— কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের

ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন— এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন-মনে যা-তা লিখেছি…।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ (সুলভ ৭); লেখন (১৩৬৮)

লেখন-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে।" কিন্তু চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে 'স্বাক্ষরলিপির দাবি' মিটাইতে হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গের কবিতাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ। বিভিন্ন স্বাক্ষরসংগ্রহে যে তারিখ পাওয়া যায় তাহাই যে উহার রচনাকাল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বহু কবিতা লেখন কাব্য-প্রকাশের পরবর্তীকালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমসাময়িক, বহু পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতেও কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ২১, ৮০, ৯৯, ১৭৯, ২৩৮ ও ২৫৭ -সংখ্যক কবিতা গীতিমাল্যের পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত ; বিলাতের নার্সিংহোমে বা সমুদ্রবক্ষে, ১৯১৩ সালে রচিত অনেকগুলি লেখন এই খাতায় আছে ; তাহার অধিকাংশ লেখন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অবশিষ্টগুলি স্ফুলিঙ্গে সংকলিত।

৩০-সংখ্যক কবিতা মূলত পরিশেষ-ধৃত 'দিনাবসান' কবিতার (২৫ বৈশাখ ১৯৩৩) অঙ্গীভূত ছিল ; পরিশেষে সংকলনের কালে বর্জিত। অধুনা প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বৈকালী-কাব্যে (আষাঢ় ১৩৮১) ৪০-সংখ্যক কবিতার চতুর্থ স্তবক -রূপেও পাওয়া যাইবে। উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থপরিচয় অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

১১৫-সংখ্যক কবিতাটিকে সেঁজুতি গ্রন্থের (রচনাবলীর দ্বাবিংশ খণ্ড: সুলভ একাদশ) 'প্রতীক্ষা' কবিতার পূর্বাভাস বলা চলে ; ১২৮-সংখ্যক কবিতাটির গীতরূপ 'ওরে নূতন যুগের ভোরে' প্রচলিত গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে বা অখণ্ড গীতবিতান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ১৪৭-সংখ্যক কবিতাটি মহুয়া কাব্যের (রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ড: সুলভ অষ্টম) উৎসর্গপত্রের 'শুধায়ো না, কবে কোন্ গান' কবিতাটির পূর্বতন পাঠ।

১০২ ও ১১৬ -সংখ্যক কবিতাকে লেখনের দুটি কবিতার রূপান্তর বলা যায়। কোনো-এক সময়ে লেখনের 'কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ নাই তার লাজ' কবিতাটি কাটিয়া এই গ্রন্থে ১৯৩-সংখ্যক কবিতাটি লেখা হয়। ১৪৮ ও ২৫২ -সংখ্যক কবিতা-দুটিকে লেখনে-মুদ্রিত দুটি ইংরেজি লেখার পাঠান্তর বলা চলে। লেখনের অন্তর্গত বাংলা কবিতাগুলি রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ডে (সুলভ সপ্তম) ছাপা হইয়াছে। উক্ত খণ্ডে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরেজি কবিতার নিদর্শনমাত্র দেওয়া হইয়াছে।

৪৯, ৬৪, ৭৪, ১০৬, ১২১, ১২৫, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০, ১৭৫, ১৯৪, ১৯৭, ২১৪, ২৩১, ২৩৩, ২৪৯ ও ২৫১ -সংখ্যক কবিতাগুলির ইংরেজিমাত্র লেখনে আছে।

৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ১০০, ১০১, ১০৩, ১১২, ১২০, ১৪৪, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৭৩, ১৮৫, ১৯২, ২২৪, ২২৯, ২৩০, ২৪৬ ও ২৫৩ -সংখ্যক কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ গ্রন্থে (রচনাবলী একবিংশ খণ্ড: সুলভ একাদশ) উদাহরণস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

১৬-সংখ্যক কবিতাটি কবির অঙ্কিত একখানি চিত্রের পরিচয়।

১৪৩-সংখ্যক কবিতাটি 'একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ'। মূল কবিতার রচয়িতা জাঁ-পীয়ের ফ্লরিয়াঁ (জন্ম ১৭৫৫ খৃস্টাব্দ)।

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্ফুলিঙ্গের পরিবর্ধিত সংস্করণে নূতন-সংযোজিত

কবিতার সংখ্যা ৬২। ইহার অধিকাংশই রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের পাণ্ডুলিপি ব্যতীত অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের হস্তাক্ষরে 'স্ফুলিঙ্গ'-নামাঙ্কিত একখানি খাতা দেখা যায়। উহাতে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে লেখনে প্রকাশিত বহু কবিতারও পাঠান্তর বা যথাযথ রূপ সংকলিত আছে। এই খাতা হইতেও, অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই এরূপ কতকগুলি কবিতা, স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে লওয়া হইয়াছে। এ স্থলে সংখ্যা দ্বারা সেগুলির নির্দেশ করা যাইতেছে।— ১. ২, ২০, ২৩, ৪৫, ৫২, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৮১, ১৯০, ১৯৬, ২১২, ২১৩, ২২২, ২৩৪, ২৫৬ ও ২৫৮।

৪০-সংখ্যক কবিতাটি কবি আপন দৌহিত্র কুমারী নন্দিতার উদ্দেশে কৌতুক করিয়া লেখেন; ৬৬-সংখ্যক কবিতাটি কোন্ বিদেশ-যাত্রার কালে জাহাজে লেখা হইয়াছিল তাহা অমিয় চক্রবর্তীর প্রতিলিপি-খাতা হইতে জানা যায় নাই।

৮২-সংখ্যক কবিতা এবং ১৬১-সংখ্যক কবিতার পাঠান্তর পূর্বে প্রবাসী পত্রের বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৫৯-সংখ্যক কবিতা সম্পর্কে জানা যায় যে, কবি ইহা শান্তিনিকেতন-স্থিত কলাভবন-সংগ্রহশালা নন্দনের নামকরণে লিখিয়াছেন।

স্ফুলিঙ্গের কবিতাগুলি যাঁহাদের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নাম স্বতন্ত্র স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

গল্পগুচ্ছ

ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ড হইতে চতুর্বিংশ খণ্ডের মধ্যে গল্পগুচ্ছের তিনটি খণ্ডের অন্তর্গত সমূদয় গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের অনুক্রম যতদূর জানা গিয়েছে, তদনুসারে (কার্তিক ১২৯১ হইতে কার্তিক ১৩৪০) মুদ্রিত।

'খাতা' 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' 'উলুখড়ের বিপদ' এবং 'প্রতিবেশিনী' এই চারটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারা যায় নাই। এইজন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ-অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে গল্পগুচ্ছের কোন্ গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।—

চতুর্দশ খণ্ড (সুলভ সপ্তম)

ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট[1]

পঞ্চদশ খণ্ড (সুলভ অষ্টম)

দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি

ষোড়শ খণ্ড (সুলভ অষ্টম)

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়

সপ্তদশ খণ্ড (সুলভ নবম)

ত্যাগ, একরাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, রীতিমত নভেল, জয়-পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া, দানপ্রতিদান।

১ গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বালক পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে (১২৯২) প্রকাশিত হয়। ইহা ছোটো উপন্যাস বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ 'মুকুট' (১৯০৮)।

অষ্টাদশ খণ্ড (সুলভ নবম)

সম্পাদক, মধ্যবর্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, খাতা

ঊনবিংশ খণ্ড (সুলভ দশম)

অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি

বিংশ খণ্ড (সুলভ দশম)

মানভঞ্জন, ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, ইচ্ছাপূরণ

একবিংশ খণ্ড (সুলভ একাদশ)

দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটিকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান

দ্বাবিংশ খণ্ড (সুলভ একাদশ)

সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, শুভদৃষ্টি, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান, কর্মফল, মাস্টারমশাই, গুপ্তধন, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড (সুলভ দ্বাদশ)

হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী

চতুর্বিংশ খণ্ড (সুলভ দ্বাদশ)

নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চিত্রকর, চোরাই ধন

পঞ্চবিংশ খণ্ড (সুলভ ত্রয়োদশ)

রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি, ছোটো গল্প

গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তিনসঙ্গীর অন্তর্গত তিনটি গল্প 'রবিবার' 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি', 'শেষ কথা'র পাঠান্তর ছোটো গল্প ; 'বদনাম' 'প্রগতিসংহার' 'শেষ পুরস্কার' 'মুসলমানীর গল্প' নামে কয়েকটি নূতন সংকলন। 'মুকুট' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের দুটি গল্প— 'ভিখারিনী', 'করুণা'। 'মুকুট' একমাত্র দুটির পড়া পুস্তকে, পরে রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে (সুলভ সপ্তম) সংকলিত। গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত যে গল্পগুলি ইতিপূর্বে রচনাবলীর অন্যান্য খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত বাকিগুলি রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল।

বদনাম : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

"শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়াদি গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হইয়াছে ; এবার এ অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টি— অসহ্য গরম··· সন্ধ্যার পর বারান্দায় আনিয়া কবিকে বসানো হয়, মাঝে মাঝে নূতন নূতন গল্পের প্লট বলেন। তাহারই একটি 'বদনাম' নামে প্রকাশিত হয়।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ৪ (অগ্রহায়ণ ১৩৭১), পৃ ২৭৭

"প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র'[১] গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন।[২] কিন্তু

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ড (সুলভ দ্বাদশ)

২ বিপিনচন্দ্র পাল -রচিত 'মৃণালের কথা', নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২১। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' লইয়া তৎকালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আন্দোলন হয়। গল্পটি সবুজ পত্রে (শ্রাবণ ১৩২১) প্রকাশিত হইয়াছিল।

পারবেন কেন ? তার পর আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি, ১৭ মে ১৯৪১। শ্রীরানী চন্দ। আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ

"গুরুদেবকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, 'দেখ্‌— একরকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর একরকম ভালোবাসা আছে, যেটা মারে, চাপা দিয়ে দেয়। আমাদের দেশের মেয়েরা বেশির ভাগ ঐ শেষের ভালোবাসাটাই জানে। তাদের ভালোবাসা দিয়ে তারা লতার মতো জড়িয়ে থাকে, পুরুষকে বাড়তে দিতে পারে না ; তা কেন হবে ?

এই নিয়ে পর পর কয়েকটি গল্পই লিখলেন তিনি। 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি', সব শেষে রোগশয্যায় পড়েও লিখলেন 'বদনাম' গল্পটি।··· সদুকে নিয়ে বদনাম গল্পটি যে লিখলেন, সে সময়ে ছিল আর-এক ভাব। তখন তিনি রোগশয্যায়, গল্প লিখবেন, নিজে লিখতে পারেন না, একসঙ্গে বেশি ভাবতেও পারেন না, কষ্ট হয়, কপাল ঘেমে ওঠে। অল্প অল্প করে বলতেন, লিখে নিতাম। কখনও-বা স্নান হচ্ছে তাঁর, কি খাচ্ছেন, কি চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন ; হঠাৎ হঠাৎ ডেকে পাঠাতেন। এক লাইন কি দু লাইন কথা··· বললেন, 'লিখে রাখো— মনে পড়ল কথা কয়টা। পরে সদুর মুখে এক জায়গায় জুড়ে দেওয়া যাবে।'"

—শ্রীরানী চন্দ। গুরুদেব, পৃ ১২৫

'বদনাম' গল্পটির রচনাকাল ভুলক্রমে ১১-২১ জুন মুদ্রিত হইয়াছে। ১১-২১ জুনের পরিবর্তে ১৫-২২ মে হইবে।

প্রগতিসংহার : আনন্দবাজার পত্রিকা (শারদীয়া), ৩ আশ্বিন ১৩৪৮
পূর্বনাম— কাপুরুষ

শেষ পুরস্কার : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯

"এটি ঠিক গল্প নয়, গল্পের কাঠামো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় এটি কল্পিত হয়েছিল। এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।"

—সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

মুসলমানীর গল্প, ঋতুপত্র, বর্ষা-সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬২

"এই লেখাটি পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প নয়। গল্পের খসড়া মাত্র।···এটিই তাঁর শেষ গল্পরচনার চেষ্টা।"

—সম্পাদক, ঋতুপত্র

শেষ অসুস্থতার সময়েও মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথ যে গল্পের প্লট বলিয়া যাইতেন তাহার বিবরণ এই স্থলে সংকলনযোগ্য—

"এই দিকে গরম বেড়ে চলেছে, সন্ধ্যার সময় গরমের তাপ কমলে তাঁকে বারাণ্ডায় বসিয়ে দেওয়া হত। সেই সময় তাঁর মাথায় অনেক কিছু গল্পের প্লট ঘুরত এবং অনেক রকমের প্লট মুখে-মুখে বলে যেতেন···। এই অসুখের মধ্যেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের গতিরোধ হয় নি, সে নিজের আনন্দ-স্রোতে ভেসে চলেছিল, মাঝে-মাঝে রোগের গ্লানির বাধা পড়ত তার গতির মুখে, কিন্তু সে-বাধা ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর সৃষ্টি চলত আপন বেগে। সাহিত্যচর্চায় তাঁর বিরাম ছিল না···।

একদিন দুপুরে আহারাদির পর ঘুমিয়ে উঠেছেন, আমি পাশের ঘরে ছিলুম, হঠাৎ সুধাকান্ত[1] এসে আমাকে ডাকলেন, "বউদি, আপনার ডাক পড়েছে।" ঘুম থেকে তখনি উঠেছেন, বেলা তিনটা আন্দাজ হবে, কাছে বসতেই গল্প বলে যেতে লাগলেন···এক টুকরো কাগজ-কলম জোগাড় করে লিখে নিলুম। সেই প্লট থেকে আমূল পরিবর্তিত হয়ে উৎপত্তি হল 'বদনাম' গল্পের। এইরকম করেই খেলার ছলে গল্প

১ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বলতে বলতে 'প্রগতি-সংহার' তৈরি হয়ে উঠেছিল।...একদিন আবার দুপুরে ঘুম ভাঙবার পর আমার ডাক পড়ল। আজ তাঁর শরীর কিছু সুস্থ ছিল, মনও ছিল প্রফুল্ল। আমাকে বললেন, "তুমি এই সময় এলে তোমাকে গল্প বলবার সুবিধা হয়, সকালে আমি বড়ো ক্লান্ত থাকি।" আমি দেখলুম গল্প মাথায় ঘুরছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসলুম। দূরে সুধাকান্ত ব'সে গল্পটা উপভোগ করতে লাগলেন। আজ তাঁর মন বেশ তাজা, তাই রসিয়ে গল্পটি[১] বলতে লাগলেন, আমি তাঁর মুখের কথাগুলি একটির পর একটি লিখে নিলুম।"

—প্রতিমা ঠাকুর। নির্বাণ (১৩৬২), পৃ ৩৫-৩৬

শেষ অসুস্থতার সময় মুখে মুখে বলিয়া লেখানো গল্পগুলি স্বভাবতই কবি বারংবার সংশোধন করিবার প্রযত্ন করিতেন। গল্পগুলির যে রচনাকাল উল্লিখিত তাহাতে প্রথম রচনা ও শেষ সংশোধনের তারিখ সংকলন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইতিপূর্বে রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ড হইতে চতুর্বিংশ খণ্ডে (সুলভ ৭ হইতে ১২) কার্তিক ১২৯১ হইতে কার্তিক ১৩৪০-এর মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় সকল ছোটোগল্প সংকলিত হইয়াছে। রচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ডে (সুলভ ১৩) সংকলিত হইয়াছে আশ্বিন ১৩৪৭-এ প্রকাশিত গল্প তিনটি। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল আষাঢ় ১৩৪৮, আশ্বিন ১৩৪৮, শ্রাবণ ১৩৪৯ এবং আষাঢ় ১৩৬২তে প্রকাশিত গল্প ও গল্পের খসড়াগুলি।

প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গল্পগুলি সংকলিত করার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার পর অচলিত পুরাতন রচনার সংকলন। এই পর্যায়ে দুটি মাত্র রচনা 'ভিখারিনী' ও 'করুণা।'

ভিখারিনী : ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪

গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"ষোলো বছর বয়সের...আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী।... আমার মতো ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল।...আমি লিখে বসলুম এক গল্প, সেটা যে কী বকুনির বিনুনী নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।"

—রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলা

করুণা : ভারতী, আশ্বিন ১২৮৮ - ভাদ্র ১২৮৫

গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড ভিন্ন অন্য কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোনো বই বাহির হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। এই-সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি--- প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা' নামক গল্প তাহার নমুনা।

—রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতির খসড়া

শরৎকুমারী চৌধুরানী 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন, ছোটগল্প প্রথম যেটি প্রকাশিত হয়[২] তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প[৩] ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে।"

১ মুসলমানীর গল্প

২ ভিখারিনী ৩ করুণা

রবীন্দ্রনাথের ষোড়শ-সপ্তদশ বৎসর বয়সে রচিত বা মুদ্রিত এই লেখাটি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য কতকগুলি বিস্তারিত আলোচনা—

রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস : শ্রীস্মরণকুমার আচার্য।

দেশ, ১৯ শ্রাবণ ১৩৬৯

করুণা : শ্রীকানাই সামন্ত। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, কার্তিক ১৩৬৯

রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায় (১৩৭৬/অংশবিশেষ) : শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

ভারতীতে 'করুণা' প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর নিকট সম্ভবত করুণা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু করুণা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রাগৈতিহাসিক' রচনাগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য পোষণ করিতেন।—

"এক সময়ে বালক ছিলুম, তখনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, কিন্তু সাহিত্যসভায় তাকে প্রকাশ্যতা দিলে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্কের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্যকর ; কেননা সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানারকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়— অন্তত আমি তাই অনুভব করি।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১। 'ভূমিকা' ; অপিচ দ্র· কবির ভণিতা

"ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালীর কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"

—রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী' জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত। এই খণ্ডের সংকলন ও গ্রন্থপরিচয় রচনা করেন পুলিনবিহারী সেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও অভিভাষণ -সমন্বিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি গ্রন্থ-প্রকাশের কাল অনুযায়ী রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।

আত্মপরিচয়

কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টিরূপে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০। ১-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে বিরোধ এক সময়ে বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরূপ তাহার সূচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'দম্ভ ও অহমিকা'র সন্ধান পাইয়াছিলেন[২]। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মূল প্রবন্ধের পরিপূরকরূপে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।

১ দ্র· বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

২ কাব্যের উপভোগ : বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪

বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উলটা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

তাই যদি হয় তবে এতবড়ো একটা অত্যন্ত সাধারণ কথাকে বিশেষভাবে বলিতে বসা কেন?

ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাধারণ কথারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পাই তখন তাহার বিস্ময় বড়ো বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মতো অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী নিশ্চিত ও পুরাতন পদার্থেরও বিশেষ পরিচয় আমাদিগকে একটা সদ্যোনূতন আবির্ভাবের মতো চমক লাগাইয়া দেয়। এইজন্য বিশেষ অবস্থায় সাধারণ কথাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইয়া থাকে। বস্তুত সাহিত্যের বারো-আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মতো নূতন করিয়া বলা।

সম্প্রতি অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি গ্রন্থে পড়িতেছিলাম :

Though man is essentially self-conscious, he always *is* more than he *thinks* or *knows*, and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless, affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development, but we cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are.

যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে— আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো-এক রকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা অহংকার নহে, কারণ, ইহা কাহারও একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবনবিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।

—রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪

"নিজের কথা বলামাত্রের মধ্যেই অহমিকা আছে। আত্মজীবনী লিখতে গেলে সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না, সেই অনিবার্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেম— এটাকে ইচ্ছাপূর্বক অহংকার করতে বসে মাপ চাওয়ার বিড়ম্বনা বলে মনে করবেন না।"

রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে লেখা
পত্রের অংশ[১], ২৩ বৈশাখ ১৩১২

১ দ্র· রবীন্দ্রজীবনী ২ (আশ্বিন ১৩৬৮)

প্রবন্ধটির কতকাংশ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের (সুলভ দ্বিতীয়) গ্রন্থপরিচয়ে 'চিত্রা'র জীবনদেবতা-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য উদ্‌ধৃত হইয়াছে।

বর্তমান খণ্ডের ১৪১, ১৪৫, ১৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রবন্ধের অন্তর্গত যে পত্রগুলির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলীতে সংকলিত। ছিন্নপত্র-ছিন্নপত্রাবলীর পাঠে এবং বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত পাঠ স্থানে স্থানে ভিন্নতা আছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত পত্রগুলি 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলীর' কোন্ কোন্ সংখ্যার অন্তর্গত নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

রচনাবলীর পৃষ্ঠা	ছিন্নপত্র[১]'র সংখ্যা	ছিন্নপত্রাবলী[১]'র সংখ্যা
১৪১	—	২৩৮
১৪৫	৫২	৫৫
	৬৪	৭০
১৪৫-৪৬	৬৭	৭৪

২-সংখ্যক প্রবন্ধটি ভারতী পত্রে (ফাল্গুন ১৩১৮) 'অভিভাষণ' নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে 'দেশের প্রতিভূ-স্বরূপ' বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউন-হলে কবিসংবর্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একটি আনন্দ সম্মিলন (২০ মাঘ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হয়।

৩-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'আমার ধর্ম' নামে সবুজ পত্রে (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো-একটি সমালোচনার[২] উত্তরে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতে অন্য যে-একটি সমালোচনার উল্লেখ[৩] আছে, তাহা বিপিনচন্দ্র পাল-কর্তৃক লিখিত।[৪]

"'আমার ধর্ম' লেখাটা ছাপাখানায় চলে গেছে— সেখানকার কালী সংগ্রহ করে যখন ফিরবে তখন তোমাকে দিতে আমার কোনো বাধা নেই। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩২৪"

—রবীন্দ্রনাথ। সুরীতি দেবীকে লেখা পত্রাংশ[৫]

৪-সংখ্যক প্রবন্ধটি সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কবিকর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি। অভিভাষণটি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশিত হয়।

আত্মপরিচয়ের অন্তর্গত ৫-সংখ্যক প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে কবিতাংশ বাদে 'অবতরণিকা' রূপে মুদ্রিত। সেইজন্য প্রবন্ধটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল না। প্রবন্ধটি বিচিত্রা গ্রন্থেও সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই খণ্ডের আত্মপরিচয় অংশে ৫-সংখ্যক প্রবন্ধটি মূলত উক্ত গ্রন্থের ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ।

'আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে' প্রবেশ উপলক্ষে প্রবন্ধটি (বর্তমান খণ্ডের ৫-সংখ্যক প্রবন্ধ) লেখা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) 'জন্মদিনে' নামাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১ ছিন্নপত্র : শ্রাবণ ১৩৬৭, ছিন্নপত্রাবলী : বৈশাখ ১৩৭০

২ "ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ", প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা ; পুনর্মুদ্রণ নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৪। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, "ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ", প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ; এবং রবীন্দ্রনাথের "আমার ধর্ম" প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ধর্ম", প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা।

৩ বর্তমান খণ্ড রচনাবলী, পৃ ১৫৩

৪ "রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত", বিজয়া ১৩২০

৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪ ; বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্য-সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থটির অন্তর্গত রচনাসমূহের অনেকগুলিই যথার্থ প্রবন্ধ নয় ; কতকগুলি চিঠি এবং অভিভাষণ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ১-সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০। ঐ বৎসর আশ্বিনে পুনর্মুদ্রণ-কালে এই গ্রন্থে 'সাহিত্যের মাত্রা' এবং 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধ দুইটি নূতন সংযোজিত হয়।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'কাব্যে গদ্যরীতি' পত্রনিবন্ধটি ব্যতীত সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই পুনর্মুদ্রিত হইল। উক্ত পত্রনিবন্ধটি ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত[১]।

সংকলিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। সাময়িক পত্রে এগুলির প্রথম প্রকাশ-তারিখ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ এখানে দেওয়া হইল—

সাহিত্যের স্বরূপ : কবিতা, বৈশাখ ১৩৪৫

সাহিত্যের মাত্রা : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪০
পত্রটি দিলীপকুমার রায়কে লেখা।

সাহিত্যে আধুনিকতা : পরিচয়, মাঘ ১৩৪১
অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রখানি 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত হয়।

কাব্য ও ছন্দ : কবিতা, পৌষ ১৩৪৩
'গদ্যকাব্য' নামে প্রকাশিত।

গদ্যকাব্য : প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬
শান্তিনিকেতনে অভিভাষণের অনুলিপি।

সাহিত্যবিচার : কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৮
পত্রখানি নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত। সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে পত্রখানির রচনাকাল ১৩৪৭ সাল দেওয়া আছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ঐ সাল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা[২] গ্রন্থে ভূমিকারূপে ব্যবহৃত এই পত্রখানিতে রচনাকাল ১০ আষাঢ় ১৩৪৮ রহিয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' বইখানি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্রখানি লেখেন।

সাহিত্যের মূল্য : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ ও কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৮
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে লেখা বলিয়া জানাইয়াছেন। বিশ্বপতি চৌধুরী-লিখিত উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটি সমালোচনা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ এই পত্রখানি লেখেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্তর নিকট হইতে এই তথ্য জানা যায়।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৪১৯-৪২২, ৪২৩-৪২৪ (সুলভ ১১)।
পত্রনিবন্ধটির প্রথমাংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬শ খণ্ডে (সুলভ অষ্টম) 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থপরিচয়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।
২ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা।

পত্রটির রচনা-তারিখ ২৫ এপ্রিল ১৯৪১। ২৪ এপ্রিল এই পত্রের বিষয়বস্তু লইয়া কবি যে আলোচনা করেন তাহা 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।[১]

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা : কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৮
পত্রটি বুদ্ধদেব বসুকে লেখা।

"কিছুকাল হইতে কবির মনে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত বুদ্ধদেবের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হয়। তবে প্রধানত যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য ও চিত্র সম্বন্ধে কবির অভিমত।"

— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ৪

সত্য ও বাস্তব : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮
'সাহিত্য, শিল্প' নামে প্রকাশিত।

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও পুস্তিকা হইতে সংকলিত হইয়া প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২৯ মাঘ ১৩৫৪ সালে।

'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে প্রবেশক রূপে মুদ্রিত 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির অংশ 'পুনশ্চ'[২] কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতাংশ এবং 'গান্ধী মহারাজ' কবিতাটি ব্যতীত মূল গ্রন্থটির আর সকল রচনাই বর্তমান খণ্ডে গৃহীত হইল।

নিম্নে 'গান্ধী মহারাজ' কবিতাটি[৩] মুদ্রিত হইল।

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ওই যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'

১ শ্রীরানী চন্দ। আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮), পৃ ৯২-৯৫
২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ (সুলভ অষ্টম)
৩ প্রকাশ : প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪৭

সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহাত্মা গান্ধী : প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

১৩৪৩ সালে মহাত্মাজির জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ১৬ আশ্বিন তারিখে প্রদত্ত ভাষণ। ভাষণটি শ্রীক্ষিতীশ রায় ও প্রভাত গুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তাকর্তৃক সংশোধিত।

গান্ধীজি : প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

১৩৩৮ সালে মহাত্মাজির জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে ১৫ আশ্বিন তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ 'মহাত্মা গান্ধী' নামে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হয়।

চৌঠা আশ্বিন : বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৯

৪ আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ। হিন্দু অনুন্নত শ্রেণীর পৃথক নির্বাচন স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিচ্ছেদকে আইনত স্থায়ী করিবার যে চেষ্টা হয় সেই অকল্যাণের প্রতিবিধান-কল্পে ১৩৩৯ সালের চৌঠা আশ্বিন মহাত্মাজি পুণার য়েরবাদা জেলে অনশন আরম্ভ করেন। সেই সংকট-কালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসীদের নিকট ভাষণদান করেন।

ভাষণটি '৪ঠা আশ্বিন' পুস্তিকা হইতে প্রবাসী পত্রেও পুনর্মুদ্রিত হয় (কার্তিক ১৩৩৯)।

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৯

মহাত্মাজির অনশন (২০ মে ১৯৩২) উপলক্ষে ৫ আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে আহূত পল্লীবাসীদের নিকট প্রদত্ত ভাষণ। 'মহাত্মাজির শেষ ব্রত' শিরোনামে ভাষণটি প্রকাশিত এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও বিতরিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর নিকট রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম—

"It is well worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such self-offering to the conscience of our own countrymen will not be in vain. I fervently hope that we will not callously allow such national tragedy to reach its extreme

length. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love." 19-9-32

রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্মাজির টেলিগ্রাম—

"Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received. Thank you." 20-9-32

রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্মাজির পত্র—

Dear Gurudev,

This is early morning 3 o'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon—if you can bless the effort, I want it. You have been to me a true friend because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud. I had looked forward to a firm opinion from you one way or the order. But you have refused to criticise. Though it can now only be during my fast, I will yet prize your criticism, if your heart condemns my action, I am not too proud to make an open confession of my blunder, whatever the cost of the confession, if I find myself in error. If your heart approves of the action I want your blessing. It will sustain me. I hope I have made myself clear. My love. 20-9-32

10-30 a.m.

Just as I was handing this to the Superintendent, I got your loving and magnificent wire. It will sustain me in the midst of the storm I am about to enter. I am sending you a wire. Thank you. M.K.G.

—Rabindranath Tagore, *Mahatmaji and the Depressed Humanity*.

ব্রত-উদ্‌যাপন : বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মহাত্মাজির অনশন-সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ য়েরবাদা জেলে গমন করেন এবং তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপন-কালে উপস্থিত থাকেন। পুণা হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের নিকট ভাষণটি দান করেন।

ভাষণটি 'পুণা ভ্রমণ' নামে বিচিত্রা পত্রে প্রকাশিত হয়।

মহাদেব দেশাই-এর নিকট টেলিগ্রাম—

"Gurudeva eager start Poona if Mahatmaji has no objection. Wire health and if compromise reached."

Amiya Chakravarty,
23-9-32.

রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্মাজির টেলিগ্রাম—

"Have read your loving message to Mahadev also Amiya's. You have put fresh heart in me. Do indeed come if your health permits. Mahadev will send you daily wires. Talks about settlement still proceeding. Love Will wire again if necessary."

23-9-32

—Rabindranath Tagore, *Mahatmaji and the Depressed Humanity*.

'চৌঠা আশ্বিন', 'মহাত্মাজির পুণ্যব্রত' এবং 'ব্রত-উদ্‌যাপন' প্রবন্ধ তিনটি *Mahatmaji and the Depressed Humanity* (December 1932) পুস্তিকায় ইতিপূর্বে সংকলিত হয়।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

বিশ্বভারতী পুস্তিকামালার অন্তর্গত হইয়া ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহাতে প্রবন্ধ ছিল দুইটি। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আরো একটি প্রবন্ধ যোগ করিয়া ইহার পরিবর্ধিত সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই পরিবর্ধিত সংস্করণের অন্তর্গত প্রবন্ধ তিনটিই সন্নিবেশিত হইল।

পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রথম প্রবন্ধটি 'আশ্রমের শিক্ষা' নামে ১৩৪৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়, এবং নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ -প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পুস্তিকার (১৩৪৩) অন্তর্ভুক্ত হয়। ভিন্ন পাঠে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৩৫১ ও তৎপরবর্তী সংস্করণেও ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আষাঢ় ১৩৪৮) পুস্তিকারও অন্তর্গত।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আষাঢ় ১৩৪৮) পুস্তিকায় প্রথম প্রকাশিত ও তাহার কিছুকাল পূর্বে লিখিত।

তৃতীয় প্রবন্ধটি 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' নামে ১৩৪০ আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতনে পঠিত। ইতিপূর্বে উহা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের অধিককাল শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশই সংকলিত। এগুলি ইতিপূর্বে কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত সকল রচনাই গৃহীত হইল।

১৩০৮ সালের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতীয় পরিষদ্ সভার প্রতিষ্ঠা।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু' রচনার কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ক্রমশ অধিকার করিতে থাকে; শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে লিখিত কোনো কোনো পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"সিকাগো। ৩ মার্চ [১৯১৩]।...এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে।... মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?... মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখিদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে না?"...

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২০। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, কষ্টিপাথর।

"লস এঞ্জেলস্। ১১ অক্টোবর ১৯১৬।... তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।"— চিঠিপত্র ২।

"...বিশ্বভারতীর উদ্যোগ। গত [১৩২৫] ৮ই পৌষে তাহার সূচনা হয় এবং গত বৎসরই চিত্র, সংগীত প্রভৃতি কলা এবং সংস্কৃত, পালি ইংরেজি প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয়।" "গত বৎসর [১৩২৫] ৮ই পৌষে আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়, এবং বর্তমান বৎসরের [১৩২৬] ১৮ই আষাঢ় ইহার নিয়মানুযায়ী কার্যের আরম্ভ হয়।" "বিগত ২৩ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ [১৩৬৮] বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক...সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়"— এই তারিখই বর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবস বলিয়া স্বীকৃত ; এই দিন "সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ" করা হয়।

বিশ্বভারতীর সূচনা হইবার পর, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া The Centre of Indian Culture প্রভৃতি প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করেন (১৯১৯)। "আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি। বিষয়টি এত বড়ো যে আমাদের এই ছোটো পত্রপুটে তাহা ধরিবে না। সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি।" এই 'মর্ম' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ বৈশাখ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয় ; উহাই বর্তমান গ্রন্থের ১-সংখ্যক প্রবন্ধ।

"গত [১৩২৬] ১৮ই আষাঢ় আশ্রমের অধিপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রারম্ভোৎসব সমাধা করিয়া বিশ্বভারতীর কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।" এই কার্যারম্ভের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহার সারসংকলন বর্তমান গ্রন্থের ২-সংখ্যক প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইল ; প্রথমে ইহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বিগত ২৩ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ [১৩২৮] বোলপুরে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মহাশয়ের নূতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির, ডাক্তার মিস্ ক্রামরিশ্, শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়ার্সন, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, স্যার নীলরতন সরকার, দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস্ কে রুদ্র, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।...সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন...।"—

"আমি ইচ্ছা করি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কিছু বলেন। আমাদের কী কর্তব্য, এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতিক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।"

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহা এই গ্রন্থের ৩-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত হইল— পূর্বে তাহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সভাপতি রূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণের 'সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

৪-সংখ্যক রচনাটি 'আলোচনা : বিশ্বভারতীর কথা' নামে ১৩২৯ ভাদ্র ও আশ্বিনসংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়— "গত ২০শে ফাল্গুন বিশ্বভারতীর কয়েকটি নবাগত ছাত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম।" এই আলোচনার পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি চাই, তোমরা বিশ্বভারতীর নূতন ছাত্রেরা খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন করে কাজ করে যাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অনুরোধ যে, তোমরা এখানকার তপস্যাকে শ্রদ্ধা করে চলবে, যাতে এই প্রাণ-দিয়ে-গড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রদ্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।"

'বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার -কল্পে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে যে একটি সভা স্থাপিত হয়', ১৩২৯ সালে তাহার একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন, ৫-সংখ্যক রচনা সেই বক্তৃতার অনুলিপি ; 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী : লেভি-সাহেবের বিদায়-সম্বর্ধনার পরে আলোচনাসভা' নামে ইহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে 'আশ্রম সংবাদ'-এ প্রকাশিত সিলভ্যাঁ লেভি-সম্পর্কিত বিবরণ হইতে বক্তৃতার তারিখটি অনুমিত।

১৯২২ সালের ২১ অগস্ট রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, ৬-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি। *Presidency College Magazine*-এ (VOL IX NO. I. September 1922) তাহা 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় WELCOME. RABINDRANATH-শীর্ষক রচনায় এই বক্তৃতার আনুষঙ্গিক বিবরণ মুদ্রিত আছে।

৭-সংখ্যক রচনা, ১৩৩০ সালের নববর্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে নববর্ষের উৎসবে আচার্যের উপদেশ ; ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে 'নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮-সংখ্যক প্রবন্ধ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ৫ বৈশাখ ১৩৩০ তারিখে কথিত আচার্যের উপদেশের অনুলিপি—শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি প্রবাসীর ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় কষ্টিপাথর-বিভাগে 'তীর্থ' নামে অংশত মুদ্রিত হয়।

৯-সংখ্যক রচনা 'বিশ্বভারতী' নামে ১৩৩০ পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়।

১৩৩০ সালে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থের ১০-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত। প্রথমে উহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় '৭ই পৌষ : দ্বিতীয় ব্যাখ্যান' আখ্যায় মুদ্রিত হয়।

১১-সংখ্যক রচনা, 'দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবার পূর্ব-রাত্রে (১৭ ভাদ্র ১৩৩১) শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত 'যাত্রার পূর্বকথা' নামে ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

১৩৩২ সালের ৯ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১২-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি। ১৩৩২ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রের ক্রোড়পত্ররূপে, পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ইহা প্রচারিত হয়।

১৩-সংখ্যক রচনা ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতী পত্রে প্রকাশিত হয়, ও ১৩৩৩ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে কষ্টিপাথর-বিভাগে ('ভিক্ষা') উদ্ধৃত হয়।

১৪-সংখ্যক রচনা একটি আলোচনার অনুলিপি ; প্রথমে ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বিচিত্রায় 'কর্মের স্থায়িত্ব' নামে প্রকাশিত হয়।

১৩৩৯ সালের ৯ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদ্-সভায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ ১৫-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত। ইহার প্রথমে *Visva-Bharati News*-এর January 1933, Paush Utsav Number-এ 'আচার্যদেবের অভিভাষণ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩৪১ সালের ৮ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদ্-সভায় আচার্যের অভিভাষণ বর্তমান গ্রন্থের ১৬-সংখ্যক প্রবন্ধ। ইহা পূর্বে ১৩৪১ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসী পত্রে 'ধারাবাহী' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে ১৩৪২ সালের ৮ পৌষ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহা এই গ্রন্থের ১৭-সংখ্যক রচনা। এই বক্তৃতার অন্য একটি অনুলিপি 'বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮-সংখ্যক রচনা, ৫ সালের ৮ পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণ— পূর্বে ১৩৪৫ মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিশ্বভারতী' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩৪৭ সালের ৮ শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন এই গ্রন্থের ১৯-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি ; ইহা ১৩৪৭ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশ্রমের আদর্শ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর সূচনা কার্যারম্ভ প্রভৃতি সংক্রান্ত যে-সকল তারিখ ও বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদন, ও অন্যান্য বিবরণী হইতে গৃহীত।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে।

প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ : ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রগণের প্রতি যে উপদেশ দেন তাহা সমসাময়িক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ ১৮২৩ শক) 'শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব'-বিবরণের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। "সর্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন।" উপদেশান্তে "বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।"

উপদেশটি পূর্বে সুধীরচন্দ্র কর -প্রণীত 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ' গ্রন্থে (১৩৩৬) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রথম কার্যপ্রণালী : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরেই লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; 'রবীন্দ্রজীবনী'কার অনুমান করেন, 'ইহাই শান্তিনিকেতম বিদ্যালয়ের প্রথম constitution বা বিধি'। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন— 'শান্তিনিকেতনের কাজে ১৯০৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কীভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাহেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রখানি কুড়িপৃষ্ঠাব্যাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমত হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা। তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই যে তাঁহার অন্তরে শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি লেখা কবিগুরুর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিন-দশেক পূর্বে— খুব উদ্‌বেগের একটি সময়ে, পত্রশেষে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।'

পত্রখানি কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিত। 'স্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত (পৃ ১১), শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত, সমসাময়িক একটি পত্রে এই চিঠিখানির উল্লেখ আছে—

"কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনা-কার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

"বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইহাকে লিখিয়াছিলাম। এই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।

"বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি, জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষসভার সভাপতি আপনি ও কার্যসম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাস করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি, আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন।"

১৩১০ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আলমোড়া হইতে লিখিত একটি পত্রে কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের পরিচয়-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়া কুঞ্জবাবুর হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক— সুতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ী করেন— তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি। আমার সঙ্গেও তাঁহার স্বভাবের ঐক্য নাই— থাকিলে আনন্দ পাইতাম কাজ পাইতাম না।"

পত্রখানি যে কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা অনুমান করেন, তিনিই বর্তমান মন্তব্যে সংকলিত পত্র দুইখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সমবায়নীতি

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের শততম সংখ্যারূপে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬০ সালের চৈত্র মাসে।

সমবায়নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও ভাষণদান করিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে গ্রন্থখানির সকল প্রবন্ধই অন্তর্ভুক্ত হইল।

সাময়িক পত্রে রচনাগুলির প্রকাশের সূচী দেওয়া হইল—

সমবায় ১ : ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩২৫
সমবায় ২ : বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩২৯
ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা : ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩৩৪
সমবায়নীতি : পুস্তিকাকারে প্রকাশ, ২৭ মাঘ ১৩৩৫
পরিশিষ্ট। 'চরকা' প্রবন্ধের[১] অংশ : সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩৩২

ভূমিকা-রূপে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের বাণী সুধীরচন্দ্র কর -লিখিত 'লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৬০) অংশত প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের কর্মীদের প্রতি আশীর্বাণীরূপে ইহা প্রেরিত হইয়াছিল (১৯২৮); অন্যতম কর্মী নন্দলাল চন্দ্রের সৌজন্যে এই তথ্য এবং এই রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

এই তালিকায় উল্লিখিত 'ভাণ্ডার' বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন সমিতির মুখপত্র। সমবায় ১ প্রবন্ধ ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমবায় ২ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে কল্পিত— তাঁহার 'জাতীয় ভিত্তি' (১৩৩৮) গ্রন্থে ভূমিকা-রূপে ইহা মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত এক অনুচ্ছেদ ঐ ভূমিকায় (ও বর্তমান গ্রন্থে) মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯২৭ সালের "২রা জুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় [অ্যালবার্ট হলে] বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতি -কর্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন", হিরণকুমার সান্যাল ও সজীনকান্ত দাস -লিখিত তাহার অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ভাণ্ডার পত্রে 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামে মুদ্রিত হয়।

শ্রীনিকেতনে ১৩৩৫ সালের ২৭ মাঘ সর্ ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সভাপতিত্বে বর্ধমান বিভাগীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়— রবীন্দ্রনাথ তাহার উদ্‌বোধনকালে যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাহা ঐ উপলক্ষে 'সমবায়নীতি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (২৭ মাঘ ১৩৩৫)।

১ কালান্তর : রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪(সুলভ ১২)

পরিশিষ্টে ('চরকা' প্রবন্ধে) রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন 'আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন', নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম।

'জনসাধারণের নিজের অর্জনশক্তিকে মেলাবার উদ্যোগ', 'অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার উপায়', যাহাতে মানুষ 'মিলিয়া বড়ো হইবে', 'শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় বড়ো হইবে'— সমবায়ের এই মূলতত্ত্ব দেশের উন্নতির পন্থারূপে রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক রচনায় আলোচিত হইয়াছে— নিজের জমিদারিতে ও পরে বিশ্বভারতীতে তাহা কার্যতও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তাহার বিবরণ আছে— "রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে··· সমবায়শক্তি জাগরূক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারি কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই"। সমবায়-সমিতি-রূপে পরিকল্পিত 'হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি উহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই পুস্তকে সমবায়নীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত রচনাদিই মুদ্রিত হইল। পরিশিষ্ট ব্যতীত অন্য রচনাগুলি পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই।

খৃষ্ট

খৃষ্ট-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ, এবং নানা প্রবন্ধে চিঠিপত্রে অথবা অভিভাষণে খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে মূলত তাহারই সংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে খৃষ্ট গ্রন্থের মূল প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলিই সংকলিত হইল, 'খৃষ্ট-প্রসঙ্গ'র রচনাংশগুলি অন্তর্ভুক্ত হইল না।

'মানবপুত্র' পুনশ্চ গ্রন্থের (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ : সুলভ ৮) অন্তর্গত হইয়াছে, সেজন্য বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল না।

'বড়োদিন' ও 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' ইতিপূর্বে রচনাবলীর কোনো খণ্ডে সংকলিত না হওয়ায় নিম্নে মুদ্রিত হইল।

বড়োদিন[১]

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি ;
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর !
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।'

বড়োদিন। ১৯৩৯

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬। চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'ছায়াপথ' পত্রে ভিন্নতর পাঠ মুদ্রিত।

পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে[১]

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বলছেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্ছ,
তোমাদের কাছে এ কি কিছুই নয়।
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য।"
পুণ্য দীক্ষা-অনুষ্ঠান শেষ হল।
মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাসবাণী—
"এসো আমার কাছে, যারা কর্ম্মক্লিষ্ট,
এসো যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
শুনলুম, "ঊর্ধ্বে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেছি তোমারই দিকে।"
চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন ক'রে চলেছে।
ক্লান্ত আক্রান্ত গুরুভারে,
তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্‌বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল্ আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত তৃষার্ত তারা, ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।
এ দিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্ম্মমতা
সে আমারই প্রতি।"

২২ এপ্রিল ১৯৪০
মংপু। দার্জিলিং

১ 'চার্লস্ অ্যান্ড্রুজের রচিত কবিতার অনুবাদ।' ১৩৪৭ আষাঢ় সংখ্যা 'সমসাময়িক' পত্রে প্রকাশিত।

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "১৩১৬ সালে মহাপুরুষদিগের জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে তাঁহাদিগের চরিত ও উপদেশ -আলোচনার জন্য [শান্তিনিকেতনে] উৎসব করা স্থির হইল। খৃষ্টমাসে প্রথম খৃষ্টোৎসব হইল। তার পরে চৈতন্য ও কবীরের উৎসব হইয়াছিল। সকল মহাপুরুষকেই ভালো করিয়া জানিবার ও বুঝিবার সংকল্প হইতেই এ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি।"

এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনে নিয়মিতভাবে খৃষ্ট-জন্মদিনে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

যিশুচরিত : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৩ শক (১৩১৮)

'শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসবের দিনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।' অজিতকুমার চক্রবর্তী -প্রণীত 'খৃষ্ট' গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে এই রচনা ব্যবহৃত।

খৃষ্টধর্ম : সবুজপত্র, পৌষ ১৩২১

'খৃষ্টজন্মদিনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত।'

খৃষ্টোৎসব : শান্তিনিকেতন পত্র, চৈত্র ১৩৩০

মানবসম্বন্ধের দেবতা : বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪০

এই অভিভাষণ প্রথমে 'খৃষ্টোৎসব' নামে ১৩৩৮ আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা মুক্তধারা পত্রে প্রকাশিত হয় ; পরে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' নামে বিচিত্রা পত্রে প্রকাশ পায় ; তাহাই এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

বড়োদিন : প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৯

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে খৃষ্টদিবসের উদ্‌যাপন-উদ্দেশে রচিত গান।

খৃষ্ট : প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩

৩-সংখ্যক ভাষণ প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক, ৫-সংখ্যক ভাষণ অমিয় চক্রবর্তী -কর্তৃক, ৪ ও ৬ -সংখ্যক ভাষণ পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক অনুলিখিত এবং সমস্তই বক্তা -কর্তৃক সংশোধিত। ২-সংখ্যক প্রবন্ধটিও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি হওয়া সম্ভব। ১-সংখ্যক 'বক্তৃতার সারমর্ম' বক্তা-কর্তৃক বিস্তারিত আকারে পুনর্লিখিত বলিয়া অনুমিত।

পল্লীপ্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য -সূচক প্রবন্ধ ভাষণ ও পত্রাদির সংকলন। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার (২৩ মাঘ ১৩২৮) সাংবার্ষিক উৎসবোপলক্ষে রবীন্দ্রশতপূর্তি বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৩ মাঘ ১৩৬৮ সালে।

ভারতবর্ষে পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে সংকলিত।

এই গ্রন্থে প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত 'ফিরে চল্ মাটির টানে' গানটি, তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত পত্রগুলি এবং দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে গৃহীত হইল না। প্রবন্ধটি শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্গত। রচনাবলীর পরবর্তী কোনো খণ্ডে, 'শিক্ষা'র যে প্রবন্ধগুলি রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেইগুলির সহিত, উক্ত প্রবন্ধটিও যুক্ত হইবে।

গ্রন্থের প্রথম ভাগের অন্তর্গত 'সভাপতির অভিভাষণ' 'কর্মযজ্ঞ' 'পল্লীসেবা' 'গ্রামবাসীদের প্রতি' প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ববর্তী কয়েকটি খণ্ডে সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া বর্তমান খণ্ড রচনাবলীভুক্ত হইল না।

এই খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলির অধিকাংশই পূর্বে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই, সাময়িক পত্রে নিবদ্ধ ছিল। সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী দেওয়া হইল :

পল্লীর উন্নতি	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২২
ভূমিলক্ষ্মী	ভূমিলক্ষ্মী। আশ্বিন ১৩২৫
শ্রীনিকেতন	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
পল্লীপ্রকৃতি	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৩৫
দেশের কাজ	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৮
উপেক্ষিতা পল্লী	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪০
অরণ্যদেবতা	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৫
অভিভাষণ[১]	বিচিত্রা। পৌষ ১৩৪৫
শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৬
হলকর্ষণ	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৬
পল্লীসেবা	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪৬

॥ ২ ॥

অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন পত্র। ১৩২৯
সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ	সংহতি। ভাদ্র ১৩৩০
ম্যালেরিয়া	বঙ্গবাণী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
প্রতিভাষণ[২]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৩
বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৮
জলোৎসর্গ[৩]	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৩
সম্ভাষণ[৪]	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪৩
অভিভাষণ[৫]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭

প্রধান রচনাগুলি প্রথম ভাগে মুদ্রিত; দ্বিতীয় ভাগে প্রাসঙ্গিক বিবিধ রচনার সংগ্রহ।

পল্লীর উন্নতি। কর্মযজ্ঞ : বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথের দুইটি বক্তৃতা।

ভূমিলক্ষ্মী : 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনা প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ কষ্টিপাথর বিভাগ হইতে সংকলিত।

অভিভাষণ : ১৩৪৫ সালের ২২ অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভবনে শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের উদ্‌বোধন করেন সুভাষচন্দ্র বসু, এই উপলক্ষে পঠিত রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত অভিভাষণ। তিনি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিভাষণে, 'তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান' বা 'তোমরা স্বদেশের প্রতীক' এই উক্তির লক্ষ্য কন্‌গ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র।

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ : শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত বর্তমান ভাষণে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে কালীমোহন ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, সি.এফ. অ্যান্ড্রুজ ও এল. কে. এলম্‌হার্স্ট্।

১ 'শ্রীনিকেতন' নামে মুদ্রিত
২ 'পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা' নামে মুদ্রিত
৩ 'রবিবাসরের অভিভাষণ' নামে মুদ্রিত
৪ 'অভিভাষণ' নামে মুদ্রিত
৫ 'কবির উত্তর' নামে মুদ্রিত

এই প্রবন্ধে যে 'ভাঙা বাড়ি', 'ভুতুড়ে বাড়ি'-র কথা বলা হইয়াছে (পৃ ৩৮০), হেমলতা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সেই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পত্রখানি হেমলতা দেবীর একটি প্রবন্ধের সহিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি হেমলতা দেবীর প্রবন্ধের শেষাংশ-সহ মুদ্রিত হইল।—

... তাঁর [রবীন্দ্রনাথ] ভ্রাতুষ্পুত্র আমার স্বর্গীয় স্বামীর [দ্বিপেন্দ্রনাথ] উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের। দখল নেওয়ার আদেশ এসেছিল তাঁরই কাছে। দখল নিতে গিয়ে দেখেন, বাড়িটির বহু খিলান ফাটা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেওয়ালের গায়ে ফাটল হয়ে গাছ বেরিয়েছে নানারকম। বললেন, অনেক টাকা খরচ না করলে এ বাড়ি বাস-যোগ্য হবে না। আমাকে বললেন, সেই খবর কবিকে চিঠি লিখে জানাতে।

খবর পেয়ে উত্তরে কবি যে পত্র লেখেন সেই পত্রখানি—

508, W. High Street
Urbana Illinois
২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

বৌমা— তোমাদের কাছে সুরুলের বাড়ির বর্ণনা শুনে বোঝা গেল, আমার ভাগ্যের কিছু পরিবর্তন হয় নি। কেনাবেচার বাজারে আমাকে চিরদিন ঠকতেই হবে— ঠকার সীমা যদি ঐ টাকার থলির মধ্যেই বদ্ধ থাকে তা হলেও তেমন ক্ষতি নেই, ফাঁড়া তা হলে ঐখানেই কেটে যায়। যা হোক, কাজ যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে তখন লোকসানের দিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে পরিতাপ করে কোনো ফল নেই— ওর মধ্যে যতটুকু লাভ আছে, তা যত সামান্যই হোক, সেইটেকেই প্রচুর জ্ঞান করে তাকে যথাযোগ্য ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করা কর্তব্য— ওর দেয়াল ফাটা, ওর গাছগুলো বুড়ো, ওর চারি দিকে জঙ্গল এ বলে মন ভারী করে বসে থাকলে ঠকাটিকে কেবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলা হবে। যে আটহাজার টাকা আমার গেছে, সে তো গেছেই— কিন্তু তার বদলে যেটুকু পেয়েছি তাকে পেয়েছি বলেই গণ্য করতে হবে। আমার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে কী রকমে কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে তা এতদূর থেকে বলা এবং ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে শক্ত। তোমরা সকলে পরামর্শ করে যেরকম ভালো বোধ কর তাই করো। আর কিছু না হোক, জমি অনেকটা আছে ওর মধ্যে, কিছু কিছু চাষ হতে পারে না কি? সন্তোষের গোয়ালঘরের কল্যাণে গোবরের সারের তো অভাব হবে না। এখন থেকে ফল গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে ওতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিতে পারলে হয়তো আমের সময় ছেলেদের জন্য কিছু আম পাওয়া যেতে পারে।...

হলকর্ষণ : নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত একখানি চিঠি এই অভিভাষণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"আজ সুরুলে হলচালন উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্র-যোগে কাজটা করতে হবে ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাল-লাঙল কাঁধে করে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে। বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল-লাঙলের উদ্‌ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে

পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে খাদ্য উদ্ধার করে ; মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র-উদ্‌ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর কর্মে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় বলে থাকি— dignity of labour, অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে-অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা বলেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল-লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্‌ভাবন-কৌশলের আদিম প্রকাশ ব'লে। সেইখানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তা হলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে— আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে— সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই বলে আক্ষেপ করছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে, তাতে করে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধি ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি— কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে— একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬

পথে ও পথের প্রান্তে

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে মুদ্রিত অপর সকল রচনাই শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারি) বা হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ -উৎসবে কথিত ভাষণের অনুলিপি। 'পল্লীপ্রকৃতি', অনুরূপ অনুলিপি অবলম্বনে কবি-কর্তৃক পরিবর্ধিত আকারে লিখিত হয় (মুদ্রণকালে আরো পরিবর্তন হয়)।

অভিভাষণ : কলিকাতায় বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে এল· কে· এল্‌ম্‌হার্স্ট্ Robbery of the Soil[১] সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, এই সভার সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ।

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ : "বিশ্বভারতী সম্মিলনী ও অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে ২৯শে আগস্ট [১৯২৩] তারিখে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি গৃহে আহূত সভায় সভাপতির বক্তৃতা।" 'সংহতি'-সম্পাদক মুরলীধর বসু অনুগ্রহপূর্বক এই বক্তৃতার প্রতিলিপি 'সংহতি' হইতে আমাদের দেন ; তিনি আমাদের জানাইয়াছিলেন যে, এই অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত।

ম্যালেরিয়া : "অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সভায় সভাপতি রূপে প্রদত্ত বক্তৃতা। অ্যাল্‌ফ্রেড থিয়েটার হল। ২৩।২। [১৯] ২৪।" অনুলিপি-পাঠে মনে হয় যে উহা বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত নহে। তৎসত্ত্বেও প্রসঙ্গানুরোধে যৎসামান্য আক্ষরিক সংশোধনে পুনর্মুদ্রিত হইল। বর্তমান প্রসঙ্গে 'সমাধান' প্রবন্ধের (১৩৩০) অংশবিশেষ উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

১ প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কৃত অনুবাদ 'মাটির উপর দস্যুবৃত্তি', শান্তিনিকেতন পত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

"সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেছে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।— বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মনমরা করে দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমন প্রকৃতির কাজ এমন ধরনে করতে পারব যা এখন পারি নে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি— কিন্তু সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে? অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

"এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে উঠলেন, দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড়ো কথা বলবার ভরসাকেই তো আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরু-মানা অবতার-মানা দেশে এত বড়ো বুকের পাটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

"এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হল।"

"স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত-দ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মতো প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জের জন্যে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পিলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতি-সাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

"ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এতে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুনতি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে যায়। স্বরাজ বলো, সভ্যতা বলো, মানুষের যা-কিছু মূল্যবান ঐশ্বর্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক-না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই ব'লেই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষের মন পরিমাণ হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার, এই অবুদ্ধির, জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না, এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে এই আমাদের কাজ। এ কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যাঁরা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ন হবেন, সত্যতা থেকে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিতে পারেন।"[১]

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৪৯৬-৯৭ (সুলভ ১২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ· ৭২৪-২৫)

প্রতিভাষণ : ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গভ্রমণে যান, এই সময় ময়মনসিংহেও গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল তাহার উত্তর।

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত : এই প্রবন্ধ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধক্রমে রচিত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এই সংবাদ দিয়াছেন। 'বাংলার তাঁতি' নামে ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'তেও প্রকাশিত হইয়াছিল। মোহিনী মিল -কর্তৃক প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়।

জলোৎসর্গ : "এবারকার বর্ষামঙ্গলে একটু নূতনত্ব ছিল। চিরপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে [৭ ভাদ্র ১৩৪৩]। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটিকে খনন ক'রে নির্মল জলের সম্বল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয়-প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল-উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়, তাই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়।... সর্বশেষে কবি... নব-উৎসারিত জলকে অভিনন্দিত ক'রে একটি অভিভাষণ দ্বারা উৎসবকে সুসম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত করলেন।"[১]

সম্ভাষণ : অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসর' শান্তিনিকেতনে এক অধিবেশনে সমবেত হন, তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহার অনুলিপির একাংশ।

অভিভাষণ : ১৩৪৬ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় যান। জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে এই ভাষণ।

এই গ্রন্থে সংকলিত অনেকগুলি রচনাই বক্তৃতার অনুলিপি, অধিকাংশ স্থলে কবি-কর্তৃক সংশোধিত— কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সে কথা সাময়িক পত্রে উল্লিখিত ; অপর কোনো-কোনো স্থলে তাহা অনুমান করা যায়। তবে কতক সংকলন যে যথোচিত অথবা সংশোধিত অনুলিপি নহে তাহাও সহজেই বুঝা যায়— বিষয়গুণে এগুলিও রক্ষিত হইল।

পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন পুলিনবিহারী সেন ; বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ও তিনি রচনা করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে অন্যান্য বিবরণ স্বতন্ত্রমুদ্রিত পল্লীপ্রকৃতির গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রষ্টব্য।

১৩১৭ সালে 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগী -কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সেই চিঠিটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রটি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

এই পত্রে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগের কাল, ১৩০৭ স্থলে ১৩০৯ হইবে।

এই খণ্ড সংকলনের কাজে সহায়তা করিয়াছেন অমিয়কুমার সেন।

১ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩। প্রবন্ধটিতে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

অচলিত সংগ্রহ ১

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল।

[ ] বন্ধনী-চিহ্নে প্রদত্ত ইংরেজি তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

কবি-কাহিনী

রচনার দিক দিয়া 'বন-ফুল' পূর্ববর্তী হইলেও 'কবি-কাহিনী'ই পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা এবং ইহা একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। সংবৎ ১৯৩৫ [৫ নভেম্বর ১৮৭৮] ইহা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৩। ইহা পুনরমুদ্রিত হয় নাই।

কবি-কাহিনী প্রথম বৎসরের 'ভারতী'র (১২৮৪ সাল) পৌষ হইতে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ষোলো বৎসর। এই পুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

এই কবি-কাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।

—প্রথম সংস্করণ, পৃ· ১০৮

এই উক্তির মধ্যে সামান্য একটু ভুল আছে ; রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে থাকিতে এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। 'কবি-কাহিনী' ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পুস্তক তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত "উৎসাহী বন্ধু"ই 'কবি-কাহিনী'র প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

বন-ফুল

'বন-ফুল' রবীন্দ্রনাথ-লিখিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। ইহা ১২৮৬ সালে [৯ মার্চ ১৮৮০] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৩। ইহা পুনরমুদ্রিত হয় নাই।

এই কাব্যের রচনাকাল অন্তত আরো চার বৎসর পূর্বে। কারণ, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' -নামক মাসিক পত্রে (সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস) ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, অগ্রহায়ণ সংখ্যা পত্রিকা ১৪ ফাল্গুন প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে কয়েক সংখ্যা পত্রিকায় (পৌষ, ফাল্গুন ১২৮২ ; বৈশাখ, আষাঢ় ১২৮৩) 'বন-ফুল' বাহির হয় নাই।

ভগ্নহৃদয়

এই বিচিত্র নাট্য-কাব্যখানি ১৮০৩ শকে [২৩ জুন ১৮৮১] মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯৬। ইহা পুনরমুদ্রিত হয় নাই।

সমগ্র পুস্তক মোট ৩৪ সর্গে সমাপ্ত। ১২৮৭ সালের কার্তিক হইতে ফাল্গুন অবধি 'ভারতী' পত্রে ধারাবাহিকভাবে ইহার প্রথম ছয় সর্গ বাহির হয়।

'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

বিলাতে আর এক একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। "ভগ্নহৃদয়" নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল।... 'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো।'

—প্রথম সংস্করণ, পৃ· ১২৭

এই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি 'ভারতী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে'র "উপহার"-রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় "উপহার"টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে।

'ভগ্নহৃদয়' স্বতন্ত্রাকারে বিলুপ্ত হইলেও ইহার বহু অংশ সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথের নানা সংগীত ও কাব্য -সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে। আজও গাওয়া হইয়া থাকে বা গাওয়া যাইতে পারে তাহা গীতবিতান, বিশেষত উহার প্রচল তৃতীয় খণ্ড (১৩৭৬ বা ১৩৭৯), দেখিলে বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে (আশ্বিন ১৩০৩) ভগ্নহৃদয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলেও যেমন ইহার কয়েকটি গান আছে তেমনি ২২টি সর্গ হইতে (মোট সর্গসংখ্যা ৩৪) অন্যূন ২৯টি রচনাংশ, স্বয়ংপূর্ণ কবিতা হিসাবে, 'বাসকসজ্জা' 'শ্যামা' 'চাঞ্চল্য' প্রভৃতি শিরোনামে "কৈশোরক" অংশে (দ্রষ্টব্য পৃ· ৫-১৫) দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ বর্জনের অপমান এটিকে সহিতে হয় নাই। বস্তুত, নানা রূপে রূপান্তরে সামগ্রিক রবীন্দ্র-রচনাধারায় সূক্ষ্মভাবে ইহার সত্তা মিলিয়া মিশিয়া আছে।

ভগ্নহৃদয় গ্রন্থ প্রকাশের শতবর্ষ পরে মাঘ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি-আধারিত বিচার-বিশ্লেষণ -সংবলিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রুদ্রচণ্ড

'রুদ্রচণ্ড' কবির প্রথম নাটক (গীতনাট্য নহে)। ইহা ১৮০৩ শকে [২৫ জুন ১৮৮১] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৩। 'রুদ্রচণ্ড' পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার দুইটি গান গীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত ; উহাই সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারে "ফুলের ইতিহাস" নামে শিশু কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

'রুদ্রচণ্ডে'র গান দুইটি ১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র "কৈশোরক" অংশে স্থান পাইয়াছিল।

কালমৃগয়া

এই গীতিনাট্য ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে [৫ ডিসেম্বর ১৮৮২] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮। বর্তমানে ইহা তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে পুনর্মুদ্রিত।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট "অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কাল-মৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ (শনিবার) তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো-ভবনে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সম্মিলন উপলক্ষে 'কালমৃগয়া' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন—

বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে ষ্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল— ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।... অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

—প্রথম সংস্করণ, পৃ· ১৩৯, ১৪১

'কালমৃগয়া'র প্রথম তিনটি দৃশ্যের গানগুলি এবং চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম তিনটি গান প্রতিভাসুন্দরী দেবী -কৃত স্বরলিপিসহ ১২৯২ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'বালক' পত্রিকায় বাহির হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক। ১৮০৫ শকের ভাদ্র মাসে [১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯। ইহা অদ্যাবধি পুনরমুদ্রিত হয় নাই।

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শেষ রচনা "সমাপন" (সূচীতে "সমাপন ও উৎসর্গ" পুস্তকের জন্যই বিশেষ ভাবে লিখিত) ব্যতীত সকল প্রবন্ধই 'ভারতী'তে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।—

মনের বাগান-বাড়ি	শ্রাবণ ১২৮৮	ফল ফুল	আশ্বিন ১২৮৮
গরীব হইবার সামর্থ্য	শ্রাবণ ১২৮৮	মাছ ধরা	আশ্বিন ১২৮৮
কিস্তু-ওয়ালা	শ্রাবণ ১২৮৮	ইচ্ছার দাম্ভিকতা	আশ্বিন ১২৮৮
দয়ালু মাংসাশী	শ্রাবণ ১২৮৮	অভিনয়	আশ্বিন ১২৮৮
অনধিকার	বৈশাখ ১২৮৯	খাঁটি বিনয়	আশ্বিন ১২৮৮
অধিকার	বৈশাখ ১২৮৯	ধরা কথা	আশ্বিন ১২৮৮
আত্মীয়ের বেড়া	মাঘ ১২৮৮	অন্ত্যেষ্টিসৎকার	আশ্বিন ১২৮৮
বেশি দেখা ও কম দেখা	মাঘ ১২৮৮	দ্রুত বুদ্ধি	আশ্বিন ১২৮৮
বসন্ত ও বর্ষা	ভাদ্র ১২৮৮	লজ্জাভূষণ	মাঘ ১২৮৮
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল	ফাল্গুন ১২৮৮	ঘর ও বাসাবাড়ি	মাঘ ১২৮৮
আদর্শ প্রেম	ফাল্গুন ১২৮৮	নিরহংকার আত্মম্ভরিতা	মাঘ ১২৮৮
বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা	ফাল্গুন ১২৮৮	আত্মময় আত্মবিস্মৃতি	মাঘ ১২৮৮
আত্মসংসর্গ	ফাল্গুন ১২৮৮	ছোটো ভাব	পৌষ ১২৮৮
বধিরতার সুখ	ফাল্গুন ১২৮৮	জগতের জন্ম-মৃত্যু	পৌষ ১২৮৮
শূন্য	ভাদ্র ১২৮৮	অসংখ্য জগৎ	পৌষ ১২৮৮
স্ত্রৈণ	ভাদ্র ১২৮৮	জগতের জমিদারি	পৌষ ১২৮৮
জমা খরচ	ভাদ্র ১২৮৮	প্রকৃতি পুরুষ	চৈত্র ১২৮৮
মনোগণিত	ভাদ্র ১২৮৮	জগৎ-পীড়া	চৈত্র ১২৮৮
নৌকা	ভাদ্র ১২৮৮		

নলিনী

এই নাট্যকাব্যটি ১২৯১ সালে [১০ মে ১৮৮৪] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬। ইহা পুনরমুদ্রিত হয় নাই।

নলিনীর আংশিক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে বর্তমান। ইহার আলোচনা হইতে নলিনীর রচনা সম্পর্কে কিছু তথ্যও জানা যায়; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-বিবরণ: নলিনী। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫, পৃ· ১৭৯।

পরবর্তী 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) গীতিনাট্যের বিজ্ঞপ্তিতে 'নলিনী'র সহিত উহার সাদৃশ্যের বিষয়ে কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু উল্লেখ করা যায়, 'নলিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' উভয় রচনারই মূলগত প্রেরণা 'মায়ার খেলা'য় সার্থকভাবে পুনশ্চ সক্রিয় হইয়াছে।

শৈশবসঙ্গীত

এই কবিতাসংগ্রহ পুস্তকটি ১২৯১ সালে [২৯ মে ১৮৮৪] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯। ইহা পুনরমুদ্রিত হয় নাই।

'শৈশবসঙ্গীতে'র নিম্নলিখিত কবিতাগুলি 'ভারতী'তে এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।—

ফুলবালা	কার্তিক ১২৮৫	কামিনী ফুল	ভাদ্র ১২৮৭
দিকবালা	আষাঢ় ১২৮৫	প্রেমমরীচিকা	ফাল্গুন ১২৮৬
প্রতিশোধ	শ্রাবণ ১২৮৫	গোলাপবালা	অগ্রহায়ণ ১২৮৭
ছিন্ন লতিকা	অগ্রহায়ণ ১২৮৪	হরহৃদে কালিকা	আশ্বিন ১২৮৭
ভারতী-বন্দনা	মাঘ ১২৮৪	ভগ্নতরী	আষাঢ় ১২৮৬
লীলা	আশ্বিন ১২৮৫	পথিক	পৌষ ১২৮৭
অপ্সরা-প্রেম	ফাল্গুন ১২৮৫		

অতীত ও ভবিষ্যৎ, ফুলের ধ্যান, প্রভাতী, লাজময়ী-- এই চারিটি কবিতা একেবারেই বর্তমান কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। তন্মধ্যে শেষোক্ত কবিতা, অবশ্য, ইতঃপূর্বে ভগ্নহৃদয়ের সপ্তম সর্গে সূচনাতেই (দ্রষ্টব্য পৃ· ৫৫৬-৫৭) অনিলের গান -রূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। উভয়ে সামান্য পাঠভেদ আছে (উভয়ত্র পঞ্চম ছত্র দ্রষ্টব্য)— 'লাজময়ী' অভিনব পাঠ হিসাবেই পুনরমুদ্রিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কাব্য গ্রন্থাবলীতে (১৩০৩। পৃ· ৮) পুনশ্চ ইহার পরিবর্তন ও ২ ছত্র বর্জন করা হয়।

বাল্মীকি প্রতিভা

ইহা ১৮০২ শকের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্ভবত বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানপত্র-হিসাবে। 'ভারতী'র তৎকালীন প্রচ্ছদপট এই পুস্তকের মলাট হইয়াছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৩। আন্দাজ ১৮৮১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। পুস্তকটিও এই দিনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল।··· আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই [বিদ্বজ্জনসমাগম] সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল—ইহাই

শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল— বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।... বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

—প্রথম সংস্করণ, পৃ· ১৩৮-৪১

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে [২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬] পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, 'কালমৃগয়া'র কিয়দংশ তখনই ইহাতে যুক্ত হয়। এই নাটিকার পরবর্তী সংস্করণ মূল রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে এবং বর্তমানে-প্রচলিত গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে পুনরমুদ্রিত হইয়াছে।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী। ১৩৭৯)।

প্রথম প্রকাশকালে (১৩৪৭) রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় রচনা করেন সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উহার কিছু কিছু তথ্য সংযোজন ও সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীকানাই সামন্ত ১৩৬৯ ও ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মুদ্রণে।

সংশোধন ॥ ৬৩৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নেপথ্যসংগীতে শেষ ছত্রের পূর্বে 'ফুলটির মৃদুপ্রাণ হায়' এই ভ্রষ্ট ছত্র সংযোজিত হইয়াছে।

৬৮৯ পৃষ্ঠার ১৯ ছত্রে বর্তমান সংস্করণে যে পরিবর্তিত পাঠ পাওয়া যাইবে তাহাই 'ভারতী' পত্রে মুদ্রিত শুদ্ধপাঠ।

বৈশাখ ১৩৬৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অচলিত সংগ্রহ: প্রথম খণ্ড

সুলভ সংস্করণ

সুলভ সংস্করণ

ISBN-81-7522-369-3 (V.14)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)